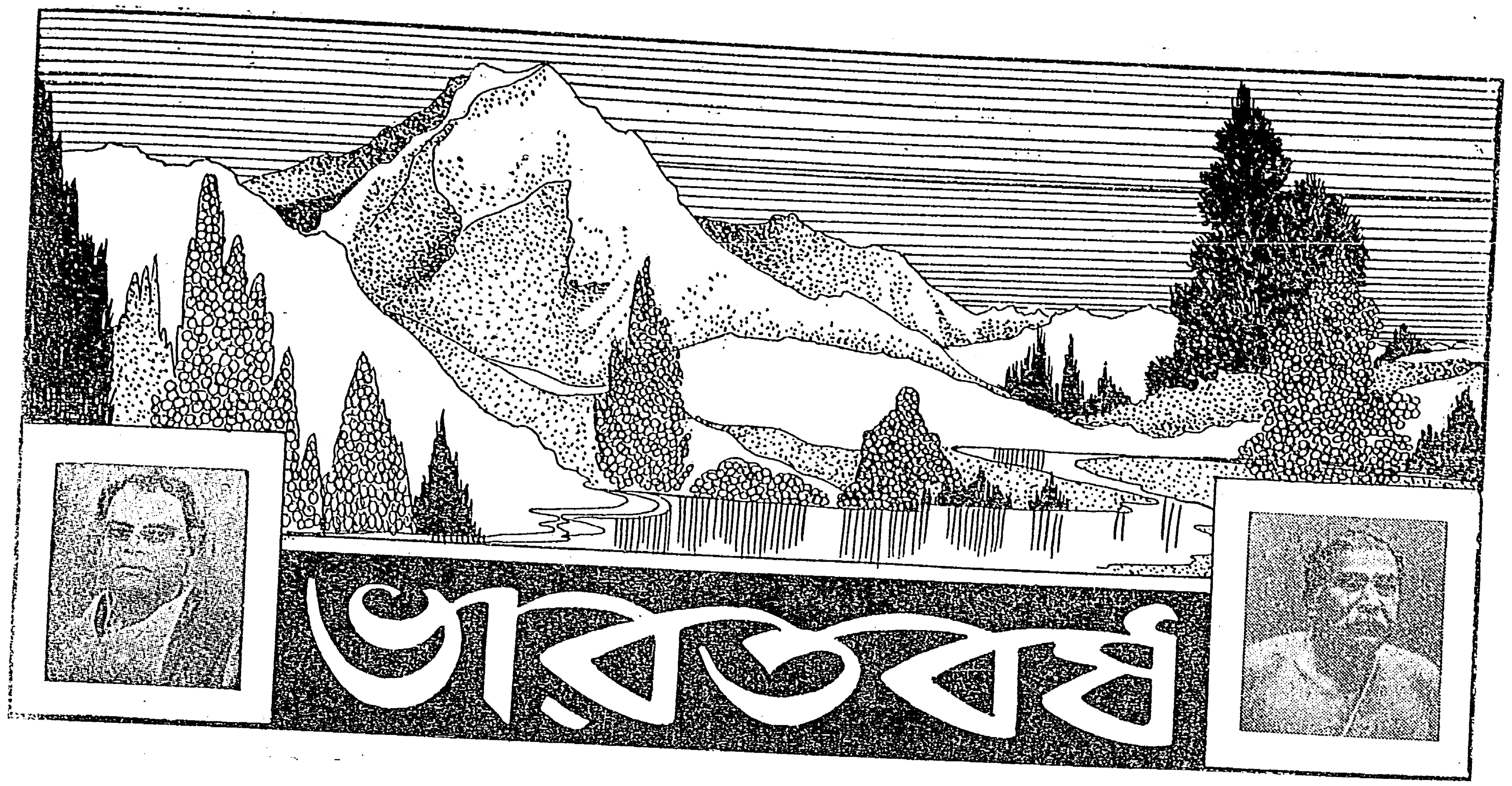

অগ্রহায়ণ—১৩৪৬

প্রথম খণ্ড	সপ্তবিংশ বর্ষ	ষষ্ঠ সংখ্যা

ব্রহ্মসূত্রের কোন্ ভাষ্য ব্যাস-সম্মত ?

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

ব্রহ্মসূত্র নামক গ্রন্থখানি ভগবদ্ ব্যাস প্রণীত। ইহা বহু নামে প্রসিদ্ধ, যথা—বেদান্তদর্শন, শারীরকসূত্র, উত্তর-মীমাংসা, ব্রহ্মমীমাংসা ইত্যাদি। এই ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থে ব্যাসদেব, উপনিষদের অর্থাৎ বেদান্তের সিদ্ধান্ত কি, তাহা নির্ণয় করিয়াছেন। উপনিষদের নানা স্থলে যে সব কথা আছে, তাহাতে প্রথমতঃ অনেকেরই উপনিষৎ-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সন্দেহ বা ভ্রম হইতে পারে, এই জন্য ব্যাসদেব উপনিষদের তাদৃশ স্থলগুলির একটা মীমাংসা করিয়া উপনিষদের কি সিদ্ধান্ত, তাহা দার্শনিক রীতির অনুসরণ করিয়া সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এজন্য ব্যাসদেব যে সূত্রগুলি রচনা করিয়াছেন, তাহা, ঐ সূত্রগ্রন্থের বর্ত্তমানে উপলভ্যমান সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ভাষ্যের মতে ৫৫৫টী মাত্র। কিন্তু উক্ত প্রাচীনতম ভাষ্যের পরে যে সব ভাষ্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তন্মতে ঐ সূত্রসংখ্যা অন্যরূপ। যেমন ভাস্কর মতে ৫৪১, রামানুজ মতে ৫৪৫, নিম্বার্ক মতে ৫৪৯ এবং মধ্ব মতে ৫৬৪ ইত্যাদি। ইহার কারণ, কেহ কোথায় দুইটী সূত্রকে একটী করিয়াছেন, কেহ কোথায় একটী সূত্রকে দুইটী করিয়াছেন, কেহ কোথায় বা পূর্ব্বপঠিত সূত্রকে বর্জ্জন করিয়াছেন, কোথায় কেহ বা আবার অতিরিক্ত সূত্রযোজনা করিয়াছেন। এইরূপ মতভেদ শঙ্করভাষ্যের পরবর্ত্তী সমস্ত ভাষ্যগুলির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করভাষ্য অপেক্ষা প্রাচীন ভাষ্য পাওয়া যায় না, এজন্য এই ব্যাপারটী শঙ্করভাষ্যে আছে কি-না বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু যদি ইহারও কারণ অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে বহু কথাই আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার প্রধান কারণ, ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থখানি উপনিষদের মীমাংসাবিশেষ, কোন ঋষি বা কোন সিদ্ধ-পুরুষ, অথবা কোন যোগী ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতামূলক

মতবাদ ইহা নহে। দ্বিতীয় কারণ, ভগবান্ নারায়ণের অবতার মহর্ষি বেদব্যাস, বেদার্থমীমাংসার জন্য যে "লোক ও বেদ সাধারণ নিয়মাবলী" আছে, সেই নিয়মাবলীর অনুসরণ করিয়া উপনিষদের মীমাংসা করিয়াছেন, আর তজ্জন্য "আদি বিদ্বান্" মহর্ষি কপিলের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ ঋষির মতবাদও ব্যক্তিবিশেষের মতবাদ বলিয়া, তাহার অনুসরণ করা অবৈধ, ইহাও ঘোষণা করিতে তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। এজন্য ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের ২।১।১ সূত্র দ্রষ্টব্য। আর এজন্য যেখানে তাঁহার নিজমত প্রকাশ করা আবশ্যক হইয়াছে, সেখানে তিনি নিজ নামেই সেই মীমাংসা বা সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। তৃতীয় কারণ, ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থখানি উপনিষদেরই মীমাংসা বলিয়া তাহাকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন বেদসেবী বেদপ্রামাণ্যবাদীরই কোনরূপ বাধা বা আপত্তি হইতে পারিবে না। পরিশেষে চতুর্থ কারণ এই যে, উপনিষদই সর্ব্বজ্ঞের উক্ত নিত্য অপৌরুষেয় বাক্যবিশেষ বলিয়া অলৌকিক বিষয়ে তাহারই প্রামাণ্য একমাত্র ও সর্ব্বোপরি বর্ত্তমান বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে। এইরূপ নানা কারণে মহর্ষি ব্যাসের ব্রহ্মসূত্রের এত আদর, এত প্রামাণ্য; অপর সকল দর্শন অপেক্ষা এজন্য বেদান্ত-দর্শনের এত প্রাধান্য। বস্তুত, সকলেই ইহাকে অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক মতের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। সকলেই এই ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের উপর ভাষ্যাদি রচনা করিয়া নিজ নিজ মতের প্রামাণ্য সুদৃঢ় করিয়াছেন। আর সেই কারণেই এই ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের সূত্রসংখ্যায় এইরূপ মতভেদ, এবং সূত্রপাঠাদি বিষয়ে এইরূপ মতভেদ ঘটিয়াছে। আর এই জন্যই এই ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের এত পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাষ্যাদিরও আবির্ভাব হইয়াছে। এই সকল ভাষ্যাদির আবির্ভাব, ব্যাসদেবের সূত্র রচনার কিছু পর হইতেই ঘটিয়াছে, তাহাও উপলভ্যমান ভাষ্যাদি গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায়। কিন্তু সেই সকল ভাষ্যাদির সংখ্যা কত, ও তাহাদের মতভেদই বা কিরূপ, তাহার সবিশেষ জানিতে পারা যায় না। সে সমস্ত ভাষ্যাদিই আজ বিলুপ্ত। বর্ত্তমানে যে সমস্ত ভাষ্যাদি পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে যাহারা প্রসিদ্ধ তাহারা—১। শঙ্করভাষ্য, ২। ভাস্করভাষ্য, ৩। যাদবপ্রকাশভাষ্য, ৪। রামানুজভাষ্য, ৫। নিম্বার্কভাষ্য, ৬। মধ্বভাষ্য, ৭। শ্রীকণ্ঠভাষ্য, ৮। শ্রীকরভাষ্য, ৯। বল্লভভাষ্য, ১০। বিজ্ঞানভিক্ষুভাষ্য, ১১। বলদেবভাষ্য এবং ১২। বৈখানসভাষ্য ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে যাদবপ্রকাশভাষ্য এখনও মুদ্রিত হয় নাই, অন্যগুলি মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু এই সব ভাষ্য ভিন্ন আরও অনেক অমুদ্রিত ভাষ্যের নাম পাওয়া যায়। এজন্য মধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। এই সকল ভাষ্যের পূর্ব্ব পূর্ব্বগুলি পর পর ভাষ্যের অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ শঙ্করভাষ্যটী প্রাচীনতম, এবং যথাক্রমে বলদেবভাষ্যটী আধুনিকতম। অবশ্য এতদ্ ভিন্নও আরও কয়েকখানি ভাষ্য মুদ্রিত হইয়াছে, যথা—রামাৎ সম্প্রদায়ের ভাষ্য, বৈখানস সম্প্রদায়ের ভাষ্য, ইত্যাদি কিন্তু তাহারা আরও আধুনিক। প্রাচীন বিষয়ে আধুনিক অপেক্ষা প্রাচীনেরই প্রামাণ্য সাধারণত অধিকই হয়, এজন্য তাহারা পরিত্যক্ত হইল। আর ব্যাসদেবের পর এবং শঙ্করভাষ্যের আবির্ভাবকালের মধ্যে যে সব প্রাচীনতর ভাষ্যের নামাদি পাওয়া যায়, তাহাও বহু, যথা, বোধায়নবৃত্তি, উপবর্ষবৃত্তি, ব্রহ্মনন্দীভাষ্য, ব্রহ্মদত্তভাষ্য, ভর্তৃপ্রপঞ্চভাষ্য (?), ভর্তৃহরিভাষ্য (?), দ্রমিড়ভাষ্য, রেণুকভাষ্য ইত্যাদি। কিন্তু এই সব ভাষ্য আজ বিলুপ্ত। ইহাদের নাম বা মতবাদ বা বাক্য মাত্রই শাঙ্করাদি ভাষ্যের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের পরিচয় কাশী হইতে প্রকাশিত অচ্যুত গ্রন্থাবলীর বেদান্ত-দর্শনের ভূমিকা মধ্যে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় কর্ত্তৃক সংক্ষেপে সরলভাবে প্রদত্ত হইয়াছে দেখা যায়।

এখন দেখা যাউক, উপলভ্যমান মুদ্রিত প্রসিদ্ধ ভাষ্যগুলির মধ্যে কোন্ ভাষ্যটী কতদূর ব্যাস-সম্মত? এজন্য আমরা ১০খানি ভাষ্য এস্থলে অবলম্বন করিলাম। যথা—

১। শাঙ্করভাষ্য (ব্রাহ্মমতে)
(অদ্বৈতবাদী)

২। ভাস্করভাষ্য (ঐ)
(দ্বৈতাদ্বৈতবাদী)

৩। রামানুজভাষ্য (বৈষ্ণব মতে)
(বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী)

৪। নিম্বার্কভাষ্য (ঐ)
(ভেদাভেদবাদী)

৫। মধ্বভাষ্য (ঐ)
(দ্বৈতবাদী)

৬। শ্রীকণ্ঠভাষ্য (শৈবমতে)
(বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী)

৭। শ্রীকরভাষ্য (ঐ)
(বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী)

৮। বল্লভভাষ্য (বৈষ্ণব মতে)
(শুদ্ধাদ্বৈতবাদী)

৯। বিজ্ঞানভিক্ষুভাষ্য (ঐ)
(ভেদাভেদবাদী)

১০। বলদেবভাষ্য (ঐ)
(অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী)

কারণ এইগুলি অপেক্ষাকৃত সুলভ ও সুপ্রচারিত।

কিন্তু এই কয়খানি ভাষ্য তুলনা করিয়া কোন্ ভাষ্যখানি ব্যাস-সম্মত বা ব্যাস-মতসন্নিকটবর্ত্তী, ইহা নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে কোন্ পথে এই কার্য্যটী সাধিত করা উচিত এবং সম্ভব তাহার বিষয় একটু আলোচনা করা কর্ত্তব্য। কারণ, "উপেয়" চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে "উপায়" চিন্তা করা বুদ্ধিমানের কার্য্য—এইরূপ একটী প্রবাদই আছে। পথ ভুল হইলে গন্তব্য স্থানে গমন সম্ভবপর হয় না। অতএব এখন দেখা যাউক, কোন্ পথে ব্যাস-সম্মত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য নির্ণয় করা যাইতে পারে।

এই চিন্তা করিলে আমরা প্রথমেই দেখিতে পাই যে, ব্রহ্মসূত্রের উক্ত ভাষ্যকারগণ, সকলেই প্রায় আচার্য্য পদবাচ্য হইয়াছেন বা হইবার যোগ্য, সকলেই মহাত্মা ও সিদ্ধ পুরুষ, সকলেই অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সকলেরই সম্প্রদায় প্রায় বর্ত্তমান, সকলেরই বহু শিষ্য প্রশিষ্যাদি, সকলেরই অনুগামী বহু ব্যক্তি। আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে ইহাদের তুলনা করা বা ইহাদের গুণাগুণ বিচার করা পিপীলিকার হিমালয় অতিক্রমের প্রযত্ন তুল্য। এজন্য আমাদের পক্ষে এ কার্য্য অসম্ভব, অধিক কি, অসঙ্গত বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু তথাপি এরূপ সমস্যা যথাসাধ্য মীমাংসা করিতে পারিলে কে কোন্ পথে চলিবে, তাহার নির্ণয় হয় না। যিনি যতই ক্ষুদ্র হউন, যতই অজ্ঞ হউন, তাঁহার কর্ত্তব্য, কি অবলম্বনীয়, কি ভজনীয়—ইত্যাদি বিষয়ে একটা কিছু নির্ণীত না হইলে তাঁহার জীবনগতি অচল হইয়া উঠিবে। ঈশ্বরকে আমরা জানি না বটে, কিন্তু সেই সম্বন্ধে আমরা সকলেই একটা না একটা সিদ্ধান্ত করিয়া আমরা আমাদের জীবনপথে চলিতে থাকি ইহাই আমাদের প্রকৃতি। এজন্য এই আচার্য্যগণের তুলনা বা সমালোচনার যোগ্য—আমরা না হইলেও আমাদিগকে ইহা করিতেই হইবে। এরূপ কার্য্য সকলেই করিয়া থাকেন, বুঝিয়াই হউক অথবা না বুঝিয়াই হউক, সকলেই নিজ কর্ত্তব্য, নিজ উপাস্য প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করিয়া নিজ গন্তব্য পথ নির্ণয় করিয়া থাকেন। সুতরাং আমাদিগকেও ইহা করিতেই হইবে, আর করিলেও কোন দোষ হইতে পারে না।

এজন্য বোধ হয়, যদি বলা যায় যে, সকল আচার্য্যই যখন মহাত্মা মহাপুরুষ, অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি, তখন অধিক সংখ্যক আচার্য্য যে ভাবে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যে ভাবে সূত্র পাঠাদির গ্রহণ করিয়াছেন, সেই ভাবটীই ব্যাস-সম্মত, আর তজ্জন্য অল্পসংখ্যক আচার্য্যের যে সূত্র ব্যাখ্যাদি, তাহা ব্যাস-সম্মত নহে ইত্যাদি, তাহা হইলে বোধ হয় বড় বেশী অন্যায় কল্পনা করা হইবে না। আজকাল "ভোটের" বলে সকল কার্য্যই যখন হইতেছে; ন্যায়অন্যায়, সত্যাসত্য সবই যখন নির্ণীত হইতেছে, অজ্ঞের ভোটে বিজ্ঞ যখন বাধ্য হইতেছেন, মূর্খের ভোটে যখন পণ্ডিত নিয়ন্ত্রিত হইতেছেন, তখন সময়ের হাওয়া অনুসারে, যদি আমরাও চলি, তাহা হইলে বোধ হয়, অধিক নিন্দাভাগী হইতে হইবে না। বস্তুত, এই পথ অবলম্বন করিয়া আজকাল অনেক মণীষীই "ব্যাস-সম্মত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য" নির্ণয় করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রথমে আমরা দেখিব অধিকের সম্মতি অনুসারে বা ভোটের বলে কোন্ ভাষ্যখানি ব্যাস-সম্মত হইবার যোগ্য অর্থাৎ আমরা প্রথমেই দেখিব, অধিক-সংখ্যক আচার্য্য যে সকল বিষয়ে একমত, সেই সকল বিষয়ে সেই দলে কাহারা অবস্থিত এবং কাহারা অবস্থিত নহেন। এইরূপে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকবার অধিকাংশের দলভুক্ত হইবেন, তাঁহার ভাষ্যই ব্যাস-সম্মত ভাষ্য হইবে, ইহাই আমরা মনে করিব। এস্থলে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাস-সম্মত ভাষ্য নির্ণয়ের জন্য ইহাই আমাদের প্রথম পথ বা প্রথম উপায়, এরূপ হইলে বোধ হয় বিশেষ অন্যায় হইবে না।

দ্বিতীয় পথ বা উপায়টী কিন্তু একটু অন্যরূপ। ইহাকে

"দুর্গম পথ" বা "সূক্ষ্ম উপায়" বলা যাইতে পারে। এই পথে আমরা দেখিব—ব্যাসদেব তাঁহার এই সূত্রগ্রন্থ রচনা করিবার জন্য যে নিয়মসমূহের অনুসরণ করিয়াছিলেন, সেই নিয়মসমূহ এই ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থ হইতেই অধিক সংখ্যক ভাষ্যের সম্মতিতেই নির্ণয় বা আবিষ্কার করিয়া সেই নিয়ম দ্বারা উক্ত ভাষ্য দশখানিকে তুলনা করিলে কিরূপ ফল লাভ হয়। অর্থাৎ উক্ত নিয়মসমূহ দ্বারা উক্ত ভাষ্য দশখানির তুলনা বা সমালোচনা করাই আমাদের এই দ্বিতীয় পথ। এতদ্বারা যিনি একবার উক্ত নিয়মের অনুসারী বা অধীন হইবেন, তিনি যদি পরে কোথাও তাহার লঙ্ঘন করিতেছেন দেখা যায়, তাহা হইলে তাঁহাকে সেইস্থলে দোষী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যাইবে, অর্থাৎ সেইস্থলে তাঁহাকে "ব্যাস-মত" হইতে দূরবর্ত্তী বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। এইরূপে যে ভাষ্যখানি যত অল্প দোষযুক্ত হইবে, সেই ভাষ্যখানি তত অধিক ব্যাস-সম্মত বলিয়া বিবেচিত হইবে। বলা বাহুল্য, এই নিয়মগুলি ব্যাসদেবের অনুসৃত নিজ নিয়ম হইলেও ইহারা যুক্তিবহির্ভূত হওয়া উচিত নহে। কারণ, একমাত্র যুক্তিই সর্ব্ববাদিসম্মত বিষয় হইয়া থাকে, যুক্তিসিদ্ধ কথাই সকলে বুঝিতে সমর্থ হয়, যুক্তিবহির্ভূত বিষয় লোকের বুদ্ধিগম্য হয় না। তথাপি এই নিয়মগুলিতেই ব্যাসদেবের কতকটা নিজত্ব বা স্বাতন্ত্র্যও আছে বলিয়াও বুঝিতে হইবে। কারণ, এই নিয়মগুলি তাঁহারই রচিত সূত্র সম্বন্ধীয়, অন্য রচিত সূত্র সম্বন্ধীয় নহে। এজন্য এই নিয়মগুলি সূত্রের প্রকৃতি দেখিয়া অধিকের সম্মতি অনুসারে যুক্তিসঙ্গত ভাবে নির্ণয় করিতে হইবে। আর যুক্তিটী মনুষ্যের চিন্তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া নির্ণয় করিতে হয়। যেমন মানুষ যাহাকে যে ভাবে "হাঁ" বলে সে ভাবে আর তাহাকে "না" বলে না। ইহা মানবের প্রকৃতি। এই বিষয়গুলি মনুষ্য-চিন্তার প্রকৃতি দেখিয়া স্থির করিতে হয়। যুক্তি ও নিয়মের মধ্যে ইহাই প্রভেদ। যাহা হউক, এইরূপে ব্যাসসূত্র রচনার নিয়মাবলী আবিষ্কার করিয়া তাহার দ্বারা তুলনাই এস্থলে আমাদের অবলম্বিত দ্বিতীয় পথ হইলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি কতকটা হইবে মনে হয়। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন ভাষ্য তুলনার আরও একটী পথ আছে। সেটী সূত্রার্থবিচার। অর্থাৎ সূত্রের অর্থ করিবার কালে সূত্রস্থ পদসমূহের অর্থের প্রসিদ্ধিও একরূপতা এবং অন্বয়ের স্বাভাবিকতা প্রভৃতি রক্ষিত হইতেছে কি-না তাহার পরীক্ষা, এবং পরিশেষে সূত্রার্থটী যুক্তিসঙ্গতভাবে শ্রুতির অনুকূল হইতেছে কি-না তাহার বিবেচনা। অবশ্য এই তৃতীয় পথটী এস্থলে আমরা অবলম্বন করিলাম না। কারণ, ইহা একটী অতি বিরাট ব্যাপারবিশেষ। এ কারণ, ব্যাস-সম্মত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য নির্ণয়ের জন্য এই তিনটী উপায়ের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় উপায়টী যত সহজসাধ্য, তৃতীয় উপায়টী তত সহজসাধ্যও নহে। আর তজ্জন্য এস্থলে আমরা প্রথম দুইটীর দ্বারা কোন্ ভাষ্যটী ব্যাস-সম্মত হয়, তাহাই দেখিব। অবশ্য সমুদয় নিয়ম বা সেই সব নিয়মের আবিষ্কার কৌশল প্রভৃতির কথা আর এস্থলে আমরা আলোচনা করিব না। কারণ, তাহা প্রবন্ধ মধ্যে লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর হইতে পারে না। তজ্জন্য পৃথক্ গ্রন্থ প্রণয়নই আবশ্যক হয়। তথাপি এই নিয়ম সম্বন্ধে আমরা এস্থলে দুই-একটী কথা আলোচনা করিতেছি। ইহা হইতে সুধী পাঠকবর্গ, আমাদের অবলম্বিত সমুদয় নিয়ম সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে পারিবেন।

ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থ হইতে এই নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টা করিলে দেখা যায় যে, ব্যাসদেব যে উদ্দেশ্যে ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন, তাহা প্রথমত শ্রুতির মীমাংসা, এবং তৎপরে তদ্দ্বারা দার্শনিকতত্ত্বের অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ের নির্দ্ধারণ। বস্তুত এই দার্শনিকতত্ত্ব বা দর্শনশাস্ত্র প্রতিপাদ্য বিষয় বলিতে, এস্থলে তিনটী বিষয় বুঝিতে হইবে। যথা—প্রথমটী, তত্ত্ব বা সত্যনির্ণয়, দ্বিতীয়টী তাহার ব্যবহার এবং তৃতীয়টী তাহার ফলনিরূপণ।

ইহাদের মধ্যে প্রথমটী আবার দুইপ্রকার, যথা—স্বপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডন। অর্থাৎ যাহা তত্ত্ব বা সত্য বলিয়া নির্ণয় করিতে হইবে, তাহা প্রথমে যুক্তিসহকারে প্রতিপাদন করিয়া স্বপক্ষ স্থাপন করিতে হয়, এবং সেই সঙ্গে তাহার বিরুদ্ধে অপরে কে কি আপত্তি করেন, তাহার মীমাংসা করিতে হয়, এবং তৎপরে পরপক্ষ খণ্ডন করিতে হয়, অর্থাৎ বিপক্ষের মতের যে দোষ, তাহাও প্রদর্শন করিতে হয়। এইরূপে স্বপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডন করিতে পারিলে, তত্ত্বনির্ণয় বা সত্য নির্দ্ধারণ কার্য্যটী সম্পূর্ণ হয়, নচেৎ সে নির্ণয়ে আপত্তি বা সংশয়ের অবকাশ থাকিয়া যায়। তত্ত্বনির্ণয়ের ইহাই দার্শনিকরীতি। সুতরাং

দার্শনিকতত্ত্ব বা প্রতিপাদ্য বিষয় তিনটীর মধ্যে ইহা "একটী" তত্ত্ব। বস্তুত, সকল দর্শনেরই ইহা প্রতিপাদ্য, সকল দর্শনেই ইহা করা হইয়া থাকে।

অতঃপর দার্শনিকতত্ত্বের দ্বিতীয় বিষয়টী—সেই নির্ণীত তত্ত্বের বা সত্যের ব্যবহার। ইহারই নামান্তর সাধন, অর্থাৎ জীবনটীকে সেই দার্শনিক সত্যের অনুসারে পরিচালিত কিরূপে করিতে হইবে, তাহার নির্দ্দেশ। ইহাও সকল দর্শনেই করা হইয়া থাকে। সুতরাং সকল দর্শনেরই ইহাও একটী তত্ত্ব বা প্রতিপাদ্য বিষয়।

পরিশেষে দার্শনিকতত্ত্বের তৃতীয় বিষয়টী এই যে, উক্ত সাধনের ফলে মনুষ্য জীবনের পরিণতি কিরূপ হয়, তাহার নির্ণয় করা, অর্থাৎ উক্ত সাধনের ফল নির্দ্দেশ করা। ইহাও দার্শনিকতত্ত্বের একটী বিষয় হয়। কারণ, আমরা কি জন্য সাধন করিতেছি, তাহা যদি না জানিতে পারি, তাহা হইলে আমরা সে সাধনে প্রবৃত্ত হইব কেন? ফল জানিয়া কার্য্য করাই ত মানবের স্বভাব। এজন্য ইহাও দর্শনশাস্ত্রের একটী তত্ত্ব বা প্রতিপাদ্য বিষয়। এইরূপে এই তিনটী বিষয়ই সকল দর্শনশাস্ত্রের আলোচ্য বা প্রতিপাদ্য বিষয় বলা হয়। ব্যাসদেব এই তিনটী বিষয়কে যথাক্রমে সাজাইয়া তাঁহার ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের চারিটী অধ্যায় রচনা করিয়াছেন। যথা—প্রথম সমন্বয়াধ্যায়, দ্বিতীয় অবিরোধ অধ্যায়, তৃতীয় সাধন অধ্যায় এবং চতুর্থ ফলাধ্যায়।

ইহাদের মধ্যে "সমন্বয় ও অবিরোধ অধ্যায়ে" শ্রুতি ও যুক্তিদ্বারা স্বপক্ষ স্থাপন পূর্ব্বক পরপক্ষ খণ্ডন করিয়া তত্ত্ব বা সত্য নির্ণয় করা হইয়াছে, "সাধন অধ্যায়ে" সেই তত্ত্বের অভ্যাস বা অনুষ্ঠান কি করিয়া করিতে হয়, শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং "ফল অধ্যায়ে" মনুষ্য জীবনের শেষ লক্ষ্য কি, তাহার পরিচয় শাস্ত্র ও যুক্তির সাহায্যে নির্ণয় করা হইয়াছে। এই জন্য বলা হয়, ব্যাসদেব এই বেদান্তদর্শনে একাধারে শ্রুতিমীমাংসা ও দার্শনিকতত্ত্বের নির্ণয় করিয়াছেন। বস্তুত, এই দুইটী কার্য্য একাধারে কোন বৈদিকদর্শন গ্রন্থে দেখা যায় না। ইহাই দেবান্তদর্শন বা ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের বিশেষত্ব।

এজন্য সমন্বয় অধ্যায়ে যে ১৩৪টী সূত্র আছে তাহাদিগকে "বেদান্ত বাক্যগুলি ব্রহ্মে সমন্বয়পর" করিয়া, এবং অবিরোধ অধ্যায়ে যে ১৫৭টী সূত্র আছে তাহাদিগকে "বিরোধভঞ্জনপর" করিয়া এবং সাধন অধ্যায়ে ১৮৬টী সূত্র আছে, তাহাদিগকে "সাধনপর" করিয়া এবং ফলাধ্যায়ে যে ৭৮টী সূত্র আছে, তাহাদিগকে "ফলপর" করিয়া ব্যাখ্যা করাই ব্যাস-সম্মত সূত্র-ব্যাখ্যার একটা নিয়ম বা রীতি বা পদ্ধতি। ইহার যিনি অন্যথা করিবেন, তিনি ব্যাস-মতে সূত্রব্যাখ্যা করিবেন না, ইহাই বুঝিতে হইবে। ইহাই হইল সূত্ররচনার ব্যাসদেবের একটী নিয়ম বা কৌশল। ইহাকে অধ্যায়সঙ্গতির অনুসরণ করা বলে। আমাদের তুলনাকার্য্যের মধ্যে এই নিয়মটীও অবলম্বন করা হইয়াছে।

অতঃপর আমাদের অবলম্বিত দ্বিতীয় নিয়ম এই যে, এই ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থখানি শ্রুতির মীমাংসা অর্থাৎ শ্রুত্যুক্ত বিষয়ের আপাতপ্রতীয়মান বিরোধপরিহার, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থের সকল সূত্রেই শ্রুতিবাক্য-সমূহের আপাতপ্রতীয়মান বিরোধপরিহার থাকিবে। আর তাহা হইলে সকল সূত্রের দ্বারা লক্ষিত এক বা একাধিক শ্রুতিবাক্যও থাকিবে। শ্রুতিতে নাই এমন কথা এই সূত্রগ্রন্থে আলোচিত হইবে না, অথবা শ্রুতির উপদিষ্ট বিষয়, উপেক্ষা বা বর্জ্জন করাও চলিবে না। যদি কেহ এই ভাবে সূত্রের ব্যাখ্যা না করেন, শ্রুতির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া সূত্রব্যাখ্যা করেন তাহা হইলে তাঁহার ব্যাখ্যা ব্যাস-সম্মত ব্যাখ্যা হইবে না। যেমন, যেখানে সাংখ্যমত বা বৌদ্ধমত বা জৈনমত প্রভৃতি অন্য মত খণ্ডন করা হইতেছে, সেখানেও সেই মতানুকূল সেই মতের মূল শ্রুতি বাক্যদ্বারা সেই মত প্রতিপাদন করিয়া এবং শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা তাহার খণ্ডন করিয়া যিনি সূত্রব্যাখ্যা করিবেন, তিনিই ব্যাস-সম্মত সূত্রার্থ করিবেন, বুঝিতে হইবে। অথবা যেমন শ্রুতিতে "সদ্যঃ মুক্তি বা জীবন্মুক্তি" এবং "বিদেহ মুক্তির" কথা আছে। কিন্তু যদি কেহ একটী স্বীকার করিয়া সূত্রের অর্থ করেন তাহা হইলে তাঁহার অর্থ ব্যাস-সম্মত অর্থ হইবে না। এই নিয়মের অনুসরণ যিনি যত না করিবেন, তিনি ততই ব্যাস-মত হইতে দূরবর্ত্তী বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহার নাম এই শাস্ত্রে শ্রুতিসঙ্গতির অনুসরণ করা বলে। আমাদের অবলম্বিত নিয়ম মধ্যে ইহাকেও গ্রহণ করা হইয়াছে।

তদ্রূপ এস্থলে আমাদের অবলম্বিত তৃতীয় নিয়মটী এই যে, এই গ্রন্থে এক বা একাধিক সূত্রে এক একটী বিচার বা আলোচ্য বিষয় বা "অধিকরণ" স্থান পাইয়াছে। এইরূপ বিচার বা "অধিকরণ" এই গ্রন্থে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মতে

১৯১টী এবং ইহা ৫৫৫টী সূত্রে রচিত। প্রত্যেক অধিকরণ বা আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে,—সঙ্গতি, ফলভেদ, বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত—এই ছয়টী অঙ্গ থাকে। তাহার পর যে সূত্রে এই বিচার বা "অধিকরণ" আরম্ভ হইবে, তাহাতে প্রথমান্ত পদ থাকিবে, বা উহ্য থাকিবে। কারণ, প্রথমান্ত পদের দ্বারা লোকে বক্তব্য বিষয়ের নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এজন্য ইহা সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে ব্যাসদেবের সূত্র রচনার একটী কৌশল বলিয়া বিবেচনা করা হয়। এইরূপ আরও বহু নিয়ম আছে আমরা সেগুলি আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এবং তাহার দ্বারাই এই তুলনা করিয়াছি। সূত্র ব্যাখ্যায় এই সব নিয়মের যিনি যত লঙ্ঘন করিবেন, তিনি তত ব্যাস-মত হইতে দূরবর্ত্তী বলিয়া বিবেচিত হইবেন, আর যিনি যত পালন করিবেন, তিনি তত ব্যাস-মতের নিকটবর্ত্তী হইবেন। ইহাই হইল এই ব্রহ্মসূত্র রচনার ব্যাসদেবের কৌশলের মধ্যে কতিপয়ের দৃষ্টান্ত। আমরা এস্থলে এইরূপ কতিপয় নিয়ম গ্রহণ করিয়াছি। আশা হয়, এতদ্দারাই আমাদের আবিষ্কৃত নিয়মাবলী সম্বন্ধে সুধী পাঠকবর্গ একটা ধারণা করিতে পারিবেন।

আমাদের মনে হয়, এই সকল নিয়মদ্বারা বিভিন্ন ভাষ্যের ব্যাসসম্মতি নির্ণয় করা যে কতকটা সম্ভবপর হইবে, তাহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত ভোটের দ্বারা যেমন ব্যাসসম্মতি নির্ণয় কতকটা সম্ভব বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, বলা হইয়াছে, এই পথেও তদ্রূপ তাহা আরও অধিক সম্ভবপর বলিতে পারা যায়। প্রত্যুত এইপথে আরও সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় সম্ভবপর হইতে পারে বলিয়াই বোধ হয়। কারণ, ইহার "মূল সূত্র" হইতেছে এই যে, যিনি যে নিয়ম পূর্ব্বে মান্য করিয়াছেন, তাঁহাকে যদি পরে সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিতে দেখা যায়, তাহা হইলে তিনি দোষী হইবেন। আর যিনি যত অধিক দোষী হইবেন তিনি ততই ব্যাসসম্মতি হইতে দূরবর্ত্তী বলিয়া বুঝিতে হইবে, ইত্যাদি। অতএব এই নিয়ম দ্বারা তুলনার ফল, ভোটের দ্বারা তুলনার ফল অপেক্ষা অধিক বলবৎ এবং নিশ্চায়ক।

আমরা এই দুইটী পথে ব্রহ্মসূত্রের উক্ত দশখানি ভাষ্যের তুলনা করিয়াছি। অর্থাৎ ভোটের দ্বারা এবং যুক্তি ও ভোট এই উভয় দ্বারা নিরূপিত যে নিয়ম, সেই নিয়মদ্বারা তুলনা করিয়াছি। কেবল তৃতীয় পথে অর্থাৎ সূত্রার্থ বিচার-রূপ তৃতীয়পথে এই তুলনা করি নাই। এখন এতাদৃশ তুলনার যে ফল, তাহাই এস্থলে আমরা পাঠকবর্গকে উপহার দিব। ক্ষুদ্রের বৃহৎ চেষ্টা বলিয়া উপেক্ষণীয় হইবে না আশা করি।

এস্থলে তৃতীয় পথে তুলনা না করিবার, অর্থাৎ সূত্রার্থ বিচারদ্বারা তুলনা না করিবার একটী কারণও আছে, তাহাও এস্থলে বলিয়া রাখা ভাল। উহা যে কেবল অতি বিরাট্ ব্যাপার বলিয়া আমরা তাহাতে প্রবৃত্ত হই নাই, তাহা নহে, কিন্তু ব্যাস-সম্মত ভাষ্যনির্ণয়ে ইহার উপযোগিতা অল্প বলিয়া প্রবৃত্ত হই নাই। ইহার কারণ, ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থখানি "শ্রুতির মীমাংসা"। সুতরাং শ্রুতির অর্থই সূত্রের অর্থ হইবার কথা। ইহাতে ব্যাসের নিজ মত প্রকটিত করা ব্যাসদেবের উদ্দেশ্যই নহে। ইহা পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি। সুতরাং সূত্রার্থ মধ্যে ব্যাস-মত প্রকাশের সম্ভাবনা নাই। তবে ব্যাস-মত প্রকাশের সম্ভাবনা কেবল সূত্রগ্রন্থের "সূত্র-ক্রমের" মধ্যে এবং "বিষয়বিন্যাসের" মধ্যেই থাকা সম্ভব; কারণ, বিষয়বিন্যাসাদি ব্যক্তিগত ইচ্ছার অধীন বিষয়; ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য এইরূপ স্থলেই থাকে। পরমতবর্ণনকালে এই স্থলেই বর্ণন-কর্ত্তার স্বাতন্ত্র্য থাকে। সুতরাং সংক্ষেপে সহজে ব্যাস-সম্মত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য নির্ণয় করিতে হইলে "বিষয়-বিন্যাসাদির" বিচার বা তুলনাই মুখ্য উপায় হইবার কথা; "সূত্রার্থবিচার" মুখ্য উপায় নহে। কারণ, উহা সূত্রার্থের অধীন, আর সেই সূত্রার্থ আবার শ্রুত্যার্থর অধীন। অতএব সূত্রার্থ বিচার অপেক্ষা বিষয়বিন্যাসের বিচারই অধিক ফল-প্রদ। আমরা এজন্য প্রথমে অধিক সম্মতি বা ভোটের দ্বারা ইহার নির্ণয়ের জন্য সাতটী বিষয় নির্ব্বাচন করিয়াছি, যথা—১। অধিকরণ রচনা, ২। সূত্রপাঠ, ৩। সূত্র-বিভাগ, ৪। সূত্রযোগ, ৫। পূর্ব্বস্বীকৃত সূত্রবর্জ্জন, ৬। অতিরিক্ত সূত্র গ্রহণ, এবং ৭। সূত্রক্রম বিপর্য্যয়। এই সাতটী বিষয়ে ভোটের দ্বারা তুলনার ফল এস্থলে আমরা প্রথমে প্রদর্শন করিব। তৎপরে অধিকরণ রচনার আবিষ্কৃত নিয়ম সাহায্যে ব্যাস-সম্মত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য নির্ণয়ের জন্য "অধিকরণ রচনা"-রূপ একটী মাত্র বিষয়কে অবলম্বন করিয়াছি। ইহা হইতে প্রত্যেক ভাষ্যের অধিকরণ রচনা-বিষয়ক নির্ণয়ের ফল প্রদর্শন করিব। ইহাতে যিনি অধিক সংখ্যকের দলভুক্ত যত অধিক হইবেন, ততই তিনি ব্যাস-সম্মত হইবেন, আর যিনি অল্প সংখ্যক দলভুক্ত, যত হইবেন,

তিনি ততই দোষী বা ব্যাস-মত হইতে দূরবর্ত্তী হইবেন। এইরূপে এই দোষ কাহার কত অল্প বা কত অধিক হইয়াছে, তাহা এই তুলনার ফল হইতে জানিতে পারা যাইবে, আর তাহার ফলে কোন্ ভাষ্যটী কতটা ব্যাসদেবের সম্মতি লাভের যোগ্য তাহা কল্পনা করিতে পাঠকবর্গের বড় বেশী অসুবিধা হইবে না। এস্থলে ব্যাস-সম্মত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য নির্ণয়ের জন্য এই দুইটী উপায় আমরা অবলম্বন করিয়াছি।

এই কার্য্যটী সম্পন্ন করিবার জন্য আজ প্রায় পনর বৎসর প্রযত্ন হইয়াছে। ইহার পথ-প্রদর্শক আমার স্বর্গীয় অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীলক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড় মহোদয় ছিলেন। প্রথমে তিনি স্বয়ংই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ হওয়ায় আরম্ভেই বিঘ্ন ঘটে। অতঃপর আমার এই ক্ষুদ্র চেষ্টা, তবে তাঁহার আশীর্ব্বাদে আমি কোনরূপ ইহার সম্পূর্ণতা সাধনে সমর্থ হইয়াছি। "ভারতবর্ষ" পত্রিকার পাঠকবর্গের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে, সাত-আট বৎসর পূর্ব্বে কোন এক ভাদ্র মাসের "ভারতবর্ষে" ইহার সূচনা করিয়া এই নাম দিয়াই আমি একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে পাঠকবর্গকে আমার এই দীর্ঘকালব্যাপী চেষ্টার ফলটী উপহার প্রদান করিব। আমার এই পরিশ্রমটী পুস্তকাকারে রচিত হইলেও তাহা প্রকাশিত হইবে কি-না জানি না। এইজন্য প্রবন্ধাকারে ইহার ফলটী অতি সংক্ষেপে পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। প্রথমে গ্রন্থখানি বঙ্গ ভাষায় রচিত হয়, পরে কাশী ও হরিদ্বারের কতিপয় মহামান্য সন্ন্যাসিবৃন্দের ইচ্ছানুসারে ইহা সংস্কৃত ভাষাতেও রচিত হইয়াছে। মুদ্রিত হইলে ইহা প্রায় সহস্র পৃষ্ঠাব্যাপি পুস্তক হইবে। যাহা হউক, তুলনার ফল এই—

১। অধিক সম্মতি বা ভোট অনুসারে তুলনার ফল ঃ—

ভাষ্যের নাম	অধিকরণ রচনায় দোষ	সূত্রপাঠে দোষ	সূত্রযোগে দোষ	সূত্রবিভাগে দোষ	অতিরিক্ত সূত্রগ্রহণে দোষ	গৃহীত সূত্রবর্জ্জনে দোষ	সূত্রক্রম বিপর্য্যয়ে দোষ	দোষ-সমষ্টি
শাঙ্করভাষ্য	১৩	১০	১	.	.	.	.	২৪
ভাস্করভাষ্য	১১	৪৬	৪	.	.	৪	.	৬৫
রামানুজভাষ্য	২৩	৩৬	১৪	৬	৩	২	২	৮৬
নিম্বার্কভাষ্য	৪৩	৩৩	৮	২	৩	২	.	৯১
মধ্বভাষ্য	১০৬	৪৭	১	৬	৬	৩	১	১৭০
শ্রীকণ্ঠভাষ্য	২৮	২৬	১৪	৬	৩	২	২	৮১
শ্রীকরভাষ্য	১৯	৬৩	১১	০	২	০	৪	৯৯
বল্লভভাষ্য	৭৬	২৪	২	.	১	১	.	১০৪
বিজ্ঞানভিক্ষুভাষ্য	.	২৯	১	.	১	.	.	৩১
বলদেবভাষ্য	.	৪১	২	.	১	.	.	৪৪
	৩১	৩৫৫	৫৮	২০	২০	১৪	৯	৭৯৫

অর্থাৎ অধিকরণ রচনা ও সূত্র পাঠাদি সাতটী বিষয়ে "নিয়মনিরপেক্ষ তুলনার বা ভোটের ফলে যে ভাষ্যের যত দোষ তাহা এই—

১। শাঙ্করভাষ্যে ২৪টী দোষ
২। ভাস্করভাষ্যে ৬৫টী দোষ
৩। রামানুজভাষ্যে ৮৬টী দোষ
৪। নিম্বার্কভাষ্যে ৯১টী দোষ
৫। মধ্বভাষ্যে ১৭০টী দোষ
৬। শ্রীকণ্ঠভাষ্যে ৮১টী দোষ
৭। শ্রীকরভাষ্যে ৯৯টী দোষ
৮। বল্লভভাষ্যে ১০৪টী দোষ
৯। বিজ্ঞানভিক্ষুভাষ্যে ৩১টী দোষ
১০। বলদেবভাষ্যে ৪৪টী দোষ

ইহাদের মধ্যে বিজ্ঞানভিক্ষুভাষ্য ও বলদেবভাষ্যের অধিকরণ রচনা-বিষয়ক তুলনার ফল প্রদর্শিত হইল না, পাঠভেদাদি অন্য ছয়টী বিষয়ের ফলই প্রদত্ত হইল। কারণ, ঐ দুইটী ভাষ্য, অধিকরণনির্দ্দেশ পূর্ব্বক মুদ্রিত হয় নাই। ভাস্করভাষ্যটী ও অধিকরণনির্দ্দেশ-পূর্ব্বক মুদ্রিত হয় নাই। তবে, উহা মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয় করিয়াছিলেন, তাহাই এস্থলে গৃহীত হইল।

এইবার দেখা যাউক, সূত্র রচনার নিয়ম সাহায্যে তুলনার ফল কিরূপ হয়। ইহাতে "অধিকরণ রচনা-বিষয়ক" ফল, অর্থাৎ দোষ মাত্র প্রদর্শিত হইল। আর, এজন্য শাঙ্করাদি আটটী ভাষ্যেরই তুলনা করা হইয়াছে। যেহেতু বিজ্ঞানভিক্ষুভাষ্য এবং বলদেবভাষ্য অধিকরণ নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক মুদ্রিত হয় নাই।

২। সুতরাং অধিকরণ রচনায় নিয়মসাপেক্ষ তুলনার ফলটী এইরূপ—

১। শাঙ্করভাষ্যে দোষ নাই।
২। ভাস্করভাষ্যে দোষ ৩টী
৩। রামানুজভাষ্যে দোষ ৪৯টী
৪। নিম্বার্কভাষ্যে দোষ ৬৯টী
৫। মধ্বভাষ্যে দোষ ১২১টী
৬। শ্রীকণ্ঠভাষ্যে দোষ ৪৭টী
৭। শ্রীকরভাষ্যে দোষ ৩৯টী
৮। বল্লভভাষ্যে দোষ ৮৮টী

এখন এই নিয়মসাপেক্ষ তুলনার ফলটী যদি নিয়ম-নিরপেক্ষ তুলনার ফলের সহিত একত্রিত করা যায়, তাহা হইলে সেই দোষ সংখ্যা এইরূপ হয়, যথা—

ভাষ্যের নাম	নিয়মনিরপেক্ষ দোষ	নিয়মসাপেক্ষ দোষ	সমষ্টি দোষ
শাঙ্করভাষ্য	১৩	০	১৩
ভাস্করভাষ্য	১১	৩	১৪
রামানুজভাষ্য	২৩	৪৯	৭২
নিম্বার্কভাষ্য	৪৩	৬৯	১১২
মধ্বভাষ্য	১০৬	১২১	২২৭
শ্রীকণ্ঠভাষ্য	২৮	৪৭	৭৫
শ্রীকরভাষ্য	১৯	৩৯	৫৮
বল্লভভাষ্য	৭৬	৮৮	১৮৪
	৩১৯	৪১৬	৭৩৫

ইহাই হইল কেবলমাত্র অধিকরণরচনাবিষয়ে ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের আটখানি ভাষ্য তুলনার ফল। পাঠভেদাদি সহকৃত সাত বিষয়ের তুলনার ফল উপরে প্রদত্ত হইয়াছে। এখন সুধী পাঠকবর্গ বিচার করিবেন কোন্ ভাষ্যখানি কত দূর ব্যাস-সম্মত? বিশেষ বিবরণ প্রবন্ধ মধ্যে প্রকাশ করা অসম্ভব বলিয়া উহা এস্থলে পরিত্যক্ত হইল।

রাঙা রাখী

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আজি সন্ধ্যায় কেবল তোমায়
পড়িতেছে সখী মনে,
শরৎ-সন্ধ্যা-হিমেল হাওয়ায়
দেহে আনে শিহরণ;
সুন্দর তব অনিন্দ্য মুখ
ভাসে নভো দর্পণে
মেঘলেশহীন দূর দিগন্তে
হারাল আমার মন।

এমন আকাশ জীবনে দেখিনি
যেন সে নীল পাথার,
অতল গহীন সীমানাবিহীন
তোমার হৃদয়খানি,
নিলখে যেন সে মিলন-মায়ায়
হয়ে গেছে একাকার,
কি যে রহস্য গোপন সেথায়
কি তার মর্ম্মবাণী?

দূরে উঠিতেছে দ্বিতীয়ার চাঁদ
—আরো দূরে দুটি তারা,
দেওদার শিরে প্রদোষ আঁধারে
জোনাকির তারা জ্বলে,
শ্রান্ত পাখায় পাখী উড়ে যায়
সে বুঝি দোসর-হারা
তারি বেদনায় অশ্রু ঘনায়
আমার নয়নতলে।

আমার বাগানে ফুটিয়াছে ফুল
সেফালি গন্ধরাজ,
রজনীগন্ধা ভালবাস তুমি
এখনো কিছুটা আছে,
দোলন-চাঁপা যে পরিতে খোঁপায়
শুকায়ে ঝরিছে আজ
দুয়ারের পাশে লবঙ্গলতা
কত ফুল ফুটিয়াছে!

তুলসী-মঞ্চে মাটির প্রদীপ
হে গৃহলক্ষ্মী মোর,
আজি জ্বালিবার কেহ নাহি আর
শূন্য এ আঙিনায়,
দুয়ার খুলিয়া বৃথা পথ-চাওয়া
নিশি হয়ে যায় ভোর,
আশা গিয়ে ফের আশা ফিরে আসে
তাই মোর হাসি পায়।

কেমনে না জানি ঘেরিয়া তোমায়
করিয়াছি গুঞ্জন,
নিশিদিন-মান তোমা পানে মোর
আরতির দীপ জ্বালা,
স্মৃতির আধারে রেখেছি যতনে
সেই ক্ষণ ভুঞ্জন
সকাল সন্ধ্যা ঝরা শেফালির
আদরে পূর্ণ ডালা।

হাসি পায় যত স্মরণ-পথের
চিহ্ন চিনিয়া চলি,
দুঃখের হাসি হাসিতে তাই ত
লজ্জায় মরে যাই,
কুঞ্জবিতানে ঝরা বকুলেরে
গিয়েছ চরণে দলি,
দ্বার খোলা পড়ে—কখন গিয়েছ
কিছু মোর মনে নাই!

আমার ডালার ফুল দেখে মোর
আমারি লজ্জা পায়,
কুয়াসা আঁধারে কেমনে আমারে
বল না লুকায়ে রাখি,
কত দূরে তুমি আমি কত দূরে
হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়
ক্ষণিকের তরে এসো প্রিয়তমে
হাতে দিই রাঙা রাখী।

গল্প ও উপন্যাস

১৯৪৯

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

এক

জ্যৈষ্ঠের প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন, পৃথিবীটা যেন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নীরবে পুড়িয়া মরিতেছে। সহর কলিকাতা, রাস্তায় লোক চলাচল নাই বলিলেও হয়; গলির মোড়ে একটা রোয়াকের উপর হিন্দুস্থানী 'কাপড়াওলা' হাঁকিয়া শ্রান্ত হইয়া, কাপড়ের বোঝা মাথায় দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; 'বেনারস্‌কা বোম্বাই আঁব'ওলাও তাহার পাশে বিশ্রাম-শয্যা রচনা করিবার উদ্যোগ করিতেছে। এমন সময় বিশ-পঁচিশ বছর বয়সের একটী সৌখীন নারী সূক্ষ্ম ছাতা মাথায় দিয়া, একটা ছোট বাড়ীর বারান্দায় উঠিয়া কড়া আস্তে আস্তে নাড়িতে লাগিল।

ঘরের ভিতর হইতে সাড়া আসিল, কে?

—আমি সবিতা, দরজা খোল্," বলিয়া আগন্তুক রমণী ছাতা বন্ধ করিলেন। দ্বার খুলিয়া প্রায়-ঐ বয়সের আর একটি মেয়ে বাহিরে আসিয়া বিস্ময়ভরা সুরে বলিল, এই রৌদ্রে, কি কাণ্ড!

—বলছি, চ' ভেতরে।

উভয়ে ভিতরে আসিয়া বসিল। ঘরটি যাহার, সেই মেয়েটি ছোট একখানি টেবিল ফ্যান সবিতার কাছে বসাইয়া চালাইয়া দিল। হাওয়া যত না হোক্, আওয়াজ খুব। সবিতা যখন পাখাখানিকে কখন এদিক, কখন ওদিক করিয়া, কাছে টানিয়া, দূরে সরাইয়াও হাওয়া আদায় করিতে পারিল না, তখন রাগতভাবে বলিল, সরা তোর ঘ্যানর ঘ্যানর!

সবিতা তাহার হাত-ব্যাগের ভিতর হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ চোখ চশমা ঘাড় হাত মণিবন্ধ বেশ করিয়া মুছিয়া ফেলিল; ছোট একখানি আর্সিতে মুখখানি, চুলগুলি নিরীক্ষণ করিয়া, ব্যাগ বন্ধ করিতে করিতে বলিল, তোর মা কোথা শুকি?

শুকি, ওরফে শুক্লা বলিল, ওঘরে ঘুমুচ্ছে! তুমি এই দুপুরে কোত্থেকে ভাই? স্কুল ত বন্ধ।

—হ্যাঁ; বাড়ী থেকে আসছি। শোন্, তোর বর পেয়েছি।

শুক্লা হাসিয়া বলিল, মাইরী?

—সত্যি! সব বলছি,—

—দাঁড়া ভাই, যতটা বলেছিস, তারই পুরস্কার দিই আগে। কি খাবি বল্? কীল, চড়, চিমটি, হাসি—

—জ্যাঠামি রাখ্! কাগজ কলম আন্?

—বিয়ের আগেই প্রেমপত্র লিখতে হবে নাকি?

সবিতা বলিল, যা বলি, তাই কর দেখি! বাজে কথা ক'য়ে আমার দেরী করিয়ে দিস্ নে। আজ আবার ওঁর বিদেশ যাবার কথা আছে, কলেজ থেকে এসে খেয়ে দেয়েই বেরুবেন। চট্‌পট্ নিয়ে আয়।

শুক্লা কাগজ কলম আনিতে গেল। সবিতা ব্যাগ খুলিয়া সংবাদপত্রের একটি কর্ত্তিতাংশ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। শুক্লা আসিয়া তাহার ঘাড়ের উপর ঘাড় দিয়া বসিলে, পাঠ্যবস্তুটা উভয়েই পড়িল:

> চাই: কোনও সুন্দরী সুশিক্ষিতা, সচ্চরিত্রা, সদ্বংশজাতা বয়স্কা কুমারীর সহিত পরিণয়োদ্দেশে পরিচয় করিতে চাই। প্রোফেসর, বাঙ্গালাদেশের বাহিরে স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিতি। তরুণী সুগায়িকা হইলে ভাল হয়; উদ্যান-পরিচর্য্যায় আগ্রহ থাকা বাঞ্ছনীয়। উত্তম সাহিত্য-জ্ঞান না থাকিলে পত্রালাপ করা বৃথা; ন্যাকামী বাঙ্গালী তরুণীদের ভূষণ। আমি সেই ভূষণবিবর্জ্জিতা নারীর সহযোগিতা কামনা করি। বিজ্ঞাপনের উত্তরে ফটোসহ স্বহস্তে পত্র লিখুন। আমার দুই চক্ষু ব্যতীত কেহ ফটো বা পত্র দেখিবে না। বক্স নম্বর ৪২; অমৃতবাজার পত্রিকা।

পড়া শেষ হইলে সবিতা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, দেখলি ত?

শুক্লা হাসিয়া বলিল, দে, ভাল ক'রে দেখি।

কাগজটি হাতে লইয়া তক্তপোষের উপর চাপটালি খাইয়া বসিয়া উচ্ছ্বসিত হাস্যে কহিল, বাছার না-চাই কি তাই ভাবছি! সুন্দরী হওয়া চাই; সুশিক্ষিতা হওয়া চাই; আবার সচ্চরিত্রা—মাথাখারাপ নাকি? সদ্বংশজাতা, সুগায়িকা—

সবিতা বলিল, সুসাহিত্যিকা!

—হ্যাঁ, তা'ও চাই! তারপর ভাল মালী হওয়া চাই! মা মরি!

—আবার ন্যাকামী-ভূষণবর্জ্জিতা নারী হওয়া চাই!

শুক্লা বলিল, এক কাজ করুক না ভাই, একটা পুরুষ মানুষ বিয়ে করুক না, ন্যাকামী থাকবে না!

সবিতা বলিল, দূর দূর! ওগুলো ন্যাকার রাজা; থাকে ভিজে বেড়ালটির মতো। নিজেরা ন্যাকার শিরোমণি, তাই বউ খোঁজবার সময় ন্যাকামী-ভূষণ বর্জ্জিতা নারী খুঁজে হয়রাণ।

শুক্লা বিজ্ঞাপন পড়িতেছিল, বলিল আচ্ছা সবিতা, সাহিত্যিক বউয়ে ওর দরকারটা কি বল্ ত?

—ও থিসিস্ লিখবে আর ওর বউ কবিতা দিয়ে পাদপূরণ করবে! মাসিক পত্রিকায় দেখিস্ নি, কেউ হয়ত একটা খুব গম্ভীর প্রবন্ধ লিখলে, নীচে একটুখানি জায়গা খালি, সম্পাদক মশাই একটা আজে-বাজে কবিতা ঢুকিয়ে দিয়ে বসলেন! পাছে গম্ভীর প্রবন্ধ প'ড়ে পাঠক-পাঠিকার মাথা ঘুরে যায়, তাই এই ব্যবস্থা। তোর ভাবী বরও থিসিসের পাদপূরণ করবে তোকে দিয়ে!—বলিয়া সবিতা হাসিয়া, বিজ্ঞাপন পড়িতে পড়িতে আবার বলিল, 'উদ্যান-পরিচর্য্যায় আগ্রহ থাকা বাঞ্ছনীয়'। কেন, মালী রাখলে চলে না! কিন্তু তা হোক্‌গে, বাগানের কাজ করা ভাল—খিদে হয়, শরীরের বাঁধুনী ভাল থাকে; সাঁওতালদের দেখেছিস্ ত! তবে লোকটা ভালমানুষ হ'বে; ভাল জায়গায় থাকে, ভাল চাকরী ক'রে—একে হাত-ছাড়া করা নয়।

—কিন্তু সেই প্রোফেসর!—শুক্লার মুখে অবজ্ঞার হাসি ফুটিয়া উঠিল।

—তা আর কি করবি বল্? এত কাল ত আশায় আশায় কাট্‌ল, মালঞ্চের মালাকর ত জুট্‌ল না। প্রোফেসর প্রোফেসরই সই!

—ওগুলো না কি মানুষ? দাদাকে দিয়েই দেখছি ত!

—আমিও দেখছি, সবিতা হাসিল। তাহার স্বামীও প্রোফেসর—দর্শনশাস্ত্রের প্রোফেসর।

—না-মানুষ, না-জন্তু—

সবিতা মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, কিম্ভূত! খাবার সময় ব'লে দিতে হ'বে, ওগো খাও; কলেজ যাবার সময় মনে করিয়ে দিতে হ'বে, দুটোয় ক্লাশ; শোবার সময় বলে দিতে হ'বে, ওগো, দয়া ক'রে শোও—

শুক্লা বলিল, তোকে আদর করবার সময়ও মনে করিয়ে দিতে হয় না কি ভাই?

—মনে করিয়ে দিয়েও কাজ হ'লে ত ভালই ছিল! হুঁসও নেই। জোর জার ক'রে যতটা আদায় ক'রে নেওয়া যায়।

ঘরে কেহ নাই, দুটি এক বয়সের তরুণী, অভিন্নহৃদয়া বান্ধবী, কথায় বার্ত্তায় আগড় না থাকিবারই কথা; তবে ততখানি বেপরোয়া ইহারা নয়। ইঙ্গিতে, ভাবে খানিক হাসিয়া, এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িয়া অনেক অব্যক্ত কথা ব্যক্ত করিয়া আনন্দ উপভোগ করিল!

সবিতা হাত ঘড়িতে দেখিল, চারটা বাজে। বলিল, তোর সেই ফটোটা বের কর্!

—কোন্‌টা?

—সেই যে-টা দেবীকারাণী-মডেলে তুলিয়েছিলি। আছে ত, না কাউকে দিয়ে বসে আছিস্?

শুক্লা ম্লানমুখে কহিল, কাকে আর দোব সই? কে আছে নেবার? বলিয়া গুনগুন সুরে গাহিল—

"আমি ত বিলাতে চাই আমারে!"

সবিতা বলিল, কেন কলেজের ম্যাড়াগুলো কি হলো?

শুক্লা হাসিল, বলিল, ম্যাড়াদের যা হয় তাই, শিং নাড়াই সার!

সবিতা বলিল, নে চট্ ক'রে চিঠিখানা লিখে ফেল্, আমার আবার তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

শুক্লা বলিল, হ্যাঁ ভাই, জানাজানি হয়ে পড়বে না ত? আমার কেমন যেন—

—কিছু না, ওটা নার্ভাস ডেবিলিটি, ওষুধ খা।

—মা যদি জানতে পারেন?

—পারলেই বা! স্বয়ম্বর প্রথা এদেশে হাজার বছর

ধ'রে চলে আসছে, তা জানিস্? লেখ লেখ্! আমারও ত খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে—

শুক্লা রঙ্গভরে বলিল, কিন্তু তুমি ত নিজেই বলছ, না-মানুষ না-জন্তু, একটি কিম্ভূত!

সবিতা কহিল, হ'লোই বা কিম্ভূত! হুকুম শুনে চললেই হ'ল।

শুক্লা বডিসে আঁটা ফাউণ্টেন পেনটি বাহির করিয়া দাঁতে চাপিয়া বলিল, কি জানি ভাই, বড্ড বেশী য়্যাডভেঞ্চারাস্ ব'লে মনে হচ্ছে।

সবিতা চটিয়া উঠিয়া বলিল, হচ্ছেই ত! কেনই বা না হ'বে? বাড়ীর লোক যদি বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত বসিয়ে রাখে, খুঁটে খাবার চেষ্টা আমাদের করতেই হবে। বি-এ, এম্-এ পাস্‌গুলো বিফলে যাবে নাকি?

সবিতা এম্-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল, পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই; শুক্লা এই বছর আই-এ পাশ করিয়াছে। সবিতা একটি স্কুলে মাষ্টারীও করে; শুক্লাও মাষ্টারী খুঁজিতেছিল। এমন সময়ে, ঐ বিজ্ঞাপন!

শুক্লা বলিল, কিন্তু—

সবিতা এবার সত্য সত্যই রাগিয়া উঠিল; ব্যাগ প্যারাসোল্ প্রভৃতি হাতের কাছে টানিয়া গুছাইয়া লইয়া বলিল, লিখবি নে ত, আমি চললুম্।

শুক্লা বলিল, ভাল ক'রে ভেবে চিন্তে কাজ করাই ভাল নয়?

—তুই ভাব্; আমি উঠি।

—বোস্, বোস্, অত রাগতে হবে না। দাঁড়া—

সবিতা হাসিয়া বলিল, একবার বলে বোস্, একবার ব'লে দাঁড়া; বিয়ের নামেই তোর মাথা খারাপ হ'ল নাকি?

—তা যা বলিছিস্ ভাই! দাঁড়া, একটা একটা ক'রে পয়েণ্টগুলো ক্লিয়ার ক'রে নেওয়া যাক্।

—কি আবার পয়েণ্ট?

বিজ্ঞাপনটির উপর চোখ রাখিয়া শুক্লা বলিল, এক নম্বর পয়েণ্ট—সুন্দরী?

—ন্যাকামী রাখ্। আমি তা বলে বঙ্কিমবাবুর মত আয়েষার রূপবর্ণনা করতে বসছি নে; অত ফুর্সতও নেই।

শুক্লা বলিল, সুশিক্ষিতা ও সচ্চরিত্রা—

সবিতা বলিল, পরীক্ষা করুক না; আর সচ্চরিত্রা কি না, সেটাও—

শুক্লা তাহাকে ঠেলা দিয়া, থামাইয়া দিল।

—সদ্বংশজাতা, বয়স্কা কুমারী—

—বয়স্কা কি-না যদি বলে, দাঁত দেখাবি।

—দাঁত দেখিয়ে কি হবে?

—ওমা, তা জানিস্ নে বুঝি? গরুর বয়স ঠিক ক'রে দাঁত দেখে।

—আমি বুঝি গরু?

—শুধু গরু! মুলতানি গাই! নে আর তোর কি পয়েণ্ট আছে বল্।

—সুগায়িকা—

—হার্মোনিয়ম বাজিয়ে চিঁ হিঁ করলেই ওদের মুণ্ডু ঘুরতে থাকে; নে, তুই যথেষ্ট সুগায়িকা।

—উদ্যান-পরিচর্য্যা—

—সটনের ক্যাটালগ সঙ্গে দিয়ে দোব; রোজ দামী দামী গাছ আর বীজের অর্ডার দিবি; ভি-পি খালাস করতে করতে বাছাধনের বাগানের সখ কর্পূর হয়ে যাবে। আর কি পয়েণ্ট আছে, বল?

—না, আর তেমন কিছু ত দেখছি নে।

—তবে লেখ্।

—কিন্তু যদি ভাই, কিছু ফ্যাঁসাদ হয়—

—তুই ভারি কা-পুরুষ—না, না, কা-রমণী! আমি চলি—

শুক্লা বলিল, এই দেখ, কলম খুলেছি।

দুই

পাঠিকা মহাশয়াকে এখন আমাদের সঙ্গে অনেক দূর-দেশে যাইতে হইবে। কলিকাতা হইতে দুই রাত্রির পথ; তবে ভয় নাই, যেহেতু আমরা, বায়ুরাজ্যে বিচরণকারী, মিনিটখানেকের মধ্যেই পঁহুছিয়া যাইব। কোনও কষ্ট হইবে না। সহর ডেরাদূন। এখান হইতেই মুসূরী পাহাড়ে উঠিতে হয়। মুসূরীর বরফ-ঢাকা পাহাড়গুলা এখান হইতে বেশ দেখা যায়—মোটে ত উনিশ মাইল দূর।

প্রকাণ্ড পাঁচিলঘেরা একটা বাঙলো-বাড়ীর ভিতরে একটি ঘরে দুইজন লোক বসিয়া রাজনীতি-চর্চ্চা করিতেছিল। একজন ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রের ব্যাকনাথ গান্ধীর কোষ্ঠি কাটিতেছিল; অপরজন অপদার্থ বাঙ্গালী অপদার্থতার ওয়্যাগন্ খালাস্ করিতেছিল। প্রথম ব্যক্তি, বাঙ্গালী; অপরজন ছাতু বা লাড্ডু অর্থাৎ যুক্তপ্রদেশীয়।

বেহারা ট্রে সাজাইয়া চা ও চায়ের সরঞ্জাম আনিয়া পার্শ্বের ছোট টেবিলে রাখিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, গৃহস্বামী বেহারাকে বলিল, লিচু তৈয়ার থাকে ত লইয়া আইস।

বাড়ীটার হাতায় যতগুলি গাছ, সবগুলিতেই লিচু ফলিয়াছে। এত লিচু, লিচুর এত ঘোর লাল রঙ, লীচুর পীঠস্থান মজঃফরপুরেও হয় কি-না সন্দেহ। বেহারা কয়েকগুচ্ছ লিচু প্লেটের উপর রাখিয়া গেল।

—মুলুক, চা ঢালি?

—ঢাল; কিন্তু তোমাদের বাঙ্গালী অপদার্থ!

—চা খাও। তোমাদের ছাতুরা জুয়াচোর, ভণ্ড।

এমন সময় পিওন্ আসিয়া কয়েকখানি পত্র, একটি পুলিন্দা টেবিলের উপর রাখিল। একটা কাগজে সহি দরকার। গৃহস্বামী উঠিয়া আসিয়া সহি করিয়া দিল। পুলিন্দা দেখিয়াই মনে হয়, ভিতরে ছবি আছে। গৃহস্বামী বাঙ্গালী; নাম, হিরণকুমার রায়। গামা-প্যাটার্ণের চেহারা বলিয়া ছাত্রেরা নামকরণ করিয়াছে, হিরণ্যকশিপু! সামরিক কলেজের অধ্যাপক। মুলুকচাঁদ আগরওয়ালা তাহার বন্ধু ও সহকর্ম্মী। ১৯৩৯ সালের জার্মান-পোলাণ্ড যুদ্ধের পরেই ভারতবর্ষে ভারতীয়গণের সামরিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই ঐতিহাসিক ঘটনাটা দশ বৎসর পরের ১৯৪৯ সালের পাঠক-পাঠিকাকে বলিয়া দেওয়ার দরকার না থাকিলেও অধিকন্তু ন দোষায়ঃ করা গেল।

মুলুকচাঁদ বলিল, ফটো এল?

—মনে হচ্ছে। বলিয়া হিরণ্যকশিপু পুলিন্দাটা খুলিয়া, চায়ের টেবিলে ফিরিয়া আসিল। দু'জনে অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা, পর্য্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ইত্যাদি করিল এবং মনে মনে বলিল, মন্দ নয়!

হিরণ্যকশিপু বলিল, কি রকম মনে হচ্ছে?

মুলুকচাঁদ বলিল, বড্ড স্কিনি, গায়ে মাংস নেই বললেই হয়!

হিরণ্যকশিপু কহিল, আজকালকার ফ্যাসানই ঐ!

মুলুক বলিল, দাঁড়ানো, হাত রাখা, চাওয়া সবই সিনেমা ঢঙের।

হিরণ্যকশিপু কহিল, এটা ত সিনেমারই যুগ।

—চোখে কাজল দিয়েছে নাকি?

—আপ-টু ডেট্ মেয়েরা দেয়।

—ফুলহাতা শার্ট পরেছে না-কি?

—সেটা কলকাতা সহর, মেড়োর দেশ ডেরাডুন নয়। সম্ভ্রান্তঘরের শিক্ষিতা মেয়েরা ফুলহাতা ব্লাউজই এখন পরে।

মুলুকচাঁদ মনে মনে রঙ্গ অনুভব করিতেছিল; বলিল, তা যেন হ'ল। কিন্তু, জুতোর হিল্ এত লো কেন বাপু? হাই হিল্‌ই ত ফ্যাসান। হা হা।

হিরণ্যকশিপু বলিল, তা জান না বুঝি? প্লেনে লো হিল্ আর হিল্‌স-এ হাই হিল হচ্ছে মডার্নিজ্‌ম্!

মুলুক বলিল, কানে ও দু'টো কি রে বাবা? ঘুড়ী নয় ত?

—না, ওকে অজন্তার কর্ণাভরণ বলে। তোমরা এ সবের জান্‌বে কি? এক সের ছাতুতে ক'টা কাঁচা লঙ্কা চট্‌কাতে হয়, তারই হিসেব কর গে যাও।

মুলুক কৃত্রিম-মলিনমুখে বলিল, তা হ'লে আর তর্ক করব না ভাই; তুমি বিয়ে ক'রে ফেলো।

হিরণ্যকশিপু বলিল, দাঁড়া, চিঠি পড়ি আগে।

মুলুক বলিল, চিঠি এসেছে নাকি?

—নিশ্চয় এসেছে। তুই যে কিছুই খেলি নে মুলুক! দু'খানা কচুরী খানা।

মুলুক বলিল, চিঠি আন্।

চিঠি খুবই সংক্ষিপ্ত ঃ

> মহাশয়, অপরিচিতার নমস্কার গ্রহণ করুন। অপরিচয়ের যেটুকু বাধা, সেটুকু অতিক্রম করার জন্য আমার ছবি পাঠালাম। আপনার ছবি আসিলে পরিচয়ের ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে। ভরসা করি অবিলম্বে বাসনা পূর্ণ করিবেন।
>
> বিনীতা
>
> শুক্লা সেন

হিরণ্যকশিপু বলিল, লেখাপড়া জানে বলেই মনে হচ্ছে। ছোট চিঠির ভেতরে সব কথাই বলেছে।

মুলুক বলিল, হ্যাঁ। হাতের লেখাটাও ভাল।

—সেটা স্কুলে-কলেজে পড়া মেয়ে মাত্রেরই ভাল আর এক টাইপ। তুমি দু'জন পুরুষের লেখা একরকমের

পাবে না ; কিন্তু দু'শ মেয়ের লেখার মধ্যে তফাৎ খুঁজে পাওয়া ভার।

বেহারা ঘরে ঢুকিয়া চায়ের পাত্রাদি বাহির করিয়া লইয়া যাইবার সময় আলোর সুইচ্ টিপিয়া দিয়া গেল ; আলো জ্বলিল।

মুলুক বলিল, বেরোবে না কি ?

—আর একটু পরে, বাইরে এখনও বড্ড ঝাঁজ।

আরও কতকগুলি পত্র ছিল, হিরণ্যকশিপু সেগুলি খুলিয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল ; মুলুক ফটোখানায় মনোনিবেশ করিল। চিঠি পড়িতে পড়িতে হিরণ্যকশিপু কহিল, লোকটা কি বোকা! মেয়ের হয়ে দরখাস্ত পাঠাচ্ছে। আমার মেয়ে খুব সুন্দরী, সুরালয় থেকে গীতশ্রী খেতাব পেয়েছে, বি-এ পর্য্যন্ত পড়েছে, সম্প্রতি টাইফয়েড থেকে উঠেছে ব'লে ছবি তুলিয়ে পাঠাতে পারলুম না। মহাশয় কিসের প্রোফেসর, কত বেতন পান, মহাশয়ের লেখা টেক্সট বুক ক'খানি আছে, সেগুলা ডিরেক্টার বাহাদুর কর্ত্তৃক অনুমোদিত কি-না এবং কতগুলি স্কুলে ধরাতে পেরেছেন, কত ক'রে সংস্করণ ছেপেছেন, কতগুলো কেটেছে, টেক্সট্ বুকগুলির জন্য ক্যানভাসার আছে কি-না। সমস্ত ইউ-পি'তে চালাবার চেষ্টা হয়েছে কি-না—নিশ্চয় মাথা খারাপ! রিটায়ারড হেড মাষ্টার, তাই! নইলে এত বুদ্ধি! এই যাও, তোমার যোগ্য স্থানে!—বলিয়া হিরণ্যকশিপু সেই চিঠিখানিকে কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া বাতিল-বাক্সে ফেলিয়া দিল।

মুলুক তখনও ফটোখানা দেখিতেছিল, হিরণ্যকশিপু কহিল, বড্ডই মনে ধরে গেল নাকি মুলুক ?

মুলুক মলিনমুখে কহিল, বেশী ধরলেই বা কি, কম ধরলেই বা কি! তুমি কি আর হস্তান্তর করবে!—বলিয়া সে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল ; আবার বলিল, বেল্ পাক্‌লে কাকের কি বল্ ?

হিরণ্যকশিপু কহিল, তোর জন্যেও একটা বিজ্ঞাপন দিই, কি বলিস্? এই রকম আর একটি কি পাওয়া যাবে না ?

—বাঙ্গালী ?

—দোষ কি ?

—ছোঃ ছোঃ! তার চেয়ে লক্‌নৌয়ের বাঈজী ভাল! ঢংও জানে, গানও জানে। বাঙ্গালীরা ঢংটাই শেখে, গানের বেলা শেয়াল ডাকে।

—তুই ভারি নিন্দুক। বোস্ সাহেবের মেয়ের গান, সেদিন শুনলি ত! কি সুন্দর গাইলে, কেমন চড়া গলা—

—নাকের খানিকটা কেটে দিলে ভাল হ'ত।

হিরণ্যকশিপু বলিল, একটু নাকি সুর, তা বটে!

মুকুন্দ বলিল, ভগবান নাক দিয়েছিলেন নিশ্বেস ফেলবার জন্যে, গন্ধ শোঁকবার জন্যেও হতে পারে ; মানুষ খোদার ওপর খোদকারী ক'রে সেই নাকে চশমা পরলে ; সর্দ্দি ঝাড়তে সুরু করলে ; তাতেও সন্তুষ্ট নয়, নস্যি গাদলে লাগল ঃ আবার গানের ভেতরও যদি সেই নাক ঢোকাতে আসে, বরদাস্ত হবে কেন বল ? খোদার অসীম ধৈর্য্য, তিনি যদি বা বরদাস্ত করেন, আমি পারি নে।

উভয়েই হাসিয়া উঠিল।

পরমুহূর্ত্তে সমস্যা জাগিল, হিরণ্যকশিপুর ভাল ফটো নাই। ফটো এখনই উঠান যায় বটে ; কিন্তু কি ভাবে, কি রকম ধাঁজে উঠান হইবে, সেইটাই সমস্যা। মুলুকচাঁদ বলে, লেঙট-আঁটা ছবি পাঠান সঙ্গত হইবে না, মেয়েটি মূর্চ্ছা যাইবে ; ইউনিফর্ম্ম-এও সে আশঙ্কা আছে ; এক্স্প্যাণ্ডেড চেষ্ট ও এক্সপ্যাণ্ডেড মাস্‌ল-আর্ম্মের ছবি পাঠান মন্দ নয় বটে ; কিন্তু তাহাতে কাব্যের কিছু অসদ্ভাব ঘটে। হিরণ্যকশিপুর খাওয়ার ছবি একখানা উপহার দেওয়া যাইতে পারে। একটি ছাগবৎস, দুইটি লেগহর্ণ কুক্কুট, দুই ডজন কলা, অর্দ্ধ ডজন ডিম, দিস্তাখানেক রুটীর পার্শ্বে বসিয়া ছবি তুলাইলে ঠিক হয় সত্য ; কিন্তু মেয়ের আত্মীয় স্বজন ভয় পাইবে। শ্বশুরালয়ে নিমন্ত্রণের সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত ত হইবেই, অকস্মাৎ জামাতার আবির্ভাব হইলে বাড়ীর কচি কাচা সামাল্ সামাল্ করিতে করিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইবে।

শেষ পর্য্যন্ত স্থির হইল, বাস্ট্ ফটো তুলিয়া পাঠানই যুক্তিযুক্ত। আগামী কল্য ইংরেজ ফটোগ্রাফার্সের স্টুডিও হইতে তসবীর উঠাইয়া পাঠাইবার সঙ্কল্প পাকা করিয়া, উভয় বন্ধুতে সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইল।

তিন

হিরণ্যকশিপু পত্র পাঠ করিতেছিলেন। পত্রের একাংশ খুবই ভাল লাগিয়াছে,বারম্বার সেই অংশটি পাঠ করিতেছেন ঃ

সেকালের সেই দিনের কথা মনে করুন। বল্কল-পরিহিতা কণ্বদুহিতা যখন আলবালে জলসেচন করিতেছিলেন, তখন বৃক্ষান্তরাল হইতে প্রবল-পরাক্রান্ত রাজা দেখিতেছিলেন আর ভাবিতে-ছিলেন, ঐ নবনীত কোমল দেহে জলসিঞ্চনের কষ্ট আশ্রমবালিকা সহ্য করিতেছেন কিরূপে ? রাজার ইচ্ছা হইতেছিল, তিনিই জল তুলিয়া দেন, প্রাণমনোমোহিনীর কষ্টের লাঘব করেন। সেকালে ও একালে কতই প্রভেদ! একালের সবই যেন বস্তুতান্ত্রিকতায় ভরা—কাব্যের স্পর্শ-মাত্র নাই। যাহাদের মনে কাব্যের লেশমাত্রও আছে, তাহাদের যেন এই অবস্থার মধ্যে দম বন্ধ হইয়া আসে। নীলিমাবিহীন আকাশ, তরঙ্গশূন্য সাগর, প্রেমহীন হৃদয়, কাব্যবোধহীন মানবহৃদয় কি ভয়াবহ! আমি ত কল্পনাতেও সহ্য করিতে পারি না।

পত্রের আর-এক অংশও তুলনারহিত ঃ

এই পৃথিবী কি একটা পণ্যশালা? থরে বিথরে পণ্য সাজান আছে, দাম ফেল, লইয়া যাও—বাড়ী গিয়া দেখ, যাহার যাহা মিলিয়াছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক। এই কি সৃষ্টির বিধান? নিশ্চয়ই নয়। বিধান যদি ঐরূপই হইবে, তবে চক্ষু কেন, কর্ণ কেন, বাক্য কেন, গন্ধ কেন, স্পর্শ কেন? বিচার-বুদ্ধি কেন, যুক্তি তর্ক কেন, ভাল-মন্দ বিভেদ কেন? পৃথিবীটাকে নিছক পণ্যশালা বলিয়া মনে করিবার কি কারণ থাকিতে পারে ?

শেষাংশ আরও মধুর ঃ

নদী বুঝিতে পারে, সাগর বহুদূর নয়। বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে, দেহ স্ফীত হয় ; মিলন-কামনায় উত্তাল, অধীর হইয়া পড়ে। এ সত্য শাশ্বত—চিরন্তন সত্য। যে দিন নদীর সৃষ্টি হইয়াছে, সাগর সৃজিত হইয়াছে, নদী আসিয়া সাগরের বুকে মিশিয়াছে, সাগর তাহাকে শত বাহু মেলিয়া বুকে ধরিয়াছে, সেই দিন হইতে এই সত্য জগতে প্রকাশ। নদী এই শুভদিন, শুভক্ষণ, শুভ মুহূর্ত্তটির আশায় দূর দুরান্ত হইতে, বিরহমিলনের গান, সুখদুঃখের গাথা, হর্ষ বিষাদের কাহিনী আশা নিরাশার ব্যথা বহিয়া, কখনও কাঁদিয়া, কখনও হাসিয়া, কখনও নীরবে, কখনও ভৈরব-রবে বহিয়া আসিতেছে—বিশ্রাম নাই, বিরাম নাই, শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই—মিলনের অজানা, অচেনা, অদেখা, অপূর্ব্ব দৃশ্যটির কল্পনায় হৃদয় ভরিয়া, কখনও অনুকূল স্রোতে কখনও বা উজানে বহিয়া চলিতেছে—চলিতেছে।"

হিরণ্যকশিপু কতবার যে পড়িল, বলা যায় না। তাহাতেও পরিতৃপ্ত হইতে না পারিয়া চিঠিখানাকে ভিতরকার বুক পকেটে ভরিয়া, ভ্রমণে বহির্গত হইল। মুলুকচাঁদের বাসায় আসিয়া দেখিল, মুলুকচাঁদ গোটা দুই-তিন রাইফেল বাহির করিয়া মহাসমারোহে সাফ্-সুতরা করিতেছে। মুলুকচাঁদ খাতির করিয়া বসাইল। বলিল, শিকারে যাইতেছি।

—কবে ?

—কাল।

—আমায় বল নি কেন ?

মুলুকচাঁদ হাসিয়া বলিল, তুমি ত সেরা জন্তু শিকারে ব্যস্ত, এখন বাঘ-হরিণে মন উঠবে কেন ?

হিরণ্যকশিপু বলিল, তোমার সঙ্গে সেই পরামর্শই করতে এলুম। আমি শীঘ্র কলকাতা যাচ্ছি।

—বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে নাকি ?

—না। কলকাতায় গিয়ে ঠিক করব।

—আমাদের ভোজটা এইখেনে হবে ত ?

হিরণ্যকশিপু বলিল, ভেবেছিলুম, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

মুলুকচাঁদ হাসিয়া বলিল, নিতবরের রেওয়াজ কি আজও আছে ?

—কি জানি! এর আগে ত বিয়ে করি নি কখনও।

—তা বটে! বলিয়া মুলুক রাইফেলে শিরীষ্ কাগজ ঘসিতে লাগিল।

হিরণ্যকশিপু বলিল, টাকাকড়ি কি নিয়ে যাব না যাব তাই ভাবছি। কলকাতায় চেনা-শোনা লোকও ত কেউ

নেই, কে কেনাকাটা করে, কেই বা কি করে! তুমি থাকলে তবু খানিকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যেত!

—'ডোণ্ট্ ওরি'! কলকাতায় গিয়ে একটা হোটেলে উঠ্বে। হোটেলের ম্যানেজারকে বলবে, সাড়ীওলা, ঘড়িওলা, জুয়েলার, ফুলওলা, টোপরওলা, সন্দেশওলা, লুচিওলা, ভাজিওলা। ব্যস্ আধঘণ্টার মধ্যে সব হাজির! টেণ্ডার দিতে বল্বে, উইথ স্পেসিফিকেসন!

—বল কি। লুচিওলা, ভাজিওলা পর্য্যন্ত?

—মায় টুথপিক্ওলা পর্য্যন্ত! বিয়ের রাত্রে তোমার ত কোন হাঙ্গামাই নেই হে, যা কিছু তারা করবে। পরের দিন তোমার পার্টিতে যে ক'জন লোক, সেই ক'জনের মত ডিস্ অর্ডার দেবে। হয়ে গেল। কলকাতা সহরে আবার ভাবনা কিসের?

হিরণ্যকশিপু মাথাটা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, না, না ভাবনা ঠিক নয়! তবে কি জান, বন্ধু একজন সঙ্গে না থাকলে আমোদটা পূর্ণ হয় না।

—দি আদার সাইড্ মাইট্ নট্ লাইক্ ইট্। একালে আই ও ইউর মধ্যে হি অথবা শে যত না আসে, ততই ভাল, তা জান ত!—বলিয়া সে একটা বাঁকা হাসি হাসিল।

হিরণ্যকশিপু গূহ্য অর্থ বুঝিল না; সে পূর্ব্বের মতই চিন্তাক্লিষ্ট ভাবে বলিতে লাগিল, আমি ভাই, এ সব বিষয়ে সেকেলেই আছি।

—ন্যাকামী রাখ না চাঁদ। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে, ফটো আনিয়ে, করেস্পণ্ডেন্স চালিয়ে বিয়ে করতে যাচ্ছ, কার মেয়ে, কেমন বংশ খোঁজ করা নেই, শাড়ী-সন্দেশের কণ্ট্রাক্ট দিচ্ছ, আবার ন্যাকামী হচ্ছে, আমি কিছু জানি নে! চীয়ার আপ্ ওল্ড বয়। এটা ১৯৪৯ সাল; আর যেখানে যাচ্ছ সেটা কলকাতা সহর! কলকাতায় ভাবনার কিছু নেই। শুনেছি সেখানে এমন কল আছে, যে কলের একদিকে একটি গাই গরু, যবের বস্তা, আলু পটোলের ঝুড়ি পুরে দেয়, অন্যদিকে বামুনদের ঢুকিয়ে দেয়, আধঘণ্টা পরে ভেউ ভেউ ক'রে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে দক্ষিণা হাতে বামুনরা বেরিয়ে আসে। তোমার প্রিয়তমাই সব ক'রে ক'ম্মে নেবেন, তুমি প্যাসিভ্ থাকলেও ক্ষতি হবে না। তা, কবে যাচ্ছ?

—সে পরামর্শও ত তোমার সঙ্গে করব বলেই এসেছিলুম। তা তোমার আশা ত ছাড়া দেখ্ছি। —আর এক কথা। তোমাদের নাইনিতালের বাড়ীটা পাব?

—সুইট্ হনিমূন? নিশ্চয়ই পাবে। আমি কালই চিঠি লিখে দিয়ে যাব।

—বাড়ীটি লেকের কাছে ত?

—কাছে কি বলছ? লেকের ওপরে; বিছানায় শুয়ে ঢেউ গোণা যায়।

পরদিন কলিকাতায় টেলিগ্রাম চলিয়া গেল।

আর একটু হইলেই টেলিগ্রামটা শুক্লার দাদার হাতে পড়িত। দাদা সেই মাত্র সান্ধ্য-সংবাদপত্র হস্তে ঘরে ঢুকিলেন—সাইক্ল-পিওন হাঁকিল, তার হ্যায়।

'তার' যে তাহার ছাড়া আর কাহারও নয়, শুক্লার মন তাহা বলিয়া দিল।

শুক্লা সেন

নন্দনকানন রোড

কলিকাতা

শুক্রবার এক্সপ্রেসে রওনা হইতেছি।

প্রেরকের নাম নাই—নিষ্প্রয়োজন; যেহেতু প্রেরণের স্থান, ডেরাডুন। শুক্লা তারটা 'বুক-পকেটে' ফেলিয়া সবিতার উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। ১৯৪৯ সাল, তবুও সে খানিকটা বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণ নিয়মেরও ব্যতিক্রম থাকে বই কি!

সবিতা বলিল, খাওয়া এখন?

শুক্লা বলিল, কি খাবি?

সবিতা উত্তরটা মুখেই দিল বটে, তবে কথা কহিয়া নয়। শুক্লা বলিল, ভোগের আগেই পেসাদ করলি!

সবিতা রঙ্গ করিয়া বলিল, শ্রীক্ষেত্রে ভোগ পায় কে, সবই ত পেসাদ!

—দূর হতচ্ছাড়ী।

রঙ্গ তামাসার পরে, শুক্লা বলিল, এখন কি করতে হ'বে তাই বল্?

—করা করি আর কি! রবিবার ভোর ৬টার সময় হাওড়া স্টেশনে হাজির থাকবি।

—তোমাকেও থাকতে হবে।

—দূর! আমি থাকব কেমন ক'রে?

—আমি যেমন ক'রে থাকব, তেমনই করে।

—যদি তোর হাত ধরতে আমার হাতই ধরে বসে?

—আমি ভুল ভেঙ্গে দেব।

—ইচ্ছাকৃত ভুল, ভাঙ্গালেও ভাঙ্গে না, জানিস্ ত?

—তা হ'লে আমি এসে ঐ খাটে শুয়ে পড়বো।

—মাইরি আর কি! আমি ব'লে পাঁচ বচ্ছর ধরে ঘ'সে মেজে তৈরী করলাম, উনি এসে বাড়া ভাতে বসে পড়লেন! টিয়া এখন একটি দু'টি বুলি কাটছে, শিস্ দিচ্ছে, এখন বুঝি ছাড়া যায়!

—ভাল রাঁধুনী, রান্নাতেই সুখ পায়। আমরা আনাড়ী লোক, তৈরী জিনিষই আমাদের ভাল। তুমি ভাই করিৎকর্ম্মা লোক, আবার তৈরী ক'রে নিও।

শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হইল, সবিতার তাঁহাকে দিয়া, পূর্ব্ব-রাত্রে একখানা মোটর ভাড়া করাইয়া রাখা হইবে। সবিতা ভোর ৫টার সময় শুক্লাকে তুলিয়া লইয়া বিজয়াভিযানে বাহির হইবে। বাকী যে সব কথা, তাহা পরে আলোচনা করিলে ক্ষতির সম্ভাবনা নাই।

চার

ফটোগ্রাফে দেখা লোককে জীবন্তে খুঁজিয়া বাহির করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। সবিতার সনির্বন্ধ অনুরোধে তাহাকে প্ল্যাটফর্মের বাহিরে মোটরে বসিয়া থাকিতে দিয়া শুক্লা প্ল্যাটফর্মেই দাঁড়াইয়াছিল। দেরাডুন এক্সপ্রেস 'ইন্' হইবামাত্র একখানা প্রথম শ্রেণীর ছোট কামরার দরজায় চেনা মুখখানা দেখিয়া গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে শুক্লা অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু গাড়ী যখন থামিল এবং সেই চেনা-লোকটি যখন দু' কাঁধে দু'টা বন্দুকের মত বস্তু ফেলিয়া নামিল, শুক্লা সভয়ে ও বাবাঃ করিয়া উঠিল। মনে হইল সবিতাকে ছাড়িয়া আসা ভাল হয় নাই। লোকটিকে বাঙ্গালী বলিয়া মনে করা দায়; লোকটি অতটা লম্বা আর মোটা চওড়া না হইলেই ভাল হইত! এক মুহূর্ত্ত পরেই লোকটি শুক্লার কাছে আসিয়া শুদ্ধ বাঙ্গালায় জিজ্ঞাসা করিল, তুমি শুক্লা ত?

এতদিন পত্রে 'আপনি'ই চলিতেছিল; আজ প্রথম দর্শনেই 'তুমি' হইয়া গেল; কিন্তু শুক্লা ক্ষুণ্ণ হইল না। ঐ বিরাটকায় ব্যক্তি আবার আপনি বলিবে কাহাকে? প্ল্যাটফর্মের যত লোক, সকলকেই তুমি বলিবার অধিকার সে কণ্ঠায়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে।

শুক্লা কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সে বলিল, তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। কিন্তু কোথায় থাকা যায় বল ত?

এই সময়ে গোটাকতক লোক তাহাদের ঘিরিয়া ফেলিল —ইহারা হোটেলের লোক। দেশী, বিদেশী, পরদেশী অনেক হোটেলের লোকই জমিয়া গিয়াছে।

হিরণ্যকশিপু শুক্লাকে বলিল, এদের মধ্যে কোন্টা ভাল, তুমি কিছু জান?

শুক্লা বলিল, বিলিতে হোটেল সবগুলোই ভাল।

—তবে তাই, বলিয়া উহাদের মধ্য হইতে একটি বাছিয়া বাক্স, বিছানা প্রভৃতি হোটেলের লোকের জিম্মা করিয়া দিয়া হিরণ্যকশিপু বলিল, তুমি আমার সঙ্গে হোটেলে আসবে ত এখন? সেখানে ব'সেই কথাবার্ত্তা হ'বে, কেমন?

শুক্লা ঘাড় নাড়িল।

হোটেলের গাইড সবিনয়ে নিবেদন করিল, গাড়ী প্ল্যাটফর্মের বাহির আছে।

—আমরা ট্যাক্সি নিয়ে যাব, কি বল?

মোটর যে অপেক্ষা করিয়া আছে একথা বলিবার দরকার আছে বলিয়া তাহার মনে হইল না: ভাবিল, সবিতার পাশ দিয়া চলিয়া যাইবার সময় অকস্মাৎ চিনিয়া ফেলিবার ভান করিলে সব দিক দিয়াই ভাল হইবে। সবিতাও কতকটা বিস্মিত হইবে, এই লোকটিও জানিবে যে একলা আসিতে ১৯৩৯ সালেও বঙ্গললনারা ভীত হইত না; ১৯৪৯ সালেও কুণ্ঠিত হয় না।

কিন্তু সবিতা নাই! সে গাড়ীও নাই! সে-যে এমন ছোটলোক শুক্লা তাহা জানিত না। দেখা হোক্, তখন বুঝাপড়া হইবে।

হোটেলে বসিয়া ইহাই স্থির হইল যে, আগামী কল্য প্রভাতে হিরণ্যকশিপু শুক্লাদের বাড়ী যাইয়া শুক্লার মাতার নিকট শুক্লার পাণি প্রার্থনা করিবে। তাহার পর উভয়ে বাহির হইয়া মার্কেটিং করিবে। হিরণ্যকশিপুর সহিত এক টেবিলে ব্রেক ফাষ্ট করিয়া ট্যাক্সি ডাকিয়া শুক্লাকে উঠাইয়া দিয়া, হিরণ্যকশিপু ঝুঁকিয়া পড়িয়া, নাঃ ১৯৩৯ই ভাল ছিল!

কিন্তু না, রাস্তার কোনও লোকের চোখই এদিকে নাই ; থাকিবার কথাও নয় ; লোকের চোখও অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, নূতনত্ব না পাইলে হাঁ করিয়া তাকায় না।

বাড়ী আসিয়া দেখিল, সবিতা তাহার মায়ের সঙ্গে খুব গল্প জমাইয়া দিয়াছে। শুক্লা মুখ অন্ধকার করিয়া ঘরে ঢুকিয়া বেশ বাস পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল। জামা কাপড় বদলাইতে বেশী সময় লাগে না, সেগুলাকে আল্‌নায় ফেলিতেও যথেষ্ট দেরী হয় না ; কিন্তু পাটকরা কাপড় খুলিয়া আবার পাট করিতে এবং বারবার ঝাড়া জামা নূতন করিয়া ঝাড়িতে মুছিতে সময় লাগে বৈ কি! এতটা সময়ের মধ্যেও দুইটি অভিন্নহৃদয় বন্ধুর মধ্যে বাক্যবিনিময় হইল না দেখিয়া, শুক্লার মা মনে মনে হাসিয়া, "সবি, কিছু খাবি না কি রে?" বলিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

সবিতা বসিয়াছিল, উঠিয়া আল্‌নার কাছে আসিয়া বলিল—

বাপ্,
ইয়া একটা বাঘ
দেখে দিলুম লাফ!

ও শুকি, জালার পাশে নেংটি ইঁদুর হয়ে যাবি যে ভাই!

শুক্লা চটিয়া উঠিয়া বলিল, হয়ে যাই, হয়ে যাব, আমি হয়ে যাব, তা'তে কারও কথা বলবার দরকার আছে বলেত মনে করি নে।

সবিতা বলিল, সেকালে কথা ছিল, বিয়ে ফুরোলে ছালনায় লাথি! তোর যে দেখছি বিয়ে পর্য্যন্ত তর সইছে না। তা' ভাল।

শুক্লা বলিল, বাঘ হ'লেও তোমায় খেত না।

—অমন কচি নধর মাংস পেলে বুড় মাংসে কার রুচি হয় বল্!

—তবে পালিয়ে এলে কেন, শুনি?

—সত্যি বলছি ভাই, চেহারা দেখে ভড়কে গেলুম।

—তোমার ভড়কাবার কি ছিল? ভয় পেতে হয়, ভড়কাতে হয়—আমি ভয় পাব, আমি ভড়কাব। তোমার কি?

সবিতা এতক্ষণে রঙ্গ পরিহাস ছাড়িয়া বলিল, দূর তা' নয়। দেখলুম তোরা কথা কইতে কইতে প্ল্যাটফর্ম থেকে বার হলি ; আমি তোদের আলাপ জমাবার সুযোগ দেবার জন্যেই সরে গিয়ে রইলুম। আমি থাক্‌লে তোদের আলাপে কতকটা ব্যাঘাত ত হোতই ; অন্ততঃ আর কিছু না হোক্, আগে কে কথা কইবে, মনের এই তর্ক মিট্‌তে মিট্‌তে রাস্তা ফুরিয়ে যেত! না হোত কথা, না হোত ভাব! হোল, ভাব টাব হোল?

—তা হোল, বলিতে বলিতে শুক্লা হাসিয়া ফেলিল।

—হাসলি যে! কি ভাই, বল্‌না ভাই! আচ্ছা, বলবিনে ত! বেশ, বলিস্‌নে। কিন্তু পেলি কার জন্যে, সেটা যেন মনে থাকে!

—বলছি বলছি, অত রাগ করতে হবে না। ভেরী র‍্যাস্!

সবিতা চোখ দু'টা পিট্‌পিট্ করিতে করিতে বলিল, হুঁ?

শুক্লা সহাসনেত্রে কহিল, হুঁ।

সবিতা প্রশ্ন করিল, মাইরি?

শুক্লা হাসিয়া বলিল, মাইরি?

আঙুল দেখাইয়া সবিতা সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতে বলিল; শুক্লা তর্জ্জনী উত্তোলন করিল।

—কখন্?

—আসবার সময়, ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে।

—হি ইজ ব্রেভ্, ডিজার্ভস্ ইউ।

সবিতা, অন্য কথাবার্ত্তার পর জিজ্ঞাসা করিল, আজ কথা কিছু হোল?

শুক্লা বলিল, কাল আসবে।

সবিতা বলিল, নিজে সোজা?

—হ্যাঁ।

—হি ইজ ব্রেভ! ডিজার্ভস্ ইউ!

—তোকে কিন্তু ভাই, কাল সকালে থাক্‌তে হবে।

—সে তুই না বললেও থাক্‌ব! উঃ কি দুঃসাহসী লোক! রাস্তার ধারে ট্যাক্সিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তোকে কিস্ করলে?

—ঝাঁপিয়ে অবিশ্যি পড়েনি, ঝুঁকে পড়েছিল বটে!

—তারপর নিজেই এসে বলবে, শুক্লাকে বিয়ে করতে এসেছি! হ্যাঁ দুঃসাহস বটে! এ লোক ন্যাকা পেলে পছন্দ করতে পারে না—ঠিক। একটা কথা তোকে ব'লে রাখি শুকি, মনে রাখিস্। 'কেন' কথাটা একদম বাদ দিয়ে যাস্। কোন সময়ে 'কেন' করবি নে। ওটায় যত বা ন্যাকামী ফুটে ওঠে, তত বা অশান্তি ডাকে। মনে থাকে যেন।

—'কেন'র ওপর তোর বিষম রাগ দেখি! তুই বলিস্‌নে ওঁর কাছে?

—না।

—কোন কিছু জানতে হোলে?

—'কেন' না ব'লে ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করি। আমি শতকরা নিরানব্বইটা কেসে, শুনেছি ও দেখেছি, কেন-টা পুরুষদের ভ্যানিটিতে লাগে। জাতটা ভ্যানিটিতে ভরা, তা স্বীকার করিস্ ত? ভাবে—কৈফিয়ৎ চাইছে। চটে যায়! গাধা গাধা, একেবারে ধোপার গাধা, বুদ্ধি সাধ্যি যদি কিছু থাকে!

পরদিন সকালে অভিনব কাণ্ড কিছুই হইল না। 'হিরণ্যকুমার রায়, ভারতীয় সামরিক কলেজের অধ্যাপক, ডেরাডুন' এই কার্ড দেখিবামাত্র শুক্লার প্রোফেসর দাদা বাহির হইয়া আসিলেন। আগন্তককে দেখিবামাত্র তিনিও মনে মনে ও সভয়ে কহিলেন, ও বাবাঃ!

আগন্তুক বলিল, শুক্লা সেন, আপনার কে?

—আমার বোন। কেন?

—আমি তাঁকে বিয়ে করতে এসেছি। পরশু ভাল দিন আছে, বিয়ে ক'রে তারপর দিনই আমরা নইনিতাল যাব, হনিমূন করতে।

প্রোফেসর দাদার মাথা ঘুরিতেছিল। জানা নাই, শোনা নাই, নৈনীতালে একেবারে হনিমূন পর্য্যন্ত! লোকটি স্থবির গোছের, বই, কলেজ, ট্রাম, নস্যের ডিবা পর্য্যন্ত দৌড়, এত দ্রুত দৌড়িতে পারিবে কেন? খালি মালগাড়ী যেমন ষ্টেশন হইতে যাই যাই করিয়াও চলিতে পারে না, প্রোফেসার দাদার কথাগুলিও তদ্রূপ ; বাহির হয়-হয় হয় না! বলিল, আপনি, আমার বোন—আপনাকে ত, আপনার দেশ, নইনিতালে কেন—আপনার সঙ্গে আমার বোনের বিয়ে, আপনাকে আমরা চিনিনে জানিনে—

আচম্বিতে, সবিতা বাহিরে আসিয়া বলিল, এই যে আপনি এসেছেন, নমস্কার, আসুন, আসুন।

সবিতা তাহাকে ভিতরে লইয়া গেল। প্রোফেসরদাদা নাসিকারূপ হাউইট্‌জার গানে নস্যরূপ বারুদ গাদিয়া ভাবিলেন, তাহ'লে বোঝা গেল, সবিতাই ঘটক। বাঁচা গেল বাবা! যা ভয় হইয়াছিল! যাক্, একটু বেরিয়ে পড়া যাক্। পাছে পুনরায় কোন কঠিন, জটিল ও দুর্ভেদ্য সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়, অবিলম্বে কাঁধে জামাটা ফেলিয়া তিনি মধ্যাহ্ন ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলেন।

হিরণ্যকশিপু শাড়ীর, জুতার, জড়োয়ার ক্যাটালগগুলি খুলিয়া বলিল, আপনারা পছন্দ ক'রে নম্বরগুলোর পাশে পাশে দাগ দিয়ে দিন, ওরা বিকেলেই সব ডেলিভারী দিয়ে যাবে।

সবিতা বলিল, আমরা আসল জিনিষ ছাড়া আর কিছুই বাছাই করিনে।

লোকটি ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিল, সে কি! এ সবই জোচ্চুরী নাকি?

সবিতা বলিল, না, না, তা' বলিনি। আমরা বলছি কি, শুক্লার আসল জিনিষটা আমরা পছন্দ করিছি, বাকী যা-কিছু তা' তিনিই পছন্দ করুন ; আমরা আর পরিশ্রম করতে নারাজ!

—ওঁরও কি সেই মত?

—আমরা সকল বিষয়ে একমত।

—শুক্লা কথা বলে না কেন? ও বোধ হয় আড়ালে কিছু বলতে চায়?

—জিজ্ঞাসা ক'রে দেখতে পারেন ; তবে মনে রাখবেন, এটা ট্যাক্সি নয় ; ট্যাক্সি-ড্রাইভাররা চেষ্টাকৃত ঠুলিবদ্ধ চক্ষু ; দেখলেও দেখে না। এখানে মা বিদ্যমানা এবং দুই চক্ষে দুই জোড়া পাওয়ারফুল লেন্স। আর শুক্লার প্রোফেসার-দাদাকে দেখলেন ত? "আপনারা? কোন্ জাতি, কোন্ বর্ণ, কোন্ ঘর, কুলীন না মৌলিক"!—বলিয়া হাসিতে হাসিতে সবিতা উঠিয়া গেল। শুক্লা আসিল।

—আমি বলি কি, তুমি চল, পছন্দ ক'রে সব কিনে আনবে চল?

—সেই কথাই ত ছিল।

—তা' ছিল, তবু এগুলো নিয়ে এলুম, যদি দেখে শুনে কতকটা ধারণা ক'রে যাওয়া যায়, সুবিধে হয়।

সবিতা শুক্লার মা'কে লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, নাও মা, তোমার মেয়ের শাড়ী, জুতো, জড়োয়া গয়না তুমিই সব পছন্দ ক'রে দাও। পর্শু দিন ঠিক হয়েছে—

শুক্লা বলিল, আমরা বেরুচ্ছি, দেখে শুনে সব কিনে আন্‌ব।

সবিতা বলিল, সেই ভাল। মা, তুমি চট্ ক'রে জামাইকে চা' করে দাও দিকি!

বাহিরে আসিয়া শুক্লার মা সবিতাকে একরাশ গালি পাড়িলেন—হতচ্ছাড়ী, শতেকখোয়ারী, টেবো-গালি, ইত্যাদি! গোপনে গোপনে এত কাণ্ড করা হইয়াছে, তাঁহাকে বলিতে দোষটা কি ছিল, পোড়ারমুখী! বাঁদরী, ছুঁচোমুখী!

গালিগালাজের অভিধানগুলা কি সৃষ্টিনাশের তারিখ পর্য্যন্তই বলবৎ থাকিবে! হায় রে! এক হাজার নয় শত উনপঞ্চাশ সালেও তাহাদের সমান দাপট!

পাঁচ

নইনিতাল। এবার নইনিতালেও ভীষণ গরম। বাজারে হাতপাখা বিক্রীত হইতে দেখা যাইতেছে। আগেকার দিনে পাখার নাম শুনিলে লোকে আকাশের পানে চাহিয়া পাখীর খোঁজ করিত। তবে হ্যাঁ, মধুচন্দ্র যাপন করিবার যোগ্যস্থান বটে! লেকের জলে যখন জ্যোৎস্না ভাসে, পাহাড়ের গায়ের আলো যখন সেই জলে ঝিকিমিকি করে, তখন যাহাদের মধুচন্দ্রের দিন অবসান হয় নাই, তাহারা দিল্লীর শেষ বাদশাহের অনুকরণে অবশ্যই বলিতে পারে, ওগো ধরায় স্বর্গ যদি কোথায়ও থাকে, তবে এই স্বর্গ, এই স্বর্গ! তোমরা শুনিয়া অবাক্ হইয়া যাইবে, এই দূর দেশেও পাখী ডাকে এবং মিষ্ট সুরেই ডাকে। বোধ করি মধুচন্দ্রীদের মনের মাধুর্য্য বৃদ্ধির জন্য তাহারাও দেশান্তর হইতে আসিয়াছে। বাঙ্গালাদেশের আমদানী।

ছোট বাড়ীটি; কিন্তু বড় সাজান-গোছান। বাগানটি যেন ছবিতে আঁকা। শুক্লা সীজন ফ্লাওয়ার বেডে জল দিতেছিল, হিরণ্যকশিপু আসিয়া সংস্কৃতে বলিল, প্রিয়তমে, মক্ষিকাটি তোমাকে বড়ই পীড়িত করিতেছে; কিন্তু আর ভয় নাই, আমি-দুষ্মন্ত আসিয়া পড়িয়াছি।

শুক্লা হাসিয়া চাহিল মাত্র।

'দুষ্মন্ত' কহিল, প্রিয়ে আজ্ঞা দাও, ঐ দুষ্ট মাছিটাকে নিগৃহীত করি।

শুক্লা বলিল, কোথায় আবার মাছি?

হিরণ বলিল, রূপক বলছিলাম। শকুন্তলার গল্প নিশ্চয়ই পড়েছ?

—না; আমাদের বছরে শকুন্তলা টেক্সট্ ছিল না। একটু একটু জানি গল্পটা। তুমি নিশ্চয়ই সবটা জান?

—তা জানি।

—বল-না।

—এখন! পাগল নাকি? চল, বেড়িয়ে আসি।

—রাত্রে বল্‌বে?

—বলব?

শকুন্তলার গল্প শুনিতে শুনিতে রাত্রি কাটিয়া গেল। ভোরের দিকে হিরণ জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আমার সঙ্গে জুয়াচুরি করেছ।

—কি আবার জুয়াচুরি দেখলে?

—চিঠিগুলো তোমার লেখা নয়।

—আমার লেখা। মিলিয়ে দেখ।

—তোমার হাতের লেখা বটে, রচনা তোমার নয়।

শুক্লা হাসিতে লাগিল।

—এই ত জুয়াচুরি!

—তুমিও করেছ।

—আমি?

—হ্যাঁ। তুমি বিজ্ঞাপনে লিখলে, প্রোফেসর! আমরা কলেজের প্রোফেসর, প্রেমের কবিতা লেখ, প্রেমের গল্প টল্প লেখ এই ভেবে রইলাম, ছিপছিপে ফিট্‌ফাট; তিরিক্ষি মিরিক্ষি দুর্ভিক্ষের দেশের চেহারা, সেই ভাবে তৈরী হ'লাম; কিন্তু এলে একেবারে গুণ্ডোর সর্দ্দার! মীনে পেলোয়ারী! এটা জুয়াচুরি নয়?

—তা'তে তোমাদের কোনও ক্ষতি হয়েছে?

—চিঠির রচনা আমার নয়, তা'তে তোমার কোন ক্ষতি হয়েছে?

—না, তা' না, ক্ষতি—না, তা' এমন—

—আমারও না, তা' না, ক্ষতি,—না, তা এমন—

—কিন্তু কে লিখ্‌ত, বলতে হবে?

শুক্লা বলিতে যাইতেছিল—"কেন," সবিতার নিষেধবাক্য মনে পড়িয়া গেল; বলিল, কি হবে আর সে-সব জেনে? সাহিত্য নিয়ে ধুয়ে খাবার ইচ্ছে থাকে ত বল! না নিজে ঘুমোবে, না আমায় ঘুমোতে দেবে! কি মুস্কিলেই পড়লুম গা!

—তোমার মা'র চিঠির জবাব দিয়েছ?

—না।

—দিলে না কেন? কত ভাবছেন—

শুক্লা বলিল, ভাবছেন বলেই ত দিলাম না। ভাবনাটা কিসের শুনি? জানেন আমরা মধুচন্দ্র করতে এসেছি, উনি ভেবে সারা। দস্তুরমত ন্যাকামী!—একটু থামিয়া আবার বলিল, তুমি ত বিজ্ঞাপনে বলেছিলে, ন্যাকামী পছন্দ ক'র না; এই সব ন্যাকামী, 'ভাবনা', 'সারা হলুম' এ গুলো সহ্য হয়?

হিরণ্যকশিপু মাস্‌ল ফুলাইতে ফুলাইতে জবাব ঠিক করিতেছিল, শুক্লা বলিল, আমি অনেক ভেবে দেখলুম, মা-গুলো সেই কৌশল্যার যুগেই পড়ে আছে; আর পুরুষ-গুলোও সেই বোকারাম যুধিষ্ঠিরই থেকে গেছে।

তখন না হোক্, পরে কোন-একটা সময়ে পত্র-লেখিকার নামটা প্রকাশ করিতে হইল। শুনিয়া হিরণ বলিল, তাহ'লে প্রকৃতপক্ষে আমার বিয়েটা তার সঙ্গেই হয়েছে। কি বল?

শুক্লা বলিল, প্রকৃতপক্ষটিকে আনতে যাও-না! গিয়ে একবার মজাটা দেখ-না। তার তিনিটি লজিকের প্রোফেসার, এইসা লজিক ঝাড়বেন, বন্দুক ফন্দুক ফেলে ছুটতে পথ পাবে না। তুমি ত তুমি, তাঁর গিন্নীই লজিকের ঠেলায় মাসের আর্দ্ধেক দিন আমাদের বাড়ীতে এসে লুকিয়ে থাকে। তাঁর লজিকের প্রবন্ধ পড়ে বিলেতের লোকসুদ্ধ কাঁপতে থাকে।

—বল কি!

—বিশ্বাস না হয়, একবার দেখ না পরখ করে! তোমার সোর্ড-এর চেয়ে তাঁর পেন ঢের মাইটিয়ার।

—তবে আর কাজ নেই কি বল? ওকি লেপ্‌টা সবই তুমি টেনে নিচ্ছ যে; আমি যে শীতে কাঁপি।

শুক্লা লেপটা আরও টানিয়া লইল ও পাশ ফিরিয়া আড়ষ্টভাবে শুইয়া রুষ্টস্বরে বলিল, আমার কাছে কেন, যাও না প্রকৃতপক্ষের কাছে লেপ চাওগে না!

প্রণয়ী-প্রণয়িনীদের অভিমানের কারণ, রূপ ও ধারা ১৯৪৯এ'ও অপরিবর্ত্তিত, ইহাই প্রমাণিত হইল।

মধুচন্দ্র সমাপ্ত করিয়া তাহারা যখন ডেরাডুনে ফিরিল, তখন ১৯৪৯ পরিবর্ত্তিত হইয়া ১৯৫০ হইয়া গিয়াছে।

—তবু—

কমলরাণী মিত্র

প্রতি দিবসের আলো গানগুলি
হারায়েছে প্রতি রাতে,
কতো আশা হায় ব্যর্থ নিরাশে
ঝ'রেছে নয়ন-পাতে;
তবু ফুটিয়াছে ফুল—
নেমেছে জ্যোৎস্না-ধারা;
বারে বারে তাই উন্মনা হ'য়ে
তবুও দিয়েছি সাড়া!
দুঃখ-দৈন্য রূঢ়তমরূপে
ফিরিতেছে ঘরে ঘরে,
শুধু ক্রন্দন, হাহাকার শুধু
কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরে;
তবু অমৃত গান
গেয়েছি কণ্ঠ ভরি',
মুক্ত-অসীম-গগন-সাগরে
বয়েছি স্বপ্ন-তরী!!
থাক ক্ষয়-ক্ষতি জীবন ভরিয়া,
থাক্ যতো পরাজয়,
হারায় যদি বা হারাইয়া যাক্
জীবনের সঞ্চয়;
তবুও হাসিবে ধরা
শারদ-শুভ্র হাসি,
তবুও নিখিল ভুবন-ভবনে
বাজিবে প্রেমের বাঁশি!!

আদিশূর কর্ত্তৃক পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন

অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম্-এ, পি-এইচ্-ডি ভাইস্-চ্যান্সেলার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মহারাজ আদিশূর কর্ত্তৃক কনৌজ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন ও বঙ্গদেশে তাহাদের প্রতিষ্ঠা এই মূল ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়াই প্রায় সমুদয় প্রাচীন কুলগ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই পঞ্চব্রাহ্মণের বংশধরগণের সামাজিক ইতিহাসই কুলগ্রন্থের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়, সুতরাং প্রথমেই এই আখ্যানটির আলোচনা করা যাউক। বলা বাহুল্য যে এই আখ্যানটি সম্বন্ধে বিভিন্ন কুলগ্রন্থে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। এই আখ্যানের স্থূলমর্ম্মটুকু প্রায় সকল কুলগ্রন্থেরই অনুমোদিত—তাহা এই ঃ

"মহারাজ আদিশূর গৌড়ের রাজা ছিলেন। তিনি কোলাঞ্চ অথবা কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। অভীষ্টকার্য্য সিদ্ধ করিয়া পঞ্চব্রাহ্মণ কান্যকুব্জে প্রত্যাগত হন। কিন্তু গৌড়দেশে গমন হেতু তাঁহারা সমাজে গৃহীত না হওয়ায় পুনরায় গৌড় দেশে ফিরিয়া আসেন। মহারাজ আদিশূর পরম যত্নে তাঁহাদিগকে বাসযোগ্য গ্রামাদি দান করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। পঞ্চব্রাহ্মণের সঙ্গে যে পাঁচজন কায়স্থ ভৃত্য আসিয়াছিলেন তাঁহারাও গৌড়ে বাস-স্থাপন করেন।"

এই আখ্যানটি সম্বন্ধে বিভিন্ন কুলগ্রন্থের মতভেদ সম্যক বুঝিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পৃথকভাবে আলোচনা করিতে হইবে।

১। মহারাজ আদিশূর কে?
২। কোন্ সময়ে তিনি পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন?
৩। পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নের কারণ কি?
৪। কি উপায়ে এবং কোথা হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনীত হন?
৫। পঞ্চব্রাহ্মণের নাম ও গোত্র।
৬। কোথায় কিভাবে আদিশূরের সহিত তাঁহাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়?
৭। বঙ্গদেশে পঞ্চব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা।

১। মহারাজ আদিশূর কে?

'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' প্রণেতা লিখিয়াছেন ঃ

"কুলাচার্য্যগ্রন্থে আদিশূরের বংশাবলী পাওয়া যায়, কিন্তু ধারাবাহিকরূপে লিখিত নাই। কুলাচার্য্যগ্রন্থ এবং প্রাচীন কুলাচার্য্যগণের কথানুসারে নিম্নলিখিত বংশাবলী জানা যায়—"(১)

কবিশূর
|
মাধবশূর
|
আদিশূর
|
ভূশূর
|
ক্ষিতিশূর
|
ধরাশূর
⋮
প্রদ্যুম্নশূর
⋮
বরেন্দ্রশূর
⋮
অনুশূর

[মাধবশূর হইতে ধরাশূর পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার পুত্র। শেষ তিনজন রাজার পরস্পর ও পূর্ব্ববর্ত্তীগণের সহিত সম্বন্ধ জানা যায় না।] অনুশূরের পরেই বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেন রাজা হন।

'কুলতত্ত্বার্ণব' গ্রন্থে নিম্নলিখিত বংশাবলী পাওয়া যায়—

মাধবশূর
|
আদিশূর
|
ভূশূর
|

(১) গৌ—ব্রা (২৮)

|
ক্ষিতিশূর
|
মহীশূর
|
পৃথ্বীশূর
|
ধরাশূর
|
চন্দ্রশূর
|
সোমশূর

অপুত্রক সোমশূরের মৃত্যু হইলে বল্লালসেন তদীয় রাজ্যে রাজা হইলেন।

কোন কোন কুলগ্রন্থে নিম্নলিখিত বংশাবলী পাওয়া যায় (১ ক)

আদিশূর
|
ভূশূর
|
ক্ষিতিশূর
|
অবনীশূর
|
ধরণীশূর
|
রণশূর

অনেক কুলগ্রন্থে তিনি বৈদ্যবংশীয় বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং তাঁহার সম্পূর্ণ বিভিন্ন বংশাবলী প্রদত্ত হইয়াছে (২)

'বিপ্রকুল-কল্পলতা'র মতে বঙ্গদেশাধিপতি বৈদ্যবংশীয় শালবান নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার বংশে প্রতাপচন্দ্র এবং তদ্বংশে তেজঃশেখর জন্মগ্রহণ করেন। তেজঃশেখরের বংশে রাজা আদিশূর জন্মগ্রহণ করেন।(২ক)

কোন কোন কুলগ্রন্থে আদিশূর বল্লালসেনের মাতামহ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, আবার অন্যত্র বল্লালসেন আদিশূরের দৌহিত্র-কুল-জাত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। (২খ)

'কুলতত্ত্বার্ণব' অনুসারে গৌড়রাজ আদিশূর অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কর্ণাট, কেরল, কামরূপ, সৌরাষ্ট্র, মগধ, মালব, গুর্জ্জর প্রভৃতি দেশ জয় করিয়াছিলেন এবং কান্যকুব্জ-রাজ ব্যতীত অন্যান্য সকল নরপতি তাঁহার বশীভূত হইয়াছিলেন।(৩)

ধনঞ্জয়কৃত 'কুলপ্রদীপে' উক্ত হইয়াছে যে, "অবনীপতি শ্রীশ্রীমান্ আদিশূর বৌদ্ধগণকে পরাজিত করিয়া গৌড়রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন।"(৪) ভাদুড়িকুলের বংশাবলীতে আর একটু বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে যে, আদিশূর 'বৌদ্ধনৃপপালবংশ' পরাজিত করিয়া গৌড়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন।(৫) ইহাতে বৌদ্ধ পাল-রাজগণের পরাজয়ের কথা সূচিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। 'লঘু-ভারতে'ও এই উক্তি আছে।(৬) সংস্কৃত রাজাবলী নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে আদিশূর রাঢ়, বরেন্দ্র, গৌড়, বঙ্গ, ও উৎকল জয় করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মপুত্রনদের পশ্চিমে বিক্রমপুরের 'রামপল্যাখ্য' স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল।(৬ক)

এস্থলে বলা আবশ্যক যে কুলগ্রন্থোক্ত এই সমুদয় উক্তির সমর্থক কোন প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই এবং বাংলার ইতিহাস যতটুকু আমরা জানি তাহাতে আদিশূরের দিগ্বিজয় কাহিনীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ৺নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে রাজ-তরঙ্গিনীতে উল্লিখিত কাশ্মীর-রাজ জয়াদিত্যের শ্বশুর গৌড়াধিপ জয়ন্ত জামাতা কর্ত্তৃক পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর হইলে আদিশূর উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কৃত্রিম

(১ক) ৺মনোমোহন চক্রবর্ত্তী এই বংশলতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রমাণ স্বরূপ তিনি 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু উক্ত গ্রন্থে এই বংশলতা নাই; যাহা আছে তাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। (Journal of the Asiaic Society of Bengal, 1908, p 280, f.n.)

(২) মো—মু (৩৪২) পার্ব্বতীশঙ্কর রায় চৌধুরী—আদিশূর ও বল্লালসেন (১৮-২০)।

(২ক) মো—মু (৩৪৫)।

(২খ) পরবর্ত্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৩) ৬ শ্লোক।

(৪) সং নিং (২৫৭)।

(৫) গৌ—বা (৮৩)।

(৬) ৩য় খণ্ড, ১৫৭ পৃঃ। গৌ—বা (৩২)।

(৬ক) অপ্রকাশিত রাজাবলী গ্রন্থের বিবরণ শীঘ্রই সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

(৭) বসু—১ (১০১)।

বলিয়া প্রমাণিত একটি সংস্কৃত শ্লোক ভিন্ন ইহার অন্যবিধ কোন প্রমাণ নাই।

২। পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নের তারিখ

আদিশূর কোন্ সময়ে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন তৎসম্বন্ধে কুলগ্রন্থে বহুমত প্রচলিত। এই সময়-জ্ঞাপক যে বহু শ্লোক প্রচলিত আছে নিম্নে তাহার তালিকা দিতেছি।

১। বেদচন্দ্রাঙ্ক (৯১৪) শাকে তু গৌড়ে
বিপ্রাঃ সমাগতাঃ (৮)

২। বেদবাণাঙ্ক শাকে (৯৫৪)······
—বংশীবদন বিদ্যারত্ন ধৃত কুলপঞ্জিকা।(৯)

৩। অঙ্কে অঙ্কে বামাগত বেদযুক্ত তদা···(৯৯৪)
—বাঙ্গালার ভট্টগ্রন্থ।(১০)

৪। নবনবত্যধিক নবশতী শকাব্দে···(৯৯৯)
—ক্ষিতীশ-বংশাবলীচরিত—২পৃঃ (১১)

৫। বেদবাণাহিমে শাকে···(৮৫৪)
—নুলো পঞ্চাননের 'সারাবলী'-ধৃত কুলার্ণব গ্রন্থ।(১২)

৬। শাকে বেদকলঙ্কষট্‌কবিমিতে···(৬৫৪)
—বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকা।(১৩)

৭। বেদবাণাঙ্গ শাকে···(৬৫৪)
—বাচস্পতি মিশ্র কৃত রাঢ়ীয় ঘটক-কারিকা।(১৪)

৮। শাকে শরাব্ধি-ঋতুমে···(৬৭৫)
—কুলতত্ত্বার্ণব।(১৫)

৯। বেদাষ্টশতাব্দকে···(৮০৪)
—দত্তবংশমালা।(১৬)

১০। বেদবাণ নবমান শকাব্দে (৯৫৪)
—প্রেমবিলাস।(১৭)

১১। যে অঙ্কের নান্তগতি ত্রিরাবৃত্তি তার মাঘ মাস
(৯৯৯ সংবৎ=৮৬৪ শাকে) (১৮)

১২। বিক্রমের উনবর্ষ দশ শত অব্দ
(৯৯৯ সংবৎ=৮৬৪ শাকে)
—নুলো পঞ্চানন।(১৯)

উদ্ধৃত শ্লোকগুলির মধ্যে কোনটিই কোন প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থে আছে এরূপ প্রমাণ নাই। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ইহাদের কয়েকটির উল্লেখ করিয়া বলেন, "যে যে কুলজ্ঞগণের সহিত আলাপ করিয়াছি তাঁহারা এই সকল বচনের কোনটির বিষয়ই অবগত নহেন। সুতরাং এই সকল বচন প্রবল জনশ্রুতি-মূলক বলিয়া স্বীকার করা যায় না।"(২০)

ব্রাহ্মণ আনয়নের সময়জ্ঞাপক এই সকল উক্তি ব্যতীত কুলগ্রন্থে আদিশূরের সময়-জ্ঞাপক অন্যবিধ প্রমাণ আছে।

'লঘু ভারত' মতে কলির ৪১৩০ অব্দ গত হইলে (অর্থাৎ ৯৫১ শাকে) আদিশূর সিংহাসনে আরোহণ করেন।(২১)

বিপ্রকুল-কল্পলতা অনুসারে আদিশূর ৯৫১ শাকে জন্মগ্রহণ করেন ও ৯৬৪ শাকে সিংহাসনে আরোহণ করেন।(২২)

---

(৮) গৌ—বা (৩৩)।

(৯) গৌ—বা। (৩৫)।

(১০) গৌ—বা (৩৪)। বসু—১ (৯৭)।

(১১) বসু—১ (৯৭)।

(১২)। বসু—১ (৯৭)। সং নিং (৬৩৭)।

(১৩) বসু—১ (৮৩)।

(১৪) বসু—১ (৮৩)।

(১৫) শ্লোক ৫৪।

(১৬) বসু—১ (৯৭)।

(১৭) ২৪ ম বিলাস, ২৬২ পৃঃ—২য় স্তম্ভ। আদিশূর (৪৯)।

(১৮) সং নিং (৩১১)।

(১৯) সং নিং (৩৭৪)।

(২০) গৌড়রাজমালা (৫৮)।

(২১) শূণ্যবহ্নিবিধুবেদমিতে কল্যব্দকে গতে।
তেজঃশেখরবংশৈক আদিশূরো নৃপোঽভবৎ॥
—লঘুভারত, ২য় খণ্ড, ১১০ পৃঃ।

(২২) বিধুবাণগ্রহমিতে শকাব্দে বিগতে পুরা।
তদ্বংশে জনিতঃ শ্রীমান্ আদিশূরো মহীপতিঃ।
বেদষট্‌ফণিমানাব্দে শাকে সদ্‌গুণসাগরঃ।
গৌড়রাজ্যাধিরাজঃ সন্নভিষিক্তো মহামতিঃ॥
(মো—মু ৩৪৩)

মো—মু ও আদিশূর (৪৭) এই উভয় গ্রন্থেই 'বেদষট্‌-ফণি' অর্থে —৮৬৪ ধরা হইয়াছে। বিধুবাণগ্রহ অর্থাৎ ৯৫১ শাকে যাঁহার জন্ম, ৮৬৪ শকে তাঁহার রাজ্যাভিষেক হইতে পারে না, সুতরাং উভয় গ্রন্থকারই নানাপ্রকার কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। কিন্তু 'ফণি' শব্দে ৯ বুঝায় (আপ্তের সংস্কৃত অভিধানে 'ফণভৃৎ' শব্দ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ৯৫১ শকাব্দে আদিশূরের জন্ম এবং ৯৬৪ শকাব্দে তাঁহার রাজ্যারোহণ এই সঙ্গত অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে।

আদিশূর ও বল্লালসেনের মধ্যে বর্ষ ব্যবধান কত তাহা জানিতে পারিলেও আদিশূরের সময় সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যায়। কুলতত্ত্বার্ণব ও গৌড়ব্রাহ্মণ-ধৃত যে বংশাবলী পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে তদনুসারে আদিশূর ও বল্লালসেন এই দুই রাজার মধ্যে সাত জন রাজা রাজত্ব করিয়াছেন। গড়পড়তা পঁচিশ বৎসর করিয়া প্রতি রাজ্যকাল ধরিলে এবং বল্লালসেনের রাজ্যলাভ কাল ১১৬০ খৃষ্টাব্দ ধরিলে আদিশূর শকাব্দের দশম শতকের প্রথমে রাজত্ব করেন এরূপ অনুমান করিতে হয়। পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রথম, দ্বিতীয় ও দশম সময়জ্ঞাপক বচনের সহিত ইহার সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে।

অপর পক্ষে বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকা অনুসারে—"আদিশূর রাজার স্বর্গারোহণের অল্পকাল পরেই তাঁহার দৌহিত্রকুলে বল্লালসেনের জন্ম হয়।"(২৩) রামজীবনকৃত কুল-পঞ্জিকায় বল্লালসেনকে আদিশূরের দৌহিত্র ও শ্রীধরের সুত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।(২৪) সময়-জ্ঞাপক—৩, ৪, ১১, ১২ ও আদিশূর বৌদ্ধ পালবংশ পরাজয় করিয়াছিলেন পূর্ব্বোল্লিখিত এই উক্তির সহিত এই মতের সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়।

কিন্তু ৺লালমোহন বিদ্যানিধি বলেন যে, "বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণের কুলশাস্ত্রে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, মহারাজ বল্লালসেন আদিশূরের দৌহিত্র-বংশের অধস্তন সপ্তম পুরুষ।" এই মতের সমর্থনকল্পে তিনি বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকার কয়েকটি শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন।(২৫)

৺নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন "প্রাচীন কুলাচার্য্য হরিমিশ্র লিখিয়াছেন পালবংশীয় রাজা দেবপালের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে আদিশূর আবির্ভূত হইয়াছিলেন"।(২৬) কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কোন বচন উদ্ধৃত করেন নাই।

লাহেড়ী বংশাবলী মতে আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত ব্রাহ্মণ ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঞি ওঝাকে রাজা ধর্ম্মপাল ধামসার নামক গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মপালকে যদি পালবংশীয় স্বনামধন্য নৃপতিরূপে গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে আদিশূরকে পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের সমকালীন বলিয়া গণ্য করিতে হয়। এই সিদ্ধান্তের সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত সময়-জ্ঞাপক ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম বচনের সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু আদিশূর পালবংশ ধ্বংস করিয়া গৌড়ে রাজা হইয়াছিলেন পূর্ব্বোল্লিখিত এই প্রবাদ এই সমুদয় উক্তি ও সিদ্ধান্তের বিরোধী।(২৭)

কেহ কেহ আদিশূর আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম ভট্টনারায়ণকে 'বেণীসংহার' নাটকের গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া মনে করেন। বেণীসংহার সপ্তম শতাব্দের শেষভাগে অথবা অষ্টম শতাব্দের প্রারম্ভে রচিত হইয়াছিল এরূপ মনে করার কারণ আছে। এই যুক্তিবলে আদিশূরেরও ঐ সময় নির্দ্ধারণ করা হয়। কিন্তু আদিশূর আনীত ভট্টনারায়ণ যে বেণীসংহারের গ্রন্থকর্ত্তা ইহার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। কোন বিশ্বস্ত কুলগ্রন্থেই ভট্টনারায়ণ গ্রন্থকার বলিয়া উল্লিখিত হন নাই।(২৮)

মোটের উপর দেখা যায় যে, আদিশূরের সময় সম্বন্ধে দুইটি বিশিষ্ট ও বিরোধী মত ছিল। একমতে তিনি পাল-রাজবংশের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে এবং মতান্তরে তিনি পাল-রাজবংশ ধ্বংসের প্রাক্কালে গৌড়রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। আদিশূরের সময়জ্ঞাপক কুলগ্রন্থের যে সমুদয় বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার পঞ্চম ও নবম ব্যতীত অন্য

---

(২৩) গৌড়রাজমালা (৫৮)। মো—মু (৩৪২) ধৃত বৈদ্যকুলচন্দ্রিকা।

(২৪) আদিশূর মহারাজ জগতে বিখ্যাত।
তাঁর দৌহিত্র বল্লাল শ্রীধরের সুত॥
(সং নিং ২১৯)

(২৫) সং নিং (৩১৬)।

(২৬) বসু—১ (৯৮)। বিশ্বকোষ, (চতুর্থ ভাগ, ৩০৮ পৃষ্ঠায় হরিমিশ্রের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

(২৭) বসু—১ (৯৮)। গৌ—বা (৯৬)। বিশ্বকোষ ৪।৩১২।

(২৮) 'আদিশূর' গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীঅমরেশ্বর ঠাকুর ভট্টনারায়ণকে বেণীসংহারের প্রণেতা বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাঁহার সময় নির্দ্দেশ করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন (পৃঃ ৸৵০)। কিন্তু 'আদিশূর' গ্রন্থকার স্বয়ং যথার্থই বলিয়াছেন: "কুলগ্রন্থে ভট্টনারায়ণকে মুনিসত্তম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি মহত্ত্বব্যঞ্জক নানা বিশেষণে বিশেষিত করিলেও কোথাও তাঁহাকে গ্রন্থকার বলিয়া অভিহিত করিতে দেখি না।···. আমরা জানি না, এই বেণীসংহার নাটককে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ক্ষিতীশ-পুত্র ভট্টনারায়ণ রচিত বলিয়া নিশ্চিতরূপে ধরিতে পারি কি-না। (আদিশূর, পৃঃ ২০১-২)।

সকলগুলিই এই দু'য়ের মধ্যে একের অনুবর্ত্তী বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কেহ কেহ কুলপর্য্যায় ধরিয়া আদিশূরের কালনির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন অর্থাৎ বল্লালসেনের নিকট যাঁহারা কৌলীন্য মর্য্যাদা পাইয়াছিলেন তাঁহারা আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত ব্রাহ্মণ-পঞ্চকের অধস্তন কত পুরুষ তাহা হিসাব করিয়া গড়পড়তা তিন বা চারি পুরুষে একশত বৎসর ধরিয়া তাঁহারা আদিশূর ও বল্লালসেনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান নির্ণয় করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, বল্লালসেনের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণগণের বংশাবলী সম্বন্ধে কুলগ্রন্থে এত বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় যে তাহার উপর নির্ভর করিয়া কোন স্থিরসিদ্ধান্তে আসা অসম্ভব। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ৺লালমোহন বিদ্যানিধি ও ৺নগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক উদ্ধৃত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের বংশাবলীর পর্য্যায় নিম্নে উল্লেখ করিতেছি (২৯) :—

গোত্র	পর্য্যায়ের শেষ ব্রাহ্মণ	বিদ্যানিধির মতে যে কয় পুরুষ	বসুর মতে যে কয় পুরুষ
শাণ্ডিল্য	মহেশ্বর	১০	১০
বাৎস্য	শিব	৪	১১
সাবর্ণি	শিশু গাঙ্গুলি	৮	১২
কাশ্যপ	বহুরূপ	৮	৮
ভরদ্বাজ	উৎসাহ	১৩	১২

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে উভয়েই প্রচলিত ও প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন।

বারেন্দ্র কুলগ্রন্থ অনুসারে আদিশূরানীত বীজপুরুষ হইতে উক্ত পঞ্চ গোত্রের যথাক্রমে ১৪শ, ৪র্থ, ১৩শ, ১৫শ ও ১৩শ পুরুষ বল্লালের সভায় উপস্থিত ছিলেন।(৩০)

৺নগেন্দ্রনাথ বসু কুলগ্রন্থে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন এবং বহু কুলগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া তৎসাহায্যে বাংলার সামাজিক ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন। বর্ত্তমানকালের ঐতিহাসিকগণের মতে কুলগ্রন্থ সম্বন্ধে তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন এবং অন্ধ বিশ্বাসের পরিচায়ক। তিনি কুলগ্রন্থোক্ত বংশাবলী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য।

"বল্লালসেনের কুলবিধি প্রবর্ত্তন ও ঘটক নিয়োগ হইতেই রীতিমত কুলপর্য্যায় রক্ষা প্রথা কুলীনসমাজে প্রচলিত হইয়াছে। এই সময় হইতে বংশ ধরিয়া ধ্রুবানন্দাদি যে সকল বংশাবলী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে কোন দোষ পাওয়া যায় না বা বংশাবলীর পর্য্যায় গণনায় কোন প্রকার পার্থক্য লক্ষিত হয় না। কিন্তু বল্লালসেনের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণগণের বংশাবলী সেইরূপ নির্ব্বিরোধ নহে। এড়ুমিশ্র, ধ্রুবানন্দ, দেবীবর প্রভৃতি এ সম্বন্ধে নিরুত্তর। কোন কোন কুলাচার্য্য লিখিয়াছেন মুসলমানের দৌরাত্ম্যে ও বর্গির উৎপাতে নানা কারণে প্রাচীন কুলগ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে, আধুনিক ঘটকগণ পরে নানা স্থান হইতে বংশাবলী সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রাচীন কুলগ্রন্থ নষ্ট হওয়াতেই এইরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। হরিমিশ্র দুই-একজনের বংশাবলী মাত্র প্রকাশ করিয়াছেন, কেবল মহেশের 'নির্দ্দোষ কুলপঞ্জিকা', কুলরাম ও আধুনিক মূ(কু ?)ল গ্রন্থে পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণবংশাবলী লিখিত থাকিলেও পরস্পর অনৈক্য। বিশেষতঃ আধুনিক গদ্যে লিখিত কুলপঞ্জিকায় যেরূপ বংশতালিকা পাওয়া যায়, তাহা সহজেই বিশ্বাস করা যায় না।"(৩১)

বল্লালসেনের পূর্ব্ববর্ত্তীকালের বংশাবলী সম্বন্ধে ৺বসুজ মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু কেবল বংশাবলী নহে কুলগ্রন্থোক্ত অন্যান্য রাজনৈতিক ও সামাজিক তথ্য সম্বন্ধেও তাঁহার উক্তি সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ৺বসুজ মহাশয় ইহা সত্ত্বেও এই সমুদয় কুলগ্রন্থের ক্ষীণ ভিত্তির উপর প্রাগ্-বল্লাল-যুগের বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস-রূপ বিরাট সৌধ নির্ম্মাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

বল্লালের পরবর্ত্তীকালের বংশপর্য্যায় সম্বন্ধে কুলগ্রন্থে বিশেষ পার্থক্য না থাকিলেও তাহার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছি তাহাতেই প্রতীয়মান হইবে যে, বল্লালের পরবর্ত্তীকালের বংশাবলীও নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ধ্রুবানন্দ মিশ্র নিজের গ্রন্থে যে বংশাবলী দিয়াছেন তদনুসারে তিনি বল্লাল-পূজিত মহেশ্বর বন্দ্যোর সপ্তম অধস্তন পুরুষ। ধ্রুবানন্দ যে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন

(২৯) বসু—১ (১৪০)। সং নিং (৩৩৪)।
(৩০) বসু—২ (৩৫)।

(৩১) বসু—১ (১৩৯)।

তাহার নানারূপ প্রমাণ আছে এবং ৺বসু মহাশয়ও তাহা স্বীকার করেন। বল্লালসেন আনুমানিক ১১৭৮ খৃষ্টাব্দে লোকান্তরিত হন। সুতরাং ধ্রুবানন্দ মিশ্র বল্লালের মৃত্যুর তিনশত বৎসর পরে বিদ্যমান ছিলেন। সাত পুরুষে তিনশত বৎসরের ব্যবধান স্বীকার করা কঠিন এবং যদি স্বীকার করা যায় তাহা হইলে বংশপর্য্যায়ের গড়পড়তা ধরিয়া সময় হিসাব করার কোন মূল্য থাকে না। সুতরাং ধ্রুবানন্দ মিশ্রের গ্রন্থে প্রদত্ত তাঁহার নিজের বংশাবলী সম্বন্ধেই সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। যে সময়ে রীতিমত বংশাবলী রক্ষা করার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন এবং যে সময়ের বংশাবলী সম্বন্ধে বিভিন্ন কুলগ্রন্থে অনেকটা ঐক্য দৃষ্ট হয়, সেই সময়কার বংশাবলীই যদি নির্ভরযোগ্য নয় বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে বল্লালের পূর্ব্ববর্ত্তী তিন-চারি শত বৎসরের বংশাবলীর উপর নির্ভর করিয়া আদিশূরের সময় নিরূপণ করা যে কতদূর অবিধেয় তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন।

বিশেষতঃ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কুলগ্রন্থ-মতে আদিশূর ও বল্লালসেনের মধ্যে অনধিক সাতজন রাজা রাজত্ব করিয়াছেন (কাহারও মতে মাত্র দুই-এক জন) অথচ ব্রাহ্মণের পর্য্যায় হিসাবে গণনা করিলে উভয়ের মধ্যে অনধিক পনর পুরুষের ব্যবধান। এ দুয়ের সামঞ্জস্য করাও অসম্ভব। সুতরাং কনৌজাগত পঞ্চব্রাহ্মণের বংশাবলীর পর্য্যায় গণনা করিয়া আদিশূরের সময় নির্দ্ধারণ করার ঐতিহাসিক কোন মূল্য নাই।

৩। পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নের কারণ কি?

বিভিন্ন কুলগ্রন্থে নিম্নলিখিত ভিন্ন ভিন্ন কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে—

১। আদিশূরের রাণী চান্দ্রায়ণ ব্রতানুষ্ঠান করেন। গৌড়দেশীয় ব্রাহ্মণেরা বেদে অনভিজ্ঞতা হেতু ("বয়ং নৈব জানীমহে বেদবাণীম্") উক্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে না পারায় রাণীর অনুরোধে আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া রাণীর ব্রত সম্পন্ন করেন।

—(বারেন্দ্র কুলপঞ্জী) (৩২)

২। রাজা আদিশূর অগ্নিহোত্রীয় যজ্ঞ করিবার জন্য কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন।

—(বংশীবদন বিদ্যারত্ন-ধৃত বচন) (৩৩)

৩। রাজা আদিশূর অপুত্রক ছিলেন। পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার অভিপ্রায়ে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন।

(১। কুলতত্ত্বার্ণব) (৩৪)
(২। হরিমিশ্রের ও এড়ুমিশ্রের কারিকা দৃষ্টে রাজভাটের কাহিনী) (৩৫)
(৩। চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রাজা প্রেমনারায়ণের সভাস্থ ধ্রুবানন্দের মত) (৩৬)

৪। আদিশূর দূতমুখে কাশীরাজকে আদেশ করিলেন, 'হয় কর দিন, নচেৎ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হউন।' প্রত্যুত্তরে কাশীরাজ কর দিতে অস্বীকৃত হইয়া যে পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন তাহাতে আদিশূরের রাজ্যকে 'দ্বিজবেদযজ্ঞ রহিত' বলিয়া নিন্দা করায় আদিশূর যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজয় করিয়া তাঁহার রাজ্য হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিলেন।

—(বাচস্পতি মিশ্রকৃত কুলরাম) (৩৭)

৫। অনাবৃষ্টি নিবারণকল্পে বাজপেয় যজ্ঞ সম্পাদনার্থ আদিশূর পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন।

—(দুর্গামঙ্গল, রাজাবলী) (৩৮)

৬। আদিশূরের প্রাসাদের উপর এক গৃধ্র পড়িয়াছিল। অমঙ্গল দূর করিবার জন্য আদিশূর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তজ্জন্য পঞ্চব্রাহ্মণ আনীত হন।

—(ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিত)(৩৯)

৭। ভগবৎপ্রীতি সাধনের ইচ্ছায় আদিশূর যজ্ঞানুষ্ঠান করেন ও তাহার জন্য পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন।

—(কায়স্থকুলদীপিকা) (৪০)

(৩২) গৌ—বা (৩৭-৮)।

(৩৩) গৌ—বা (৩৮)।
(৩৪) শ্লোক—১০।
(৩৫) সং নিং (৩৭৩)।
(৩৬) বসু—১। (৭৮)।
(৩৭) বসু—১ (৮০)।
(৩৮) আদিশূর, (পৃঃ ৮০, ১৩৯) রাজাবলী (১৩১২) ৪১ পৃঃ।
(৩৯) পৃঃ ১—২। আদিশূর, পৃঃ ৮০, ১৪২—১৪৩।
(৪০) আদিশূর (১ ৪৩-৪)।

৪। কি উপায়ে এবং কোথা হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনীত হন ?

পঞ্চব্রাহ্মণ যে কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছিলেন এ বিষয়ে প্রায় সব কুলগ্রন্থই একমত। বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকার মতে আদিশূর কান্যকুব্জের রাজা চন্দ্রকেতুর কন্যা চন্দ্রমুখীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং শ্বশুরকে পত্র লিখিয়া সাগ্নিক ও বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণ আনাইয়া রাজ্ঞীর ব্রত সম্পন্ন করেন।(৪১)

মতান্তরে কান্যকুব্জের রাজা বীরসিংহ প্রথমে আদিশূরের প্রার্থনামত বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ পাঠাইতে স্বীকার করেন নাই, কারণ শাস্ত্রমতে তীর্থযাত্রা ভিন্ন অন্য কারণে বঙ্গদেশে আসিলে পতিত হইতে হয়। তখন আদিশূর কান্যকুব্জ-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।(৪২)

কান্যকুব্জেশ্বরকে ছলে যুদ্ধে হারাইবার জন্য আদিশূর সাতশত ব্রাহ্মণকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া গোবাহনে কান্যকুব্জ-রাজের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। গো-বিপ্র-প্রতিপালক কান্যকুব্জ-রাজ 'ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধে পরাজয় শ্রেয়স্কর' ইহা বিবেচনা করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন এবং আদিশূরের নিকট ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিয়া শান্তি-স্থাপন করিলেন।(৪৩)

কোন কোন কুলগ্রন্থের মতে আদিশূর প্রথমবার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তারপর এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন।(৪৪)

বাচস্পতি মিশ্র বীরসিংহকে কাশী-রাজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কুলাচার্য্য হরিমিশ্রও আদিশূরের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাকে কাশী-রাজ বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের মতেও পঞ্চব্রাহ্মণ কোলাঞ্চ অর্থাৎ কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছিলেন।

৫। পঞ্চব্রাহ্মণের নাম ও গোত্র

আদিশূর যে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে গৌড়ে আনয়ন করেন তাঁহারা শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, ভরদ্বাজ এবং সার্বর্ণিগোত্রজ ছিলেন। এবিষয়ে সকল কুলগ্রন্থই একমত। কিন্তু এই পাঁচজনের নাম সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। নিম্নে বিশিষ্ট কয়টি মত উদ্ধৃত করিলাম।

বাচস্পতি ও অন্যান্য রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণের মতে পঞ্চব্রাহ্মণের নাম ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, ছান্দড়, হর্ষ এবং বেদগর্ভ।(৪৫)

বারেন্দ্র কুলাচার্য্যগণের মতে উক্ত গোত্রজ ব্রাহ্মণগণের নাম যথাক্রমে নারায়ণ, সুষেণ, ধরাধর, গৌতম এবং পরাশর এবং আদিম বাসস্থান জম্বুচত্বরগ্রাম, কোলাঞ্চ, তাড়িতগ্রাম, ঔড়ম্বরগ্রাম ও মদ্রগ্রাম।(৪৬)

এডুমিশ্র, হরিমিশ্র, দেবীবর, মহেশ প্রভৃতি প্রাচীন কুলাচার্য্যগণের মতে এবং কুলতত্ত্বার্ণব অনুসারে উক্ত ব্রাহ্মণগণের নাম যথাক্রমে ক্ষিতীশ, বীতরাগ, সুধানিধি, তিথিমেধা (অথবা মেধাতিথি) ও সৌভরি।(৪৭)

কুলতত্ত্বার্ণব, রাঢ়ীয় ঘটকপ্রধান বংশীবদন বিদ্যারত্নের যে কয়টি শ্লোক 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং ৺নগেন্দ্রনাথ বসু হরিমিশ্রের উক্তি বলিয়া যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন তৎসমুদয় হইতে অনুমিত হয় যে শেষোক্ত পাঁচজন ব্রাহ্মণই গৌড়ে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই একটি পুত্র রাঢ়ে এবং অপরটি বরেন্দ্রে বসবাস করেন। রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র কুলাচার্য্যগণ এই সন্তানগণকেই আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত ব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।(৪৮)

নিম্নলিখিত বংশাবলীদৃষ্টে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হইবে।

(৪১) গৌ—বা (৩৭)।

(৪২) চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রাজা প্রেমনারায়ণের সভাস্থ ধ্রুবানন্দের মত। বসু- ১ (৭৮)। কুল (শ্লোক ১৭—২৫)। বাচস্পতি মিশ্রের মতে বীরসিংহ কাশীর রাজা ছিলেন—(পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ আনয়নের চতুর্থ কারণ দ্রষ্টব্য।)

(৪৩) বাচস্পতি মিশ্র কৃত কুলরাম (বসু—১, পৃঃ ৮০—৮২)। কুল (শ্লোক ৩৮-৪৯)।

(৪৪) ধ্রুবানন্দের মত (বসু—১, পৃঃ ৭৮)।

(৪৫) বসু—১ (১০১)। গৌ—বা (৪২)।

(৪৬) বসু—১ (১০৩)। গৌ—বা (৪৩)।

(৪৭) বসু—১ (১০৩)। গৌ—বা (৪৪)। কুল (শ্লোক ৬৪—৬৭)।

(৪৮) কুল (শ্লোক ৮৭—৯৭)। গৌ—বা (৪৪-৪৭)। বসু—১ (১০৩)।

আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত ব্রাহ্মণ	গোত্র	যে পুত্র রাঢ়ে বাস করেন	যে পুত্র বরেন্দ্রে বাস করেন
১। ক্ষিতীশ	শাণ্ডিল্য	ভট্টনারায়ণ	দামোদর এবং ভট্টনারায়ণের পুত্র আদি গাঞি-ওঝা
২। বীতরাগ	কাশ্যপ	দক্ষ	সুষেণ
৩। সুধানিধি	বাৎস্য	ছান্দড়	ধরাধর
৪। তিথিমেধা বা মেধাতিথি	ভরদ্বাজ	হর্ষ	গৌতম
৫। সৌভরি	সাবর্ণ	বেদগর্ভ	পরাশর

বরেন্দ্র কুলাচার্য্যগণোক্ত নারায়ণ ও রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থোক্ত ভট্টনারায়ণকে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিলে উল্লিখিত বংশাবলী দ্বারা উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা যায়। তবে এই বংশাবলীর সমর্থন কল্পে কোন প্রাচীন গ্রন্থাদির প্রমাণ আছে কি-না অথবা রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কুলাচার্য্যগণের মতভেদের নিরাসকরণের জন্যই উহা পরবর্ত্তীকালে কল্পিত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

৬। পঞ্চব্রাহ্মণের সহিত আদিশূরের প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ

কুলতত্ত্বার্ণব বাচস্পতিমিশ্রের কুলরাম প্রভৃতি কুলগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, পঞ্চব্রাহ্মণ ধনুর্ব্বাণাদি অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এবং চর্ম্মপাদুকা ধারণ পূর্ব্বক অশ্বারোহণে আগমন করেন। তাঁহাদের এই যোদ্ধৃবেশ দর্শন করিয়া আদিশূর বিষাদপ্রাপ্ত হন এবং তাঁহাদের যথোচিত সমাদর করেন না। তখন ব্রাহ্মণেরা নিজেদের ক্ষমতা দেখাইবার নিমিত্ত আশীর্মন্ত্র পাঠ করিয়া নির্ম্মাল্য অথবা অর্ঘ্য একটি শুষ্ক স্তম্ভ-কাষ্ঠের উপর দেওয়া মাত্রেই উক্ত কাষ্ঠখণ্ড অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। ইহা শ্রবণ করিয়া আদিশূর ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া বাহিরে আসিলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ব্রাহ্মণদের যথোচিত সৎকারাদি করিলেন।(৪৯)

কোন্ স্থানে আদিশূরের সহিত পঞ্চব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হয়, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। লালমোহন বিদ্যানিধি (৫০) ও পার্ব্বতীশঙ্কর রায়চৌধুরীর (৫১) মতে পঞ্চব্রাহ্মণ আদিশূরের রাজধানী বিক্রমপুরে আগমন করেন। কিন্তু কেহই এ বিষয়ে কোন প্রমাণ দেন নাই। রায়চৌধুরী মহাশয় মুন্সীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী রামপালের গজাড়ী বৃক্ষের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, "সকলেই এই গজাড়ী বৃক্ষটিকে আদিশূরনীত পঞ্চব্রাহ্মণ প্রদত্ত আশীর্ব্বাদে জীবিত মল্লকাষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করে।" এইরূপ জনপ্রবাদ আমরাও শুনিয়াছি এবং মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই গজাড়ী বৃক্ষটি মরিয়া গিয়াছে! কিন্তু এই জনপ্রবাদের সমর্থক কোন বিশিষ্ট প্রমাণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে সংস্কৃত রাজাবলী গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, আদিশূরের রাজধানী বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপলী বা রামপল্যাতে ছিল। শেষোক্ত নামটি রামপালের বিকৃতি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। অপরপক্ষে বাচস্পতিমিশ্রের কুলরাম ও বরেন্দ্র-কুলপঞ্জিকায় উক্ত হইয়াছে যে, পঞ্চব্রাহ্মণ গৌড়ে আসিয়াছিলেন। কুলতত্ত্বার্ণবে উক্ত হইয়াছে যে আদিশূর তখন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীতে ছিলেন।(৫২) আদিশূর রাজার প্রকৃত পরিচয় এবং তাঁহার রাজধানী কোথায় ছিল তাহা সঠিক নির্ণয় করিতে না পারিলে এ তর্কের মীমাংসা হইবে না।

৭। বঙ্গদেশে পঞ্চব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা

রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণের মতে যজ্ঞসমাপনান্তে আদিশূর পঞ্চব্রাহ্মণকে পঞ্চগ্রাম দান করিয়া এদেশে বসবাস করার ব্যবস্থা করেন।(৫৩)

বারেন্দ্রকুলাচার্য্যগণ বলেন যে, উক্ত পঞ্চব্রাহ্মণ যজ্ঞ-সমাপনান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু তথায় অন্য ব্রাহ্মণেরা বঙ্গদেশ গমন-হেতু পতিত জ্ঞান করিয়া তাঁহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন। ইহাতে অস্বীকৃত হইয়া স্ত্রীপুত্র-ভৃত্যাদিসহ তাঁহারা পুনরায় আদিশূর রাজার নিকট প্রত্যাগমন করেন। আদিশূর ইহাতে পরম তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের বাসের জন্য পাঁচখানি গ্রাম দান করেন।(৫৪)

(৪৯) কুল (শ্লোক ৫৬-৬৩)। কুলরাম (বসু—১ পৃঃ ১০৬)। সং নিং (৬৩৬)। বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা (গৌ—বা—পৃঃ ৪০—৪১)।

(৫০) সং নিং (৫০)।

(৫১) আদিশূর ও বল্লালসেন (পৃঃ ৪)।

(৫২) শ্লোক —৫১

(৫৩) বসু—১ (১০৯)।

(৫৪) গৌ—বা—(৫২-৫৭)।

৪। কি উপায়ে এবং কোথা হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনীত হন ?

পঞ্চব্রাহ্মণ যে কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছিলেন এ বিষয়ে প্রায় সব কুলগ্রন্থই একমত। বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকার মতে আদিশূর কান্যকুব্জের রাজা চন্দ্রকেতুর কন্যা চন্দ্রমুখীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং শ্বশুরকে পত্র লিখিয়া সাগ্নিক ও বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণ আনাইয়া রাজ্ঞীর ব্রত সম্পন্ন করেন।(৪১)

মতান্তরে কান্যকুব্জের রাজা বীরসিংহ প্রথমে আদিশূরের প্রার্থনামত বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ পাঠাইতে স্বীকার করেন নাই, কারণ শাস্ত্রমতে তীর্থযাত্রা ভিন্ন অন্য কারণে বঙ্গদেশে আসিলে পতিত হইতে হয়। তখন আদিশূর কান্যকুব্জ-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।(৪২)

কান্যকুব্জেশ্বরকে ছলে যুদ্ধে হারাইবার জন্য আদিশূর সাতশত ব্রাহ্মণকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া গোবাহনে কান্যকুব্জ-রাজের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। গো-বিপ্র-প্রতিপালক কান্যকুব্জ-রাজ 'ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধে পরাজয় শ্রেয়স্কর' ইহা বিবেচনা করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন এবং আদিশূরের নিকট ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিয়া শান্তি-স্থাপন করিলেন।(৪৩)

কোন কোন কুলগ্রন্থের মতে আদিশূর প্রথমবার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তারপর এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন।(৪৪)

বাচস্পতি মিশ্র বীরসিংহকে কাশী-রাজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কুলাচার্য্য হরিমিশ্রও আদিশূরের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাকে কাশী-রাজ বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের মতেও পঞ্চব্রাহ্মণ কোলাঞ্চ অর্থাৎ কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছিলেন।

৫। পঞ্চব্রাহ্মণের নাম ও গোত্র

আদিশূর যে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে গৌড়ে আনয়ন করেন তাঁহারা শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, ভরদ্বাজ এবং সাবর্ণিগোত্রজ ছিলেন। এবিষয়ে সকল কুলগ্রন্থই একমত। কিন্তু এই পাঁচজনের নাম সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। নিম্নে বিশিষ্ট কয়টি মত উদ্ধৃত করিলাম।

বাচস্পতি ও অন্যান্য রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণের মতে পঞ্চব্রাহ্মণের নাম ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, ছান্দড়, হর্ষ এবং বেদগর্ভ।(৪৫)

বারেন্দ্র কুলাচার্য্যগণের মতে উক্ত গোত্রজ ব্রাহ্মণগণের নাম যথাক্রমে নারায়ণ, সুষেণ, ধরাধর, গৌতম এবং পরাশর এবং আদিম বাসস্থান জম্বুচত্বরগ্রাম, কোলাঞ্চ, তাড়িতগ্রাম, ঔড়ম্বরগ্রাম ও মদ্রগ্রাম।(৪৬)

এড়ুমিশ্র, হরিমিশ্র, দেবীবর, মহেশ প্রভৃতি প্রাচীন কুলাচার্য্যগণের মতে এবং কুলতত্ত্বার্ণব অনুসারে উক্ত ব্রাহ্মণগণের নাম যথাক্রমে ক্ষিতীশ, বীতরাগ, সুধানিধি, তিথিমেধা (অথবা মেধাতিথি) ও সৌভরি।(৪৭)

কুলতত্ত্বার্ণব, রাঢ়ীয় ঘটকপ্রধান বংশীবদন বিদ্যারত্নের যে কয়টি শ্লোক 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং ৺নগেন্দ্রনাথ বসু হরিমিশ্রের উক্তি বলিয়া যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন তৎসমুদয় হইতে অনুমিত হয় যে শেষোক্ত পাঁচজন ব্রাহ্মণই গৌড়ে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই একটি পুত্র রাঢ়ে এবং অপরটি বরেন্দ্রে বসবাস করেন। রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র কুলাচার্য্যগণ এই সন্তানগণকেই আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত ব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।(৪৮)

নিম্নলিখিত বংশাবলীদৃষ্টে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হইবে।

(৪১) গৌ—বা (৩৭)।

(৪২) চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রাজা প্রেমনারায়ণের সভাস্থ ধ্রুবানন্দের মত। বসু- ১ (৭৮)। কুল (শ্লোক ১৭—২৫)। বাচস্পতি মিশ্রের মতে বীরসিংহ কাশীর রাজা ছিলেন—(পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ আনয়নের চতুর্থ কারণ দ্রষ্টব্য।)

(৪৩) বাচস্পতি মিশ্র কৃত কুলরাম (বসু—১, পৃঃ ৮০—৮২)। কুল (শ্লোক ৩৮-৪৯)।

(৪৪) ধ্রুবানন্দের মত (বসু—১, পৃঃ ৭৮)।

(৪৫) বসু—১ (১০১)। গৌ—বা (৪২)।

(৪৬) বসু—১ (১০৩)। গৌ—বা (৪৩)।

(৪৭) বসু—১ (১০৩)। গৌ—বা (৪৪)। কুল (শ্লোক ৬৪—৬৭)।

(৪৮) কুল (শ্লোক ৮৭—৯৭)। গৌ—বা (৪৪-৪৭)। বসু—১ (১০৩)।

আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত ব্রাহ্মণ	গোত্র	যে পুত্র রাঢ়ে বাস করেন	যে পুত্র বরেন্দ্রে বাস করেন
১। ক্ষিতীশ	শাণ্ডিল্য	ভট্টনারায়ণ	দামোদর এবং ভট্টনারায়ণের পুত্র আদি গাঞি-ওঝা
২। বীতরাগ	কাশ্যপ	দক্ষ	সুষেণ
৩। সুধানিধি	বাৎস্য	ছান্দড়	ধরাধর
৪। তিথিমেধা বা মেধাতিথি	ভরদ্বাজ	হর্ষ	গৌতম
৫। সৌভরি	সাবর্ণ	বেদগর্ভ	পরাশর

বরেন্দ্র কুলাচার্য্যগণোক্ত নারায়ণ ও রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থোক্ত ভট্টনারায়ণকে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিলে উল্লিখিত বংশাবলী দ্বারা উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা যায়। তবে এই বংশাবলীর সমর্থন কল্পে কোন প্রাচীন গ্রন্থাদির প্রমাণ আছে কি-না অথবা রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কুলাচার্য্যগণের মতভেদের নিরাসকরণের জন্যই উহা পরবর্ত্তীকালে কল্পিত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

৬। পঞ্চব্রাহ্মণের সহিত আদিশূরের প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ

কুলতত্ত্বার্ণব বাচস্পতিমিশ্রের কুলরাম প্রভৃতি কুলগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, পঞ্চব্রাহ্মণ ধনুর্ব্বাণাদি অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এবং চর্ম্মপাদুকা ধারণ পূর্ব্বক অশ্বারোহণে আগমন করেন। তাঁহাদের এই যোদ্ধবেশ দর্শন করিয়া আদিশূর বিষাদপ্রাপ্ত হন এবং তাঁহাদের যথোচিত সমাদর করেন না। তখন ব্রাহ্মণেরা নিজেদের ক্ষমতা দেখাইবার নিমিত্ত আশীর্মন্ত্র পাঠ করিয়া নির্ম্মাল্য অথবা অর্ঘ্য একটি শুষ্ক স্তম্ভ-কাষ্ঠের উপর দেওয়া মাত্রেই উক্ত কাষ্ঠখণ্ড অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। ইহা শ্রবণ করিয়া আদিশূর ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া বাহিরে আসিলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ব্রাহ্মণদের যথোচিত সংকারাদি করিলেন।(৪৯)

কোন্ স্থানে আদিশূরের সহিত পঞ্চব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হয়, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। লালমোহন বিদ্যানিধি (৫০) ও পার্ব্বতীশঙ্কর রায়চৌধুরীর (৫১) মতে পঞ্চব্রাহ্মণ আদিশূরের রাজধানী বিক্রমপুরে আগমন করেন। কিন্তু কেহই এ বিষয়ে কোন প্রমাণ দেন নাই। রায়চৌধুরী মহাশয় মুন্সীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী রামপালের গজাড়ী বৃক্ষের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, "সকলেই এই গজাড়ী বৃক্ষটিকে আদিশূরনীত পঞ্চব্রাহ্মণ প্রদত্ত আশীর্ব্বাদে জীবিত মল্লকাষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করে।" এইরূপ জনপ্রবাদ আমরাও শুনিয়াছি এবং মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই গজাড়ী বৃক্ষটি মরিয়া গিয়াছে! কিন্তু এই জনপ্রবাদের সমর্থক কোন বিশিষ্ট প্রমাণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে সংস্কৃত রাজাবলী গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, আদিশূরের রাজধানী বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপলী বা রামপল্যাতে ছিল। শেষোক্ত নামটি রামপালের বিকৃতি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। অপরপক্ষে বাচস্পতিমিশ্রের কুলরাম ও বরেন্দ্র-কুলপঞ্জিকায় উক্ত হইয়াছে যে, পঞ্চব্রাহ্মণ গৌড়ে আসিয়াছিলেন। কুলতত্ত্বার্ণবে উক্ত হইয়াছে যে আদিশূর তখন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীতে ছিলেন।(৫২) আদিশূর রাজার প্রকৃত পরিচয় এবং তাঁহার রাজধানী কোথায় ছিল তাহা সঠিক নির্ণয় করিতে না পারিলে এ তর্কের মীমাংসা হইবে না।

৭। বঙ্গদেশে পঞ্চব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা

রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণের মতে যজ্ঞসমাপনান্তে আদিশূর পঞ্চব্রাহ্মণকে পঞ্চগ্রাম দান করিয়া এদেশে বসবাস করার ব্যবস্থা করেন।(৫৩)

বারেন্দ্রকুলাচার্য্যগণ বলেন যে, উক্ত পঞ্চব্রাহ্মণ যজ্ঞ-সমাপনান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু তথায় অন্য ব্রাহ্মণেরা বঙ্গদেশ গমন-হেতু পতিত জ্ঞান করিয়া তাঁহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন। ইহাতে অস্বীকৃত হইয়া স্ত্রীপুত্র-ভৃত্যাদিসহ তাঁহারা পুনরায় আদিশূর রাজার নিকট প্রত্যাগমন করেন। আদিশূর ইহাতে পরম তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের বাসের জন্য পাঁচখানি গ্রাম দান করেন।(৫৪)

(৪৯) কুল (শ্লোক ৫৬-৬৩)। কুলরাম (বসু—১ পৃঃ ১০৬)। সং নিং (৬৩৬)। বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা (গৌ—বা—পৃঃ ৪০—৪১)।

(৫০) সং নিং (৫০)।

(৫১) আদিশূর ও বল্লালসেন (পৃঃ ৪)।

(৫২) শ্লোক —৫১

(৫৩) বসু—১ (১০৯)।

(৫৪) গৌ—বা—(৫২-৫৭)।

কুলগ্রন্থ অনুসারে এই পাঁচটি গ্রাম গঙ্গাতীরবর্ত্তী এবং তাহাদের নাম কামঠি, ব্রহ্মপুরী, হরিকোট, কঙ্কগ্রাম ও বটগ্রাম। ৺লালমোহন বিদ্যানিধি উদ্ধৃত বাঙ্গালা বচন অনুসারে এই পঞ্চগ্রামের নাম পঞ্চকোটি, কামকোটি হরিকোটি, কঙ্কগ্রাম ও বটগ্রাম। এ দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ সামান্য; হরিকোটি এবং কামঠি ও কামকোটি অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করা যায়, কেবল ব্রহ্মপুরী স্থানে পঞ্চকোটি।(৫৫)

৺বিদ্যানিধি মহাশয় ও ৺নগেন্দ্রনাথ বসু এই পঞ্চগ্রামের বর্ত্তমান অবস্থিতি নির্ণয় করিতে যত্নবান হইয়াছেন। কিন্তু বিশিষ্ট প্রমাণ অভাবে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না।

৮। সাধারণ মন্তব্য

আদিশূর কর্ত্তৃক পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নের আখ্যান শেষ করিবার পূর্ব্বে দুই-একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে দেখা যাইবে যে, এড়ুমিশ্রের কারিকা, মহেশের নির্দ্দোষ কুলপঞ্জিকা, এমন কি ধ্রুবানন্দ মিশ্র প্রণীত মহাবংশ প্রভৃতি খুব প্রাচীন ও প্রামাণিক কুলগ্রন্থসমূহে আদিশূরের কোন উল্লেখ নাই।

৺নগেন্দ্রনাথ বসু হরিমিশ্রের কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।(৫৬) তাহার সারমর্ম্ম এই যে মহারাজ আদিশূরের সভায় সাগ্নিক ব্রাহ্মণ না থাকায় তিনি কোলাঞ্চ দেশ হইতে ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি নামক পাঁচজন :ব্রাহ্মণ গৌড়মণ্ডলে আনিয়াছিলেন। অন্যত্র বসু মহাশয় বলেন—"হরিমিশ্র লিখিয়াছেন, পালবংশীয় রাজা দেবপালের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে আদিশূর আবির্ভূত হইয়াছিলেন।"(৫৭) যে কারণে ৺বসু মহাশয়ের সংগৃহীত হরিমিশ্রের পুঁথি প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না পূর্ব্বে তাহা আলোচনা করিয়াছি। ৺লালমোহন বিদ্যানিধি ও ৺মহিমাচন্দ্র মজুমদার ও অন্যান্য পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ কেহই আদিশূর সম্বন্ধীয় হরিমিশ্রের এই সমুদয় উক্তি জানিতেন না। সুতরাং ৺বসু মহাশয়-ধৃত হরিমিশ্রের উপরোক্ত উক্তিদ্বয় বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে অকৃত্রিম ও প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

৺লালমোহন বিদ্যানিধি পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন সম্বন্ধে দুইটি রাজভাটের কাহিনী উদ্ধৃত করিয়াছেন।(৫৮) উভয়েরই উপসংহারে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আখ্যানটি হরিমিশ্র ও এড়ুমিশ্রের গ্রন্থ দেখিয়া রচিত। ইহাতে পরবর্ত্তী কুলগ্রন্থোক্ত আখ্যানটি আছে কিন্তু আদিশূরের নাম নাই।

একদিকে ৺নগেন্দ্রনাথ বসু সংগৃহীত হরিমিশ্রের কারিকায় আদিশূরের ও পঞ্চব্রাহ্মণের নাম আছে কিন্তু ব্রাহ্মণ আনয়নের 'অপূর্ব্ব' কাহিনীর কোন উল্লেখ নাই, অপরদিকে হরিমিশ্রের কারিকার সাহায্যে রচিত ভাটের কাহিনীতে 'অপূর্ব্ব' কাহিনী আছে কিন্তু আদিশূরের নাম নাই। এই সমুদয় বিবেচনা করিলে প্রকৃত হরিমিশ্রের কারিকায় আদিশূর সম্বন্ধে আদৌ কিছু উল্লেখ ছিল কি-না তদ্বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ জন্মে।(৫৯)

মহেশের নির্দ্দোষ কুলপঞ্জিকায় ক্ষিতীশাদি পঞ্চব্রাহ্মণের গৌড়ে আগমনের কথা আছে কিন্তু আদিশূরের নাম নাই।

মোটের উপর একথা বলা যায় যে, যে সমুদয় কুলগ্রন্থে আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ আনয়নের আখ্যান বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে তাহার কোনখানিই খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত এরূপ কোন প্রমাণ নাই।

আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ আনয়নের উপাখ্যানের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সম্বন্ধে যে সমুদয় বিভিন্ন মতের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে কোনটিকে অন্যের অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন। এই সমুদয় আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী ও তাহার পরে যে সময়ে প্রচলিত কুলগ্রন্থগুলিতে আদিশূরের আখ্যান লিপিবদ্ধ হয় সে সময়ে আদিশূরের প্রকৃত ইতিহাস সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল এবং তাঁহার সম্বন্ধে কোন প্রামাণিক গ্রন্থ ত দূরের কথা, কোন বিশ্বাস্য ও নির্ভরযোগ্য সর্ব্ববাদীসম্মত প্রবাদও প্রচলিত ছিল না। আদিশূরের কথা তখন উপকথায় (legend or myth)

(৫৫) বসু—১ (১০৯—১১২)।
(৫৬) বসু—১ (১০১)।
(৫৭) বসু—১ (৯৮)
(৫৮) সং নিং (৩৭৩, ৭০৬)।
(৫৯) ৺বসু মহাশয় লিখিয়াছেন: "রাজতরঙ্গিণী হইতে যে ঐতিহাসিক বিবরণ বিবৃত হইল, আধুনিক ইতিহাসানভিজ্ঞ ঘটকবর্গের হস্তে পড়িয়া বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে, পূর্ব্বতন ক্ষীণ স্মৃতিমাত্র জাগিয়া আছে। প্রাচীন কুলাচার্য্য হরিমিশ্র এই কারণে ব্রাহ্মণাগমনের অপূর্ব্ব কাহিনীর অবতারণা করেন নাই। (বসু—১, পৃঃ ১০২)।

পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং যেমন সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে, লোকের মুখে মুখে নানা কাল্পনিক ঘটনাযুক্ত হইয়া ইহার বহু রূপান্তর হইয়াছে।(৬০)

উপকথার একটি বিশেষত্ব এই যে, কতকগুলি আশ্চর্য্য ও চমকপ্রদ ঘটনা প্রায় সব উপকথাতেই থাকে (যেমন রাক্ষস কর্ত্তৃক বিনষ্ট রাজপুরীতে ঘুমন্ত রাজকন্যার সহিত রাজপুত্রের সাক্ষাৎ)। কুলগ্রন্থেও সেইরূপ প্রাসাদোপরি শকুনিপতন, তন্নিবন্ধন যজ্ঞের আবশ্যকতা ও তদুদ্দেশ্যে পাশ্চাত্য দেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন এবং নবাগত ব্রাহ্মণের অলৌকিক শক্তিতে শুষ্ক কাষ্ঠ সঞ্জীবিত হওয়া প্রভৃতি যেমন আদিশূরের আখ্যানে দেখিতে পাই তেমনি পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়নের প্রসঙ্গে শ্যামলবর্ম্মার আখ্যানেও উক্ত হইয়াছে। আবার কুলগ্রন্থ মতে আদিশূর যেমন পুত্রেষ্টি যজ্ঞের নিমিত্ত পাশ্চাত্যদেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন রাজা শূদ্রকও তেমনি উক্ত যজ্ঞের জন্য সাতশতী ব্রাহ্মণদের পূর্ব্বপুরুষ সারস্বত ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। কুলগ্রন্থোক্ত বিভিন্ন আখ্যান যত্নপূর্ব্বক আলোচনা করিলে সম্ভবতঃ এইরূপ আরও সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইবে। এই সমুদয় স্মরণ রাখিলে কুলগ্রন্থোক্ত ব্রাহ্মণ আনয়নের বিভিন্ন উপাখ্যানের প্রকৃতি ও মূল্য সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা সম্ভব হইবে।

৺ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন যে, আদিশূর সম্বন্ধীয় "জনশ্রুতি এদেশে অত্যন্ত প্রবল ও বদ্ধমূল হইলেও কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ ইহাকে মোটেই আমল দিতে চান না।"(৬১) তিনি বলেন, "অন্যান্য দেশে যাহাই হউক না কেন, আমাদের দেশে ইতিহাস সংরচনে জনশ্রুতিকে কিছুতেই বাদ দেওয়া যায় না। প্রত্যুত, জনশ্রুতিকে ইতিহাস রচনার অন্যতর প্রধান উপকরণ বলিয়া ধরিতে হইবে।"(৬২) বঙ্গদেশের অনেকেই এবিষয়ে অনুরূপ মত পোষণ করেন। আমাদের মত এই যে, জনশ্রুতিমাত্রেই নির্ব্বিচারে গ্রহণীয় বা ত্যজ্য নহে। কিন্তু তাহার উৎপত্তি, সঙ্গতি ও প্রকৃতি বিবেচনাপূর্ব্বক তাহার ঐতিহাসিক মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এই নির্দ্ধারণের সহায়তার জন্যই আদিশূর উপাখ্যানের বিভিন্ন অঙ্গের বিশ্লেষণ করিয়াছি। ইহার সাহায্যে আদিশূর আখ্যানের প্রকৃত ঐতিহাসিক মূল্য কতটুকু তাহার বিচার পঞ্চম প্রবন্ধে করা হইবে।

(৬০) কুলগ্রন্থে শ্রদ্ধান্বিত ৺বসু মহাশয়কেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, কুলগ্রন্থে অনেক অলীক গল্প স্থান পাইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন: "সপ্তশতী বিবরণে কুলপঞ্জিকা ও প্রবাদ হইতে যে সকল আখ্যায়িকা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা আরব্যোপন্যাসের গল্প বলিয়া মনে করাই উচিত। তন্মধ্যে যে কিছু ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য।" (বসু—১, পৃঃ ১১৪-৫)।

প্রাচীন কুলাচার্য্য এড়ুমিশ্রের কারিকায় "অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য ঘটনার সমাবেশ এবং মধ্যে মধ্যে আধুনিক কুলাচার্য্যের লিখিত বিবরণাদি প্রক্ষিপ্ত" থাকার কথাও ৺বসু মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন (বসু—১, পৃঃ ১২৫)।

প্রাচীন কুলগ্রন্থ যে অধিকাংশই বহু পূর্ব্বে লুপ্ত হইয়াছিল গোপাল শর্ম্মা তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "বণিকেন হৃতং সর্ব্বং পুস্তকং বিমলং মহৎ" (গো—বা, পৃঃ।/০)। কুলতত্ত্বার্ণবে দেবীবরের প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে, কুলগ্রন্থও বংশাবলী যবন কর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়াছিল, দেবীবর কোন উপায়েই ঐ সমুদয় উদ্ধার করিতে পারিলেন না (৫৮৭ শ্লোক)। সুতরাং আধুনিক ঘটকগণ যে স্বরচিত পুঁথি বা শ্লোক প্রাচীন আচার্য্যের নামে চালাইয়া থাকিবেন ইহা খুবই স্বাভাবিক ও সম্ভব। এই সমুদয় বিবেচনা করিয়া আধুনিক ঐতিহাসিক যদি কুলগ্রন্থের বিবরণে আস্থা স্থাপন করিতে না পারেন তবে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না।

(৬১) আদিশূর (৫)।
(৬২) আদিশূর (৭)

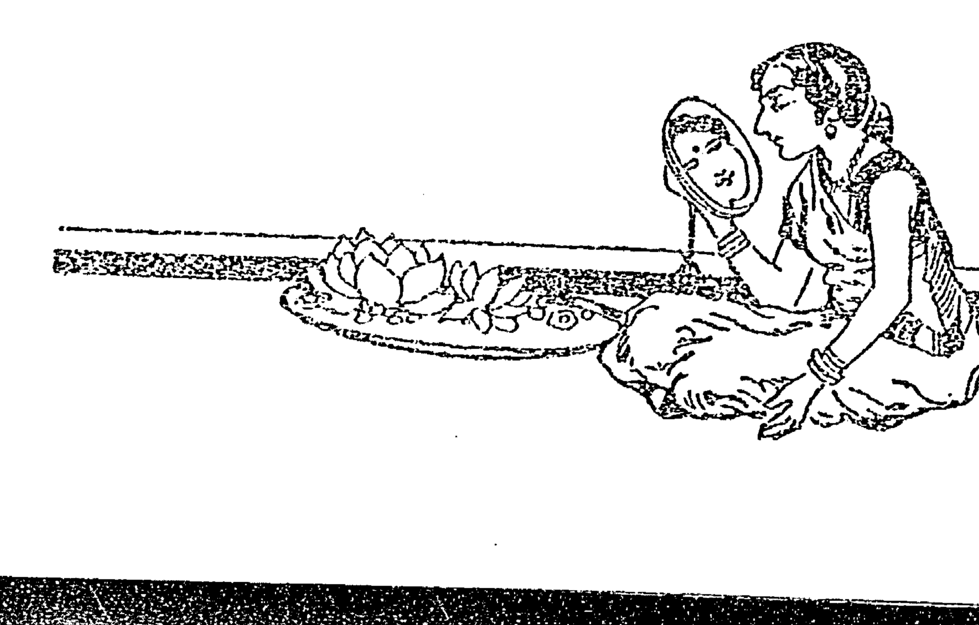

প্রেম ও কবিতা

শ্রীনরেন্দ্র দেব

"—দিন চলে না ঘুরি ফিরি ভিক্ষা ক'রে খাই!" দিন না চলার এই যে করুণ অভিব্যক্তি সঙ্গীতের একটি মাত্র ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে—সে কেবল তারাই বোঝে—যাদের দিন যথার্থই নানা অভাবে অচল। তেমনি, সময় যেন আর কাটতে চায় না—এ কথাটার মধ্যে যে কতখানি অন্তর্গূঢ় বেদনা নিহিত আছে, সেটা শুধু তাঁরাই অনুভব করতে পারবেন, যাঁদের সময় কাটাবার জন্য নানা অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করতে হয়। তাশ নিয়ে 'পেশেন্স্' খেলা থেকে সুরু করে খবরের কাগজ মাসিকপত্র ও বই পড়া, পোস্টেজ স্ট্যাম্প সংগ্রহ, সিনেমা দেখা, এমন কি, 'শব্দ-সন্ধান' সমাধান পর্য্যন্ত তাঁদের করতে হয়। আড্ডায় আড্ডায় দু'বেলা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেওয়ার সঙ্গে পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা করা সত্ত্বেও তবু যখন তাদের হাতে সময় পড়ে থাকে পর্য্যাপ্ত, তখন বেলা পর্য্যন্ত শুয়ে থাকা ও দিবানিদ্রার আশ্রয় লওয়া ভিন্ন তাদের আর—নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়!

ব্যাপারটা হাস্যকর ব'লে মনে হ'লেও এর চেয়ে দুঃখের বিষয় কিন্তু আর কিছু নেই! আমাদের মত মুটে মজুর মানুষ, যাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের তাড়ায় নিত্য স্নানাহারের পর্য্যন্ত ফুরসুৎ থাকে না, স্ত্রীপুত্রের দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখবারও যাদের অবসর নেই, তারা হয়ত—এই একদল হতভাগ্যদের সময় কাটানো যায় কি করে? —সমস্যাটা যে কতখানি পীড়াদায়ক, তা সম্যক উপলব্ধি করতে পারবে না।

পুরাকালে দেখা যায়, বড় বড় যাগ-যজ্ঞ ছাড়াও রাজা রাজড়ারা দ্যূতক্রীড়া, মৃগয়া, স্বয়ম্বর-সভায় উৎপাত ও দিগ্বিজয়ে দিন কাটাতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও আচার্য্য-স্থানীয় ব্যক্তিরা শাস্ত্রচর্চ্চা, পূজা ধ্যান, জপ তপ প্রভৃতি নিয়ে থাকতেন, কবিরা অতিকায় মহাকাব্য রচনা করতেন আর শিল্পীরা ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনাপুরী বা মহাকালের মন্দিরের ন্যায় বিরাট কিছু না কিছুর কল্পনা ও সৃষ্টি করতেন! এ সবই যে সময় কাটাবার তাড়ায়—তাতে আর কোনো সন্দেহ থাক্‌তে পারে না!

চারুদত্তের হাতে অফুরন্ত সময় না থাকলে বসন্তসেনার প্রেম যে ব্যর্থ হ'ত তাতে আর কোনো ভুল নেই! দণ্ডীরাজ এক ঘোটকীর সেবায় দিন কাটাতে পারতেন না। বর্দ্ধমান থেকে কাঞ্চিপুর পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ খনন একটা সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার! আর, একথা বোধ হয় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন যে 'সাত কাণ্ড রামায়ণ' বা 'অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত' অল্প সময়ের মধ্যে লিখে ওঠা বাল্মিকী-বেদব্যাসের পক্ষেও সম্ভব নয়।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে প্রেম ও কবিতা ও দুটোর জন্যই দরকার মানুষের অফুরন্ত সময়। সে যুগে যা সত্য ছিল এ যুগেও তা অব্যাহত আছে। সময় যখন কাটে না, এ যুগের মানুষও তখন কবিতা লিখতে বসে, অথবা প্রেমাসক্ত হয়। অতএব, এ থেকে বোঝা যায় যে প্রেম ও কবিতার সঙ্গে কালের প্রভাবের একটা ঘনিষ্ঠতর যোগ থাকা একেবারে অনিবার্য্য!

মিহির গুপ্তর সঙ্গে মণিকা রায়ের বিবাহ আগামী নব-ফাল্গুনের বাসন্তী সন্ধ্যায় মহাসমারোহে সম্পন্ন হবে স্থির হয়েছে। সুতরাং তাদের কাছে এবার শরৎ এসেছে সত্যই যেন সোনার বরণ রূপ ধ'রে। তার আলো ঝলমল সুন্দর প্রভাত, তার জ্যোৎস্না বিধৌত চাঁদনী রাত, তার নিবিড় স্নিগ্ধ নীলাকাশে লঘু শুভ্র মেঘের খেলা সবই হ'য়ে উঠেছে তাদের কাছে আজ একান্ত মনোরম!

কিন্তু অমল সেনের দিন আর যেন কাটছে না! "উদাসী" নামে প্রসিদ্ধ মাসিকপত্রের সম্পাদক সে, সুকবি বলে শিক্ষিত সমাজে তার একটা সুনামও আছে। প্রিয়দর্শন মিষ্টভাষী মানুষ। তার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনেরা বহুচেষ্টা করেও কিন্তু এ পর্য্যন্ত অমলের বিবাহ দিতে পারেন নি। চিরকুমার থাকবেন বলে ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছেন তিনি। অগত্যা তাঁরা একে একে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

অমলের অবস্থা ভাল। ভরণ পোষণের সংস্থান আছে বলে উপার্জ্জনের কোনো তাগিদ নেই, কাজেই হাতে তার পর্য্যাপ্ত সময়। কাটতে যেন আর চায় না! কবিতা লিখে, খবরের কাগজ ও মাসিকপত্র পড়ে, অনেকগুলো লাইব্রেরীর সমস্ত বই একাধিকবার শেষ করেও যখন বাড়্‌তি সময় হাতে রয়েই যেতে লাগলো, তখন দিগদারি হ'য়ে অমল নিজেই এক নূতন ধরণের মাসিকপত্র বার ক'রে ফেললে। নাম দিলে তার "উদাসী"। প্রথম পাতার উপর বড় বড় হরফে লিখে রাখলে এই 'মটো'—"আমি একলা চলেছি এই ভবে!" উদাসীর প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্যই হ'ল—'কোনো বিবাহিত লেখকের রচনা এ পত্রিকায় স্থান পাবে না।' সুতরাং বলা বাহুল্য যে অল্পদিনের মধ্যেই 'উদাসী' দেশের কুমার-সমাজে ও কুমারী-মহলে বিশেষ আদরণীয় হয়ে উঠলো!

তরুণ সাহিত্যলোকে 'উদাসী'র জয়যাত্রা সুরু হ'য়ে গেল যেন জগঝম্প ও কাড়ানাকাড়া বাজিয়ে!

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই উদাসীর পাঠকগণ লক্ষ্য করলেন যে প্রায় প্রতিমাসেই উদাসীর প্রথম পৃষ্ঠায় পাইকা বা ইংলিশ টাইপে সযত্নে ছাপা হচ্ছে কুমারী বিজয়িনী দেবীর রচিত বিচিত্র ছন্দের বড় বড় সব প্রেমের কবিতা! কবিতাগুলি সুখপাঠ্য, মনোজ্ঞ ও মর্ম্মস্পর্শী। কাজেই কুমারী বিজয়িনী দেবীর কবিখ্যাতি অচিরে প্রচারিত হ'য়ে পড়লো। সকলের মুখেই শোনা যেতে লাগলো বাংলা সাহিত্যে এইবার সত্যকার একজন প্রতিভাশালিনী মহিলা কবির আবির্ভাব হয়েছে!

কিন্তু একথা তখনও পর্য্যন্ত কেউ জানতে পারলে না যে, 'উদাসী'র সম্পাদক অমল সেনের সঙ্গে এই নবাগতা মহিলা-কবিটির পত্রযোগে যে পরিচয় ঘটেছিল তা ক্রমে টেলিফোন যোগে আলাপ ও শেষে নিমন্ত্রণ ও দেখাসাক্ষাতের ভিতর দিয়ে একান্ত ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠেছে। কবিতার তরঙ্গছন্দে ভেসে এসেছে প্রেমের সুবর্ণ তরণী প্রণয়ের অনুকূল বাতাসে দুটি হৃদয়ের শূন্যকূলে।

অমলের অন্তরঙ্গরা কেউ কেউ তার আধুনিক রচনা-বলীর ভঙ্গী দেখে ব্যাপারটা কতক সন্দেহ করলেও সাহস করেনি সেটা প্রকাশ্যভাবে জিজ্ঞাসা করতে। কারণ, অমলের সেই নারীজাতি সম্বন্ধে উদাস ভাবটা সে তখনও বহির্জগতে বর্জ্জন করেনি।

'উদাসী' কার্য্যালয়ে অমল আজ অসময়ে এসে সম্পাদকের ঘর আগলে বসেছিল। কাগজপত্র এটা ওটা নাড়ছিল বটে, কিন্তু কোনো কাজেই যেন তার মন বস্‌ছিল না! ঘন ঘন ঘড়ি দেখছিল আর 'সময় যেন কাটছে না!'—ব'লে বেশ একটু অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠছিল।

আজ প্রায় একমাসের উপর হবে কুমারী বিজয়িনী দেবীর সঙ্গে অমলের দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। কারণ বিজয়িনী দেবী এখানে ছিলেন না। বি-এ পরীক্ষার পর বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য তিনি মাসাধিককাল শিলঙে অবস্থান করছিলেন। যাবার সময় তিনি অমলকে বলে গেছলেন—"শিলঙ থেকে চিঠিপত্র লেখার সুবিধা হবে না। আমি যাঁদের অতিথি হয়ে থাকবো সেখানে, তাঁরা কেউ এ সব পছন্দ করেন না। তা ছাড়া, আমিই যে 'বিজয়িনী দেবী' এই ছদ্ম নামে 'উদাসী'তে কবিতা লিখি, এ খবরও তাঁরা কেউ জানেন না—সুতরাং—

অমল তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিল—"কোনো ভয় নেই বিজয়িনী! আমি অবশ্য পত্র তোমাকে রোজ লিখবো বটে, কিন্তু একখানিও ডাকে দেব না। আমার কাছেই জমা থাকবে, তুমি ফিরে এলে সেই পত্রাঞ্জলি দিয়ে আমি তোমার শুভ প্রত্যাগমনকে অভিবাদন করবো।"

বিজয়িনী উৎসাহিত হ'য়ে উঠে বলেছিল—"চমৎকার আইডিয়া! আপনি যথার্থই কবি, এই জন্যই আপনাকে আমার এত ভাল লাগে।"

অমল বলেছিল—"আমার জন্য শিলঙ্‌ থেকে কি উপহার নিয়ে আসবে বিজয়িনী?—

বিজয়িনী জিজ্ঞাসা করলে—"আপনিই বলুন কি আনবো? কী পেলে আপনি খুশী হবেন?"

অমল বললে—"একমাসের জন্য দৃষ্টির অন্তরালে চলে যাবে বিজয়িনী, এই একমাস আমি কাটাবো শুধু তোমাকে চিঠি লিখে, অথচ তোমার চিঠি আমি পাব না একখানিও—এইটেই আমাকে সবচেয়ে কাতর ক'রে তুলেছে, আচ্ছা, তুমি কি—"

বিজয়িনী বললে—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়। আমিও রোজ রাত্রে শুতে যাবার আগে লুকিয়ে আপনাকে একখানি ক'রে চিঠি লিখে রেখে তবে ঘুমাবো।"

"তোমার সে ঘুম হোক্ সুখস্বপ্নের আনন্দে মধুময়। ফিরে এসে সে চিঠিগুলি কিন্তু স্বহস্তে আমায় বিলি করে যাবে কথা দাও—" বলতে বলতে অমল মিনতি ভরে বিজয়িনীর হাত দু'খানি নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধ'রেছিল।

বিজয়িনীর মুখখানি সেদিন যে অপূর্ব্ব সুন্দর ও মধুর মনোহর লজ্জার অরুণরাগে রক্তিম হ'য়ে উঠেছিল—আজ কেবলই থেকে থেকে অমলের চোখের সামনে সেই কমনীয় মুখখানি ভেসে উঠ্ছে! বিজয়িনী আজ শিলঙ্ মেলে কলকাতায় ফিরছে। গোপনে সে টেলিগ্রাম ক'রে জানিয়েছে "স্টেশনে আসবেন না যেন! সঙ্গে মাসীমা থাকবেন। আমি বাড়ী পৌঁছেই আপনাকে ফোন করবো।"

শিলঙ মেল সওয়া একটায় শেয়ালদহে এসে পৌঁছবে। অমল কিন্তু বেলা বারোটার আগেই 'উদাসী' অফিসে এসে বসে আছে। মনে মনে কেবলই হিসাব করছে সওয়া একটায় শিলঙ্ মেল এসে পৌঁছলে বিজয়িনীর বাড়ী ফিরতে কতক্ষণ সময় লাগতে পারে? কাপড়-চোপড় বদলে মুখহাত ধুয়ে লাঞ্চ্ খেয়ে তারপর সে নিশ্চয় সবার আগেই তাকে টেলিফোন করবে! সেটা বড়জোর দুটো-স' দুটো নাগাদ। ঘণ্টাখানেক ত লাগবেই তার প্রস্তুত হ'তে। অমল ঘন ঘন ঘড়ির দিকে চায়! সময় আর কাটে না! বারটা থেকে একটা বাজলো। অমল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। কিন্তু বাকি পনেরো মিনিট সময়ের যেন একেবারে কুর্ম্মগতি! মাত্র এক কোয়ার্টার সময় যে এতখানি—তা ইতিপূর্ব্বে অমলের ধারণাই ছিল না! তার কানের ভিতর যেন সে সময় ট্রেন চলার ঘড় ঘড় শব্দ আসছিল, শিলঙ্ মেলের সঙ্গে তার মনও তখন দৌড়চ্ছিল সমানে পাল্লা দিয়ে।

—ক্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং! টেলিফোন রিঙ্ ক'রে উঠলো! চম্‌কে ধড়মড়িয়ে কম্পিত হাতে অমল রিসিভারটা তুলে নিলে। তার বেপথু বুকের মধ্যে তখন প্রিয়-মিলনের থর থর কম্পন!···

"হ্যালো!"

গলা যতদূর সম্ভব কোমল মিহি ও মিষ্টি ক'রে অমল ফোনের মুখে মুখ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"হ্যালো, বিজয়িনী? কখন এলে?" মোটা হেঁড়ে গলায় ফোনের অপর দিক থেকে কে বলে উঠলো "আরে কেঁও লালাজী?—রাম রাম! শেঠ যম্‌না···"

সজোরে রিসিভারটা যথাস্থানে নিক্ষেপ ক'রে অমল বলে উঠলো—'ড্যাম ইট!'

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলে—কাঁটায় কাঁটায় সওয়া একটা!

ঝন্ ঝন্ ক'রে আবার টেলিফোন বেজে উঠলো। ব্যস্ত হ'য়ে অমল ধরলে! ভাবলে ট্রেন থেকে নেমে শেয়ালদা স্টেশন থেকেই বোধ হয় বিজয়িনী 'কল' করছে।

কিন্তু, না। এবারও অমলকে হতাশ হ'তে হ'ল। সেই মাড়োয়ারীরই হেঁড়ে গলা! "ক্যা হুয়া শেঠজী?"—'রং নাম্বার' বলে ধমক দিয়ে অমল আবার ফোন্ কেটে দিলে। তার মুখ চোখে একটা তীব্র বিরক্তি ফুটে উঠলো!

অধীর আগ্রহে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে মানুষ যখন কিছুর প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করে, সময়ের প্রত্যেক মুহূর্ত্তটি যেন তখন তার কাছে অনন্তকালের নিরবচ্ছিন্ন রূপ ধ'রে প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে! সময় আর কাটতে চায় না!

এমনই কাতর অস্থিরতার মধ্যে আরও পনেরো মিনিট উত্তীর্ণ হ'ল। 'উদাসী' অফিসের দেওয়ালে বড় ঘড়িটায় ঢং করে দেড়টার ঘণ্টা বাজল! অমলের বুকটা ধড়াস্ ক'রে উঠলো।

"ক্রিং ক্রীং ক্রীং ক্রীং—" টেলিফোনে রিং হ'তে লাগলো। অমল ভাবলে বিজয়িনী কি এর মধ্যেই বাড়ী এসে পৌঁছল? বাড়ী ঢুকে ধূলো পায়েই তাকে ফোন্ করছে!—

ব্যগ্র হয়ে রিসিভার কানে তুলে নিলে অমল। তার প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস এসে পড়লো ফোঁস করে হর্নের গহ্বরের মধ্যে! একটু দম নিয়ে ধীরে ধীরে অমল বললে—'হ্যালো!'

ফোনের অপর প্রান্ত থেকে উচ্ছল কণ্ঠে এক পরিচিত পুরুষের গলা বলে উঠলো—"গুড্ লাক্! হ্যালো! অমল, তুমি নাকি? আরে! তোমাকে যে এ সময় 'উদাসী' অফিসে পাবো—I never expected it!—আমি জানি বেলা তিনটের আগে তুমি আস না! মণিকা বললে—একবার ট্রাই ক'রে দেখই না যদি ধ'রতে পারো! ভাগ্যিস্ তার পরামর্শ শুনে রিং করলুম! নইলে তোমাকে হয়ত miss করতুম!···"

অমল ঘড়ির দিকে চেয়েছিল। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে

চলেছে। বিজয়িনী যদি এসময় ফোন্ করে—তাকে পাবে না। এক্সচেঞ্জ থেকে বলে দেবে "engaged"—আঃ! মিহির স্টুপিড্ কি আর সময় পেলে না—ফোনে আড্ডা দেবার? বিরক্ত হয়ে বললে—"কি দরকার তোমার চট্ ক'রে সেরে নাও মিহির! আমি ভয়ানক্ busy! ডিকেন্সন কোম্পানীর সাহেব এসে wait করছে—"

"আরে রেখে দাও তোমার ডিকেন্সন্ কোম্পানী! কাল সন্ধ্যের সময় আমাদের ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ীতে তোমাকে অতি অবশ্য আসতে হবে। কাল আমরা একটা পার্টি দিচ্ছি, বুঝলে—কেবলমাত্র আমাদের intimate friendsদের। আমাদের আসন্ন বিবাহ উপলক্ষে এটা একটা "অধিবাস-উৎসব" বলতে পারো। মণিকা "মণিপুরী" dance দেখাবে। তোমার কাগজে তার একটা বেশ কবিত্বপূর্ণ বিবরণ ছাপা চাই কিন্তু—মিস্ সেন রবীন্দ্রনাথের নূতন গান শোনাবেন—

অমল এবার রীতিমত অধৈর্য্য হয়ে উঠলো—ব্যস্ত হয়ে বললে—"আচ্ছা—আচ্ছা! সে হবে এখন, সন্ধ্যের পর নিশ্চয়ই যাবো—O. K!"

"দূর গাধা! আজ সন্ধ্যেবেলা নয়। কাল, কাল, কাল সন্ধ্যেবেলা—বুঝলি? আজ আমি সন্ধ্যের সময় থাকবো না!—মণিকাকে নিয়ে ছ'টার শো'তে 'লাইট হাউসে' যাচ্ছি—'She Loves Me' ছবিখানা দেখতে!—চমৎকার ছবি। Charming!—"

অমলের মন অস্থির। দৃষ্টি ঘড়ির কাঁটার দিকে নিবদ্ধ। মিহিরের এ সময় এই বেয়াদপি তার কাছে অসহ্য ঠেকছিল। তাড়াতাড়ি বললে—"আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে! ছ'টার শো'তে লাইট হাউসেই যাবো—গুড্‌বাই!

"নন্‌সেন্স! I don't want any intruder this evening. I want to have her all to myself! দোহাই তোমার বন্ধু! আজ আর ধূমকেতুর মত 'লাইট হাউসে' এসে উদয় হ'য়ো না!—কাল বরং একটু সকাল করে—"

অমলের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে পড়লো। ভদ্রতা বুঝি আর রক্ষে করা চলে না!—"অল রাইট!—কাল সকালেই যাচ্ছি, গুডবাই!" বলে তাড়াতাড়ি অমল ফোন নামিয়ে রেখে অত্যন্ত রেগে বলে উঠলো—"একটা nuisance! হতভাগা—বাঁদর! আর সময় পেলেন না ডাকবার! হয় ত টেলিফোন্ করে বিজয়িনী এর মধ্যে 'নো রিপ্লাই' শুনে—I mean 'engaged' শুনে ফিরে গেল! একটা স্টুপিড! নিজের মনের আনন্দেই মশ্‌গুল হ'য়ে আছেন! যেন বিয়ে আর কেউ কখনো করে নি—করবেও না?—"

"ক্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং"—টেলিফোন বেজে উঠলো!

অমল তাড়াতাড়ি ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলে—ঠিক পৌণে দুটো!—

হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে টেবিলের উপর ঝুঁকে রিসিভারটা সে কানে তুলে নিলে।··

"হ্যালো!"

এবার যে মধুময় কোমল কণ্ঠ টেলিফোনের ওপার হ'তে সাড়া দিলে তা দিলরুবার সুরের চেয়েও মিঠে!···এই তো বিজয়িনীর গলা! অমল যেন আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে পড়লো!

"হ্যালো! এটা কি 'উদাসী' অফিস? সম্পাদক মহাশয় আছেন?—সম্পাদক মশাইকে একবার ডেকে দিন ত!"

"সত্যিই তবে তুমি ফিরে এসেছ বিজু?

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অমল সাগ্রহে এই প্রশ্ন করলে।

"এ্যাঁ? কি বললেন? সম্পাদক মশাই বেরিয়েছেন?"

ব্যাকুল হ'য়ে অমল বললে—"না না বিজু, এই যে আমি—আমিই ত কথা বলছি—উদাসীর সম্পাদক, অমল সেন—"

"ও! আপনিই বুঝি, নমস্কার! আমি মনে করেছি আপনার কাগজের সেই দুঃসহ সহকারী মশাই বুঝি ফোন্ ধরেছেন—"

"না না, আজ আর কেউ নেই অফিসে। সবাইকে ছুটি দিয়েছি। আমি একলাই বেলা বারটা থেকে—তোমার প্রতীক্ষায় অধীর হ'য়ে অপেক্ষা করছি!"

"বেলা বারটা থেকে?—বলেন কি?"

"হ্যাঁ বিজু।"

"কেন? একি পাগলামী?—আমি তো তখন 'ঈশ্বরদী'তে—"

"হ্যাঁ, আমি টাইম টেবিল খুলে—ঘড়ি ধ'রে—"

"ট্রেনের পদক্ষেপ গুণছিলেন বুঝি?"

"একরকম তাই! তুমি কখন এলে বিজু?—"

"ঠিক্ স'একটায় আমাদের ট্রেন punctually প্ল্যাটফর্মে in করেছে।"

"না না, সে ত জানি, বাড়ী এসে পৌঁছলে কখন ?—"

"এই মিনিট পনেরো হবে। মাসীমাকে তালতলায়—নামিয়ে দিয়ে আসতে একটু দেরী হ'য়ে গেল।"

"ও! তাহ'লে বাড়ী ঢুকেই আমাকে ফোন ক'রেছো দেখছি, কাপড়-চোপড় বদলানো—মুখহাত ধোয়া এখনও কিছুই হয়নি নিশ্চয়—"

"ফোনে আমাদের পক্ষে ঐ একটা মস্ত সুবিধে। চক্ষু-লজ্জার বালাই নেই! যা অবস্থায় আছি এখন—একেবারে ভূতের মত! এ বেশে কারুর সামনেই বেরোতে পারতুম না; আপনার—সামনে ত নয়ই।"

"আমি কিন্তু বিজু ফোনেও দু-একজনের চক্ষুলজ্জা দেখেছি—একবার কোনো একজন প্রসিদ্ধ রায়-বাহাদুরের বাড়ীতে সকালে কি একটা কাজে গেছলুম। তাঁর সঙ্গে কথা বলছি এমন সময় ফোন এলো। তাঁর সেক্রেটারী দৌড়ে এসে ফোন ধরলেন এবং একটু পরেই রায় বাহাদুরকে বললেন, 'গভর্ণমেণ্ট হাউস থেকে চীফ্ সেক্রেটারী সার মরিসন্ হামফ্রে আপনাকে ডাকছেন। রায় বাহাদুর শশব্যস্তে উঠে পড়ে ফোন ধ'রে চীফ সেক্রেটারীর উদ্দেশে এক আভূমিপ্রণত সেলাম ঠুকে বললেন—Yes sir! Rai Bahadur speaking sir! at your service sir!—"

টেলিফোনের ওপারে একটা সুধা কণ্ঠের কলহাস্য যেন 'পিয়ানো'র ঝঙ্কারের মত বেজে উঠলো!

অমলের পক্ষে সে যেন একেবারে কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো—আকুল করিল মন প্রাণ!

অমল বিগলিত কণ্ঠে বললে—"উঃ! কত দিন যে তোমায় দেখিনি বিজু! এক একটা দিন আমার মনে হয়েছে যেন এক একটা যুগ!"

উত্তর এল—"আমারও ঠিক ওই অবস্থা।

"সত্যি বলছো বিজু!"—অমলের চোখমুখ একটা চাপা খুশীতে যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো!

"সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন। শিলঙ্ এসময় একেবারে ফাঁকা! এটা তো এখন ওখানকার season নয় কিনা—কাজেই, সময় যেন আর কাটে না!"

অমল একটা ঢোক গিলে বললে—"ও! হ্যাঁ, তা বটে।" অমলের মুহূর্ত্তপূর্ব্বের সে খুশীর ভাবটা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেন মুষড়ে পড়ল। বললে—"তা, এতটা ট্রেনজার্নির পর একটু বিশ্রাম করলে পারতে বিজু! বাড়ীতে এসেই একেবারে ব্যস্ত হ'য়ে আমায় ফোন করা—"

উত্তর এলো—"একটা বিশেষ দরকারে পড়ে আপনাকে ফোন করতে হ'ল। মিহির গুপ্তর ফোন নম্বরটা কি বলতে পারেন? আমি ত টেলিফোন গাইড হাত্ড়ে—কোথাও পেলাম না।"

"শুধু কি ওই সংবাদটুকু জানবার জন্যই আমাকে ব্যস্ত হ'য়ে ফোন করছ বিজু?"

অমলের কণ্ঠে একটা ক্ষুব্ধ অভিমানের আমেজ দেখা দেয়।

টেলিফোনের অপরপ্রান্তে শোনা যায়—"বা-রে! একমাস আপনার কোনও খবর পাইনি, সেটা বুঝি—"

"সত্যি বলছো বিজু? আমার খবর কি সত্যিই তুমি জানতে চাও?"

"বা-রে! জানতে চাই না বুঝি?—আপনি ত এই একমাসের মধ্যেই দেখছি আমাকে ভুলে গেছেন, তাই বলে কি—"

"ভুলিছি! তোমাকে ভুলবো বিজু? এ জীবনে ত নয়ই—হয় ত পর-জীবনেও!—"

"যান! ওই সব বলেই ত আমাকে—"

"বিজু, আমি যে তোমাকেই জীবনে প্রথম—"

"দেখুন, যুগে যুগে মেয়েরা পুরুষদের বিশ্বাস করে ঠকেছে, তবু কি জানি কেন আপনাকে আমি কিছুতেই অবিশ্বাস ক'রতে পারিনি।"

"তোমার বিশ্বাস অপাত্রে ন্যস্ত হয়নি বিজু! এই একমাস তোমার জন্য অহরহ আমার কী যে মন কেমন করেছে—"

"শুনবেন তবে?…একটা কথা চুপি চুপি আপনার কানে কানে তা হ'লে আজ বলি—সেই প্রথম যেদিন আপনার সঙ্গে আমার দেখা—মনে পড়েকি—?"

অমল একেবারে উৎকর্ণ হ'য়ে উঠলো। টেলিফোনের রিসিভারটা ভাল করে বাগিয়ে কানে একেবারে সজোরে চেপে ধরে সামনে একটু ঝুঁকে পড়লো।—

অকস্মাৎ একটা খুব মোটা ভারি পুরুষের গলা অমলের কানে এল। "নমস্কার! আপনিই কি উদাসীর সম্পাদক?"

"না—না—আমি না"—অমল ভীষণ রেগে গর্জ্জন করে উঠলো—

"ও! আপনি তাঁর সহকারী বুঝি? তা দেখুন—আমারই নাম প্রিয়তোষ পাল। একটু পরে গেলে সম্পাদক মশায়ের সঙ্গে দেখা হ'তে পারে কি?"

"তোমার কোনো কথা আমি—শুনতে চাইনি! সরে যাও এখনই টেলিফোন ছেড়ে—সরে যাও বলছি—"

"বেশ, তা হ'লে সরেই যাচ্ছি, আপনি যখন শুনতে চান না—"

এবার গানের সুরের মত মিষ্টি মেয়েলী গলায় এই কথাগুলি—কানে এল। শশব্যস্ত হয়ে অমল বলে উঠলো—"আরে না না, বিজু, আমি তোমাকে কিছু বলিনি। লক্ষীটি, তুমি যেও না—দেখ না—কে কোথাকার এক ছোটলোক এই সময় টেলিফোনে জ্বালাতে এসেছে—"

"ক্রস-কনেক্শান হয়েছিল বুঝি? ও! তাই ত বলি, হঠাৎ আপনি আমার ওপর—এমন রূঢ় হ'য়ে উঠলেন কেন—?

"এই দেখ না সম্পাদকতা করা কী এক বিষম ঝকমারী—একটু নিরিবিলি নির্ঝঞ্ঝাটে টেলিফোন করবারও উপায় নেই! হ্যাঁ, তুমি কি বলছিলে বিজু?"—অমলের গলা যেন সুধাসিক্ত!"

"বলছিলুম—মিহিরবাবুর—"

"ও! হ্যাঁ, তার ফোন নম্বরটা—না?

"হ্যাঁ, আমি বাড়ী ফিরেই দেখি মণিকাদি' কাল সন্ধ্যের সময় মিহিরবাবুদের বাড়ীতে উপস্থিত হবার জন্য বিশেষ অনুরোধ ক'রে আমায় একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছেন, ওদের নাকি বিয়ের দিনটা—"

অমলের এ অবান্তর আলোচনা এসময় একটুও ভাল লাগছিল না। মিহির গুপ্তর বিয়ে নিয়ে তাদের কিসের এত মাথা ব্যথা?—কিন্তু, এ প্রসঙ্গ চাপা দেবারই বা উপায় কি? কাজেই বলতে হ'ল—"হ্যাঁ, আমাকেও যেতে বলেছে ওরা—"

"যাচ্ছেন নাকি?"

"তুমি কি যাবে?—তুমি যদি যাও ত, দু'জনে একসঙ্গে যেতে পারি—"

"আমার বোধ হয় যাওয়া হবে না। ঠিক ঐসময়—মাসীমার মেয়ের পাকা দেখা যে কাল! কাল আমরা বাড়ীশুদ্ধ তালতলায় যাবো।"

"ও! আচ্ছা। তা হ'লে ত আর কথাই নেই।" অমল মনে মনে বললে—আঃ! কোথা থেকে যে আবার এই এক মাসীমা এসে জুটলেন?—একটু পরেই অমল অনুরোধ করলে—"হ্যাঁ, কাল বিকেলে 'লাইট-হাউসে' এস না কেন বিজু! অনেক দিন তোমার সঙ্গে একসঙ্গে ছবি দেখা হয়নি। খুব চমৎকার একখানি ফিল্ম এনেছে ওরা—"

"কি ছবি?

"She Loves Me!"

"তাই নাকি?—ছবির নামটী যেন 'উদাসী' সম্পাদকের কবি-কল্পনা-প্রসূত ব'লে মনে হ'চ্ছে না?—"

অমল খুশীতে একমুখ হেসে উঠলো—গদ্গদ্ কণ্ঠে বললে—"না না, সত্যি! তুমি আজকের 'স্টেট্স্ম্যানের য়্যামিউজমেণ্ট্ পেজটা খুলে দেখ না কেন—"

"তা' না হয় হ'লো, কিন্তু বিজ্ঞ সম্পাদক মশাই!—কাল কেমন ক'রে আপনার যাওয়া হবে শুনি?—কাল ত আপনি মিহিরবাবুদের ওখানে engaged."

"আরে ধেৎ, তোমার যাবার যখন কোনো ঠিক নেই বলছো, তখন আমার আর ওখানে যাবার কোনো interest-ই নেই। তার চেয়ে বরং তোমার সঙ্গে 'লাইট হাউস'-এ দু'ঘণ্টা—"

"কিন্তু, আমি যে মাসীমার মেয়ের পাকা দেখায় কাল তালতলায়—

"ওঃ! হ্যাঁ, তাও ত বটে!" কিন্তু স্বগত উক্তি হ'ল—'ওফ্! Hang this মাসীমা!' প্রকাশ্যে বললে—"আমি একেবারে ওকথা ভুলে গেছলুম বিজু, আঃ! এই সামাজিক সুসভ্য মানুষের সময় যে একটা দিনও তার নিজের নয়—এটা এ ব্যাপার থেকে বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে!—Primitive যুগটাই দেখছি ছিল ভাল!"

ঝর্ ঝর্ করে এক ঝলক হাসির ঝর্ণা ঝরে এসে অমলের কর্ণকুহর তৃপ্ত করে দিলে—সেই কলকণ্ঠের সুরলহরীর মধ্যে শোনা গেল—"কিছু মনে করবেন না অমলবাবু! সে আদিম যুগের বর্ব্বরতা কিন্তু পুরুষদের ভিতর থেকে এখনও একেবারে নিঃশেষে লোপ পায়নি!"

অমল বললে—"তোমার কথাটা অভ্রান্ত বলে মেনে নিতুম

বিজু, যদি আমি জোর কোরে তোমাকে কাল তালতলা থেকে তুলে এনে 'লাইট হাউসে' বসাতে পারতুম!"

"আচ্ছা, আচ্ছা, আপনাকে অতটা disappointed হ'য়ে পড়তে হবে না। চলুন আমরা পরশু গিয়ে ছবিখানা দেখে আসি—"

অমল অত্যন্ত হতাশ হয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—"পরশু যে ওদের change of programme!"

"ওঃ! তা হ'লে ত আর হয় না!"—ক্ষণকাল দু'জনেই চুপ চাপ! তারপর ওদিক থেকে শোনা গেল—"আচ্ছা; শুনুন; এক কাজ করা যাক আসুন—আজই সন্ধ্যেয় 'লাইট হাউসে যাওয়া যাক! কেমন? রাজি আছেন?—"

অমল উৎসাহে উত্তেজিত হ'য়ে উঠে ব'লে ফেললে—"তাহলে ত খুব ভালই হয়!" কিন্তু, পরক্ষণেই লজ্জিত হয়ে বললে—"না, না, থাক, একে এই এতটা ট্রেন জার্নি ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে এসেছো—আজই সন্ধ্যের পর বেরুনো—"

"তার জন্য ভাববেন না! আপনি সঙ্গে থাকলে—আমি একটুও ক্লান্তি বোধ করবো না—"

অমল যেন হাতে স্বর্গ পেলে! একেবারে—উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলো—"বিজু! তোমার কবিতা যে কেন আমার রবি ঠাকুরের লেখার চেয়েও ভাল লাগে তা কি এখনও বোঝ নি?"

"আচ্ছা, আমি এখন চল্লুম—মা ডাকছেন—গুডবাই! তা হ'লে আজ সন্ধ্যেবেলা 'লাইট হাউসে' দেখা হবে, কেমন—?"

"O-k! গুডবাই Love!"

ফোন নামিয়ে রেখে অমল ফিরে দেখে—সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে—শ্রীমান প্রিয়তোষ পাল!

একটু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"আরে! তুমি কতক্ষণ এসেছ?"

এক মুখ হেসে প্রিয়তোষ বললে—"একটু আগে টেলিফোনে আপনি আছেন কি-না জেনে—তখনি বেরিয়ে পড়িছি! আপনাকে ত সহজে ধরা যায় না। কতবার যে এসে ফিরে ফিরে গেছি, তার ঠিক নেই!—যখনই আসি—শুনি, আপনি নেই, বা এইমাত্র চলে গেছেন, কিংবা আজ আর আসবেন না—"

হো হো ক'রে হেসে উঠে অমল বললে—"কি করি বলো, তোমার মত সব ছন্দ-ছোঁয়াচে—কাব্যাক্রান্তদের হাত থেকে আত্মরক্ষার যে আর কোনো উপায় নেই!"

প্রিয়তোষ পালের মুখ গম্ভীর হ'য়ে উঠলো। হাসি মিলিয়ে গেল। ধীরে ধীরে বললে—"আমাকে ত আপনি পত্র লিখে ডেকে পাঠিয়েছিলেন! নইলে আমি কখনই আপনাকে বিরক্ত করতে আসতুম না।"

"ডেকে পাঠিয়েছিলুম নাকি? কী আশ্চর্য্য!—"

"এই দেখুন না, আমি কি মিথ্যে কথা বলছি? সে চিঠি আমার পকেটেই রয়েছে।"

"থাক্ থাক্, আর চিঠি দেখাতে হবে না—"

"কিন্তু, আমি ত ইতিমধ্যেই এ চিঠি অনেককেই দেখিয়েছি—আমার বন্ধুবান্ধবেরা সকলেই জানে 'উদাসী'র সম্পাদক আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন—"

"ও! বুঝিচি, চিঠিখানা কাউকে দেখাতে আর বাকি রাখ নি? পকেটে পকেটে নিয়েই ঘুরছো! —তা বেশ ক'রেছ। কিন্তু, কেন ডেকে পাঠিয়েছিলুম বলতে পারো?—"

"সেই যে আমি 'পল্লীপথ' নামে একটি ছোট্ট কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলুম 'উদাসী'র পূজাসংখ্যায় প্রকাশ করবার জন্য। আপনি সে কবিতাটি ফেরত দিয়ে আমায় লিখে-ছিলেন—'এখন আর আমাদের গতি পল্লীর সেই পায়ে-চলা সংকীর্ণ পথের মধ্যে আবদ্ধ রাখলে চলবে না—তাকে এগিয়ে আসতে হবে—বড় বড় বিশাল নগরীর প্রশস্ত রাজপথে। তোমরা তরুণের দল! তোমাদের উপরই জাতির এই অভিনিষ্ক্রমণ—এই জয়যাত্রার মহৎ কর্ত্তব্য নির্ভর করছে—যদি পারো তো তোমার কবিতাটি বদলে লিখে নিয়ে এসো—"

মাথাটা একটু চুলকে অমল জিজ্ঞাসা করলে—"তুমি কি বদলে আবার লিখে এনেছ নাকি কবিতাটা?"

সলজ্জ ভাবে ঘাড় হেঁট ক'রে প্রিয়তোষ পাল বললে—"আজ্ঞে হ্যাঁ! সেটা বদলে এবার 'রাজপথে'র উপর লিখেছি! আপনাকে পড়ে শোনাবার জন্য আমি নিজে লেখাটি সঙ্গে নিয়ে এসেছি—"

"ও! তা বেশ করেছ', কিন্তু···হ্যাঁ, তোমার কবিতাটা কি আকারেও প্রশস্ত রাজপথের মত খুব বড় হয়ে প'ড়েছে?"

"আজ্ঞে না, অল্প কয়েক লাইন মাত্র! একটা brief

sketch বলা চলে!—তুলির দু-একটা আঁচড়ে একখানা ছবি ফুটিয়ে তোলার মতো! এই যে পড়ি—শুনুন না, শুনলেই বুঝতে পারবেন—'বড় রাস্তা'—"

"কবিতার নাম দিয়েছো কি—'বড় রাস্তা'?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"কেন, 'রাজপথ' দিলেই ত পারতে।"

"আজ্ঞে, কবিতার প্রথম লাইনটি ধরেই নামকরণ করিছি যে—"

"ও! প্রথম লাইনেই আছে বুঝি—'বড় রাস্তা'? তা ওর সঙ্গে মিল দিয়েছ কি? খুব সম্ভব 'খাস্তা'?—কারণ, ওছাড়া ত আর কোনো ভালো মিল নেই! কি ছন্দে লিখেছ?—"

"আজ্ঞে, দয়া করে একটু শুনলেই বুঝতে পারবেন। মিল ত আপনিই রাখতে আমায় নিষেধ ক'রেছিলেন। এই যে চিঠিতে লিখেছেন—'এ যুগে আমাদের জীবনে 'মিল' কোথা?—না সমাজে, না রাষ্ট্রে, না কর্পোরেশনে, না কংগ্রেসে, না সাহিত্য সম্মিলনে! সুতরাং আধুনিক সাহিত্যে তার ছাপ ত পড়বেই! কবিতায় বর্ত্তমান সময়ে মিল থাকাটা শুধু অস্বাভাবিক নয়, সে মিল হবে হিন্দু-মুসলমানের মিলের মতই কৃত্রিম! যে দেশে স্বামী-স্ত্রী হ'য়েও দু'টি নরনারীর মনের মিল নেই সে দেশে কবিতার 'মিল' ভণ্ডামির নামান্তর—!"

"ও! আমি বুঝি এইসব কথা—তোমাকে লিখেছিলুম?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এতে আমার খুব সুবিধে হয়ে গেছে কিন্তু, কবিতা লেখবার পরিশ্রম অনেক হালকা হ'য়ে গেছে! মিলের জন্য আমাকে এত বেগ পেতে হ'ত—"

অমল মনে মনে নিজের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলো! কোন্ অসতর্ক মুহূর্ত্তে এই তরুণ কবিযশপ্রার্থীকে—এসব লিখে পাঠানো তার খুবই অন্যায় হয়েছে বুঝতে পারলে; সাধে কি আর জ্ঞানী মহাপুরুষেরা বলে গেছেন—শতং বদ 'মা' লিখ—কিন্তু, ঢিল যখন ছোঁড়া হয়ে গেছে তখন আর উপায় কি? অত্যন্ত অনুতপ্তের মত অমল বললে—"মিল দুর্লভ বটে, তুমি ঠিকই বলেছ—মিলের জন্য অবশ্যই অত্যন্ত বেগ পেতে হয়, কিন্তু যাই বলো প্রিয়তোষ, মিল যদি খুঁজে পাওয়া যায় তার চেয়ে মধুময় পৃথিবীতে বোধ হয় আর কিছু নেই—"

প্রিয়তোষ বিস্মিত হয়ে বললে—"আজ্ঞে—আপনি—

অমল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—"এই ধর যেমন—

"মনসিজ ফুলশর
ছুটি প্রিয় অন্তর
বিঁধিল যবে
কাঁপে হিয়া থর থর;
ব্যাকুল পরস্পর
মিলিবে কবে?" এর কাছে কি আর?—"

"আজ্ঞে, আমার রচনা কিন্তু 'অতি আধুনিক।' আপনি যা বললেন—ও তো pre-war Poetry—"

"আচ্ছা, পড়ো তো শুনি, Post-war Poem তুমি কি রকম লিখেছ—"

প্রিয়তোষ বার দুই গলাটা ঝেড়ে নিয়ে, একটু কেসে, লুকিয়ে পকেট থেকে একটা লবঙ্গ বার করে মুখে পুরে দিয়ে পড়তে সুরু করলে—

"বড় রাস্তা, ওগো নিষ্ঠুরা কঠিনা পাষাণী বড় রাস্তা,
নগরীর বুক চিরে চলে গেছ তুমি,
দৃক্‌পাত নেই তোমার কোনো দিকেই যেন!
ওগো বড় রাস্তা, তুমি কি শুধু বড় লোকেরই?
শুধু জুড়ি চৌঘুড়ি মোটরেরই সমাদর তোমার কাছে?
পায়ে হেঁটে বহু কষ্টে চলে আসে যারা—সর্ব্বহারা—
মাথায় মোট নিয়ে—পিঠের শিরদাঁড়া বেঁকিয়ে
গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে—
তারাই শুধু চাপা পড়বে তোমার ওই প্রশস্ত আঙিনায়?
ক্ষত বিক্ষত ক'রে—হাসপাতালে পাঠাও তুমি
—তাদের,
কেউ কেউ প্রাণেও মরে তোমার ওই
চিরমুক্ত দ্বারে এসে।
তাদের ভালবেসে একটু কি তোমার চক্র-বিরল
নির্জ্জন সঙ্গ দান করতে পার না?
ধন্য হবে তারা তোমার সে অনুগ্রহ রঞ্জিত
ধূলি ধূসর প্রেমের ছায়া লেগে—"

"ব্যস! ব্যস্!—আর পড়তে হবে না! চমৎকার হয়েছে। দাও ওটা এ মাসের 'উদাসী'র প্রথম পাতাতেই

ছেপে দেবো—প্রেম! প্রেম! বুঝলে প্রিয়তোষ! কবিতার আসল 'প্রাণ-বস্তু'ই হ'লো প্রেম! অর্থাৎ, কবিতার 'ভাইটামিন্!" কারণ, প্রেম থেকেই কবিতার উদ্ভব!—প্রেমেতেই ওর সার্থকতা—প্রেমেতেই লয়! মানুষ যখন প্রেমে পড়ে তখন বিশ্বজগৎ হয়ে ওঠে তার কাছে কবিত্বময়! তখন তার হাত দিয়ে শুধু কবিতা ছাড়া আর কিছু বেরোয়ই না!—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন—আর সে কবিতা হয় সমস্তই প্রেমের কবিতা!

"হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কি ক'রে জানলে? তুমি কি কখনো কারুর প্রেমে পড়েছো প্রিয়তোষ?—"

"আজ্ঞে না, আমি খুব সতর্ক হ'য়ে আছি। সেই যে আপনি আমাকে সাবধান ক'রে দিয়ে লিখেছিলেন—প্রেম মানুষের পক্ষে একটা মারাত্মক ব্যাধি স্বরূপ! প্রেমের ভীষণ সংক্রামক বিষাক্ত বীজাণু বহন করে বেড়ায় দেশের যত সুন্দরী তরুণীরা! প্রেমে আক্রান্ত হওয়ার চেয়ে বরং প্লেগে আক্রান্ত হওয়াও ঢের বেশী নিরাপদ!—সেই থেকে আমি ওদিকে আর ঘেঁসিনি—"

"বটে! আমি আবার কবে তোমাকে এসব লিখলুম?"

"আজ্ঞে, সেই যে আমি যখন অভিযোগ করিছিলুম যে—উদাসীর প্রথম পৃষ্ঠা কেন প্রত্যেক মাসে এমন কলঙ্কিত করতে দেওয়া হ'চ্ছে—কুমারী বিজয়িনী দেবীকে? যত সব 'এফিমিনেট্' প্রেমের প্রলাপ তাঁর সাদরে ছাপা হ'চ্ছে—একটা লাইনেও একটু passion নেই! শুধু brain work! যা ওয়েস্ট্ পেপার বাস্কেটে ফেলে দেওয়া উচিত ছিল—তখন আপনি আমাকে ঐ মহিলা-কবিটির শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে ঐ সব কথাই ত লিখেছিলেন—"

অমল ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"সে চিঠিখানা কি তোমার কাছে আছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার কোনো চিঠিই আমি ফেলিনি।

"কই দেখি সে চিঠিখানা?"

প্রিয়তোষ চিঠিখানা বার করে দিলে। অমল সেটা নিয়ে বার দুই পড়ে শুষ্কমুখে বললে—"এখানা আমার কাছেই থাক। তবে এটা ঠিক জেনো প্রিয়তোষ যে, প্রেমের ব্যাপারে মানুষের ব্যক্তিগত অবস্থা যাই হোক, কবিতা কিন্তু প্রেম ছাড়া হ'তে পারে না! কানুছাড়া বৃন্দাবনে যেমন গীত নেই, প্রেমছাড়া তেমনি পৃথিবীতে কবিতা নেই।"

প্রিয়তোষ একটু ক্ষুণ্ণ হ'ল। কিন্তু কিছু বলতে সাহস করলে না। সম্পাদককে চটালে যদি 'বড়রাস্তা' না 'উদাসী'তে বেরোয়! একটা ঢোক গিলে শুধু বললে—"কিন্তু, দেখুন একটা কথা জানতে চাই! আমাদের এই বিংশশতাব্দীর রিয়েলিষ্টিক জগতে বর্ত্তমান কর্ম্মব্যস্ততার যুগে, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ যখন কঠোর থেকে কঠিনতম হয়ে উঠেছে এ অবস্থায় বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের প্রেম নিয়ে বিলাসিতা করবার কি অবসর আছে?"

অমল উঠে পড়েলো। ঘড়িতে তখন পাঁচটা বাজে। তাকে ছটার মধ্যে 'লাইট হাউসে' যেতে হবে পাশাপাশি দু'খানা সীটবুক করতে হবে—বললে—"আচ্ছা, এ আলোচনা আর একদিন করা যাবে, আজ উঠলুম প্রিয়তোষ, আমার একটু বিশেষ দরকার আছে। তোমার প্রশ্নের উত্তরে আজ শুধু এইটুকুই বলতে পারি—যে 'বড় রাস্তা' নিয়ে বড় বড় কাব্য করবার যদি এদেশের ছেলেমেয়েদের নিরবচ্ছিন্ন অবসর থাকে, তা হ'লে প্রেম নিয়ে বিলাসিতা করবার সময়েরও তাদের অভাব হবে না! প্রেম ও কবিতা ও দুটো পরস্পর allied and interrelated. *

* বিদেশী বীজ অবলম্বনে।

সামাজিক ও দাম্পত্য স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান

ডাঃ সুবোধ মিত্র এম বি (কলিঃ) এম-ডি (বার্লিন) এফ্-আর-সি-এস্ (এডিন) এফ্-সি-ও-জি

যে বিষয়ের অবতারণা করছি তার একটা কোনো সুস্পষ্ট সংজ্ঞা আজও নির্দ্দিষ্ট হয়নি। বিজ্ঞানের প্রায় সকল বিভাগেই এমন কতকগুলি কথা ব্যবহার হয় যার বেশ পরিষ্কার অর্থ কিছু ধরা যায় না এবং ভালো ক'রে সেটা লোককে বোঝানোও যায় না। আজ যা নিয়ে আলোচনা করতে বসেছি এটা ওই ধরণেরই একটা ব্যাপার। 'পরিণয় ও পারিবারিক বা সামাজিক স্বাস্থ্যতত্ত্ব' বললে কথাটা বেশ ওজনে ভারি ব'লে মনে হয় বটে কিন্তু বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা নিশ্চয়ই হয় না। কিন্তু উপায় কি? এর চেয়ে নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা এ সম্বন্ধে আর কিছু পাওয়া যায়নি এখনও।

একজন খুব বড় জার্মান বৈজ্ঞানিক বলতেন "নারীর জীবন কোনো দিনই সুসম্পূর্ণ হ'তে পারে না—যে পর্য্যন্ত না সে পত্নী ও জননী হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে, বিশেষ ক'রে আমাদের এই বাংলাদেশে মেয়েদের অবস্থা একেবারে অন্য রকম। বিবাহ ও মাতৃত্ব বঙ্গনারীর জীবনের যেন অবশ্যম্ভাবী ঘটনা! একটু লক্ষ্য ক'রে দেখলেই চোখে পড়ে আমাদের মা-বোনেরা, আমাদের স্ত্রী ও কন্যারা কি শোচনীয় অবস্থার মধ্যেই না তাদের অভিশপ্ত জীবনের অস্তিত্বটুকু টেনে নিয়ে চলেছে! নানা দিক থেকে সম্প্রতি চেষ্টা চলেছে বটে এ দেশের নারীজাতির অনন্ত দুঃখ-দুর্দ্দশা কতকাংশে মোচন করবার, কিন্তু সে কেবল নিশীথের অন্ধকার আকাশে কালো মেঘের কোলে প্রভাতের ঈষৎ আলোর রেখাটুকুর মত ক্ষীণ! অবস্থা এখনও সেই যে তিমিরে সেই তিমিরে!

একমাত্র আশার কথা এই যে, আমাদের মেয়েরা এইবার ধীরে ধীরে তাঁদের সকরুণ অবস্থা সম্বন্ধে ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠছেন। নিজেদের দুর্দ্দশা যেদিন তাঁরা সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন, তাঁদের মুক্তির সন্ধানও সেদিন আর সুদূর বা অজ্ঞাত থাকবে না।

অতি অল্পবয়সে মেয়েদের বিবাহ দিয়ে ভারতবর্ষ যে শুধু সভ্যজগতের নিকট নিন্দাভাজন হ'য়ে প'ড়েছে তাই নয়, বাল্য-বিবাহের কু-প্রথার জন্য আমাদের সমগ্র জাতিকে দীর্ঘকাল ধরে গুরুদণ্ড ভোগ করতে হচ্ছে!

বালবিধবার ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যা যেমন একদিকে আমাদের কলঙ্ক ও লজ্জা বাড়িয়ে চলেছে—তেমনি পঙ্গু বিকলাঙ্গ দুর্ব্বল ও ক্ষীণপ্রাণ শিশুর জন্মের হারও আমাদের দেশেই সব চেয়ে বেশী। অল্প-বয়স্কা প্রসূতির মৃত্যুও আমাদের ঘরে ঘরে যেন সংক্রামক ব্যাধির মতই বৃদ্ধি পাচ্ছে! তবে পারিবারিক কল্যাণের দিক দিয়ে—বাল্য-বিবাহের স্ব-পক্ষে বলবারও কিছু আছে। এ দেশের মেয়েরা বিবাহের পরই শ্বশুরবাড়ী গিয়ে বাস করে! সে কেবলমাত্র তার পতিগৃহ নয়; সেখানে শ্বশুরশাশুড়ী, হয় ত বা দাদাশ্বশুর দিদিশাশুড়ী, স্বামী, দেবরগণ, ননন্দারা, স্বামীর খুল্লতাত ও পিতৃস্বসা প্রভৃতিও আছেন। এই বৃহৎ পরিবারের বধূ হয়ে অল্প বয়সেই তারা আসে। যে বয়সে আসে তখন মন থাকে তাদের কচি। শ্বশুরবাড়ীর হালচাল, সেখানকার রীতিনীতি পদ্ধতি ও জীবনযাত্রাপ্রণালীর সঙ্গে পরিচিত হ'তে হ'তে তাদেরই সংসারের একজন হয়ে সে বেড়ে ওঠে। তারা স্বামীকে শুধু ভালবাসতেই শেখে না, ভক্তি করতে এবং শ্রদ্ধা করতেও শেখে। স্বামীর আত্মীয়-স্বজন পরিবার ও কুটুম্বদের আপনজন ব'লে গ্রহণ করতে শেখে। স্বামীর ভাই-বোনেদের সঙ্গে সহোদরার মত একটা মধুর স্নেহের সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে পড়ে! শ্বশুরশাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনদের সেবা ও পরিচর্য্যায় আনন্দ পায়। তাদের আশীর্ব্বাদ, প্রীতি ও ভালবাসাকে সে জীবনের মস্ত বড় সহায়, সম্পদ ও সৌভাগ্য বলে বিবেচনা করতে শেখে।

এমনি ক'রেই ছোট্ট মেয়েটি শ্বশুরগৃহে এসে বড় হয়ে উঠতে থাকে তার পারিপার্শ্বিকীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে দৈনন্দিন জীবনের নিত্যতালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। তার কোনো দিনই মনে হয় না, সে এ বাড়ীর কেউ নয়, সে এখানে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে! অথবা এ কথাও সে কোনো দিনই ভাবতে পারে না যে, তার স্বামীটি একমাত্র তারই সম্পত্তি। স্বামীর উপার্জ্জনে

একমাত্র তারই অধিকার, স্বামী ছাড়া আর সকলেই তার কাছে নিতান্ত পর!

হিন্দুবিবাহের যে আদর্শ—হয় ত তার নানা দোষত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু একথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে যে, অন্য কোনো ধর্ম্ম-বিবাহই এরচেয়ে ত্রুটিহীন নয়। পাশ্চাত্য প্রগতি হয় ত অনেক বিষয়েই জগতকে আজ অগ্রবর্ত্তী ক'রে দিয়েছে। কিন্তু পারিবারিক সুখ-শান্তি মাধুর্য্য ও আনন্দ সে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেনি।

প্রতিদিন পত্নীর নানা প্রয়োজনীয় বিলাস-উপকরণ সংগ্রহের ব্যয়ভার বহনে কাতর স্বামীর শোচনীয় মানসিক অবস্থা, স্ত্রীর বহির্মুখী মনের নিয়ত একটা উত্তেজিত ভাব, অপর পক্ষের অপেক্ষা নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান ও ব্যক্তিত্বের অহঙ্কার শেষ পর্য্যন্ত ও দেশের পারিবারিক শান্তি বিনষ্ট ক'রে বিবাহবিচ্ছেদের কারণ ঘটায়। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সামাজিক সুযোগ সুবিধার দিক দিয়ে ওদেশের বিবাহ-প্রথা যতই উচ্চতর হোক না কেন পারিবারিক সুখশান্তির স্থান নেই সেখানে।

ভারতবর্ষের মেয়েরা কোনো একটি বিশেষ মানুষকে বিবাহ করে না, তারা বরমাল্য দেয় তাদের আশৈশবের আদর্শ ও ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতীক—স্বামীকে। ছেলেবেলা থেকেই তারা মনের মধ্যে পতিদেবতার একটা আদর্শ গড়ে তোলবার সুযোগ পায়। কল্পনায় সকল সদ্‌গুণের অধিকারী ব'লে মনে করে তারা স্বামীকে—স্বামী যথার্থই তার ভক্তিশ্রদ্ধা ও প্রেমের যোগ্য কি-না সে বিচারের কোনো প্রয়োজনই বোধ করে না তারা—তাদের মনের সেই নৈর্ব্যক্তিক আদর্শের প্রতি যে গভীর প্রেম ও অনুরাগ সঞ্চিত থাকে, হিন্দুবিবাহে স্বামী সহজেই তা পত্নীর কাছে লাভ করে। এর জন্যে তাকে কোনো কৃচ্ছ সাধন করতে হয় না।

আপাতদৃষ্টিতে এ ব্যাপারটাকে যদিও একান্ত কৃত্রিম হাস্যকর অস্বাভাবিক ও অন্যায় বলে মনে হয়, কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, এর একটা অন্তর্নিহিত গভীর অর্থ আছে। এ এক প্রকার আত্ম-দানের সাধনা! নিজেকে এইভাবে জীবনের একটি আদর্শের উদ্দেশে উৎসর্গ ক'রে দেওয়ার ফলেই আমাদের মায়েরা মেয়েরা, স্ত্রী ও ভগ্নীরা মানসিক ঐশ্বর্য্যে ও মাধুর্য্যে মহিয়সী হয়ে ওঠেন। সংসারে হয় ত তাঁরা অনেক স্থলেই নির্য্যাতিতা লাঞ্ছিতা ও অপমানিতা হ'ন, তাঁদের মহৎ অন্তরের ত্যাগ, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার সুযোগও নেয় জানি একাধিক অক্ষম ও নির্ম্মম স্বামী—কিন্তু এর ফলে তাঁদের চিত্তবৃত্তির বিকৃতি না ঘ'টে বরং অধিকতর আত্মোন্নতি ও মনের প্রসারতা লাভ হয়। এঁদেরই কাছে আমরা শিখি নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের মহিমা, প্রেম ও ক্ষমার অতুলনীয় আদর্শ, তাই আমরা এঁদের শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি, এঁদের সম্মান করি।

শিশুই গৃহের শোভা ও আনন্দ বর্দ্ধন করে। নরনারীর রহস্যময় সম্বন্ধ যথার্থ প্রেমে পরিণত হয়। পিতা সারাদিন কাজ করে বটে কিন্তু তার মন পড়ে থাকে সেই কুটীরখানিতে যেখানে তার বড় স্নেহের শিশু সন্তান অধীর আগ্রহে অপেক্ষা ক'রে আছে তার সুমিষ্ট আধ আধ ভাষায় 'বা-বা' বলে ডেকে তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য—আর শিশুর জননী দাঁড়িয়ে আছেন পথ-চেয়ে দুয়ারের কাছে তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা ক'রে নেবার জন্যে। দুটি চোখে তার সে কি ব্যগ্র কোমল মধুময় স্নিগ্ধ চাহনি! সারাদিন জননী তাঁর শিশুটিকে ও গৃহকর্ম্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। দেবমন্দিরের মত তিনি বাসগৃহকে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন, প্রিয়তমের জন্য স্বহস্তে বিবিধ সুখাদ্য প্রস্তুত করেন। দিনের সকল কর্ম্ম সাঙ্গ হ'লে নিজের প্রসাধন শেষ ক'রে স্বামীর অভ্যর্থনার জন্য তাঁর গৃহ-প্রত্যাগমের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকেন, সামান্য পদশব্দে সচকিত হয়ে ওঠেন—ঐ বুঝি তিনি আসছেন। কি মধুর, কি প্রীতিপ্রদ সে প্রতীক্ষা!

নারী—প্রেমের জীবন্ত প্রতিমা। স্বামীপুত্র তার প্রাণ! ওদের জন্য সে না পারে এমন কাজই নেই! পৃথিবীতে ওদের বাড়া তার কাছে আর কেউই নয়।

এদেশের মেয়েরা শুধু স্ত্রী নয়, সে গৃহিণী, সখী, সচিব, মিত্র, প্রিয়শিষ্যা। দুঃখের দিনে বিপদের দিনে অভাবের দিনে যখন সবাই আমাদের ছেড়ে চলে যায়—সে থাকে পাশে পাশে সকল দুঃখের অংশ নেবার জন্যে! সকল কষ্ট নিজের উপর নিয়ে স্বামীপুত্রকে সে প্রাণপণে দুঃখের আড়ালে রাখতে চেষ্টা করে।

পারিবারিক জীবনের শান্তিপূর্ণ সঙ্গতির মধ্যে বেসুরো কিছু নিয়ে আসার মত নিষ্ঠুরতা আর নেই। সংসারে

জননীর স্থান সবার চেয়ে বড়। স্ত্রীলোক সমাজ ও পরিবারের অধিকতর কল্যাণ সাধন করতে পারে পত্নী ও জননী রূপেই। কেরাণী, টাইপিস্ট, টিকিট-বিক্রেতা, টেলিফোঁ গার্ল ইত্যাদি জীবিকা-অর্জ্জনের কাজে তাকে নিয়োগ করা মানেই সমাজ-ব্যবস্থার একটা ওলোট-পালট করা। এ ব্যবস্থায় স্বামী-পুত্র-সংসার কারুরই মঙ্গল হয় না। স্ত্রীও তার জীবনের পরিপূর্ণ আনন্দ লাভে বঞ্চিত থাকে। সংসারে স্বামীর চেয়ে স্ত্রীর দায়িত্ব বেশী। সমস্ত সংসারের হাল ধরে থাকে সে-ই! তারই তত্ত্বাবধানে সংসারের শৃঙ্খলা বজায় থাকে, সন্তানের শিক্ষা ও চরিত্র-গঠনের ভার মায়েরই উপর।

জাতির ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা নির্ভর করছে যে জননীর উপর, দেশের আদর্শ বীরপুরুষ সম্ভব হ'তে পারে যাঁদের চেষ্টায় ও যত্নে, সংসারে নারীর সেই মহিয়সী মাতৃরূপই অধিকতর কাম্য—না জীবিকার্জ্জনের জন্য কোন একটা বৃত্তি অবলম্বন ক'রে জীবনের অধিকাংশ সময় তাঁদের সংসারের বাইরে থাকাই বাঞ্ছনীয়?

কিন্তু, 'পুরাতন নিয়মের পরিবর্ত্তন হয়।' মহাকবি টেনিসন বলেছেন—"নূতনের জন্য তাকে স্থান ছেড়ে দিতে হয়। ভগবান নানা উপায়ে তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ করেন—একই সুনিয়মে দীর্ঘকাল চললে ধরণীর নীতি ভ্রষ্ট হ'য়ে পড়তে পারে।" পৃথিবীর পরিবর্ত্তন খুব দ্রুত সাধিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন রীতিনীতিপদ্ধতি সমস্তই উল্টে পাল্টে যাচ্ছে। কে জানে এ নব জীবনের লক্ষণ, না ধ্বংসের সূচনা! তবে নানা দিকে এর বিচিত্র বিকাশ ও অভিব্যক্তি সম্বন্ধে সকলেই আজ সচেতন! নারী আজকের দিনে শুধু কেবল তার জননী ও পত্নীর মর্য্যাদা নিয়েই পরিতুষ্ট থাকতে পারছে না। সে চায় সকল বিষয়ে আজ পুরুষের সমকক্ষ হ'তে। সমষ্টিগত সুখশান্তির চেয়ে আজ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও পূর্ণ-স্বাধীনতা তাদের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। স্ত্রী আজ আর স্বামীর সহধর্ম্মিণী নয়, সংসারের সর্ব্বেসর্ব্বা গৃহকর্ত্রী নয়, সে আজ পুরুষের জীবনে মাত্র একজন সম-অংশীদার; সে রাজনীতির বড় বড় কথা কয়, পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে মাথা ঘামায়, ওলিম্পিক গেম্‌স্, আর্ট এক্‌জিবিশন, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ও ইতিহাস, এমন কি সমাজ-বিজ্ঞান ও সুপ্রজনন সমস্যারও আলোচনা করে। আবার রেডিয়ো এবং সিনেমা না হ'লেও তার দিন যেন অচল!

নারীর জীবনে এই যে আজ অতি আধুনিক বিপ্লববাদের প্রবল তরঙ্গ এসে ধাক্কা দিয়ে তার সমস্ত কিছু ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে, একে বাধা দিয়ে ঠেকাতে পারে এমন কোনো শক্তি নেই আজ পৃথিবীর কোনো দেশে। ভালই হোক্, আর মন্দই হোক্, এ প্রবাহ বন্ধ হবে না। এর গতি রোধ করবার চেষ্টা করলে শুধু ব্যক্তিগত জীবনেই নয়, সামাজিক জীবনেও নানা বিরোধের সৃষ্টি হবে। শিক্ষার প্রসার এবং আন্তর্জাতিক সংযোগ সম্ভব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারীর আত্মচেতনা বা আত্মোপলব্ধি—একটা স্বাতন্ত্র্যবোধ বা স্বকীয়তা এবং অর্থ ও জীবিকা-সম্পর্কে নিজের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তাকে সংসারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে টেনে বাইরের বিশাল ক্ষেত্রে দাঁড় করিয়েছে।

পুরুষের সঙ্গে কাজের প্রতিযোগিতায় মেয়েরা ওদেশে রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু করে দিয়েছেন। অনেক স্থলে পুরুষদের একেবারে হঠিয়েও দিয়েছেন। বিশেষ ক'রে শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এটা প্রায়ই দেখা যায়। সমস্ত কারখানাগুলোরও অধিকাংশ বিভাগ একেবারে সম্পূর্ণই মেয়েদের অধিকারে। এ ছাড়া, টাইপিস্ট, টেলিফোন অপা-রেটর, স্কুলের ছেলেমেয়েদের শিক্ষয়িত্রী, বুকিং ক্লার্ক, দোকানের কর্ম্মচারীর মধ্যে কোথাও আর পুরুষের স্থান নেই। শিল্পী হিসাবে, সাংবাদিক হিসাবে, বিমান-পরিচালক ও মোটর-চালক-হিসাবে, এমন কি পুলিশ-সার্জ্জেন ও সৈনিকের কাজেও তাঁরা পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। অধিকাংশ ব্যাঙ্ক, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ্ এবং রেলওয়ে প্রভৃতি সরকারী ও বেসরকারী অফিসে কেরাণীর কাজে মেয়েরাই অধিকতর যোগ্যতা দেখাচ্ছেন।

পৃথিবীর অনেক দেশে, যেখানে অতি-আধুনিকতারই জয়জয়কার, সেখানে মাতৃত্ব বা জননীর গৌরব লাভের জন্য আর মেয়েদের বিবাহ-বন্ধনের অধীন হ'তে হয় না। মেয়েরা সেখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল। যাকে খুশী তারা ভালবাসতে পারে, যে কোনো মনোমত পুরুষের সঙ্গ ও সাহচর্য্যে তাদের কোনই বাধা নেই, তারা সন্তানও প্রসব করে কিন্তু মায়ের দায়িত্ব নেয় না। রাষ্ট্রীয় শিশু-সদনে তাদের পাঠিয়ে দেয়। সরকারী ব্যয়ে ও সরকারের

তত্ত্বাবধানে তারা প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হয়। গৃহমুক্ত, সংসারের ভারমুক্ত ও পরিবারের দায়মুক্ত মেয়েরা আনন্দে স্বৈরাচারে দিনযাপন করে। ইহকালের পুণ্যফলে, পরকালে স্বর্গলাভের লোভ নেই—পাপের ভয়ে নরক ভোগেরও আতঙ্ক নেই এতটুকু কোথাও তাদের মনে। কারণ দেশের আইনে এসব বিশ্বাস করতে তাদের মানা!

জীবনের এই যে আর একটা দিক, হয় ত কালে সমস্ত পৃথিবীর মেয়েই এর প্রভাবে অভিভূতা হয়ে পড়বে। এটা ভাল কি মন্দ তা নিয়ে সমালোচনা ক'রে কোনো লাভ নেই, কারণ যা ঘট্‌বার তা ঘটবেই! অতি-আধুনিকতার মোহ এবং তার চুম্বকের মত প্রবল আকর্ষণী শক্তির প্রভাব থেকে নারীকে বর্ত্তমান যুগে রক্ষা করা অসম্ভব।

আমি একালের মেয়েদের জীবনযাত্রাপ্রণালীর দোষ-গুণ বিচার করতে বসিনি, বা তাদের হাল আমলের হালচালের নিন্দা করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। নারী-প্রগতির এই নব-জাগরণকে দূর থেকে লক্ষ্য ক'রে আমি শুধু মানস-চক্ষে প্রত্যক্ষ করতে চাই যে এর ফলে আমাদের অবস্থা কি দাঁড়াবে, সমাজগত সুপ্রজননের দিক থেকে এর পরিণাম কি হবে?

স্যার ফ্রান্সিস্ গ্যাল্টন এই সুপ্রজনন বিধি সম্বন্ধে বলেছেন যে, এটা সমাজের শাসনাধীন এমন একটা ব্যবস্থা—যার ফলে জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরগণের দৈহিক ও মানসিক উন্নতি বা অবনতি সহজে সাধিত হ'তে পারে। সুপ্রজনন বিধি শুধু একটা অনুশীলন যোগ্য বিদ্যামাত্র নয়, এ প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতির উচ্চাকাঙ্ক্ষা-পূর্ণ সামাজিক আদর্শকে ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠেছে এবং উদ্দেশ্য আর অন্য কিছু নয়—জাতীয় উন্নতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন ক'রে তোলা, তাদের মনে পিতৃত্বের ও মাতৃত্বের একটা গুরু দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেওয়া এবং তাদের নিজেদের যা-কিছু শৌর্য্য বীর্য্য বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতি সদ্‌গুণ তা বংশ পরম্পরায় উত্তর-বংশীয়দের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে যাবার একটা আগ্রহ বা প্রবৃত্তিকে প্ররোচিত করা।

বিষয়টাকে দুদিক থেকে দেখা যায়—যেমন, একটা হ'চ্ছে 'মুখ্য প্রজনন' (Positive Eugenics), অর্থাৎ যেটার কাজ শুধু নির্দ্দোষ ও সুস্থ স্বগোষ্ঠীর উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা—তাদের ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখা ও তার ক্রমোন্নতি সাধন করা। আর একটা দিক হচ্ছে—'পরোক্ষ প্রজনন' (Negative Eugenics) অর্থাৎ যার কাজ হচ্ছে দুষ্ট ও অসুস্থ বংশের বৃদ্ধিকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত ক'রে তার প্রসার ক্রমশ হ্রাস করা।

একথা আমরা সকলেই জানি বোধ হয় যে দেহে মনে সুস্থ সবল বুদ্ধিমান ও সমাজের কল্যাণসাধনে সক্ষম নরনারীর মিলনই আদর্শ পরিণয় এবং তাদের পরিবার তিন-চারটি ছেলেমেয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাই ভাল; কিন্তু 'জানি' বললেই ত হয় না, মানি কই আমরা এ নিয়ম? আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সুপ্রজনন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কতটা অভিজ্ঞ ছিলেন জানি না, কিন্তু তাঁদের প্রবর্ত্তিত যে বিবাহ-বিধিকে বর্ত্তমান যুগের ছেলেমেয়েরা বর্ব্বর যুগের অসভ্য প্রথা বলে ঘৃণা করে, তার মধ্যে বংশ বা গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠধারা এবং পারিবারিক স্বাস্থ্য নির্দ্দোষ ও অক্ষুণ্ণ রাখবার একটা প্রয়াস বিদ্যমান ছিল। তাঁরা পাত্র-পাত্রীর ঘর-বর-বংশ-কুল-পারিবারিক ঐতিহ্য ও সামাজিক মর্য্যাদা বিচার করে সৎপাত্রের জন্য সুকন্যা নির্ব্বাচন করতেন। এ প্রথা এখন কুসংস্কার বলে গণ্য!

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ বা গর্ভ-নিরোধ প্রথাটাকে এখনও অনেকে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতে পারেন নি। এর স্বপক্ষের চেয়ে বিপক্ষের দলই সংখ্যায় বেশী। 'জন্ম-নিয়ন্ত্রণ'—অর্থাৎ 'Birth Control' কথাটাই দুর্ভাগ্যক্রমে একটা অতি নিরর্থক অপশব্দ! এর প্রকৃত অর্থ অনেকেই বোঝেন না! 'Birth Control' বা জন্ম-নিয়ন্ত্রণ মানে কেবলমাত্র গর্ভ-নিরোধ বোঝায় না। 'Birth Control' বলতে তিনটে জিনিস বোঝায়—Proception অর্থাৎ গর্ভ-ধারণের অনুকূল ব্যবস্থা, Contraception অর্থাৎ গর্ভ-ধারণের প্রতিকূল ব্যবস্থা এবং Geroception অর্থাৎ গর্ভধারণ সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবধানের ব্যবস্থা। গর্ভ-নিরোধের চেয়ে গর্ভধারণের ব্যবস্থা অর্থাৎ Proception কোনো অংশে কম প্রয়োজনীয় নয়। অনেক মেয়ে দেখতে পাওয়া যায়—যারা চিকিৎসকদের বহু যত্ন চেষ্টা ও ব্যবস্থা সত্ত্বেও সন্তানবতী হবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকে। শোনা যায়, কৃত্রিম উপায়ে জরায়ুর মধ্যে ভিন্ন বীর্য্য সঞ্চারের দ্বারা বহু অপুত্রক নারীকে মাতৃত্বের মর্য্যাদা দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু এদেশের মেয়েরা আজীবন অপুত্রক থাকবে, তবু এ উপায়ে সন্তান লাভে

সম্মত হবে না। কাজেই চিকিৎসক হিসাবে এদিকে আমার অভিজ্ঞতা লাভের এখনও কোনো সুযোগ হয়নি। মহাভারতের যুগের সেই ক্ষেত্রজ সন্তান লাভের ব্যবস্থা নাকি ভারতের কোনো কোনো প্রদেশে আজও বর্ত্তমান আছে। অবশ্য এ সংবাদ কতদূর সত্য সে সম্বন্ধে আমি কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারিনে। এই যে নিঃসন্তান পত্নীকে কোনো সুস্থ সবল ও সাধু প্রকৃতির মহৎ ব্যক্তির সেবা ও পরিচর্য্যার দ্বারা সৎপুত্র লাভের জন্য অনুমতি দেওয়া হ'ত বা এখনও হয় এটা প্রত্যক্ষ সুপ্রজনন বিধির অন্তর্ভুক্ত!

আপনারা শুনে হয় ত আশ্চর্য্য হবেন যে, শতকরা পঁচিশ-জন নারীর নিঃসন্তান অবস্থার জন্য দোষী তাদের স্বামীরাই। সুতরাং ছেলেপিলে না হওয়ার জন্য স্ত্রীকে চিকিৎসা করাবার আগে প্রত্যেক চিকিৎসকের উচিত প্রথমে ভাল ক'রে স্বামীকে পরীক্ষা করা।

তারপর গর্ভনিরোধ বা Contraception. এর নানা নির্দ্দোষ উপায় আজকাল উদ্ভাবিত হয়েছে। কিন্তু গর্ভ-নিরোধের চেয়ে Geroception বা স্বেচ্ছা-সংযমের দ্বারা প্রতিবার গর্ভধারণ সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবধান রাখবার চেষ্টা—এটা সমাজের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর ও অবশ্য-প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় প্রসূতি সূতিকাগার থেকে বেরিয়ে তার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য আবশ্যকীয় একটা সময় পায়। সন্তানকেও উপযুক্ত মাতৃস্তন্য দিয়ে লালন করবার শক্তি ও সামর্থ্য প্রসূতির বজায় থাকে, যদি তার গর্ভধারণের মধ্যে একটা উপযুক্ত ব্যবধান সুনিয়ন্ত্রিত করা হয়। শুধু তাই নয়, গর্ভধারণের এই উপযুক্ত ব্যবধান রক্ষার ফলে গর্ভপাত, অকাল প্রসব বা মৃতবৎসা হবার সম্ভাবনা থাকে না; অথবা ক্ষীণ, দুর্ব্বল, পঙ্গু, অঙ্গহীন রুগ্ন সন্তান প্রসব ক'রে সমাজে দুর্ভাগাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে না। প্রত্যেকবার সন্তানপ্রসবের পর পুনরায় গর্ভধারণের মধ্যে প্রত্যেক মাতার অন্তত তিন-চার বৎসর কাল ব্যবধান পাওয়া একান্ত আবশ্যক।

যে সকল পিতার সন্তানকে উপযুক্ত-ভাবে লালন-পালন ও শিক্ষাদানের সামর্থ্য নেই, তাদের পিতা হবার কোনো অধিকারই নেই। কোনো নিরপরাধ শিশুকেই এই কঠিন পৃথিবীর বুকে টেনে নিয়ে আসা তাঁদের উচিত নয়। এক্ষেত্রে Contraception বা গর্ভনিরোধের ব্যবস্থা সকল দিক দিয়েই কল্যাণকর। সুস্থ ও অভাবমুক্ত জাতির অস্তিত্ব এই পৃথিবীতে সম্ভব হতে পারে আজ একমাত্র এই Contraception বা গর্ভনিরোধের উপায় অবলম্বনে।

জগতের লোকসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ভারতের জনগণনার হিসাব থেকে যা জানা যায়, তাতে আশঙ্কা হয় যে এইভাবে লোকসংখ্যা বেড়ে চললে অদূর ভবিষ্যতে ভারতে আর ভারতবাসীর অন্ন ও আশ্রয় মিলবে না। ত্রিবিধ উপায়ে এই অতিরিক্ত লোকসংখ্যা হ্রাস পেতে পারে। এক যুদ্ধের ফলে, দ্বিতীয় সংক্রামক রোগের আক্রমণে, তৃতীয় জন্ম-নিয়ন্ত্রণের দ্বারা। জ্ঞানে বিজ্ঞানে অগ্রসর উচ্চশিক্ষিত সুসভ্য য়ুরোপ ঘন ঘন বিরাট যুদ্ধের ফলে তাদের জনসংখ্যার সমতা রক্ষা ক'রে আসছে। ভারতবর্ষ টিকে আছে নানা কঠিন ও সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ নরনারী বিনষ্ট হয়ে। আমেরিকা জন্ম-নিয়ন্ত্রণকে আশ্রয় করেছে।

আমার মনে হয়, কোনো সুস্থপ্রকৃতির স্বাভাবিক বুদ্ধিবিবেচনাযুক্ত মানুষই দেশের অতিরিক্ত লোকসংখ্যা কমাবার জন্য তাদের লড়াইয়ে ধ্বংস বা রোগে বিনষ্ট হওয়াই উপযুক্ত বলে মানতে পারবেন না। আমরা য়ুরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির নামে পুলকে উত্তেজিত হয়ে উঠি, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রশংসায় আমরা পঞ্চমুখ! সাদাচামড়া মানুষ-গুলোকে আমরা মনে মনে যথেষ্ট ভয় ও ভক্তি করি; ওদের নানা গুণের আলোচনায় আনন্দে হয় ত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি। অবশ্য ওদেশে এমন সব মহামনীষী জন্মেছেন যাঁদের পায়ে পৃথিবীর মাথা নত হয়ে পড়ে! শেক্স্‌পীয়র, হাক্স্‌লে, আইনস্টাইন্, শোপেনহৌর, গ্যেটে, ডারউইন, নিউটন—কত নাম করবো! এমন হাজার জ্ঞানী গুণীর সন্ধান পাই আমরা ওদেশে। কিন্তু যখন দেখি দীর্ঘদিনের সাধনালব্ধ বিজ্ঞানকে ওরা মানুষ মারার অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে সুরু করেছে, ধ্বংস করছে নিরীহ প্রতিবেশীর সমৃদ্ধ প্রদেশ—সুদৃশ্য নগর, তাদের ধন প্রাণ গৃহ মন্দির—নির্দ্দোষ নিরপরাধ ভাইবোনেদের নৃশংস ভাবে বিনাশ করছে, নিজেদের পরস্বাপহরণ প্রবৃত্তি ও দুর্দ্দমনীয় লোভ চরিতার্থ করবার জন্য—তখন ওদের নির্ব্বোধ ও হতভাগ্য না বলে থাকতে পারিনে!

য়ুরোপ যখন এইভাবে পরস্পরকে পশুর মত হত্যা

করতে ব্যাপৃত, তখন আমরা এই দীনহীন ভারতবাসীরা ভীরু নিরুপায়ের মত দলে দলে রোগের কবলে প্রাণ হারাচ্ছি। কেমন ক'রে বেঁচে থাকতে হয় আমরা তা জানিনে! কেমন ক'রে জীবন-উপভোগ করতে হয় তাও আমাদের অজ্ঞাত। আমরা কাউকে কিছু দিতেও পারিনি—নিতেও পারিনি। ত্যাগেও অক্ষম, ভোগেও অশক্ত! আমার আজকের বক্তব্য অবশ্য এ নয় যে, মানুষ কি ভাবে জীবন যাপন করলে সুস্থ ও নীরোগ দেহে দীর্ঘায়ু ভোগ করতে পারে;—তবু শ্রীযুক্ত রকফেলার এ সম্বন্ধে যে মূল্যবান উপদেশ দিয়েছিলেন সেটা এখানে উল্লেখ করবার লোভ সংবরণ করতে পারছিনে। তিনি বলেছিলেন, যদি সুস্থদেহে শতায়ু হ'য়ে বেঁচে থাকতে চাও তাহলে মিতাহারী হও, পর্য্যাপ্ত নিদ্রা যাও, লঘু ব্যায়াম অভ্যাস করো এবং কখনো কোনো মানসিক কষ্ট বা উৎকণ্ঠাকে প্রশ্রয় দিও না।

দেশের লোকসংখ্যা একটা নির্দ্দিষ্ট অঙ্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বর্ত্তমানে প্রত্যেক আধুনিক সুসভ্য জাতির প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে কয়েকটা কার্য্যকরী উপায়ের আলোচনা ক'রে আমার বক্তব্য শেষ করব।

গর্ভনিরোধ অথবা গর্ভধারণের মধ্যে দীর্ঘ-ব্যবধান রক্ষা যে স্ত্রীসহবাস সম্পূর্ণ বর্জ্জনের দ্বারা অনায়াসে সম্ভব হ'তে পারে এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কোন পক্ষের সংযমের অভাব থাকলে অন্তত ঋতুকালের পর তিন সপ্তাহ সহবাস বন্ধ রাখা কর্ত্তব্য। অথবা সহবাস কালে এমনভাবে সতর্ক থাকা উচিত যাতে রেতঃপাত জরায়ুমুখে না হ'য়ে বাইরে হয়। এ ব্যবস্থাও যেখানে দুঃসাধ্য বলে মনে হবে সে স্থলে পেসারী বা কোন রসায়নিক পদার্থের সাহায্য নেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত স্বামীরা স্বার্থপরের মত এ বিষয়ে একেবারেই দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত অসাবধান।

স্ত্রীসহবাস সম্পূর্ণ বর্জ্জন ক'রে বিবাহিত ব্যক্তিদের ব্রহ্মচর্য্য পালন করবার উপদেশ আমি দিতে চাই না। সেটা দেবেন মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষেরা—যাঁরা গর্ভনিরোধের কোনও প্রকার বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করাকে পাপাচরণ বলে মনে করেন। ঋতুকালের অব্যবহিত পরের দু-তিন সপ্তাহ বাদ দিয়ে স্ত্রীসহবাস করা অনেকটা নিরাপদ। এটা বহুকাল থেকে সকলেই জানেন এবং অনেকেই এ নিয়ম পালন করেন। কিন্তু কিছুদিন হ'ল এ সম্বন্ধে নানা পরীক্ষা ক'রে জানা গেছে যে 'নিরাপদ সময়' বলে যথার্থ কিছু নেই। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে এটা কার্য্যকরী হতে দেখা যায় বটে, কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই যে এ সময় সহবাসের ফলে নিশ্চিত গর্ভসঞ্চার হবে না—এ কথা জোর ক'রে বলা চলে না। তারপর দ্বিতীয় পন্থাই—বাইরে বীর্য্যপাতের ব্যবস্থা। এটা সকল স্বামীর পক্ষে সহজসাধ্য নয়। মাত্র অল্প কয়েকজনই এ বিষয়ে দক্ষতার দাবী করতে পারে। তা ছাড়া এটা নেহাৎ একপক্ষের খেলা হয়ে পড়ে। স্ত্রী এরূপ স্বামীসহবাসে তৃপ্ত হতে পারে না। ফলে শীঘ্রই তার মেজাজ হয়ে ওঠে রুক্ষ এবং শেষ পর্য্যন্ত স্নায়ুবিকারে তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। রাসায়নিক পদার্থের সাহায্য নেওয়া সম্বন্ধে মুস্কিল হ'চ্ছে এই যে, বাজারে হরেক রকমের জিনিষ বেরিয়েছে এবং তার মধ্যে বেশীর ভাগই কার্য্যকরী নয়, সুতরাং ওটা একেবারেই নির্ভরযোগ্য বলা চলে না। অতএব এখন বাকী রইল হাতে মাত্র দুটি উপায়, পেসারী ও কন্‌ডোম। মেয়েদের জন্য পেসারী ও পুরুষদের জন্য কণ্ডোম বা ক্যাপ। কিন্তু এও বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, ক্যাপ ফেটে গিয়ে বহুক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটে যায়। অবশ্য সেজন্য হয় ত কতকটা দায়ী উত্তেজিত স্বামীর গোয়ার্ত্তুমি, নয় ত সস্তার খেলো জিনিস ব্যবহার বা একই ক্যাপ একাধিকবার ব্যবহার করা। এছাড়া এই রবার আচ্ছাদন ব্যবহার করার ফলে আর একটা অসুবিধা হয় এই যে, স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই অঙ্গের প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষ ঘটে না, কাজেই সঙ্গমসুখের কতকটা হানি হয়ই। তবে ওরই মধ্যে রবার পেসারী যদি ঠিকভাবে লাগানো যায় তা হ'লে সহবাস অনেকটা নিরঙ্কুশ হ'তে পারে। কিন্তু দেখতে হবে যে, পেসারী দ্বারা জরায়ুর মুখ সম্পূর্ণরূপে ঢাকা পড়েছে কি-না। এইখানেই জন্মনিরোধবিশেষজ্ঞদের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়। কারণ, একমাত্র তারাই এ সব ব্যবহার করা সম্বন্ধে শিক্ষা, উপদেশ ও পরামর্শ দিতে সক্ষম।

উপসংহারে আমি শ্রীযুক্তা মেরী স্টোপ্‌স্ বিবাহিত দম্পতির যৌন-স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে যে সমস্ত বিধিনিয়ম নিবদ্ধ ক'রে দিয়েছেন তারই কয়েকটি মাত্র এখানে উল্লেখ করতে চাই।

১। সুস্থ প্রকৃতির সাধারণ যুবকযুবতীর পক্ষে স্বাভাবিক সহবাস স্বাস্থ্যকর।

২। মানসিক চরিতার্থতা বা আত্মতৃপ্তি এবং প্রেমানুরাগজনিত শৃঙ্গাররসোপভোগ ছাড়া সহবাসের দ্বারা দ্বিবিধ দৈহিক প্রয়োজনও সিদ্ধ হয়, যথা—সৃষ্টিরক্ষা বা নবজীবোৎপাদন অর্থাৎ জরায়ুর মধ্যে প্রথম ভ্রূণের সঞ্চার এবং সঙ্গমফলে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই স্বাস্থ্যের উন্নতি ও দৈহিক পুষ্টি সাধন।

৩। সঙ্গমের যে দুটি প্রধান বা বিশেষ কার্য্য সম্পাদন তা পরস্পর সংযুক্ত বা একাত্ম হ'লেও প্রয়োজন-বোধে বিভক্ত ক'রে নেওয়া চলে।

৪। সঙ্গমফলে যেখানে সন্তানোৎপাদনের সম্ভাবনা অনিবার্য্য সেখানে সহবাস পালনে এমন সংযম থাকা উচিত, যার প্রধান লক্ষ্য হবে মাতা ও ভাবী সন্তান উভয়ের পক্ষেই যা শুভ ও কল্যাণকর।

৫। প্রথম ও দ্বিতীয়বার গর্ভধারণের মধ্যে এমন একটা দীর্ঘ অবকাশ বা সময়ের ব্যবধান থাকা দরকার যেটা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের ব্যক্তিগত মঙ্গলেচ্ছার অনুকূল।

৬। সুস্থ সবল ও সমর্থ যুবকযুবতীর পক্ষে সঙ্গম ফলে সন্তানোৎপাদন বন্ধ রাখা, অথবা গর্ভধারণের মধ্যে উপযুক্ত ব্যবধান রক্ষা করার জন্য মাঝে মাঝে জন্মনিরোধের উপযোগী বৈজ্ঞানিক বিধিব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

এরপর আমার মনে হয়, শুধু এই কথা বললেই যথেষ্ট যে, বিবাহিত জীবনের শান্তি ও সঙ্গতি অক্ষুণ্ণ রাখতে কেবল মাত্র এর দৈহিক স্বাস্থ্যরক্ষার দিকটাতেই লক্ষ্য রাখলে চলবে না, মানসিক উৎকর্ষ ও আত্মিক তৃপ্তির দিকেও যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। নারীকে কেবল মাত্র গৃহের আসবাবস্বরূপ বা নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও কামনা চরিতার্থ করবার যন্ত্রস্বরূপ মনে করলে চলবে না। সর্ব্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে স্ত্রী তোমার সহধর্ম্মিণী, তোমার জীবনের সকল কার্য্যের সুযোগ্যা সঙ্গিনী। তবেই সুসন্তান লাভের সৌভাগ্য হতে পারে।

ব্যথার পূজা

শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

তরুশীর্ষে শিহরণ কম্পমান বিপুল বনানী
দোলাইছে ধরণীরে মৃদুচ্ছন্দে মধু সমীরণ—
'শরৎ আসিল পুনঃ' এই বার্ত্তা করে কানাকানি
যেন কার আবাহনে হিল্লোলিছে দূরে বেনুবন।

কাশ-পলাশের বনে শাল পিয়ালের রূপশোভা
শ্রীহীন গ্রামেরে যেন দিল রূপ সহজ শোভায়—
গ্রামে ছিল হাসি গান রূপ রস প্রাণ মনোলোভা
সে প্রাণ চলিয়া গেল—কাটে দিন বিফল আশায়।

এখনো পল্লীরে ঘেরি বেজে ওঠে সন্ধ্যার আরতি
গলায় আঁচল দিয়া জালে বধূ সাঁঝের প্রদীপ—
সুদূর তাহার আশা বুঝি আজ হবে ফলবতী
তাই সে জাগিয়া রয় মনঃকুঞ্জে ফুটাইয়া নীপ।

শরৎ আসিল পুনঃ হাসে বধূ চিরন্তনী প্রিয়া—
বুকের ব্যাকুল বন প্রিয়তরে উঠিছে ব্যাপিয়া।

সঙ্গীত

কথা, সুর ও স্বরলিপি ঃ—শ্রীদিলীপকুমার রায়

তাল—চতুর্মাত্রিক ছন্দ—কার্ফা'র ঠেকায় গেয়।

উধাও

(গান)

অকূলে সদাই চলো ভাই ছুটে যাই,
ভালোবেসে বাঁশি-রেশে ডাকে যে সে ঃ "ভয় নাই"

(কোরাস)

ধাও প্রাণ, গাও গান বরদান এই চাই
কূল ছাড়ি' যেন তারি অভিসারী তরী বাই
ধাও প্রাণ…গাও গান…ছুটে যাই…তারি ঠাঁই

রঙিন মেলার বাসনায় উছলি'
শুনি হায় আলেয়ায় ধ্রুবতারা মুরলী
ধাও প্রাণ…ইত্যাদি

অপার-বিজয় বরাভয় স্বনিল
হৃদি-তারে ঝংকারে সে-রাগিণী রণিল।
ধাও প্রাণ…ইত্যাদি

উধাও ধাও, নাও বাও, প্রাণ গাও গান, ছুটে যাই তারি ঠাঁই।

\+ ° + ° +
II সা রা গা মা | পা -া সা সা | ধা -া মা ধা | পা -া পা পা | পধপপা মা গা মা |
অ কূ লে স দা ই চ লো ভা ই ছু টে যা ই ভা লো বে সে বাঁ শি

° + ° +
মপমমা গা রা গা | গপমগা রা ধ্‌া ন্‌া | সা -া পা পা | প্‌া প্‌া ধ্‌া ন্‌া |
রে শে ডা কে যে সে ভ য় না ই ধা ও প্রা ণ গা ও

° + ° +
সা -া গা পা | র্সা নর্সা না ধা | পা -া পক্ষা পা | পধপপা মা গা মা |
গা ন ব র দা ন এ ই চা ই কূ ল ছা ড়ি যে ন

শিল্পী—লালা বরদাপ্রসন্ন দাস

অশোক সিংহলে বোধিবৃক্ষের চারা পাঠাইতেছেন

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

মপমমা গা রা গা । গপমগা রা ধ্‌া ন্‌া । সা -া -া -া ॥ ন্‌সা রগা মগা রসা ।
তা রি অ ভি সা রী ত রী বা ই - - ধা - - -ও

ন্‌সা রগা পা -া । ক্ষাপা ধমা র্সনা ধপা । ক্ষানা ধক্ষা পা -া । ক্ষাক্ষা পপা ধধা পপা ।
প্রা - - ণ গা - - -ও গা - - ন ছু - টে -

ক্ষাক্ষা মমা গগা -া । রগা মপা গমা পধা । পমা গরা সা -া । II
যা - - ই তা - রি - ঠাঁ - - ই

সা গা রা মা । গা পা ক্ষা ধা । পধা পপা পগা মা । গা -া গা পা ।
র ঙি ন মে লা য় বা স না -য় উ ছ লি - শু নি

গপধনা র্সর্সা ধনা ধণধা । পক্ষা পা পধা পধা । গপা গপা পা মা । গা -া পা -া ।
হা য় আ লে য়া য় ক্র ব তা রা মু র লী - ধা ও

"প্রাণ গাও গান……বাই" গাহিয়া এই তান :—
র্সা না ধা পা । ক্ষা গা রা সা । সসা ধ্‌া গা রা ।
ধা - - ও প্রা - - ণ গা - - ও

পপা গা না ধা । ক্ষধা পা পনা ধা । র্সনা ধা ক্ষধা পা । ক্ষা ক্ষধা পা মপা ।
গা - - ন ছু - টে - যা - - ই তা - রি -

গা গমা রা রগা । সরা রগা গক্ষা ক্ষপা । পধা ধনা র্সনা ধনা । পধা পক্ষা গক্ষা পধা ।
ঠাঁ - - - - - - - - - - - - - - -

নধা পক্ষা পা -া । II
- - ই -

সা সা সা সা । সরা সসা ন্‌া ধ্‌ন্‌া । প্‌া ন্‌া সা রা । গা সা সা সা ।
অ পা র বি জয়্‌ - ব রা ভ য় স্ব নি ল - হৃ দি

সধ্‌া রসা গরা মপা । পগা ধপা নধা না । র্সা নর্সা ধা পা । ধগা -া পা -া ।
তা রে ঝ ঙ্‌ কা রে সে রা গি ণী র ণি ল - ধা ও

	+				|	০			
	ন্‌ন্‌া	ররা	গগা	পা	|	গগা	পপা	ধধা	ননা |
"প্রাণ গাও গান…বাই" গাহিয়া এই তান ঃ—	উ	-	-	-		ধা	-	-	ও -

+					০					+					০				
পপা	ধধা	পপা	র্সর্সা	|	ননা	ধধা	পপা	-া	|	র্সনা	ধনা	পা	-া	|	ধপা	হ্মপা	গা	-া	|
না	-	-	-		-	-	ও	-		বা	-	ও	-		প্রা	-	-	ণ	

+					০					+					০				
রগা	মপা	ধণা	ধপা	|	মগা	রসা	ন্‌া	-া	|	ন্‌া	রা	গা	পা	|	গপা	ধনা	র্সা	-া	|
গা	-	-	-ও		গা	-	-	ন		ছু	-	টে	-		যা	-	ই	-	

+					০				
র্সা	ধা	পা	গা	|	পমা	গরা	সা	-া	II II
তা	-	রি	-		ঠাঁ	-	ই	-	

এ গানটি গ্রামোফোনে গাওয়া হয়েছে ডুয়েটে—শ্রীমতী উমা বসু গেয়েছেন আমার সঙ্গে—নানা তানও দিয়েছেন আলাদা। এ গানটির মূল সুর নেওয়া হয়েছে একটি রুষ গান থেকে—যে গানটি শিখেছিলাম আমি শ্রীমতী ধর্মবীরের কাছে—"ভূস্বর্গ চঞ্চলে" লিখেছি একথা। কিন্তু এ গানের তানাদি সবই নূতন ভঙ্গিতে প্রযুক্ত হয়েছে সেইটেই লক্ষণীয়। শ্রীমতী উমা বসুর কণ্ঠে এ গানটির গিড় ডুলকি চাল প্রভৃতি যেভাবে উঠেছে গ্রামোফোনে, সেই ঢঙই হ'ল এ গানটির শ্রেষ্ঠ ঢঙ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত আমার "সাঙ্গীতিকী" পুস্তকে মূল গানটি দ্রষ্টব্য।

ইতি—সুরকার

শরত-সখী

শ্রীবিমলাশঙ্কর দাশ

আসে জোয়ারের জল্ বেয়ে নবীন্ নেয়ে
দেখে ঘোম্‌টার ফাঁকে হাসে তন্বী মেয়ে।
হাসে জলদের ফাঁক্ দিয়ে শরত-আলো
অই অন্ধী মেয়ের মত হাস্‌ছে ভালো।
তার ঝলমল রূপ করে দীপ্ত দিশি
তার পূর্ণিমা-চাঁদ্ করে তৃপ্ত নিশি
তাই তৃপ্তিতে কেয়া-বনে থাম্‌ল' কেকা
মুছে নীপ-বনে বর্ষার অশ্রু-রেখা।

সেথা দাদুরী থামায়ে উঠে দোয়েলের গান
শ্যাম প্রান্তরে বয়ে যায় পুলকের বান।
তারি কল্লোল-রোল্ জাগে পল্লী-বাটে
কচি ধান্যের দোল্ লাগে সবুজ মাঠে।
দোলে পূর্ণা নদীটি তাই জোয়ার বেয়ে
ভরা যৌবন-ভারে যেন তন্বী মেয়ে।
তারি আঁচ্‌লার হাওয়া লাগে কমল-দলে
তারি চুল্ হ'তে ফুল্ ঝরে শিউলি-তলে।

তার সৌরভে দূর হ'ল দুঃখ যত
তাই শরতের আলো হাসে সখীর মত।

জঙ্গম

বনফুল

১২

করালীচরণ বক্‌সি নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া কোষ্ঠি-গণনা করিতেছিলেন। সম্মুখে প্রসারিত একটি কাগজের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া তিনি বসিয়াছিলেন। কাগজটিতে রাশি-চক্রের ছক টোকা। তাহার পাশেই শালপাতার ঠোঙায় কিছু তেলে ভাজা ফুলুরি পড়িয়া রহিয়াছে। বকসি মহাশয়ের কিন্তু ফুলুরির দিকে লক্ষ্য নাই, তিনি রাশিচক্রটির দিকেই নিবদ্ধদৃষ্টি। বামহস্তে একটি জ্বলন্ত সিগারেট রহিয়াছে। পারিপার্শ্বিকের অবস্থা অনেকটা পূর্ব্ববৎ। মদের বোতল এবং ফাটা গেলাস ঠিকই আছে, বোতলের মুখে গোঁজা মোমবাতিও জ্বলিতেছে। আলমারির কপাট দুইটি তেমনিই উন্মুক্ত রহিয়াছে। নূতনত্বের মধ্যে আলমারির অধিকাংশ বইই তক্তপোষের উপর স্তূপীকৃত। ঘরটাতে পুরাতন পুস্তকের গন্ধে, ধূলার গন্ধে, সিগারেটের গন্ধে ও মদের গন্ধে একটা গন্ধ-বৈচিত্র্য হইয়াছে। নূতন আসবাবের মধ্যে একটা নূতন সচিত্র ক্যালেণ্ডার টেবিলের সম্মুখে ঝুলিতেছে। ছবিটি সুন্দর। একটি নয়-দশ বৎসরের সুন্দরী বালিকা কয়েকটি ধপধপে সাদা খরগোসকে কপি পাতা খাওয়াইতেছে। এমন সুন্দর ছবিখানি কিন্তু সুন্দর ভাবে টাঙানো নাই, বাঁকাভাবে কোনক্রমে ঝুলিয়া আছে। একটি সুদীর্ঘ টান মারিয়া বকসি মহাশয় সিগারেটটি ফেলিয়া দিলেন এবং একটি পঞ্জিকা খুলিয়া তাহা হইতে কি সব টুকিয়া লইলেন ও ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সেইদিকে তাকাইয়া রহিলেন। বকসি মহাশয় যে ঘরটিতে বসিয়া-ছিলেন সেই ঘর হইতে ভিতরের দিকে যাইবার জন্য একটি ক্ষুদ্র দ্বার ছিল। দ্বারটি আলমারির পাশে কোণের দিকে বলিয়া সহসা চোখে পড়ে না। সেই দ্বারপ্রান্তে স্বল্পালোকে একটি ছায়ামূর্ত্তি আসিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া অস্পষ্ট অস্ফুটস্বরে বিড় বিড় করিয়া কি যেন বলিতে লাগিল।

করালীচরণ কাগজের উপর হইতে দৃষ্টি না সরাইয়াই বলিলেন—মোস্তাক, তুমি উঠে এলে কেন?

ছায়ামূর্ত্তি ইহার কোন উত্তর দিল না, বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে আর একটু অগ্রসর হইয়া আসিল মাত্র। অগ্রসর হইয়া আসাতে তাহার গায়ে আলো পড়িল। আলোকপাত হইলে দেখা গেল, মোস্তাক লোকটি বলিষ্ঠ ব্যক্তি কিন্তু উলঙ্গ। গায়ে বহুরকম তালি দেওয়া শতছিন্ন একটি কোট রহিয়াছে, আর কিছু নাই। মুখময় গোঁফ দাড়ি, ভাসা ভাসা চক্ষু দুইটি আরক্ত। একটু ঝুঁকিয়া সে হস্তস্থিত একটি অর্দ্ধদগ্ধ বিড়িকে লক্ষ্য করিয়াই আপন মনে কি যেন বকিয়া চলিয়াছিল। বাই নারায়ণ, মোস্তাক, তুমি উঠে এলে কেন?

করালীচরণের এক চক্ষু মোস্তাকের মুখে নিবদ্ধ হইবামাত্র মোস্তাক যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল ও তৎক্ষণাৎ মিলিটারি কায়দায় দাঁড়াইয়া স্যালিউট্ করিল। তাহার পর বিড়িটি দেখাইয়া বলিল—জুৎ পাচ্ছি না!

করালীচরণ বলিলেন, জুৎ পাবে কি করে, ও যে নিবে গেছে! সরে এসো ধরিয়ে দিই—

মোস্তাক আবার মিলিটারি কায়দায় সেলাম করিল এবং বিড়িটা মুখে দিয়া মুণ্ডটা আগাইয়া আনিল। বিড়িটি গোঁফ দাড়ির জঙ্গলে একেবারে ঢাকা পড়িয়াছে দেখিয়া বকসি মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, ও ধরাতে গেলে গোঁফ দাড়িতে আগুন লেগে যাবে। ওটা ফেলে দাও, এই নাও একটা সিগারেট নাও—মোস্তাক অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া ঘন ঘন মাথা নাড়িতে লাগিল। বাই নারায়ণ, দাও তা হ'লে, ভোগালে দেখছি—

বিড়িটি জ্বলন্ত দিয়াশলাই কাঠিতে খানিকক্ষণ ধরিয়া রাখিয়াও বকসি মহাশয় যখন দেখিলেন সেটি ধরিতেছে না তখন তিনি মোস্তাককে বলিলেন—দেখছ ত?

মোস্তাক অত্যন্ত কৌতূহল ভরে দেখিতেছিল।

বলিল, খাসা আগুন।

আগুন ত খাসা, বিড়ি ধরছে কই?

মোস্তাকও সঙ্গে সঙ্গে একমত হইয়া কহিল, জুৎ হচ্ছে না!

“প্রাণ গাও গান…বাই” গাহিয়া এই তান ঃ—

+					০				
ন্‌ন্‌া	ররা	গগা	পা	|	গগা	পপা	ধধা	ননা	|
উ	-	-	-		ধা	-	-	ও -	

+					০					+					০				
পপা	ধধা	পপা	র্সর্সা	|	ননা	ধধা	পপা	-া	|	র্সনা	ধনা	পা	-া	|	ধপা	মপা	গা	-া	|
না	-	-	-		-	-	ও	-		বা	-	ও	-		প্রা	-	-	ণ	

+					০					+					০				
রগা	মপা	ধণা	ধপা	|	মগা	রসা	ন্‌া	-া	|	ন্‌া	রা	গা	পা	|	গপা	ধনা	র্সা	-া	|
গা	-	-	-ও		গা	-	-	ন		ছু	-	টে	-		যা	-	ই	-	

+					০				
র্সা	ধা	পা	গা	|	পমা	গরা	সা	-া	II II
তা	-	রি	-		ঠাঁ	-	ই	-	

এ গানটি গ্রামোফোনে গাওয়া হয়েছে ডুয়েটে—শ্রীমতী উমা বসু গেয়েছেন আমার সঙ্গে—নানা তানও দিয়েছেন আলাদা। এ গানটির মূল সুর নেওয়া হয়েছে একটি রুষ গান থেকে—যে গানটি শিখেছিলাম আমি শ্রীমতী ধর্মবীরের কাছে—“ভূস্বর্গ চঞ্চলে” লিখেছি একথা। কিন্তু এ গানের তানাদি সবই নূতন ভঙ্গিতে প্রযুক্ত হয়েছে সেইটেই লক্ষণীয়। শ্রীমতী উমা বসুর কণ্ঠে এ গানটির মিড় ডুল্‌কি চাল প্রভৃতি যেভাবে উঠেছে গ্রামোফোনে, সেই ঢঙই হ'ল এ গানটির শ্রেষ্ঠ ঢঙ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত আমার “সাঙ্গীতিকী” পুস্তকে মূল গানটি দ্রষ্টব্য।

ইতি—সুরকার

শরত-সখী

শ্রীবিমলাশঙ্কর দাশ

আসে জোয়ারের জল্‌ বেয়ে নবীন্‌ নেয়ে
দেখে ঘোম্‌টার ফাঁকে হাসে তন্বী মেয়ে।
হাসে জলদের ফাঁক্‌ দিয়ে শরত-আলো
অই অন্বী মেয়ের মত হাস্‌ছে ভালো।
তার ঝলমল রূপ করে দীপ্ত দিশি
তার পূর্ণিমা-চাঁদ্‌ করে তৃপ্ত নিশি
তাই তৃপ্তিতে কেয়া-বনে থাম্‌ল' কেকা
মুছে নীপ-বনে বর্ষার অশ্রু-রেখা।

সেথা দাদুরী থামায়ে উঠে দোয়েলের গান
শ্যাম প্রান্তরে বয়ে যায় পুলকের বান।
তারি কল্লোল-রোল্‌ জাগে পল্লী-বাটে
কচি ধান্যের দোল্‌ লাগে সবুজ মাঠে।
দোলে পূর্ণা নদীটি তাই জোয়ার বেয়ে
ভরা যৌবন-ভারে যেন তন্বী মেয়ে।
তারি আঁচ্‌লার হাওয়া লাগে কমল-দলে
তারি চুল্‌ হ'তে ফুল্‌ ঝরে শিউলি-তলে।

তার সৌরভে দূর হ'ল দুঃখ যত
তাই শরতের আলো হাসে সখীর মত।

জঙ্গম

বনফুল

১২

করালীচরণ বক্‌সি নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া কোষ্ঠি-গণনা করিতেছিলেন। সম্মুখে প্রসারিত একটি কাগজের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া তিনি বসিয়াছিলেন। কাগজটিতে রাশিচক্রের ছক টোকা। তাহার পাশেই শালপাতার ঠোঙায় কিছু তেলে ভাজা ফুলুরি পড়িয়া রহিয়াছে। বকসি মহাশয়ের কিন্তু ফুলুরির দিকে লক্ষ্য নাই, তিনি রাশিচক্রটির দিকেই নিবদ্ধদৃষ্টি। বামহস্তে একটি জ্বলন্ত সিগারেট রহিয়াছে। পারিপার্শ্বিকের অবস্থা অনেকটা পূর্ব্ববৎ। মদের বোতল এবং ফাটা গেলাস ঠিকই আছে, বোতলের মুখে গোঁজা মোমবাতিও জ্বলিতেছে। আলমারির কপাট দুইটি তেমনিই উন্মুক্ত রহিয়াছে। নূতনত্বের মধ্যে আলমারির অধিকাংশ বইই তক্তপোষের উপর স্তূপীকৃত। ঘরটাতে পুরাতন পুস্তকের গন্ধে, ধূলার গন্ধে, সিগারেটের গন্ধে ও মদের গন্ধে একটা গন্ধ-বৈচিত্র্য হইয়াছে। নূতন আসবাবের মধ্যে একটা নূতন সচিত্র ক্যালেণ্ডার টেবিলের সম্মুখে ঝুলিতেছে। ছবিটি সুন্দর। একটি নয়-দশ বৎসরের সুন্দরী বালিকা কয়েকটি ধপধপে সাদা খরগোসকে কপি পাতা খাওয়াইতেছে। এমন সুন্দর ছবিখানি কিন্তু সুন্দর ভাবে টাঙানো নাই, বাঁকাভাবে কোনক্রমে ঝুলিয়া আছে। একটি সুদীর্ঘ টান মারিয়া বকসি মহাশয় সিগারেটটি ফেলিয়া দিলেন এবং একটি পঞ্জিকা খুলিয়া তাহা হইতে কি সব টুকিয়া লইলেন ও ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সেইদিকে তাকাইয়া রহিলেন। বকসি মহাশয় যে ঘরটিতে বসিয়াছিলেন সেই ঘর হইতে ভিতরের দিকে যাইবার জন্য একটি ক্ষুদ্র দ্বার ছিল। দ্বারটি আলমারির পাশে কোণের দিকে বলিয়া সহসা চোখে পড়ে না। সেই দ্বারপ্রান্তে স্বল্পালোকে একটি ছায়ামূর্ত্তি আসিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া অস্পষ্ট অস্ফুটস্বরে বিড় বিড় করিয়া কি যেন বলিতে লাগিল।

করালীচরণ কাগজের উপর হইতে দৃষ্টি না সরাইয়াই বলিলেন—মোস্তাক, তুমি উঠে এলে কেন?

ছায়ামূর্ত্তি ইহার কোন উত্তর দিল না, বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে আর একটু অগ্রসর হইয়া আসিল মাত্র। অগ্রসর হইয়া আসাতে তাহার গায়ে আলো পড়িল। আলোকপাত হইলে দেখা গেল, মোস্তাক লোকটি বলিষ্ঠ ব্যক্তি কিন্তু উলঙ্গ। গায়ে বহুরকম তালি দেওয়া শতছিন্ন একটি কোট রহিয়াছে, আর কিছু নাই। মুখময় গোঁফ দাড়ি, ভাসা ভাসা চক্ষু দুইটি আরক্ত। একটু ঝুঁকিয়া সে হস্তস্থিত একটি অর্দ্ধদগ্ধ বিড়িকে লক্ষ্য করিয়াই আপন মনে কি যেন বকিয়া চলিয়াছিল। বাই নারায়ণ, মোস্তাক, তুমি উঠে এলে কেন?

করালীচরণের এক চক্ষু মোস্তাকের মুখে নিবদ্ধ হইবামাত্র মোস্তাক যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল ও তৎক্ষণাৎ মিলিটারি কায়দায় দাঁড়াইয়া স্যালিউট্‌ করিল। তাহার পর বিড়িটি দেখাইয়া বলিল—জুৎ পাচ্ছি না!

করালীচরণ বলিলেন, জুৎ পাবে কি করে, ও যে নিবে গেছে! সরে এসো ধরিয়ে দিই—

মোস্তাক আবার মিলিটারি কায়দায় সেলাম করিল এবং বিড়িটা মুখে দিয়া মুণ্ডটা আগাইয়া আনিল। বিড়িটি গোঁফ দাড়ির জঙ্গলে একেবারে ঢাকা পড়িয়াছে দেখিয়া বকসি মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, ও ধরাতে গেলে গোঁফ দাড়িতে আগুন লেগে যাবে। ওটা ফেলে দাও, এই নাও একটা সিগারেট নাও—মোস্তাক অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া ঘন ঘন মাথা নাড়িতে লাগিল। বাই নারায়ণ, দাও তা হ'লে, ভোগালে দেখছি—

বিড়িটি জ্বলন্ত দিয়াশলাই কাঠিতে খানিকক্ষণ ধরিয়া রাখিয়াও বকসি মহাশয় যখন দেখিলেন সেটি ধরিতেছে না তখন তিনি মোস্তাককে বলিলেন—দেখছ ত?

মোস্তাক অত্যন্ত কৌতূহল ভরে দেখিতেছিল।

বলিল, খাসা আগুন।

আগুন ত খাসা, বিড়ি ধরছে কই?

মোস্তাকও সঙ্গে সঙ্গে একমত হইয়া কহিল, জুৎ হচ্ছে না!

মোস্তাকের হাত হইতে সহজে পরিত্রাণ পাইবার জন্য বকসি মহাশয় তখন এঁটো বিড়িটাই মুখে লইয়া টান দিয়া ধরাইয়া দিলেন ও বলিলেন, এই নাও, এইবার শোওগে যাও! কম্বলটা কোথায়?

মোস্তাক জলন্ত বিড়িটা লইয়া স্যালিউট করিয়া আলমারির পাশের সেই দরজাটা দিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। কম্বল সম্বন্ধে কোনরূপ উত্তর দিল না।

বাই নারায়ণ!

বকসি মহাশয় আবার একটি সিগারেট ধরাইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কোষ্ঠি-গণনায় মনোনিবেশ করিলেন। চতুর্দ্দিকে নীরবতা ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সহসা তিনি রাশিচক্রসমন্বিত কাগজখানা হাত দিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া দিলেন এবং বলিয়া উঠিলেন, অসম্ভব!

তাহার পর সিগারেটটা ঠোঁটে চাপিয়া ধরিয়া গ্লাসে মদ ঢালিয়া পান করিতে লাগিলেন। মদ্যপান করিতে করিতে সহসা করালীচরণ নিজের দক্ষিণ হস্তটি আলোকে প্রসারিত করিয়া ধরিলেন এবং নিবিষ্টচিত্তে তাহাই দেখিতে লাগিলেন। এক চক্ষুর দৃষ্টি দিয়া তাঁহার সমস্ত অন্তর যেন তাঁহার হস্তরেখাগুলির উপর সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। ওষ্ঠদ্বয় দৃঢ়নিবদ্ধ হইয়া উঠিল। চিবুক কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতে লাগিল।

আসতে পারি দাদা?

করালীচরণ চমকাইয়া উঠিলেন, প্রসারিত হাতটা উল্টাইয়া এমন ভাবে বদ্ধদ্বারের দিকে চাহিলেন যেন দ্বারে কোন শত্রু হানা দিয়াছে! এক নিশ্বাসে মদটা নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়া বলিলেন—কে?

আমি গ্যান্‌চো খুজ্‌বুজ্‌—

ও, ভনুটুবাবু, আপনি! আসুন আসুন!

বকসি মহাশয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। ভনুটুর সহিত প্রোটোটাইপও আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং আসিয়াই ভক্তিভরে বকসি মহাশয়কে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইলেন। ভনুটুর আগে হইতেই শেখানো ছিল।

বকসি মহাশয় প্রশ্ন করিলেন—ইনি কে?

ভনুটু বলিল, ইনি হচ্ছেন লক্ষ্মণবাবু, সেই যার ছক সেদিন—

বুঝেছি—বসুন আপনারা।

বকসি মহাশয় সিগারেটটি ফেলিয়া দিলেন ও বোতল হইতে পুনরায় গ্লাসে মদ ঢালিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণবাবু অতিশয় ভয়ে ভয়ে এবং প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভরে উপবেশন করিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হইতেছিল, তিনি যেন কোন রহস্যময় মন্দিরে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছেন। ভনুটুও লক্ষ্মণবাবুর পাশে বসিয়া চোখ টিপিয়া কি যেন একটা ইসারা করিল, ভাবটা লক্ষ্মণবাবু যেন ব্যস্ত হইয়া কোন কথা এখন না বলেন। এ ইসারার প্রয়োজন ছিল না, কারণ লক্ষ্মণবাবু এমনই নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিলেন।

করালীচরণ নিঃশেষিতপ্রায় মোমবাতিটির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ধীরে ধীরে চুমুকে চুমুকে মদ্যপান করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটিল। ভনুটু একবার সশব্দে গলা খাঁকারি দিল। এই শব্দে বকসি মহাশয় ভনুটুর দিকে ফিরিয়া চাহিলেন ও মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, সর্দ্দি হয়েছে না কি? এই ঠাণ্ডায় বেরিয়েছেনও ত!

ভনুটু বলিল, লক্ষ্মণবাবু না-ছোড়, তা ছাড়া আপনার এখানে আসার কোন উপলক্ষ্যই ত আমি ছাড়ি না জানেন।

করালীচরণ মদটুকু নিঃশেষ করিয়া বলিলেন, ওঁদের দুজনেরই রাশিচক্র মিলিয়ে দেখলাম, মিল হয় নি—অসম্ভব।

লক্ষ্মণবাবুর মুখখানি সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল।

ভনুটু বলিল, গভীর গাড্ডায় ফেললেন দেখছি!

করালীচরণ আর একটি সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিলেন, গাড্ডা আবার কি! মনের মিল যখন হয়েছে তখন সেইটেই আসল মিল! লাগান আপনি, কুষ্ঠির মিল না-ই বা হল!

একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বকসি মহাশয় হাসিতে লাগিলেন। লাগিয়ে দিন!

ভনুটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল, পারবেন?

লক্ষ্মণবাবু বিমর্ষভাবে একটু মৃদু হাসিলেন মাত্র, কিছু বলিলেন না।

ভনুটু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, গভীর গাড্ডা, বুঝেছি!

করালীচরণ আবার ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, আলো কিন্তু আর বেশীক্ষণ টিকবে না। ভনুটুবাবু, ওই বইগুলোর ওদিকে আর একটা মোমবাতি আছে দেখুন ত, এটা ত গেল।

ভনুটু মোমবাতির সন্ধান করিতে করিতে বলিল, এত বই সব বার করেছেন কেন আজ?

নানারকমে বেয়ে চেয়ে দেখছিলাম—কুষ্ঠি দুখানা যদি মেলাতে পারি, দেখলাম—ও অসম্ভব।

ভনুটু মোমবাতিটি লইয়া নির্ব্বাণোন্মুখ মোমবাতি ধরাইয়া সেটি যথাস্থানে স্থাপন করিল। লক্ষ্মণবাবু নীরবে বসিয়াছিলেন। তাঁহার ম্রিয়মান মুখের দিকে চাহিয়া করালীচরণ বলিলেন, দেখুন, জ্যোতিষচর্চ্চা করি বটে, কিন্তু এটা আমি আপনাকে বলছি, মনের মিলই হ'ল শ্রেষ্ঠ মিল। সে দিকে যদি আপনার কোন গলদ না থাকে, লাগিয়ে দিন দুর্গা ব'লে—

পাশের বাড়ির ঘড়িতে টং টং করি দশটা বাজিল। লক্ষ্মণবাবু উঠিয়া পড়িলেন।

অনেক রাত হয়ে গেল, এবার আমি উঠি। ভনুটুবাবু, আপনি যদি বসতে চান ত বসুন, আমার জানেন ত—

ভনুটু বলিল, হ্যাঁ আপনি যান, কাল আপনার ওখানে যাব। আপনি দক্‌চে যাবেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে!

বকসি মহাশয়ের পদধূলি লইয়া লক্ষ্মণবাবু বিদায় লইলেন।

লক্ষ্মণবাবু চলিয়া গেলে ভনুটু জিজ্ঞাসা করিল, কি রকম বুঝলেন?

বোঝাবুঝি আর কি আছে এতে! ও মেয়ের সঙ্গে এঁর বিবাহ জ্যোতিষ মতে অসিদ্ধ। তা ছাড়া ও মেয়ের কপালে দুঃখ আছে—

মানে, একাধিক পুরুষের সংশ্রবে আসতে হবে ওকে! শুধু আসতে হবে নয়, অনেক দুঃখ ভোগও করতে হবে! একাধিক পুরুষের সংশ্রবে এলে তাকে দুঃখ ভোগ করতে হবে বই-কি!

ভনুটু একটু ঝুঁকিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, ভীমজাল তা হ'লে বলুন! প্রোটোটাইপ অতি নিরীহ লোক! মেয়েটি দেখতে ভাল, গান-টান গায় শুনেছি, লেখাপড়াও কিছু জানে, গোবেচারি প্রোটোটাইপ একেবারে লদকে গেছে!

করালীচরণ কর্কশ কণ্ঠে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। তাহার পর বলিলেন, শুক্রের কাণ্ডকারখানাই আলাদা।

ভনুটু বলিল, এ যে সঙীন শুক্র দেখছি! বেচারি প্রোটোটাইপের মুণ্ডুটি একেবারে হাড়কাঠে গলিয়ে দিয়েছে।

করালীচরণ শালপাতার ঠোঙা হইতে একটা ফুলুরি মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, বিয়ের কথাবার্ত্তা কি অগ্রসর হয়েছে?

পাগল! বাঘ অরিজিন্যাল বসে আছে—খুন ক'রে ফেলবে তা হ'লে! ছোকরা গোপনে গোপনে প্রেমে পড়েছে! ওর নিজের কুষ্ঠিতে খুব বিশ্বাস, মেয়েটিরও নাকি খুব বিশ্বাস! মেয়েটিই না কি নিজের কুষ্ঠির ছক প্রোটোটাইপকে দিয়েছে! বলেছে যে কুষ্ঠির মিল যদি হয় তা হ'লে সে তার দাদাকে বলবে যেন অরিজিন্যালের কাছে কথাটা পাড়েন—

করালীচরণ হাসিয়া বলিলেন, প্রণয়-ব্যাপারে এমন হিসেব ক'রে চলার কথা আগে কখনও শুনিনি!

ভনুটু বলিল, প্রোটোটাইপের কাণ্ডকারখানাই ফ্রগিশ!

করালীচরণ সহসা কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন। তাহার পর আবার একটা ফুলুরি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, ভনুটুবাবু, শ' পাঁচেক টাকা কি ক'রে সংগ্রহ করতে পারি বলুন ত!

কেন, এত টাকার কি দরকার এখন?

দ্রাবিড় যাব।

দ্রাবিড়?

হ্যাঁ।

কেন?

শুনেছি, দ্রাবিড়ে একজন জ্যোতিষী আছেন তিনি হস্তরেখা থেকে জন্মনির্ণয় করতে পারেন। তাঁর কাছে গিয়ে এ বিদ্যেটা আমি আয়ত্ত করতে চাই। যেমন করে হোক্—

হঠাৎ এ খেয়াল চাপলো কেন?

বাই নারায়ণ, খেয়াল বলছেন একে! দুনিয়ার লোকের কুষ্ঠি গুণছি, ভবিষ্যৎ বলছি অথচ নিজের সম্বন্ধে কিছু জানি না। আমার নিজের জন্মসময়, এমন কি, জন্ম-তারিখটা পর্য্যন্ত আমার জানা নেই। হস্তরেখা থেকে যদি জন্মসময় নির্ণয় করতে পারি তা হ'লে নিজের কুষ্ঠিটা একবার দেখি ভাল করে—

আর একটি ফুলুরি তিনি মুখের মধ্যে দিলেন।

ভনুটু নির্ব্বাক হইয়া কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আপনি নিজে যা রোজকার করেন তার থেকেই তো অনায়াসে পাঁচশ'

টাকা জমে যেতে পারে, অবশ্য যদি একটু বুঝে সুঝে খরচপত্র করেন।

করালীচরণ ভন্টুর দুটি হাত ধরিয়া সাগ্রহে বলিলেন, দিন না আপনি জমিয়ে! আমার যা কিছু উপার্জ্জন সব আমি আপনার হাতে দেব, আপনি যা আমাকে খরচের জন্যে দেবেন তাইতেই আমি চালিয়ে নেব। কিন্তু আমার কাছে টাকা থাকলে আমি খরচ না করে পারব না। নেবেন ভার?

একচক্ষু ভন্টুর মুখের উপর স্থাপিত করিয়া করালীচরণ একদৃষ্টে সাগ্রহে চাহিয়া রহিলেন।

ভন্টু কহিল, এ আর অসম্ভব কি। আপনি যা দেবেন, একটা পাশ বুক করবেন।

কিন্তু আপনার নামে। আমি নিজেকে একটুও বিশ্বাস করি না, বাই নারায়ণ!

ভন্টু হাসিয়া বলিল, বেশ ত, এ আর বেশী কথা কি—

তা হ'লে আসুন, আজ থেকেই সুরু করুন।

করালীচরণ একটা পাঁজির ভিতর হইতে দুইখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন ও বলিলেন, এই এখন আমার যথাসর্ব্বস্ব। কিছু মাল আর সিগারেট কিনে দিয়ে বাকিটা আপনি নিয়ে যান।

বেশ, কাল নিয়ে যাব এসে।

না, না, না—এখুনি নিয়ে যান আপনি, নিয়ে পালান!

করালীচরণের চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

বেশ দিন।

ভন্টু নোট দুইটি লইয়া পকেটে পুরিল।

আলমারির কোণের দ্বারপ্রান্তে আবার সেই ছায়া মূর্ত্তি আসিয়া দাঁড়াইল ও বিড় বিড় করিয়া বকিতে সুরু করিল।

ভন্টু চমকাইয়া উঠিল।

আর কেউ ঘরে আছে না কি!

করালীচরণ হাসিয়া বলিলেন, ও মোস্তাক।

মোস্তাক? মোস্তাক কে!

ও আমার একজন বন্ধু, মাঝে মাঝে আসে। মোস্তাক এদিকে এসো—

মোস্তাক অগ্রসর হইয়া আসিল ও আসিয়াই মিলিটারি কায়দায় স্যালিউট করিল। এই উলঙ্গ মূর্ত্তি দেখিয়া ভন্টু ত বিস্ময়ে নির্ব্বাক।

বকসি মহাশয় বলিলেন, উঠে এলে কেন মোস্তাক, বিড়ি আবার নিভে গেছে না কি?

জুৎ হচ্ছে না!

দাও আবার ধরিয়ে দিই, কই বিড়ি?

মোস্তাক কিছুক্ষণ বকসি মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার পর আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, হোথা চলে গেছে।

তা হ'লে একটা সিগারেট নাও।

সিগারেট খাইতে মোস্তাকের ঘোর আপত্তি, সে ঘন ঘন মাথা নাড়িতে লাগিল। তাহার পর বলিল, ছবি দেখতে এলাম—

ছবি? ও, তুমি একটা ছবি এনেছ বটে—ভুলেই গেছি! এই নাও দেখ।

বকসি মহাশয় উঠিয়া ক্যালেণ্ডারের ছবিখানি পাড়িয়া তাহার হাতে দিলেন। মোস্তাক টেবিলের উপর ছবিখানি প্রসারিত করিয়া তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। তাহার বিস্ফারিত চক্ষু দুইটিতে শিশুসুলভ বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ এইভাবে চাহিয়া থাকিয়া মোস্তাক বালিকাটির মুখের উপর ময়লা আঙুলটা রাখিয়া বলিল, এ কে?

ও খুকি।

এগুলো কি?

খরগোস।

এগুলো কি?

কপি পাতা, খরগোসরা খাচ্ছে।

খুকি—খরগোস—খাচ্ছে—সব 'খ'।

মোস্তাক এমন একটা মুখভাব করিয়া করালীচরণের দিকে তাকাইল যেন সে ছবির মধ্যে 'খ'এর প্রাধান্য আবিষ্কার করিয়া একটা মস্ত কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছে।

করালীচরণ তাহার পিঠ চাপড়াইয়া দিয়া বলিলেন, বাঃ ঠিক বলেছ, যাও এবার শুয়ে পড় গিয়ে—যাও। ছবিটা নিয়েই যাও।

সুন্দর ছবিখানা মুড়িয়া মোস্তাক সেটাকে বগলদাবা করিল, আবার স্যালিউট করিল এবং ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। কিছু দূর গিয়া সে আবার ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় স্যালিউট করিয়া প্রশ্ন করিল—কেন?

বাই নারায়ণ, কি কেন?

খুকি আর খরগোস একসঙ্গে কেন?

করালীচরণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একটু চিন্তা করিবার ভান করিলেন। তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, প্র্যাকটিস করছে। খুকি যখন বড় হবে, খরগোসগুলোও বড় হবে! বড় হলে খরগোসগুলোর চেহারা কিন্তু মানুষের মত হয়ে যাবে।

মানুষ-খরগোসকে যাতে তখন ভাল করে পোষ মানাতে পারে তারই রিহার্স্যাল দিচ্ছে আর কি—

এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইয়া স্যালিউট করিয়া মোস্তাক চলিয়া গেল। করালীচরণ হাসিয়া বলিলেন, কত অল্পে সন্তুষ্ট হয় ও।

ভন্টু বলিল—এ কে বকসি মশায়?

বললাম ত আমার একজন বন্ধু। ছেলেবেলায় একসঙ্গে পড়তাম, এফ-এ পর্য্যন্ত পড়েছিল ও, তারপর মিলিটারিতে চাকরি নিয়ে পাঞ্জাবের দিকে চলে যায়। হঠাৎ একদিন দেখি কোলকাতার রাস্তায় এইভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খোঁজ-খবর নিয়ে শুনলাম, পাগল হয়ে যাওয়াতে ওর চাকরি যায়। আত্মীয়স্বজনরা কে কোথায় আছেন, আছেন কি-না ভগবান জানেন। আমি রাস্তায় দেখতে পেয়ে ডেকে নিয়ে আসি, মাঝে মাঝে নিজেও আসে ও। আজ বিকেলে হঠাৎ ওই ক্যালেণ্ডারের ছবিখানা নিয়ে এসে হাজির! বদ্ধ পাগল—

বকসি মহাশয় আবার খানিকটা মদ গ্লাসে ঢালিলেন ও বোতলটা তুলিয়া দেখিয়া বলিলেন, ভন্টুবাবু, রাত হয়ে গেলে মাল পাবেন না, আমার এদিকে ফুরিয়েছে!

ভন্টু পশ্চাৎ হইতে ওষ্ঠভঙ্গী করিয়া তাহাকে ভ্যাঙাইল ও তৎপরে সশ্রদ্ধ কণ্ঠে বলিল, এই যে যাই।

ভন্টু বাহির হইয়া বাইকে সওয়ার হইল। লক্ষ্মণবাবু বাইকটি নিখুঁতভাবে সারাইয়া দিয়াছিলেন।

১৩

শঙ্কর একমনে আপনার ঘরে বসিয়া ইতিহাস পাঠ করিতেছিল। এত একাগ্রচিত্তে সে তাহার নিজের পাঠ্য-পুস্তকও কোনদিন পাঠ করে নাই। সে নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র। মডার্ন ইয়োরোপ তাহার পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত নহে। আগামী কল্য ফিজিক্স প্র্যাকটিকাল ক্লাস আরম্ভ হইবে, অধ্যাপক মহাশয় সে সম্বন্ধে কিছু পড়াশোনাও করিয়া আসিতে বলিয়াছেন। শঙ্করের সেদিকে কিন্তু খেয়াল নাই। মডার্ন ইয়োরোপের এই বইখানা সম্ভব হইলে আজ রাত্রের মধ্যেই পড়িয়া শেষ করিতে হইবে। জ্ঞান-পিপাসা নয়, রিণিকে তাক্ লাগাইয়া দিতে হইবে। রিণিকে দেখাইতে হইবে যে, অপূর্ব্বকৃষ্ণ পালিতই যে কেবল ইতিহাসে কৃতবিদ্য তাহা নয়, শঙ্করও ইতিহাসের কিছু কিছু জানে—যদিও সে বিজ্ঞানের ছাত্র। গতকল্য রিণির জন্মতিথি উৎসবে সে গিয়াছিল। মিষ্টিদিদি ও সোনাদিদি তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, রিণির পড়াশোনায় সাহায্য করিতে পারে এমন একটি ভাল ছেলে শঙ্কর জোগাড় করিয়া দেয় তাহা হইলে বড় উপকার হয়। প্রফেসার মিত্র নিজের পড়াশোনা লইয়া এত তন্ময় থাকেন যে, এসব দিকে, বস্তুত সংসারের কোন দিকেই তাঁহার লক্ষ্য নাই।

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল, আর কারো সঙ্গে ত আমার তেমন আলাপ নেই, আমাকে দিয়ে যদি চলে বলুন—

আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত মিষ্টিদিদি বলিয়াছিলেন, ওমা, তাহলে ত সবচেয়ে ভাল হয়! পারবেন আপনি?

পারতে পারি।

সোনাদিদি সপ্রশংস দৃষ্টিতে একবার শঙ্করের দিকে ও একবার মিষ্টিদিদির দিকে তাকাইয়া বলিয়াছিলেন, একেই বলে ভাল ছেলে! সায়েন্স কোর্সের স্টুডেণ্ট আর্ট কোর্সের মেয়েকে পড়াবার ভার নিতে চায়। উঃ, আপনাদের মাথার ভেতরটাতে কি আছে একবার দেখতে ইচ্ছে করে, সত্যি বলছি—

উত্তরে শঙ্কর বলিয়াছিল, চেষ্টা করলে সব জিনিসই সবাই করতে পারে। আপনি কিম্বা মিষ্টিদিদি যদি চেষ্টা করেন মিস মিত্রকে নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারেন।

মিষ্টিদিদি ত পারেনই, বি-এ পাশ করেছেন উনি—

মিষ্টিদিদি হাস্যতরল কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, রক্ষে করুন, আবার ওই সব। ওসব আপনাদের মতন ভাল ছেলেদেরই পোষায়! সেদিন রিণি কি একটা সামান্য জিনিস জিগ্যেস করেছিল রোমান হিষ্ট্রির, কিছুতে মনে এলো না ছাই। ভাগ্যে অপূর্ব্ববাবু ছিলেন, তিনি শেষকালে আমায় উদ্ধার করেন!

অপূর্ব্ববাবু আসেন না কি রোজ ?

এ প্রশ্নটি অনিবার্য্যভাবে শঙ্করের মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার উত্তরে সোনাদিদি মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়াছিলেন। মিষ্টিদিদিও রহস্যময় হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, হ্যাঁ, অপূর্ব্ববাবু আসেন প্রায়ই। তাঁকে বললে তিনি অবশ্য রিণিকে পড়াতে রাজি হয়ে যাবেন, কিন্তু সেটা তাঁর ওপর অত্যাচার করা হয়। তিনি বেলাকে সন্ধেবেলা গান শেখান, আরও একজায়গায় কোথায় পড়ান না কি—

গম্ভীর মুখ করিয়া সোনাদি বলিয়াছিলেন, না, সেটা ঠিক হয় না।

শঙ্কর প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছে সে রিণিকে পড়াইবে। সেইদিনই রিণিদের বাড়ি হইতে ফিরিয়া শঙ্কর প্রফেসার গুপ্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। সাহিত্যরসিক বলিয়া প্রফেসার গুপ্ত শঙ্করের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত শঙ্করের লেখা 'ট্রাজেডি ও কমেডি' শীর্ষক প্রবন্ধটি তাঁহার খুব ভাল লাগিয়াছিল এবং তিনি নিজেই আসিয়া প্রবন্ধের লেখক শঙ্করসেবক রায়ের সহিত আলাপ করিয়া গিয়াছিলেন। সেই আলাপের পর হইতে শঙ্করও দুই-একবার তাঁহার বাসায় গিয়াছে। প্রফেসার গুপ্তের সহিত আলাপ করিয়া সুখ হয়। লোকটি মার্জ্জিতরুচি ও বিদ্বান। শুধু বিলাত নয়, ইয়োরোপের অনেক দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স হইয়াছে, প্রায় পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু আলাপ করিলে মনে হয় ঠিক যেন সমবয়সী। শঙ্করের সহিত বেশ ভাব হইয়া গিয়াছে। শঙ্কর রিণিদের বাড়ি হইতে সোজা প্রফেসার গুপ্তের বাড়ি গিয়া ইতিহাসের এই বহিখানি আউট বুক হিসাবে পড়িবে বলিয়া চাহিয়া আনিয়াছে এবং তাহাই এখন তন্ময় হইয়া পড়িতেছে। বি-এ কোর্সের ইতিহাসের বহিগুলি তাহাকে চেষ্টা করিয়া পড়িয়া ফেলিতে হইবে। ইংরেজীটা তাহার মোটামুটি জানাই আছে। সংস্কৃতটা একটু-আধটু দেখিয়া লওয়া প্রয়োজন, কিন্তু তাহার জন্য তাহাকে বেশী পরিশ্রম করিতে হইবে না। সংস্কৃতে সে খুব ভাল ছেলে ছিল। ফিলজফি? ফিলজফিতে রিণিকে বিশেষ সাহায্য করিতে হইবে না। যদিই বা হয় তাহা আয়ত্ত করাও শঙ্করের পক্ষে অসম্ভব হইবে না।

শঙ্কর তন্ময় হইয়া পড়িতেছে। অন্তরের নিভৃত প্রদেশে অবনতমুখী রিণি বসিয়া রহিয়াছে। সেই লাজনম্রা, স্বল্পভাষিণী, শ্রীমণ্ডিতা তন্বীকে শুনাইয়া শুনাইয়া তন্ময় শঙ্কর পড়িয়া চলিয়াছে। ইতিহাসের কঠিন নাম ও তারিখগুলা সঙ্গীতের মত মনে হইতেছে।

হঠাৎ শঙ্করের তপোভঙ্গ হইল।

নীচে কে তাহাকে ডাকিতেছে।

চাকরটা আসিয়া প্রবেশ করিল এবং বলিল যে ভন্টুবাবু তাঁহার সহিত দেখা করিতে চান, নীচে কমন রুমে বসিয়া আছেন।

শঙ্কর নামিয়া গেল। কমন রুমে আর কেহ ছিল না, ভন্টু একাই বসিয়াছিল।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল—কি রে, এমন সময় হঠাৎ ?

ভীমজাল এবং গভীর গাড্ডা টু দি পাওয়ার থ্রি। মেজকাকা আবার সরেছে, বৌদিদির খুব জ্বর, ট্যাঁক গড়ের মাঠ—

শঙ্কর কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। শঙ্করের বিপন্ন মুখচ্ছবি দেখিয়া ওষ্ঠবিকৃতি করিয়া ভন্টু বলিল, অমন করে চেয়ে আছিস কেন গাড়োল! যা হবার হবে! এক কাপ চা খাওয়া ত আগে—

শঙ্কর চাকরকে ডাকিয়া দোকান হইতে চা আনাইয়া দিল।

চা পান করিতে করিতে ভন্টু বলিল, কানা করালীর কাছে যাবি ?

কানা করালী কে ?

সেই জ্যোতিষী, সেই যে তোর কুষ্ঠি দেখেছিল একদিন, এত ভুলিস্ তুই—

ও, হ্যাঁ হ্যাঁ—

চল্ না যাই সেখানে। তোর কুষ্টিটা গোণাবি বলেছিলি ত একদিন!

শঙ্করের তখন যাহা মনের অবস্থা তাহাতে নিজের ভবিষ্যতের সম্বন্ধে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাহাকে হিষ্ট্রির পড়া করিতে হইবে।

সুতরাং সে বলিল, এখন যাওয়া অসম্ভব।

ভন্টু চা টুকু নিঃশেষ করিয়া বলিল, আজ কনসেশন ডে ছিল, সস্তায় হ'ত। আজ বুধবার ত ?

কনসেশন ডে, মানে ?

মানে বুধবার দিন তার হাফ ফি। অন্য দিন দশটাকা নেয়, আজ পাঁচ টাকা।

তাই নাকি, বেশ ত পাঁচটা টাকা দিচ্ছি তোকে, তুই গুণিয়ে নিয়ে আয়—সব ঠিক ঠিক বলে দেবে ত ?

ভ্রূযুগল উৎক্ষিপ্ত করিয়া ভন্টু বলিল, বলে দেবে মানে ? এরকম নির্ভুল গণনা আর কোথাও পাবি না। করালী একেবারে চাম ল—দ্।

তুই তা হ'লে গুণিয়ে নিয়ে আয়, আমি টাকা দিচ্ছি তোকে—

শঙ্কর উপরে চলিয়া গেল ও পাঁচটি টাকা আনিয়া ভন্টুকে দিল। টাকা আনিল অবশ্য সে ধার করিয়া। তাহার নিজের কাছে কিছুই ছিল না। রিণির জন্মদিন উপলক্ষে তিনখানা দামী বই কিনিয়া তাহার যাহা কিছু ছিল নিঃশেষ হইয়াছে। টাকা দিয়া সে ভন্টুকে বলিল—ন'টা ত বাজে; এত রাত্রে তুই বাড়ি না গিয়ে জ্যোতিষীর ওখানে যাবি ? বৌদির জ্বর বলছিলি—

ভন্টু টাকা কয়টি ভিতরদিককার পকেটে রাখিতে রাখিতে বলিল, জ্বর ত বটেই—আমি আর বাড়ি বসে থেকে তার কি করব। যা করবার তা ত করেই এসেছি। করালীর সঙ্গে একটু লদ্‌কালদ্‌কি ক'রে আবার ফিরব এখুনি—

শঙ্কর আবার প্রশ্ন করিল, মেজকাকা সরেছে কবে ?

কাল সন্ধ্যে থেকে না-পাত্তা!

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

ভন্টু বলিল, একটা দেশলাই আন্ দেখি, বাইকের আলোটা জ্বালতে হবে—

শঙ্কর পাশের ঘর হইতে দিয়াশলাই আনিয়া দিল ও ভন্টুকে আগাইয়া দিবার জন্য তাহার সঙ্গে রাস্তা পর্য্যন্ত আসিল। ভন্টুর বাইকটি গেটের কাছেই ঠেসানো ছিল। ভন্টু পকেট হইতে একটি সরু মোমবাতি ও একটি কাগজের ঠোঙা বাহির করিল। তাহার পর বাতিটি জ্বালাইয়া ঠোঙার ভিতর স্থাপন করিয়া শঙ্করকে বলিল, ধর দিকি, আমি বাইকে চড়ি তারপর আমার হাতে দিস্।

শঙ্কর সবিস্ময়ে বলিল, তোর ল্যাম্প কি হ'ল ?

ভন্টু হাস্যদীপ্ত চক্ষে উত্তর দিল—খুজ্‌বুজ্!

খুজবুজ মানে ?

মানে, বিক্রমপুর এবং তস্য মানে বেচে ফেলেছি। সংসার চালাতে হবে ত!

ভন্টু বাইকে সওয়ার হইল।

ভন্টুকে বিদায় দিয়া শঙ্কর আবার আসিয়া পড়িতে বসিল।

রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে।

হস্টেলের সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। সকলেই নিজের নিজের ঘরে খিল দিয়াছে। ষোল নম্বর ঘরের রামকিশোরবাবু খড়ম খট্‌খট্ করিতে করিতে বাথ্‌রুমের দিকে চলিয়াছেন। শঙ্কর নিজের ঘরে বসিয়া বসিয়া তাঁহার গলায়-সাঁকি-বাহির-করা মূর্ত্তি কল্পনানেত্রে দেখিতেছিল। হাতকাটা ফতুয়া পরা, কানে পৈতা-জড়ানো। রামকিশোরবাবু তিনবার বি-এ ফেল করিয়া চতুর্থবারের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। রামকিশোরবাবুর খড়মের শব্দ পাইয়া শঙ্কর বুঝিল, এখনই আলো নিবিয়া যাইবে। কারণ আলো নিবিবার ঠিক দশ মিনিট পূর্ব্বে রামকিশোরবাবু খড়ম্ পরিয়া বাথরুম অভিমুখে যান ও ফিরিয়া আসিয়া কুঁজা হইতে জল ঢালিয়া সশব্দে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া শয়ন করেন—ইহা তাঁহার বাঁধা নিয়ম। রামকিশোরবাবু ফিরিয়া আসিলেন ও বিধিমত হস্তমুখ প্রক্ষালনান্তে নিজের ঘরে গিয়া খিল দিলেন। তখন শঙ্কর ধীরে ধীরে নিজের ঘর হইতে বাহির হইল ও এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে কপাটে তালা লাগাইতে লাগিল। ভন্টুর সহিত দেখা হইবার পর কিছুক্ষণ সে ইতিহাস পাঠ করিয়াছিল এবং পুস্তকটার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পড়িয়াও ফেলিয়াছিল, কিন্তু বেশীক্ষণ আর সে পড়িতে পারিল না। যে কারণে সে ইতিহাস পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, ঠিক সেই কারণেই তাহাকে এখন ইতিহাস-পড়া স্থগিত রাখিতে হইল। সে আশা করিয়াছিল, ভন্টু একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া কোষ্ঠি গণনার ফলাফল তাহাকে জানাইয়া যাইবে। কিন্তু ভন্টু ত কই আসিল না। এগারোটা প্রায় বাজে। ভন্টু তাহার সম্বন্ধে কি তথ্য আবিষ্কার করিল জানিবার জন্য তাহার মনটা ছটফট করিতেছিল; ইতিহাস পড়ায়

মন বসিতেছিল না। এতক্ষণ সে রামকিশোরবাবুর শয়নের প্রতীক্ষায় ছিল। রামকিশোরবাবু এই ব্লকের প্রবীণতম ছাত্র এবং 'মনিটার'। অনেক জোগাড় যন্ত্র করিয়া শঙ্কর একটি সিংগ্‌ল্‌-সিটেড্‌ রুম লইয়াছে, সুতরাং বাহিরে যাইতে হইলে তালা লাগাইয়া যাইতে হইবে। এ সময় শঙ্করের ঘরে তালা লাগানো দেখিলে তাহা রামকিশোরবাবুর দৃষ্টি এড়াইবে না। এ সকল বিষয়ে রামকিশোরবাবুর দৃষ্টি শ্যেনদৃষ্টি এবং তাঁহার এই শ্যেনদৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া নব-বিবাহিত সুপারিনটেনডেণ্ট মহাশয় (জনশ্রুতি, তিনি রামকিশোরবাবুর সহপাঠী ছিলেন) যখন তখন কলিকাতাস্থ শ্বশুরালয়ে রাত্রিযাপন করিবার সুবিধা পান এবং রামকিশোরবাবুর রিপোর্টকে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন। সুতরাং রামকিশোরকে ভয় করিয়া চলিতে হয়।

শঙ্কর ঘরে তালা লাগাইতে লাগাইতেই আলো নিভিয়া গেল। অন্ধকারে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে শঙ্কর সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। নীচে গিয়া দারোয়ানকে চুপি চুপি কি বলিল। দারোয়ান প্রথমটা একটু আপত্তি করিয়া অবশেষে শঙ্করের পীড়াপীড়িতে রাজি হইল এবং গেট খুলিয়া দিতে দিতে নিম্নকণ্ঠে বলিতে লাগিল যে সে শঙ্করবাবুর কথা অমান্য করিতে পারে না বলিয়া এই অন্যায় কার্য্যটি করিতেছে কিন্তু এ 'বাত' প্রকাশ হইয়া পড়িলে তাহার 'নোক্‌রি' থাকিবে না। শঙ্কর তাহাকে আশ্বাস দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। ভন্টুর সহিত আজ রাত্রে তাহার দেখা করিতেই হইবে। হাতে পয়সা ছিল না, সুতরাং হাঁটিয়াই সে চলিল। একা অন্যমনস্কভাবে চলিতে চলিতে শঙ্কর কখন যে একটা গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল তাহা তাহার খেয়াল ছিল না। যদিও অন্যমনস্কভাবে ঢুকিয়াছিল কিন্তু ভুল গলিতে সে ঢোকে নাই। এ গলিটা দিয়া গেলেই সোজা সে বেলেঘাটার মোড়ে গিয়া হাজির হইতে পারিবে। অন্যমনস্কভাবে সে চলিতেছিল, সজ্ঞানভাবে পথের সম্বন্ধে সে সচেতন ছিল না। তাহার সমস্ত অন্তর একাগ্রভাবে যাহার দিকে উন্মুখ হইয়াছিল সে রিণি। লজ্জিতা রিণি, কুণ্ঠিতা রিণি, স্বল্পভাষিণী রিণি, কাব্যানুরাগিণী রিণি, আনতনয়না রিণি, ঈষৎ হাস্যস্নিগ্ধা রিণি, বিরক্ত রিণি, বিপন্ন রিণি—রিণির নানা মূর্ত্তি তাহার মনের মধ্যে আনাগোনা করিতেছে। আনাগোনার আর বিরাম নাই। অপলকদৃষ্টিতে শঙ্কর রিণির সঞ্চরমান নানা মূর্ত্তির দিকে মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিয়াছে, তাহার দেখারও আর বিরাম নাই, সে আর কিছু দেখিতেছে না। জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে সে রিণিকেই দেখিতেছে, ভাবিতেছে মনে মনে স্পর্শ করিতেছে। তাহারই জন্য ইতিহাস অধ্যয়ন, তাহারই জন্য সমস্ত সত্তা উন্মুখ, তাহারই জন্য সে টাকা ধার করিয়া ভন্টুকে দিয়াছে এবং তাহার মনের গোপন বাসনাটির ভবিষ্যৎ পরিণতি কোষ্ঠি গণনায় কিছুমাত্র আভাসিত হইয়াছে কি-না তাহাই অবিলম্বে জানিবার জন্য এত রাত্রে হাঁটিয়া সে চলিয়াছে। অথচ এই কয়েক দিন পূর্ব্বেও সে রিণির কথা একবারও ভাবে নাই। দেখা হইলে সহজ শিষ্টতাসঙ্গত আলাপ পরিচয় করিয়াছে, নমস্কারের পরিবর্ত্তে প্রতিনমস্কার করিয়াছে। সহসা এ কি হইয়া গেল! অকারণে সহসা যেমন আকাশের একটা কালো মেঘ সূর্য্য-কিরণ-রঞ্জিত হইয়া মহিমময় হইয়া ওঠে, বায়ুতাড়িত ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সহসা যেমন বিরাট অগ্নিকাণ্ডের গরিমায় শিখায়িত হইয়া ওঠে, শঙ্কর তেমনি সহসা রিণির প্রেমে পড়িয়া আশা-আশঙ্কার তীব্র-মধুর উত্তেজনায় উন্মত্ত হইয়া পথ চলিতেছিল।

সহসা তাহার স্বপ্ন ভঙ্গ হইল।

একটা খামের চিঠি স-জোরে আসিয়া তাহার গালে লাগিল। রঙীন খামের চিঠি। গলির স্বল্পালোকে সে পড়িয়া দেখিল উপরে লেখা রহিয়াছে স্বর্ণলতা দেবী। ঘাড় ফিরাইতেই তাহার চোখে পড়িল একটি খোলা জানালা। জানালার ভিতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে সবিস্ময়ে দেখিল সেদিনকার সেই লোকটি অর্থাৎ ভন্টু যাহাকে মোমবাতি বলিয়া পরিচয় করিয়া দিয়াছিল তিনি এবং একটি কিশোরী কথা-বার্ত্তা বলিতেছেন। সম্মুখের টেবিলে রক্তজবার মত একটা আলো। শঙ্কর সবিস্ময়ে পত্রখানা লইয়া ভাবিতেছিল কি করা উচিত, পত্রখানা সে মৃন্ময়বাবুকে দিয়া যাইবে কি-না। ওই উন্মুক্ত বাতায়ন পথেই যে পত্রখানা আসিয়াছিল তাহাতে শঙ্করের সন্দেহ ছিল না। কে এই স্বর্ণলতা!

হঠাৎ শঙ্করের কানে গেল সেই কিশোরীটি বলিতেছে, ওটা কি ফেলে দিলে?

মৃন্ময়বাবু বলিলেন, ও একখানা বাজে কাগজ। তোমার রান্না হয়ে গেছে?

ওমা, রান্না ত ভারি! সব শেষ হয়ে গেছে কখন। তোমার রুটির নেচিগুলি করা আছে এখনো বেলা শেকা হয় নি। ঠাকুরপো কখন খেয়ে নিয়েছে!

শঙ্করের মনে হইল মৃন্ময়বাবু একটু যেন রূঢ় স্বরেই প্রশ্ন করিলেন, হঠাৎ এ ঘরে এলে কেন?

ইহাতে কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া মেয়েটি হাসিয়া বলিতে লাগিল, একটা মজার জিনিস দেখাতে এলুম, চুপি চুপি এস এ ঘরে। বেড়াল ছানাটা কেমন গোল হয়ে ফুলে তোমার বিছানার একধারে কেমন চোখটি বুজে বসে আছে, বেচারির শীত করছে বোধ হয়। তোমার মলিদার গলাবন্ধটা দিয়ে ঢেকে দিয়েছি। দুষ্টু দুষ্টু মুখটি বেরিয়ে আছে খালি। দেখবে এসো না, কেমন মজার দেখতে হয়েছে—

শঙ্কর আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। পত্রখানি পকেটে পুরিয়া সে অগ্রসর হইয়া গেল। নিজের তাগিদ ছিলই, তা ছাড়া এমনভাবে লুকাইয়া আড়ি পাতাটা তাহার ভদ্র অন্তঃকরণে ভাল লাগিতেছিল না। পরে চিঠিখানা মৃন্ময়বাবুকে ফিরাইয়া দিলেই চলিবে। নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে শঙ্কর ভন্টুর বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কলিকাতা শহর ক্রমশ নীরব হইয়া আসিতেছে। মাঝে মাঝে এক একটা রিকশার টুং টুং শব্দ, দুই-একটা ইতস্তত অপেক্ষমান ফেটিন গাড়ির গাড়োয়ানের আহ্বান অথবা ধাবমান মোটরের আকস্মিক আবির্ভাব ছাড়া চতুর্দ্দিক ঘুমন্ত। মাঝে মাঝে এক-আধটা পানের দোকানে কদাচিৎ দুই-একজন পুরুষ অথবা নারী দেখা যাইতেছে। কোন বৃহৎ অট্টালিকার গাড়ি-বারান্দার নীচের আলোটা হঠাৎ নিবিয়া গেল। এই শীতের রাস্তার ফুটপাথের উপর ঘুমন্ত দরিদ্র নর-নারী স্থানে স্থানে কুণ্ডলী পাকাইয়া রহিয়াছে। এই জাতীয় নানা জিনিস দেখিতে দেখিতে শঙ্কর অবশেষে ভন্টুর বাসায় পৌঁছিল। পৌঁছিয়া দেখিল গভীর নীরবতায় চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন। ওদিককার একটা ঘরে যেন একটু আলো জলিতেছে।

ভন্টু, ভন্টু—শঙ্কর ডাকিতে লাগিল।

অনেক ডাকাডাকির পর ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে শন্টু, ভন্টুর ভাইপো, মুখ বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কে?

আমি শঙ্কর, ভন্টু কোথায়?

কাকাবাবু এখনও বাড়ি ফেরেন নি।

ইহার পর শঙ্কর কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

শন্টুই আবার বলিল, এখুনি ফিরবেন বোধ হয় আপনি একটু বসবেন?

বেশ, চল।

বসিবার মত বাহিরের কোন পৃথক ঘর ছিল না। শঙ্করকে একেবারে অন্তঃপুরেই যাইতে হইল। গিয়াই তাহার বৌদিদির সহিত দেখা হইয়া গেল। তিনি শঙ্করের সাড়া পাইয়া শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়াছেন। জ্বর হওয়াতে মুখখানি থমথম করিতেছে। কিন্তু তাঁহার ঢলঢলে কালো মুখখানি শঙ্করকে দেখিয়াই হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, মেঘলা দিনে যেন সহসা এক ঝলক রৌদ্র দেখা দিল। তাম্বুলরঞ্জিত শুষ্ক অধর দুইটি সহসা যেন সজীবতা প্রাপ্ত হইল। শঙ্কর দেখিল, বৌদিদির কালো ডাগর চক্ষু দুইটি জ্বরের উত্তাপে আরও যেন আবেশময় হইয়া উঠিয়াছে। শঙ্কর একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া গায়ের ছিন্ন র‍্যাপারটি সর্ব্বাঙ্গে জড়াইতে জড়াইতে বৌদিদি হাসিয়া বলিলেন, দেখছো কি শঙ্কর ঠাকুরপো? এত রাত্রে হঠাৎ এলে যে—

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া শঙ্কর বলিল, জ্বর হয়েছে না কি?

হ্যাঁ।

ভন্টু এখনও ফেরে নি?

ওষুধ আনছি বলে সেই যে সন্ধ্যে থেকে বেরিয়েছে এখনও ফেরে নি। চেনই তো তাকে, একবার কোথাও বসলে আর ওঠবার নামটি করবে না।

শঙ্কর মনে মনে একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল—ভন্টু ত তাহারই জন্য জ্যোতিষীর বাড়ি গিয়াছে। কিছু না বলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে বলিল, আপনার ওষুধ-বিষুদের কোন ব্যবস্থা না করেই বেরিয়েছে সে। আশ্চর্য্য ত!

বৌদিদি বলিলেন, সন্ধ্যের সময় পাড়ার ডাক্তারবাবুকে ডেকে এনেছিল এবং একটু হাসিয়া বলিলেন, খুব ভাব করেছে তার সঙ্গে। তিনিই এসে একটা প্রেসক্রপশন্‌ লিখে দিয়েছেন, তাই আনতেই ত বেরুলো। কোথাও আটকে গেছে বোধ হয়। কিংবা কি জানি—

বৌদিদির মুখে ক্ষণিকের জন্য ছায়াপাত হইল।

মা, খিদে পেয়েছে—

শনটুর ভাই ননটু বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়াছে। দিগম্বর মূর্ত্তি, বয়স বছর পাঁচেক হইবে। সে শঙ্করকে দেখিয়া একটু থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। এই স্বল্প পরিচিত লোকটির সমক্ষে ক্ষুধার জন্য মাকে বিব্রত করা যে অশোভন হইবে তাহা সে যেন অনুভব করিল। মায়ের পাশটিতে দাঁড়াইয়া বাঁ হাতে চোখ কচলাইতে কচলাইতে আড়চোখে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে শঙ্করের দিকে সে চাহিতে লাগিল।

বৌদিদি বলিলেন, তুমি একটু বস শঙ্কর ঠাকুরপো, আমি এটাকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিই। চল্ খাবি চল্—

শিশুকে লইয়া বৌদিদি ঘরের ভিতর ঢুকিলেন।

শঙ্কর শুনিতে পাইল—শিশু বলিতেছে, সাবু খাব না!

লক্ষ্মী সোনা আমার, কাল সকালে কেমন বেগুন ভাজা দিয়ে ভাত করে দেব—কেমন? এখন এইটুকু খেয়ে শুয়ে পড় ত ধন—ননটুবাবু ভারি লক্ষ্মীছেলে, খেয়ে ফেলো ত বাবা চোঁ চোঁ করে'—

এত মিনতি সত্ত্বেও কিন্তু সাবু খাইতে সে সহসা রাজী হইল না। বায়না করিতে লাগিল। বৌদিদিরও ধৈর্য্য অসীম, অনেক কষ্টে তাহাকে ভুলাইয়া সাবুটুকু খাওয়াইলেন ও বিছানায় শোওয়াইয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া হাসিমুখে শঙ্করের সহিত গল্প করিতে বসিবেন এমন সময় ফন্তি উঠিয়া আসিল ও মায়ের কানে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল যে তাহারও ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে। শঙ্করকাকার সম্মুখে ক্ষুধার কথাটা চেঁচাইয়া বলিতে তাহার লজ্জা হইল। হাজার হোক, সে একটু বড় হইয়াছে ত।

বৌদিদি বলিলেন, ওই যে কড়াতে ঢাকা দেওয়া আছে, একটু ঢেলে নিয়ে খেয়ে শুয়ে পড় না মা, আমি শঙ্করকাকার সঙ্গে একটু কথা বলি।

ফন্তি ভিতরে চলিয়া গেল। একটু পরে ভিতর হইতে সে প্রশ্ন করিল, একটু দুধ মিশিয়ে নেব মা?

দুধ আবার কেন ফন্তু, একটুখানি দুধ আছে, বাবা আবার এখুনি হয়ত চা চাইবেন।

ভিতর হইতে আর কোন উত্তর আসিল না।

শঙ্কর প্রশ্ন না করিয়া পারিল না—এদের সবারই জ্বর নাকি, সব সাবু খেতে দিচ্ছেন যে?

বৌদিদির মুখে যেন মেঘ নামিয়া আসিল। কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য। সহাস্যমুখে তিনি বলিলেন, জ্বর না হলেও গা ছ্যাঁক-ছ্যাঁক করছে সবগুলোরই; তা ছাড়া, নিজে জ্বরে মরছি, এদের জন্যে আর ভাতের হাঙ্গাম করিনি রাত্তিরে। বাবাকে অবশ্য খানকতক লুচি ক'রে দিয়েছি সন্ধ্যেবেলা। আমাদের জন্যে আর কিছু করিনি এবেলা—বলিয়া বৌদিদি হাসিয়া গায়ের কাপড়টা আর একটু জড়াইয়া জড়োসড়ো হইয়া বসিলেন।

শীত করছে বৌদি? আমার গায়ের কাপড়টা নেবেন?

না না থাক, এতেই আমার বেশ গরম হচ্ছে।

পাশের ঘরে খুটখুট করিয়া শব্দ হইতে লাগিল।

বৌদিদি বলিলেন, বাবা উঠেছেন।

পরমুহূর্ত্তেই দরাজকণ্ঠে ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল, বৌমা ভনটু এসেছে না কি?

বৌদিদি উঠিয়া ভিতরে গেলেন। একটু পরেই সে শুনিতে পাইল বৃদ্ধ বলিতেছেন, কে, শঙ্কর এসেছে না কি? এত রাত্তিরে হঠাৎ, খাওয়া দাওয়া হয়েছে তো, জিগ্যেস করো সেটা! এখানেই ডেকে আনো না, এই শীতে বাইরে কেন?

বৌদিদি বাহিরে আসিয়া ডাকিতেই শঙ্কর ভিতরে গেল। গিয়া দেখিল ভনটুর বাবা কলিকায় ফুঁ দিতেছেন। গায়ে একটি দামি সাদা সোয়েটার। কলিকার আগুনের আভায় তাঁহার গৌরবর্ণ মুখখানি বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। শঙ্কর প্রবেশ করিতেই তিনি বলিলেন, এস, এস, এত রাত্তিরে কি মনে করে? বাইরেই বা বসে কেন, যা ঠাণ্ডাটা পড়েছে ··

ভনটুর কাছে দরকার ছিল একটু—বলিয়া শঙ্কর নিকটস্থ টুলটিতে বসিল। বৌদিদি বৃদ্ধের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া শঙ্করের উক্তি তাঁহার কর্ণগোচর করিলেন। ভনটুর বাবা কালা। খুব চীৎকার করিয়া কথা না বলিলে তিনি শুনিতেই পান না। কানের খুব কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিলে অবশ্য শুনিতে পান। সাধারণত ভনটুর বৌদিদিই সকলের কথা তাঁহাকে এইভাবে শুনাইয়া থাকেন।

শুনিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, ও ভনটু এখনও ফেরে নি বুঝি, ক'টা বাজে? এই বলিয়া বৃদ্ধ বালিশের নীচে হইতে চশমা বাহির করিয়া পরিধান করিলেন ও দেওয়ালের

ব্র্যাকেটের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, রাত ত খুব বেশী হয় নি, দশটা বাজে মোটে, এইবার ফেরবার সময় হয়েছে ভনটুর।

শঙ্কর বিস্মিত হইল। সে-ই ত হস্টেল হইতে বাহির হইয়াছে এগারোটার পর। সে বলিতে যাইতেছিল যে ঘড়িটা বোধ হয় স্লো আছে, বৌদিদি চোখ টিপিয়া নিষেধ করিলেন।

বৃদ্ধ কলিকাটি গড়গড়ার মাথায় বসাইয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, খাওয়া দাওয়া সেরে এসেছ ত, না এসে থাকো ত বৌমা খানকয়েক লুচি ভেজে দিক।

আমি খেয়ে এসেছি।

বৌদিদির মারফৎ এই কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, চা একটু হোক তা' হ'লে, চায়ের ত আর সময় অসময় নেই, কি বল বৌমা, আমাকেও একটু দিও।

পুরু লেন্সের চশমায় আলো বিকীরণ করিয়া তিনি বৌমার দিকে চাহিতেই বৌদিদি বলিলেন—হ্যাঁ, দিচ্ছি ক'রে।

বৌদিদি একটু হাসিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

শঙ্কর বসিয়া বসিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল ইহাদের সংসারের নানাবিধ অভাব সত্ত্বেও বৃদ্ধের কোনরূপ অস্বচ্ছলতা নাই। তাঁহার পরিষ্কার বিছানাপত্র, নেটের ফরসা মশারি, সারি সারি কলিকা, দামী গড়গড়া, দামী চটিজুতা, আলনায় পরিষ্কার কাপড়-জামা, চকচকে গাড়ুর উপর পাটকরা লাল গামছাখানি—দেখিয়া মনে হয় যেন কোন ধনী বৃদ্ধ দুই-চারিদিনের জন্য আসিয়া এই দরিদ্র পরিবারে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন। ইহার ঘরের বাহিরেই যে দৈন্য নানা মূর্ত্তিতে প্রকট হইয়া রহিয়াছে, তাহার লেশমাত্র আভাসটুকুও এ ঘরের মধ্যে নাই।

বৃদ্ধ চক্ষু বুজিয়া তামাক খাইতেছিলেন। হঠাৎ চক্ষু খুলিয়া শঙ্করকে বলিলেন, তুমি এসেছ ভালই হয়েছে, নানাদিক থেকে চিঠিপত্র লিখে উত্যক্ত ক'রে তুলেছে আমাকে—বলিয়া বৃদ্ধ চক্ষু বুজিয়া আবার তাম্রকূটে মন দিলেন। একটু পরেই আবার চোখ খুলিয়া বলিলেন, ভনটুর বিয়ের কথা গো! তোমরা দেখে শুনে একটা ঠিক করে ফেলো। বয়সও ত হয়েছে। আজকালই সব ধেড়ে ধেড়ে ছেলের বিয়ে হয়, আমাদের কালে—বৃদ্ধ আবার চক্ষু বুজিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ টানিয়া পুনরায় বলিলেন, আমার যখন বিয়ে হয় তখন আমার বয়স ষোল বছর আর ভনটুর গর্ভধারিণীর বয়স তখন আট কি নয়। আমার পিতার বিবাহ হয় আরো সকাল সকাল—বারো বছর বয়সে।—পুনরায় তামাকে মন দিলেন।

বাহিরে ভনটুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

বৌদি, বৌদি! শনটু!

শঙ্কর উঠিয়া বাহিরে যাইবার জন্য দাঁড়াইতেই ভনটুর বাবা চক্ষু খুলিয়া বলিলেন, যাচ্ছ কোথা, বস, এইখানেই বৌমা চা আনবে এখন।

শঙ্কর বলিল, ভনটু এসেছে।

য়্যাঁ, কি বললে?

শঙ্কর তখন তাঁহার কাছে গিয়া একটু চীৎকার করিয়াই তাহার কথার পুনরুক্তি করিল এবং বাহির হইয়া আসিল। বাহিরে আসিয়াই শুনিতে পাইল বৌদিদি বলিতেছেন, ছি ছি, এত রাত্তির করে মানুষে! তোমার অপেক্ষায় থেকে থেকে ছেলেমেয়েগুলো ঘুমিয়ে পড়ল, উনুনের আঁচ গেল। শঙ্করঠাকুরপো এসেছে, বসে আছে বাবার ঘরে। এই যে—

শঙ্কর ও ভনটু মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইল ও নিমেষের জন্য নীরবে পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল। নিমেষের জন্য।

তাহার পর ভনটু বলিল, কি রে, তুই হঠাৎ?

জানতে এলাম—

জানতে এলি! আচ্ছা, উন্মাদ ত তুই। আয় বাইকটা ধরে তুলি দু'জনে।

বৌদিদি বলিলেন, তা হ'লে তোমরা এস তাড়াতাড়ি, চায়ের জল হয়ে গেছে।

শঙ্কর বলিল, স্টোভের আওয়াজ পেলাম না, চায়ের জল করলেন কি ক'রে?

বৌদিদি বলিলেন, উনুনে আঁচ ছিল।

বৌদিদি এই বলিয়া ভনটুর দিকে চাহিলেন। ভনটু ও বৌদিদির ভাষাময় একটা দৃষ্টি-বিনিময় হইয়া গেল। শঙ্কর একটু বিস্মিত হইয়াছিল। বলিল, ব্যাপার কি?

ওসব মেয়েলি ব্যাপারে তোর ঢোকবার দরকার কি, আয় বাইকটা তুলি।

শঙ্কর ও ভনটু বাহিরে গেল।

বাহিরে গিয়া শঙ্কর দেখিল, বাইকটি বারান্দার নীচে

ঠেসানো রহিয়াছে। অন্ধকারেই শঙ্কর দেখিতে পাইল যে, বাইকের পশ্চাতে ও সম্মুখে নানারূপ জিনিস বাঁধা ও ঝুলানো রহিয়াছে। থাম্ মোমবাতিটা জ্বালি।

পকেট হইতে দিয়াশলাই বাহির করিয়া জ্বালিতেই শঙ্করের চোখে পড়িল সেই কাগজের ঠোঙাটা বারান্দায় নাগানো রহিয়াছে। তাহার ভিতর হইতে ক্ষুদ্র মোমবাতিটি বাহির করিতে করিতে ভন্টু বলিল, উঃ, রাস্তায় এতগুলো জিনিস নিয়ে যেন সার্কাস করতে করতে এসেছি!

জিনিসপত্র সমেত বাইকটা দুইজনে ধরিয়া উপরে তুলিয়া ফেলিল। তাহার পর ভন্টু বাইকটাকে ঠেলিয়া ভিতরে আনিতে আনিতে নিম্নকণ্ঠে শঙ্করকে বলিল, সব হদিস্ পেয়েছি তোর!

কি হদিস?

পরে সব বলব। এখানে সে সব কথা বলার সুবিধে হবে না।

দুই পেয়ালা চা লইয়া বৌদিদি রান্নাঘর হইতে বাহির হইলেন ও ভন্টুর কথার শেষার্দ্ধ শুনিয়া বলিলেন, কি সুবিধে হবে না! নাও, চা নাও! কি সুবিধে হবে না?

ভন্টু গম্ভীর মুখে বলিল, শঙ্করের সব ফ্রগিশ য়্যাফেয়ার, ঢুকো না ওতে।

বৌদিদি হাস্যদীপ্ত চক্ষে শঙ্করের পানে চাহিয়া আবার রান্নাঘরে ঢুকিলেন ও আর এক পেয়ালা চা লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

ভন্টু প্রশ্ন করিল, আবার কার চা?

বাবার।

চা লইয়া তিনি ঘরে ঢুকিলেন।

ভন্টু মুখ সূচালো করিয়া তাহার স্থূল শরীরের উপরার্দ্ধ নাচাইতে নাচাইতে বলিতে লাগিল, বা কুর কুর কুর কুর—

শঙ্করের চা খাওয়া হইয়া গিয়াছিল। ভন্টু তাহার কি হদিস পাইয়া আসিয়াছে না শোনা পর্য্যন্ত তাহার আর স্বস্তি ছিল না। ভন্টুকে সে বলিল, চল, বাইরে যাই।

থাম্, জিনিসপত্রগুলো বিড্‌ডিকারের জিম্মায় দিয়ে দিই আগে, বিড্‌ডিকার মানে বৌদিদি। চা দিয়া বৌদিদি বাহির হইয়া আসিলেন। ভন্টু উঠিয়া বাইক হইতে খুলিয়া খুলিয়া জিনিসগুলি তাঁহাকে দিতে লাগিল। ভন্টু জিনিস আনিয়াছিল কম নয়। চাল, ডাল, মশলা, শিশিতে করিয়া তেল, কিছু কমলালেবু, এক শিশি ঔষধ ও সেফ্‌টিপিন প্রভৃতি টুকিটাকি নানারকম জিনিস। সব নামাইয়া দিয়া ভন্টু বলিল, তুমি এবার শুয়ে পড় বৌদিদি। এই নাও তোমার জন্যে কমলালেবু এনেছি, শুয়ে শুয়ে ধ্বংস কর গে যাও। চারটি ভাতে ভাত আমিই ফুটিয়ে নিচ্ছি।

বৌদিদি হাসিয়া বলিলেন, ও বাহাদুরী আর করে কাজ নেই। হাত-পা পুড়িয়ে সেবারের মত শেষে এক কাণ্ড ক'রে বস আর কি!

ভন্টু মুখ-বিকৃতি করিয়া তাহাকে ভ্যাংচাইতে লাগিল। বৌদিদি হাসিতে হাসিতে জিনিসপত্র তুলিতে লাগিলেন।

শঙ্কর বলিল, বৌদি, আপনার জ্বর এখন কত?

আছে বোধ হয় একটু—সামান্যই হবে।

ভন্টু ভিতরে গিয়া একটা থার্মোমিটার লইয়া আসিয়া বলিল, এটা বাগিয়েছি আজ ধীরেনবাবুর কাছে। লাগাও ত দেখি।

বৌদিদি প্রথমে রাজি হ'ল না। অনেক বলা-কহার পর রাজি হইলেন। থার্মোমিটার লাগাইয়া দেখা গেল জ্বর ১০২°। শঙ্কর আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এত জ্বর লইয়াও বেশ স্বচ্ছন্দে হাসিমুখে রহিয়াছেন ত। বলিল, আপনি শুয়ে পড়ুন।

ভন্টু গম্ভীরভাবে বলিল, কেন ইউস্‌লেস্ য়্যাফেয়ারে ঢুকছিস। চল্, বাইরে যাই। বিড্‌ডিকার is as obstinate as a mule,

বৌদিদি হাসিয়া বলিলেন, পাগল হয়েছ তোমরা, অত জ্বর আমার নেই, ও থার্মোমিটার তোমাদের ভুল। ভাঙা থার্মোমিটার বলেই ধীরেন ডাক্তার দিয়ে দিয়েছে।

এতদুত্তরে ভন্টু মুখ বিকৃত করিয়া একবার তাঁহাকে ভ্যাঙাইল ও শঙ্করকে টানিয়া লইয়া বাহিরে আসিল। বাহিরে ভীষণ শীত। শঙ্কর প্রথমেই প্রশ্ন করিল, কি হ'ল কুষ্ঠির?

অনেক প্যাঁচ তোর, করালী বললে একদিনে হবে না।

প্যাঁচ? কি প্যাঁচ?

সঙীন প্যাঁচ এবং রঙীন প্যাঁচ। এর বেশী করালি আর কিছু বললে না। সব খুলে বলবে বলেছে আর একদিন। তোকে সঙ্গে নিয়ে যাব সেদিন এখন।

শঙ্কর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভন্টুর দিকে চাহিয়া রহিল।

আর কিছু বললে না?

না। উঃ কি শীত রে—চল্ ভেতরে চল্।

আসিতে আসিতে শঙ্কর বলিল, কোন খবর পেলি মেজকাকার?

কিচ্ছু না। ঘড়েল বাবাজি কোন খবর রেখে যায় নি।

শঙ্কর আবার প্রশ্ন করিল, করালী লোকটা রিলায়বল্ ত?

ভন্টু দাঁড়াইয়া হাত দুটি বিস্তার করিয়া সংক্ষেপে বলিল, গোদা চাম্।

ভন্টু গমনোদ্যত হইলে শঙ্কর বলিল, দাঁড়া আর একটা কথা জিগ্যেস করি। তুই এত রাত্রে বাজার করে নিয়ে এলি মানে? ছেলেগুলো সব সাবু খাচ্ছে—

ভন্টু দন্ত বিকশিত করিয়া হাসিয়া বলিল, নো মানি! দাদা টাকার অভাবে পড়ে পুরি থেকে টেলিগ্রাম করেছিলেন, তাকে টি. এম. ও. করতে গিয়ে অন্তভক্ষ্য ধনুর্গুণ-গোছ হয়ে দাঁড়াল। কি করব বল! উপায় কি! অনেক কষ্টে ধার ধোর করে জোগাড় করলাম কিছু টাকা। সব ফুরিয়ে গেছল, মায় চাল পর্য্যন্ত। চল্ ভেতরে চল্, বাইরে বড় ঠাণ্ডা।

ভিতরে আসিতেই বৌদিদি ভন্টুকে বলিলেন, আর একটু হলেই শঙ্করঠাকুরপো সব মাটি করেছিল। বাকুর ঘড়ি যে তুমি যাবার সময় দম দেবার নাম করে' দু'ঘণ্টা স্লো ক'রে দিয়েছিলে আর একটু হলেই সব ফাঁস হয়ে গেছল।

ভন্টু বলিল, সর্ব্বনাশ! বাকুর ঘড়ি দরকার মত স্লো ফাস্‌ট্ আমরা হরদম করছি। খবরদার ও বিষয়ে কক্ষনো কিছু বলিস না। বরং এমন ভাব করবি যে, ওইটেই বেস্‌ট্ ঘড়ি ইন্ ক্যালকাটা!

বৌদিদি হাসিতে লাগিলেন।

ভন্টু বলিতে লাগিল, মেজকাকা যে সরেছে তাই বাকু জানে না এখনও। বাকু জানে মেজকাকা প্রাণপণে চাকরির চেষ্টা করছে—সেই জন্যেই বাইরে যেতে হয়েছে, খবরদার বেফাঁস কিছু বলে ফেলিস নি যেন কোন দিন।

শঙ্কর একটু হাসিল। তাহার পর বলিল, আমি এবার যাই ভাই, রাত হয়েছে। এতটা আবার হাঁটতে হবে ত—

থেকে যা না আজ রাত্তিরে, লদকালদকি করা যাক্।

না, তা হয় না। হস্টেল থেকে পালিয়ে এসেছি ত, ফিরে না গেলে জানাজানি হয়ে যাবে। যা রামকিশোরবাবু আছেন, সেই তোর বক—

ভন্টু বলিল, ও, মিস্টার ক্রেন!

হ্যাঁ।

তাহলে যা। কাল আবার দেখা করব।

হ্যাঁ, নিশ্চয় আসিস। যাই তাহলে বৌদি।

এসো।

হ্যারিসন রোড দিয়া শঙ্কর একা হাঁটিয়া চলিয়াছিল। নানারূপ এলোমেলো চিন্তার আলোছায়ায় সমস্ত মনখানা তাহার বিচিত্র। মৃন্ময়বাবু ও তাহার চিঠির কথাটা সে এতক্ষণ ভুলিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। চিঠিখানা পকেট হইতে বাহির করিয়া রাস্তার আলোকে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতে লাগিল। এ কি, এ যে রীতিমত প্রেমপত্র! কে এই স্বর্ণলতা! হঠাৎ পিছন দিক হইতে একখানা মোটরকার আসিয়া তাহার পাশে থামিল।

শঙ্করবাবু যে, এখানে কি করছেন এত রাত্রে?

শঙ্কর চমকাইয়া তাড়াতাড়ি পত্রখানি পকেটস্থ করিল। ফিরিয়া দেখিল, অচিনবাবু। সেদিন প্রফেসার মিত্রের বাড়িতে রিণির জন্ম-তিথি উৎসবের দিন ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হইয়াছিল। অচিনবাবু মোটরকারের দালাল। দালালি করার মত সঙ্গতি আছে, দক্ষতাও আছে। শ্যামবর্ণ নাতিস্থূল বলিষ্ঠ ব্যক্তি। মাথায় সুবিন্যস্ত কোঁকড়ানো চুল। ভাসাভাসা চোখে দামি সোনার চশমা। কালো রঙে সোনার চশমা মানাইয়াছিল ভালো। মোটরখানিও দামি।

এখানে কি করছেন?

একটি বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম, ফিরছি।

আসুন তাহলে লিফ্‌ট্ দিয়ে দি।

চলুন।

মৃন্ময়বাবুর বাড়িতে ফিরিয়া তাঁহার জানালা গলাইয়া পত্রটি তাঁহার বাহিরের ঘরটিতে ফেলিয়া দিয়া যাইবে, এই উদীয়মান ইচ্ছাটি আর পূর্ণ হইল না। শঙ্কর অচিনবাবুর গাড়িতে চাপিয়া বসিল। গাড়িতে উঠিয়াই একটা তীব্র এসেন্সের গন্ধ সে পাইল। হাসিয়া বলিল, খুব গন্ধের ছড়াছড়ি দেখছি আপনার গাড়িতে!

গাড়িটা স্টার্ট করিয়া খুব গম্ভীর ভাবে অচিনবাবু বলিলেন, হ্যাঁ, এইমাত্র একজন সুরভিত প্রাণীকে নাবিয়ে দিয়ে এলাম।

জিগ্যেস করতে পারি কি, কে তিনি?

জিগ্যেস আপনি অবশ্যই করতে পারেন কিন্তু উত্তর দেওয়ার স্বাধীনতা আমার নেই।

স্টিয়ারিং ধরিয়া গম্ভীরমুখে অচিনবাবু সম্মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। দ্রুত নিঃশব্দ বেগে গাড়ি ছুটিয়া চলিয়াছে।

শঙ্কর মৃদুহাস্য করিয়া বলিল, আর প্রয়োজনও নেই, উত্তর পেয়ে গেছি—

অচিনবাবু তথাপি নীরব।

শঙ্করের মনে হইল যেন তাঁহার চোখের কোণে একটা অতি চাপা মৃদুহাস্য উঁকি দিতেছে। মুখ কিন্তু গম্ভীর। একটা রিক্সাওয়ালা গলি হইতে অপ্রত্যাশিত ভাবে বাহির হইল। তাহাকে পাশ কাটাইয়া অচিনবাবু আপন মনেই যেন বলিলেন, মানুষ মাত্রেই অহঙ্কারী। এইটেই বোধ হয় মানুষের বিশেষত্ব।

শঙ্কর কিছু বলিল না। একটু পরেই গাড়ি আসিয়া শঙ্করের হস্টেলের সম্মুখে দাঁড়াইল। শঙ্কর নামিয়া পড়িল। অচিনবাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, একটা ভুল ধারণা নিয়ে থাকবেন না যেন শঙ্করবাবু। যাঁর গন্ধ এতক্ষণ উপভোগ করতে করতে এলেন, তিনি নারী নন—পুরুষ।

এটা তা হ'লে কার?

শঙ্কর একটা সোনার মাথার কাঁটা অচিনবাবুর হাতে দিয়া হাসিয়া বলিল, গাড়ির সিটে ছিল।

অচিনবাবুর গাম্ভীর্য এতটুকু বিচলিত হইল না।

ও, ওটা আর একজনের, দিন। অনেক ধন্যবাদ। চলি তবে—গুড্ নাইট্!

মোটর চলিয়া গেল।

শঙ্কর নির্ব্বাক হইয়া সেদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্রমশঃ

করস্পর্শ

শ্রীস্মৃতিশেখর উপাধ্যায়

আমার চোখে ছিলনা চশ্‌মা।
তুমি এসে বস্‌লে পাশের চেয়ারে।
চশ্‌মাটা যেই ভুলে পরতে যাব,
ধর্‌লে হাত চেপে, বল্‌লে কাজ কি প'রে?

আমি বল্লাম—বিলক্ষণ।
তোমার মুখ যে ঠেক্‌বে ঝাপ্‌সা
মুখ দেখতে না পেলে
কথা কয়ে হয় না তৃপ্তি।

বল্লে—না-ই বা কইলে কথা।
অবচনে কি কথা বলা যায় না?
বল্লেম হেসে, ঝাপ্‌সা যদি দেখি
কথাগুলো হবে অস্পষ্ট স্বগতোক্তি।

এলে ত দেখা দিতে, কথা বলাতে,
তুমি এলেই আমার কথার কলে জল আসে।
নইলে আসে গলা পর্য্যন্ত
রসনায় পৌঁচায় না।

আজ নিলে চোখের দৃষ্টি কেড়ে,
অবচনে বল্‌তে হবে কথা,
অর্থাৎ, তুমি থেকেও থাক্‌বেনা চোখে,
শুন্‌বে শুধু অকথিত বাণী?

কিছু না বলে আমার হাত খানি নিলে হাতে,
এই প্রথম পেলেম তোমার সত্যিকার করস্পর্শ।
চোখে দৃষ্টি রসনায় বাণী ফুটল আমার হাতে,
বুঝ্‌লেম চোখবুঁজে মৌনে কথা চলে।

"শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান" সম্বন্ধে বক্তব্য

মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ

(৩)

কবিরাজ গোস্বামীর "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থের কোন কোন স্থলে পূর্ব্বাপর সংগতির বিচার করিয়া কেহ কেহ বলেন যে, "চরিতামৃত"-গ্রন্থে পরে অনেক পয়ার প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু "চরিতামৃতে"র সমালোচনায় বহুলেখক বিমানবাবু ঐরূপ কোন কথা লেখেন নাই। অবশ্য "চরিতামৃতে"র প্রত্যেক কথাকে বেদবাক্যের ন্যায় মানা যায় না, ইহা তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু তিনিও যে, শ্রদ্ধার সহিত "চরিতামৃত"-গ্রন্থের কিরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, ইহাও এখানে বক্তব্য। তিনি লিখিয়াছেন—

"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বাঙ্গলা সাহিত্যের অভ্রভেদী স্তম্ভস্বরূপ। ইহাতে কাব্য ও দার্শনিকতার অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় গোস্বামিগণ যে সমস্ত দুরূহ-তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন, তাহা কৃষ্ণদাস কবিরাজ যথাসম্ভব সরল করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরেজী কাব্য সাহিত্যে পাল্‌গ্রেভ্ যে কার্য্য করিয়াছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তি স্বরূপ সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ সেই কার্য্য করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের ভাবকে আস্বাদন করিয়া যদি সাধনপথে অগ্রসর হইতে হয়, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ছাড়া আর গতি নাই।" (৪১২পৃঃ)

বিমানবাবু পূর্ব্বে 'চরিতামৃত'কার কবিরাজ গোস্বামীর পাণ্ডিত্যেরও যথোচিত প্রশংসা করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে, কত শাস্ত্রের কত গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন, ইহাও তিনি বিশদভাবে বর্ণন করিয়াছেন। সেবিষয়ে কোন বক্তব্য নাই। কিন্তু বিমানবাবুর কোন কোন কথায় যে বক্তব্য আছে, তাহা এখানে লেখা আবশ্যক। বিমানবাবু লিখিয়াছেন,—

"কৃষ্ণদাস বাঙ্গলা দেশে থাকিতেই যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের বৈষ্ণবেরা "উদ্বাহতত্ত্ব" "একাদশীতত্ত্ব" পঠনপাঠনা করিতেন না। অথচ কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১।১৫।৩ শ্লোক উদ্বাহতত্ত্ব হইতে ও ১।২।১৪ শ্লোক "একাদশীতত্ত্ব" হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা হইতে দৃঢ় ধারণা জন্মে যে, ঝামট্‌পুরে বাস করার সময়েই তিনি স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।" (৩০৫পৃঃ)

বিমানবাবু তাঁহার ঐ দৃঢ় ধারণা প্রকাশ করিয়াও নিম্নে আবার পাদটীকায় লিখিয়াছেন,—

"ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণবেরা কি স্মৃতিশাস্ত্র আলোচনা করিতেন? নবদ্বীপের টোলে এখনও ব্রাহ্মণেতর জাতিকে স্মৃতিশাস্ত্র পড়ান হয় না।"

কিন্তু এই পাদটীকার প্রয়োজন কি, ইহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। তবে কি বিমানবাবু পরে আবার ঐ পাদটীকার দ্বারা কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের বৈদ্যত্ব বিষয়ে তাঁহার সেই সংশয়ই ব্যক্ত করিয়াছেন? কারণ, তিনি পূর্ব্বেই (৩০৪পৃঃ) লিখিয়াছেন, "কৃষ্ণদাস খুবসম্ভব জাতিতে বৈদ্য ছিলেন।" 'খুব সম্ভব' এই কথা বলিলেও কিন্তু সংশয় প্রকাশই হয়। কারণ সম্ভাবনাও সংশয়বিশেষ। উৎকট-কোটিক সংশয়ের নামই সম্ভাবনা।

কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় যে, বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত ঝামট্‌পুর গ্রামে রাঢ়ীয় বৈদ্যকুলেই জন্মগ্রহণ করেন, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। উক্ত বিষয়ে কোন বিবাদ বা মতভেদও আমরা জানি না। তাঁহার পরিচয় লিখিতে অন্যান্য লেখকগণও নিঃসন্দেহে তাঁহাকে বৈদ্য বলিয়াই লিখিয়া গিয়াছেন। সে বিষয়ে প্রমাণেরও অভাব নাই। ঝামট্‌পুরে এখনও কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের পাট্ আছে। তাঁহার বৈদ্যত্ব বিষয়ে সংশয় থাকিলে ঝামট্‌পুরে গিয়াও সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আমি ঝামট্‌পুরের নিকটবর্ত্তী গঙ্গাটিকুরী গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে কোন কারণে দুইবার গিয়া সেখানকার বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের নিকটেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৈদ্য, ইহাই শুনিয়াছি। কাহারও

নিকটে সে বিষয়ে কোন সংশয়ের কথাও শুনি নাই। বিমানবাবু সে বিষয়ে ঐতিহাসিক প্রমাণ চাহিতে পারেন। কিন্তু তিনি "পরিশিষ্টে" যে সমস্ত ভক্তকে নিঃসন্দেহেই বৈদ্য বলিয়া লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলেরই কি বৈদ্যত্ব বিষয়ে তিনি ঐতিহাসিক প্রমাণ পাইয়াছেন? তাহা পাইলে সেই সমস্ত প্রমাণ প্রদর্শন করাও তাঁহার উচিত ছিল। কারণ, সে বিষয়েও অনেকের ঐতিহাসিক প্রমাণ-প্রশ্নও হইতে পারে। সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্য-কুলচূড়ামণি কবিরাজ গোস্বামীর বৈদ্যত্ব বিষয়ে কোনরূপ সংশয় প্রকাশ করিলেও কিন্তু অনেক গোলে পড়িতে হয়।

যাহা হউক, আমরা বিমানবাবুর ঐ পাদটীকার কোন প্রয়োজন না বুঝিলেও ঐ কথায় সংক্ষেপে বক্তব্য এই যে, স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচনা ও স্মার্ত্ত পণ্ডিতের টোলে গিয়া যথানিয়মে অধ্যয়ন এক কথা নহে। অনেক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতও স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন। বম্বের ব্যবহারাজীব সুপ্রসিদ্ধ কাণে মহোদয় ইংরেজীতে স্মৃতিশাস্ত্রের বিস্তৃত ইতিহাস লিখিতে বহু স্মৃতিনিবন্ধ দেখিয়াছেন। আর একাদশ শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্য পণ্ডিত 'চরক চতুরানন' চক্রপাণিদত্ত এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে নানা গ্রন্থকার সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্য পণ্ডিত ভরত মল্লিক মূল স্মৃতিশাস্ত্র মন্বাদি সংহিতাও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন কি না, ইহা তাঁহাদিগের গ্রন্থ পাঠ করিয়াই বুঝিতে হইবে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কবিরাজ গঙ্গাধর যে, "মনুসংহিতা"রও টীকা করিয়াছিলেন, ইহাও জানা আবশ্যক। পরন্তু বিমানবাবুও পরে আবার লিখিয়াছেন,—

"পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, তিনি (কৃষ্ণদাস কবিরাজ) স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও স্মৃতির কিছু অংশ সে যুগে প্রত্যেক শিক্ষিত লোককেই পড়িতে হইত।" (৩১০পৃঃ)

তাহা হইলে বুঝিলাম,—ষোড়শ শতাব্দীতেও প্রত্যেক শিক্ষিত বৈদ্যই স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, ইহা বিমানবাবুর নিশ্চিত। তবে কেন তিনি পূর্ব্বে ঐরূপ সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন? আমরা জানি, নিশ্চিত বিষয়ে সংশয় জন্মে না। পরন্তু বিমানবাবুর ঐ শেষ কথাও কি নিশ্চিত সত্য? ষোড়শ শতাব্দীতে প্রত্যেক শিক্ষিত লোকই স্মৃতিশাস্ত্র পড়িয়াছেন, ইহাও কি শপথ করিয়া বলা যায়? এবিষয়ে আর অধিক লেখা অনাবশ্যক।

কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় "উদ্বাহতত্ত্ব" ও "একাদশীতত্ত্ব" হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করায় বিমানবাবু ঐ হেতুর দ্বারা যেরূপ অনুমান করিয়াছেন, তাহার পরীক্ষা করিতে হইলে প্রথমে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সংক্ষিপ্ত উক্তির ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। কারণ, "উদ্বাহতত্ত্ব" ও "একাদশীতত্ত্ব" কোন্ সময়ে কাহার রচিত কিরূপ স্মৃতিশাস্ত্র এবং কবিরাজ গোস্বামী তাহা হইতে কোন্ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহা বিমানবাবু বলেন নাই। অতএব এখানে প্রথমে বলা আবশ্যক যে, উক্ত "উদ্বাহতত্ত্ব" ও "একাদশীতত্ত্ব"—স্মার্ত্ত রঘুনন্দন প্রণীত স্মৃতিনিবন্ধ।

রঘুনন্দন "একাদশীতত্ত্বে" ব্রত লক্ষণের বিচার করিতে পরে "অনুবাদ্যমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। "চরিতামৃতে"র আদিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেখা যায়,—"তথাহি একাদশীতত্ত্বে ধৃতো ন্যায়ঃ—"অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ" ইত্যাদি। পরে ষোড়শ পরিচ্ছেদেও আবার ঐরূপে ঐ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।* ঐ শ্লোকের প্রতিপাদ্য এই যে, উদ্দেশ্য-বিধেয়-ভাব স্থলে প্রথমেই উদ্দেশ্য পদার্থ বলিয়া পরে বিধেয় পদার্থ বক্তব্য। প্রথমে উদ্দেশ্য না বলিয়া বিধেয় বক্তব্য নহে।

* "চরিতামৃতে"র ব্যাখ্যাকারগণের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে এখানে বক্তব্য এই যে, রঘুনন্দনের "একাদশীতত্ত্বে" উদ্ধৃত উক্ত শ্লোকে "অনুবাদ্য-মনুক্ত্বা তু" এইরূপ পাঠই আছে। "অনুবাদমনুক্ত্বা তু" এইরূপ পাঠ প্রকৃত নহে। শকুন্তলা নাটকের প্রথম শ্লোকের টীকায় বহুবিজ্ঞ রাঘব ভট্ট এবং সাহিত্যদর্পণে (৭ম পঃ) "বিধেয়াবিমর্ষ" দোষের ব্যাখ্যায় টীকাকার রামচরণ তর্কবাগীশ উক্ত শ্লোকে "অনুবাদ্যমনুক্ত্বৈব" এইরূপ পাঠ উদ্ধৃত করিলেও প্রথম পদে 'অনুবাদ্য' পাঠ সর্ব্বসম্মত। সাহিত্য দর্পণেও 'অনুবাদ্য' শব্দেরই প্রয়োগ হইয়াছে। প্রয়োজনবশতঃ সিদ্ধ পদার্থের কথনকে 'অনুবাদ' বলে। অতএব সেই সিদ্ধপদার্থকে বলা হইয়াছে "অনুবাদ্য"। উহার ফলিতার্থ উদ্দেশ্য। 'অনুবাদ্যং উদ্দেশ্যং অনুক্ত্বা বিধেয়ং ন উদীরয়েৎ ন কথয়েৎ', ইহাই ঐ শ্লোকের দ্বারা সমর্থন করা হইয়াছে। "একাদশীতত্ত্বে" উক্ত স্থলে রঘুনন্দনের বিচারও অবশ্য দ্রষ্টব্য। কিন্তু 'চরিতামৃতে' উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় পয়ারেও "অনুবাদ" শব্দই দেখা যায়। প্রকৃত পাঠনির্ণয়ের জন্য অনুসন্ধান করিয়াও আমি অতি প্রাচীন 'চরিতামৃতে'র পুঁথি দেখিতে পাই নাই।

কারণ তাহা বলিলে "বিধেয়াবিমর্ষ" দোষ হয়। উহা অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত কাব্যের দোষ বিশেষ।

রঘুনন্দন "উদ্বাহতত্ত্বে"র প্রথমে "ন গৃহং গৃহমিত্যাহু-র্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে" ইত্যাদি স্মৃতিবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। "চরিতামৃতে"র আদিলীলার পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে দেখা যায়,—"তথাহি উদ্বাহতত্ত্বে—ন গৃহং গৃহমিত্যাহু র্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে" ইত্যাদি। অতএব ঐ হেতুর দ্বারা বিমানবাবু অনুমান করিয়াছেন যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঝামট্‌পুরে বাস করার সময়েই স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

কিন্তু ঐরূপ ব্যভিচারী হেতুর দ্বারা বিমানবাবুর ঐ সাধ্য অনুমানসিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ কোন গ্রন্থ নিজে না দেখিয়াও অপরের মুখে শুনিয়া অথবা অপরের গ্রন্থে দেখিয়াও তাহার কথা উদ্ধৃত করা যায়। বিমানবাবুও কি কুত্রাপি তাহা করেন নাই? আর এই যে, এখন অনেকে বেদাদিশাস্ত্রের অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছেন, তাঁহারা কি সকলেই সেই সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন? পরের কথা লিখিলে যে, অনেকস্থলে তাহা ঠিক হয় না, ইহাও আমরা অনেকের গ্রন্থে দেখিতে পাইতেছি।

পরন্তু রঘুনন্দন "উদ্বাহতত্ত্বে" উক্ত বচন উদ্ধৃত করিতে পূর্ব্বে লিখিয়াছেন, "অতএব ভট্টভাষ্যে স্মৃতিঃ।" অর্থাৎ উক্ত বচনটি ভট্টভাষ্যে উদ্ধৃত স্মৃতিবচন। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী রঘুনন্দনের "উদ্বাহতত্ত্ব" স্বয়ং পাঠ করিয়া ঐ কথা লিখিলে তিনিও "তথাহি ভট্টভাষ্যে স্মৃতিঃ" অথবা "উদ্বাহতত্ত্ব ধৃতা স্মৃতিঃ" এই কথা লিখিবেন না কেন? ঐ "উদ্বাহতত্ত্ব" যে, মূল স্মৃতিশাস্ত্র নহে, ইহা তিনি অবশ্যই জানিতেন।

বস্তুতঃ বিমানবাবুর নিজের কথানুসারেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের শ্রীবৃন্দাবন যাত্রার পূর্ব্বে ঝামট্‌পুরে বাস করার সময়ে রঘুনন্দনের ঐ গ্রন্থ পাঠ করা সম্ভব নহে। কারণ, বিমানবাবু ঐ কথার পরেই তাঁহার মতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে জন্ম এবং ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে ৺শ্রীবৃন্দাবন যাত্রার কথা লিখিয়াছেন। (৩০৫ পৃঃ) কিন্তু রঘুনন্দনের "জ্যোতিস্তত্ত্ব" গ্রন্থ ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছে। এ বিষয়ে আমার প্রমাণ দেওয়া অনাবশ্যক। কারণ বিমানবাবু নিজেই পরে 'পরিশিষ্টে' (৬৫ পৃঃ) লিখিয়াছেন,—"তাঁহার জ্যোতিষতত্ত্ব গ্রন্থে ১৪৮৯ শকের অর্থাৎ ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দের উল্লেখ আছে।"

কিন্তু রঘুনন্দন ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে "জ্যোতিস্তত্ত্ব" রচনা করিলে "উদ্বাহতত্ত্ব" ও "একাদশীতত্ত্ব" কোন্ সময়ে রচনা করিয়াছেন? তিনি যে ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দের পরে নয় বৎসর মধ্যে ঐ দুই গ্রন্থ রচনা করেন নাই, কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজের ৺বৃন্দাবন যাত্রার অনেক পূর্ব্বেই উহা রচনা করিয়াছেন, এ বিষয়ে কোন প্রমাণই নাই। বিমানবাবু উক্তস্থলে সে বিষয়ে কোন চিন্তা করেন নাই। আর সেকালে যে, হস্তলিখিত ঐরূপ নূতন গ্রন্থের অন্যত্র শীঘ্র প্রচার সম্ভব হইত না, ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। বস্তুতঃ সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই ক্রমশঃ রঘুনন্দনের গ্রন্থের প্রচার ও কোন কোন গ্রন্থের পঠনপাঠনার আরম্ভ হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে সে বিষয়ে সকল কথা বলা এখানে সম্ভব নহে। এখানে বক্তব্য এই যে, ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কৃষ্ণদাস কবিরাজের ঝামট্‌পুরে বাস করার সময়ে রঘুনন্দনের ঐ গ্রন্থ পাঠ করা সম্ভব নহে।

অনেকদিন পূর্ব্বে কোন সুপণ্ডিত গোস্বামীকে আমি ঐ কথা বলিলে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, মনে হয়, পরে কোন অনুসন্ধিৎসু অভিজ্ঞ লেখক 'চরিতামৃতে'র পুঁথি লিখিতে যথাস্থানে "উদ্বাহতত্ত্বে" এবং "একাদশীতত্ত্বে ধৃতো ন্যায়ঃ"—এই কথা লিখিয়া দিয়াছেন। আমরা কিন্তু এইরূপও অনুমান করিতে পারি যে, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীবৃন্দাবনধামে কবিরাজ গোস্বামীর "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত"-গ্রন্থ রচনাকালে নবদ্বীপ হইতে শ্রীবৃন্দাবনধাম দর্শনার্থ উপস্থিত কোন পণ্ডিতের সঙ্গলাভ করিয়া আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার নিকটে রঘুনন্দনের "উদ্বাহতত্ত্ব" ও "একাদশীতত্ত্বে"র ঐ কথা সংক্ষিপ্তরূপে জানিয়াছিলেন। তিনি পরম জিজ্ঞাসু হইলেও তখন তাঁহার নিকটেও রঘুনন্দনের ঐ সমস্ত কথা সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারেন নাই। তখনও রঘুনন্দনের গ্রন্থের সম্পূর্ণ পঠনপাঠনা প্রচলিত হয় নাই। এ বিষয়ে আর অধিক লেখা অনাবশ্যক।

কিন্তু রঘুনন্দনের গ্রন্থের কথার প্রসঙ্গে অন্য একটি কথা মনে হইতেছে,—তাহা লেখা আবশ্যক। বিমানবাবু তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকার পরে অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থের তালিকায় লিখিয়াছেন,—৫৭। রঘুনন্দন প্রাণতোষিণীতন্ত্রম্। পরে "পরিশিষ্টে (২৯শ পৃঃ) লিখিয়াছেন, "কিন্তু নগেন্দ্রবাবুর-উক্ত গ্রন্থের ১৬১ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত বংশলতায় দেখা যায় যে,

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের পিতার নাম মহেশ বা মহেশ্বর। উক্ত বংশলতায় আরও পাওয়া যায় যে, “প্রাণতোষণী”তন্ত্র প্রণেতা রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার” ইত্যাদি। বিমানবাবু এখানে নগেন্দ্রবাবুর গ্রন্থের কথা লিখিলেও তদ্দ্বারা রঘুনন্দন যে “প্রাণতোষণী”কার নহেন, ইহাও পরে ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত কথার ঐরূপে সংশোধনও হইয়াছে।

বস্তুতঃ খড়্‌দহনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ধনী ও পরমধার্ম্মিক প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহোদয় রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের দ্বারা ঐ গ্রন্থ সম্পাদন করেন। প্রাণকৃষ্ণ নামের “প্রাণ” শব্দ ও রামতোষণ নামের “তোষণ” শব্দ গ্রহণ করিয়া ঐ গ্রন্থের নামকরণ হয়, ‘প্রাণতোষণী’। (প্রাণতোষিণী’ নহে)। রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ঐ গ্রন্থের প্রথম ভাগে—(বসুমতী সং, ৩য় পৃঃ) লিখিয়াছেন,—“শাকে নেত্র-যুগাদ্রি-কাশ্যপি মিতেঽতীতেক্ষয়ায়াং তিথৌ।” [নেত্র, ৩, যুগ ৪, অদ্রি ৭, কাশ্যপি (সূর্য্য) ১,] ‘অঙ্কস্য বামা গতিঃ’ এই নিয়মানুসারে উক্ত শ্লোকের দ্বারা বুঝা যায় যে, ১৭৪৩ শকাব্দ (১৮২১ খৃঃ) অতীত হইলে বৈশাখ মাসে ঐ গ্রন্থের আরম্ভ হয়।

উক্ত রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ঐ সময়ে প্রবীণ পণ্ডিত, ইহা নিশ্চিত। তৎপূর্ব্বে কলিকাতার হাতীবাগানে তাঁহার চতুষ্পাঠী ছিল। তখন জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় তাঁহার নিকটে অলঙ্কারশাস্ত্র পাঠ করেন। তিনি নিজেই আত্মপরিচয় বর্ণনে লিখিয়া গিয়াছেন,—“রামতোষণ-সংজ্ঞস্য বিদ্যালঙ্কারধীমতঃ। ছাত্রোঽহং সুপ্রসিদ্ধস্যালঙ্কার-গ্রন্থ-পাঠনে॥ উক্ত তর্কপঞ্চানন মহাশয় নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া প্রথমে সালিখায় চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অনেক দিন ন্যায়াদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। পরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রথম ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক নিমাই শিরোমণির পরলোক গমন হইলে তাঁহার স্থানে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তিনি কাশীলাভ করেন।

রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় “প্রাণতোষণী” গ্রন্থে (বসুমতী সং, ১৪৬ পৃঃ) “ধীমান্ শ্রীমান্ ভুবনবিদিত-স্তন্ত্রসারস্য কর্ত্তা, কৃষ্ণানন্দোঽজনি ভুবি নবদ্বীপদেশ প্রদীপঃ”, —ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা নিজেই যে পূর্ব্বপুরুষ-পরিচয়-বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়,—তিনি “তন্ত্রসার”-কর্ত্তা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের অধস্তন সপ্তম পুরুষ। তাঁহার পিতা কৃষ্ণমঙ্গল বিদ্যাবাগীশ কৃষ্ণানন্দের কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্বনাথের বৃদ্ধ প্রপৌত্র। তিনি কৃষ্ণানন্দের অত্যতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র।

এত কথা লিখিবার প্রয়োজন এই যে, ‘বসুমতী সাহিত্য-মন্দির’ হইতে প্রকাশিত ‘প্রাণতোষণী’ গ্রন্থের ভূমিকায় (২১ পৃঃ) লিখিত হইয়াছে,—“তন্ত্রসার-সংকলয়িতা শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের বৃদ্ধপ্রপৌত্র তান্ত্রিকাচার্য্য রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার।” পরে (২৩ পৃঃ) লিখিত হইয়াছে,—“যুগাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দের মহাগ্রন্থ তন্ত্রসার।” আরও অনেকে ঐরূপ কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক হইলে তাঁহার বৃদ্ধ-প্রপৌত্ররূপে রামতোষণ কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক।

‘বিশ্বকোষ’ সম্পাদক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নগেন্দ্রনাথ বসু মহোদয় “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে”র বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কাণ্ডে (১৬০ পৃঃ) লিখিয়া গিয়াছেন যে, রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার “প্রাণতোষণী” গ্রন্থে গুরুশিষ্য লক্ষণে লিখিয়াছেন, “আমার অত্যতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের তন্ত্রসারে এই লক্ষণ উক্ত হইয়াছে।” কিন্তু উক্ত স্থলে আমরা রামতোষণের ঐরূপ কোন কথাই পাই না। পরন্তু নগেন্দ্রবাবু পূর্ব্বে আরও লিখিয়া গিয়াছেন,—

“কৃষ্ণানন্দ, শ্রীচৈতন্য, রঘুনাথ শিরোমণি নবদ্বীপে একই গুরুর চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতেন। কৃষ্ণানন্দের সহিত শ্রীচৈতন্যের প্রথমে হরিহর আত্মা ছিল। যৎকালে শ্রীচৈতন্য সখীভাবে শ্রীকৃষ্ণভজনে আকৃষ্ট হন, তদবধি দুই জনের মনোমালিন্য আরম্ভ হয়। কৃষ্ণানন্দ গৌরকে সখীভাবে ভজনা করিতে নিষেধ করিয়া অপমানিত হন এবং সেই সময় হইতে দুইজনে পৃথক্‌ভাবে শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারে বদ্ধপরিকর হন।” ১৫৭ পৃঃ।

কিন্তু তাহা হইলে “শ্রীচৈতন্যচরিত”-গ্রন্থে ঐ কথার কোনরূপ উল্লেখ নাই কেন? শ্রীচৈতন্যদেবের সহাধ্যায়ী মুরারি গুপ্তও নিজ গ্রন্থে আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দের কোন কথা বলেন নাই। দুঃখের সহিত লিখিতে হইতেছে যে, কোন প্রমাণ না দিয়া কোন বিচার না করিয়া এযুগেও ঐরূপ অনেক গল্প ইতিহাসরূপে লিখিত হইয়াছে। আর

অনেক স্থানে অনেক প্রবাদ এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে যে, বহু প্রতিবাদ করিলেও তাহার প্রভাব নষ্ট হয় না, এবং অনেকে সে বিষয়ে কোন বিচারই করেন না। কিন্তু বিচার করা অত্যাবশ্যক যে, পূর্ব্বোক্ত জয়নারায়ণ তর্ক-পঞ্চাননের অধ্যাপক যে রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার ১৮২২ খৃষ্টাব্দে—“প্রাণতোষণী” রচনা করিয়াছেন, তাঁহার ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ কৃষ্ণানন্দ কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। আমাদিগের বিচারে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে অর্থাৎ ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা নিশ্চিত।

এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, আমরা কিন্তু প্রবাদ-মাত্রকেই অসত্য বলি না। যে প্রবাদ চিরপ্রসিদ্ধ এবং যাহাতে কোন বিবাদ নাই, তাহা কোন প্রমাণ বিরুদ্ধ না হইলে মূলতঃ সেই প্রবাদকে অসত্য বলা যায় না। যেমন—পূর্ব্বোক্ত বাসুদেব সার্ব্বভৌম নবদ্বীপ হইতে মিথিলায় গিয়া ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়া আসিয়াছিলেন এবং রঘুনাথ শিরোমণি তাঁহার ছাত্র, ও রঘুনাথ কাণ ছিলেন, এইরূপ প্রবাদ বঙ্গদেশে চিরপ্রসিদ্ধ। নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ ঐরূপ অমূলক প্রবাদের সৃষ্টি করেন নাই। নবদ্বীপ হইতে কখনও কেহ অন্যত্র পড়িতে যান নাই, চিরকাল হইতেই নবদ্বীপ সর্ব্ব-বিদ্যাপীঠ, এইরূপ বলিয়া তাঁহারাও কখনও নবদ্বীপের গৌরব খ্যাপন করেন নাই। উক্তরূপ প্রবাদের বিরুদ্ধে এ পর্য্যন্ত কোন প্রমাণও পাওয়া যায় নাই। ৺কাশীধামে বহুবিজ্ঞ গবেষক মঃ মঃ বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদী এবং মঃ মঃ শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহোদয় প্রভৃতিও উক্ত প্রবাদকে অসত্য বলেন নাই। রাধানগরে সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণে বহুবিজ্ঞ ঐতিহাসিক ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও নিঃসন্দেহেই লিখিয়া গিয়াছেন—“অনেক বড় বড় বাঙ্গালী পুরুষোত্তমে যাইয়া বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে বাসুদেব সার্ব্বভৌম সর্ব্বপ্রধান। এই বাসুদেব সার্ব্বভৌমই সর্ব্বপ্রথম মিথিলায় গিয়া ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়া আসেন।”

কিন্তু বিমানবাবু তাঁহার নিবন্ধের পরিশিষ্টে (৮৯ পৃঃ) লিখিয়াছেন,—“লক্ষ্মীধর কৃত “অদ্বৈতমকরন্দে”র টীকায় বাসুদেব সার্ব্বভৌম নিজ পিতাকে “বেদান্তবিদ্যাময়” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পিতা মহেশ্বর বিশারদ “প্রত্যক্ষ-মণি মাহেশ্বরী” নামে “তত্ত্ব-চিন্তামণি” গ্রন্থের এক টীকা লেখেন (গোপীনাথ কবিরাজ Saraswati Bhaban Studies, IV, P. 60)। সুতরাং সার্ব্বভৌম যে, মিথিলায় গিয়া “তত্ত্ব-চিন্তামণি” মুখস্থ করিয়া আসিয়াছিলেন এই কিম্বদন্তি বিশ্বাস করা যায় না। বস্তুতঃ, খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে বাংলা দেশে ন্যায়ের চর্চ্চা হইয়াছিল, ন্যায়কন্দলীর লেখক শ্রীধর রাঢ়ের লোক। শ্রীচৈতন্য বা রঘুনাথ শিরোমণি যে, সার্ব্বভৌমের ছাত্র ছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই।”

বুঝিতেছি,—বিমানবাবু এখানে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে উপযুক্ত অধ্যয়ন ও সম্পূর্ণ বিচার না করিয়াই সহসা অসংকোচে ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার কথায় বক্তব্য এই যে, শ্রীধর ভট্ট “ন্যায়কন্দলী”র শেষে লিখিয়া গিয়াছেন,— “ত্র্যধিকদশোত্তরনবশতশাকাব্দে ন্যায়কন্দলী রচিতা॥” ৯১৩ শকাব্দ ৯৯১ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু তৎপূর্ব্বে নবম শতাব্দীতেও যে, বঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা হইয়াছে, এ বিষয়ে বিমানবাবু কোন প্রমাণ বলেন নাই। “ন্যায়-কন্দলী”কার শ্রীধরভট্ট “রাঢ়ের লোক” হইলেও তিনি দশম শতাব্দীর শেষে বৈশেষিক দর্শনের প্রশস্তপাদভাষ্যের “ন্যায়কন্দলী” নামে টীকা রচনা করেন। উহা ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ না হইলেও উহাতে ন্যায়ভাষ্যাদি প্রাচীন ন্যায়গ্রন্থের অনেক কথা আছে। সুতরাং তৎকালে বঙ্গে যে প্রাচীন ন্যায়গ্রন্থের বিশেষ চর্চ্চা হইয়াছে,—ইহা নিশ্চিত।

কিন্তু পরে মিথিলার গঙ্গেশ উপাধ্যায় “তত্ত্ব-চিন্তামণি” নামে যে অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করেন, উহাই নব্যন্যায়ের মূলগ্রন্থ। গঙ্গেশ প্রথমে “তত্ত্ব-চিন্তামণি”র দ্বারা মিথিলায় নব্যন্যায় মন্দিরের যে মণিময়ভিত্তির প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার উপরেই ক্রমে মিথিলার বহু সুদক্ষ টীকাকার নব্যন্যায়ের সুবিশাল মহামন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ভারতের বিদ্বৎসমাজকে চমৎকৃত করেন। তৎকালে গঙ্গেশের ঐ “তত্ত্ব-চিন্তামণি”র এমন প্রতিষ্ঠা হয় যে, যিনি উহা পড়েন নাই, তিনি ন্যায়ভাষ্যাদি প্রাচীন ন্যায়গ্রন্থে সুপণ্ডিত হইলেও নৈয়ায়িক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন না। আর যিনি ঐ “তত্ত্ব-চিন্তামণি”র নূতন টীকা করিতে পারিতেন,—তিনি তখন ভারতের বিদ্বৎসমাজে অসামান্য গৌরব লাভ করিতেন। তাই তখন ভারতের নানা দেশ হইতে বহু বিদ্যার্থী গঙ্গেশের “তত্ত্ব-চিন্তামণি” পাঠ করিবার জন্য

মিথিলায় গমন করিতেন। কারণ তখন অন্যত্র "তত্ত্ব-চিন্তামণি" প্রভৃতি নব্যন্যায়গ্রন্থের অধ্যয়ন সম্ভব হইত না।

বিমানবাবুর মনের কথা এই যে, নবদ্বীপে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদই যখন "তত্ত্ব-চিন্তামণি"র টীকা করিয়াছিলেন, তখন তৎপুত্র বাসুদেবের "তত্ত্ব-চিন্তামণি" পাঠ করিতে মিথিলায় যাওয়া অনাবশ্যক। কিন্তু তাহা হইলে মহেশ্বর বিশারদ কোথায় গিয়া "তত্ত্ব-চিন্তামণি" পাঠ করিয়াছিলেন? ইহা বলা আবশ্যক। আর তিনি—"তত্ত্ব-চিন্তামণি"র প্রত্যক্ষ খণ্ডের "প্রত্যক্ষ-মণিমাহেশ্বরী" নামে টীকা করিলেও সুবিস্তৃত অনুমান খণ্ড প্রভৃতিও যে, তিনি সম্পূর্ণ পাইয়াছিলেন এবং তাহাও তিনি নিজ পুত্র বাসুদেবকে পড়াইয়াছিলেন এবং বাসুদেব নবদ্বীপেই মহানৈয়ায়িক হইয়া সার্ব্বভৌম উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এ বিষয়ে প্রমাণ কি আছে? তাহাও কি সহসা ঐরূপ অনুমান দ্বারাই নিশ্চিত হইতে পারে?

বস্তুতঃ বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদই যে, "তত্ত্ব-চিন্তামণি"র প্রত্যক্ষখণ্ডের "প্রত্যক্ষ-মণিমাহেশ্বরী"র টীকাকার, ইহা নিশ্চিত হয় নাই। 'মাহেশ্বরী' এই নামের দ্বারাই তাহা নিশ্চয় করা যায় না। পরমানন্দ চক্রবর্ত্তীর পরে "কাব্যপ্রকাশে"র টীকাকার মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারও নব্যন্যায়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি অথবা অন্য কোন মহেশ্বর যে, ঐ "মাহেশ্বরী" টীকার কর্ত্তা নহেন, এ বিষয়েও প্রকৃত প্রমাণ আবশ্যক। বিমানবাবু মঃ মঃ শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের প্রবন্ধ দেখিয়াই ঐরূপ নিশ্চিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বহু-গ্রন্থদর্শী উক্ত কবিরাজ মহাশয়ও নিশ্চয়পূর্ব্বক ঐ কথা লেখেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন,—

It cannot now be ascertained whether Visarada was an author, but I believe that Ms. no. 240, a comm. on Tattva Chintamani (Ist section), deposited in the Govt. Sanskrit Library, Benares, and labelled as Pratyaksa-manimahesvari was *his* production. This is avowedly a mere conjecture, with no claim to the stability of an established thesis, but the following considerations, weighed together, would seem to bear this sufficiently out. (Sarasvati Bhaban Studies, Vol. iv p. 60).

পরন্তু বাসুদেব সার্ব্বভৌম বন্দ্যবংশসম্ভব (বন্দ্যোপাধ্যায়) ছিলেন। নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে"র রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকাণ্ডে বন্দ্যবংশ বিবরণে মুদ্রিত "কুলপঞ্জিকা"য় বাসুদেবের পিতার নাম 'নরহরি' ইহা পাওয়া যায়। বিমানবাবু পূর্ব্বোক্ত পরিশিষ্টে (৯০ পৃঃ) পরে ঐ কথারও সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—"কিন্তু সার্ব্বভৌমের নিজের লেখায় ও শ্রীচৈতন্যভাগবতে (২।২১) যখন তাঁহার পিতার নাম মহেশ্বর বিশারদ পাওয়া যাইতেছে, তখন নাতিপ্রামাণিক কুলজী শাস্ত্রের কথায় বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।"

কিন্তু সার্ব্বভৌমের নিজের লেখায় কোথায় তাঁহার পিতার নাম মহেশ্বর বিশারদ পাওয়া যাইতেছে,—ইহা ত বিমানবাবু দেখান নাই। পরন্তু তিনি মঃ মঃ শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের যে প্রবন্ধ দেখিয়া ঐ সমস্ত কথা লিখিয়াছেন,—সেই প্রবন্ধেই কবিরাজ মহাশয় নিয়ে শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন,—"শ্রীবন্দ্যান্বয়কৈরবামৃতরুচো বেদান্তবিদ্যাময়াদ্ ভট্টাচার্য্যবিশারদান্নরহরেঃ" ****॥*

"অদ্বৈতমকরন্দে"র টীকার প্রারম্ভে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের উক্ত শ্লোকের দ্বারা বুঝা যায়,—ভট্টাচার্য্যবিশারদ নরহরি বন্দ্যবংশরূপ কুমুদের চন্দ্রস্বরূপ ও বেদান্তবিদ্যাময় ছিলেন। বিমানবাবু লিখিয়াছেন,—"অদ্বৈতমকরন্দে"র টীকায় বাসুদেব সার্ব্বভৌম নিজ পিতাকে বেদান্তবিদ্যাময়" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন"। কিন্তু উক্ত শ্লোকে সার্ব্বভৌম যাহাকে "বেদান্তবিদ্যাময়" বলিয়াছেন, তিনি যে, উক্ত শ্লোকে নরহরি নামেই কথিত হইয়াছেন, ইহাও ত দেখা আবশ্যক। তাহা হইলে সার্ব্বভৌমের নিজের লেখায় কোথায় তাঁহার পিতার নাম মহেশ্বর পাওয়া যাইতেছে এবং নরহরিই বা কে? ইহাও বলা আবশ্যক। কিন্তু এ বিষয়ে সহসা কিছু বলা যায় না।

ক্রমশঃ

* কবিরাজ মহাশয় সম্পূর্ণ শ্লোক উদ্ধৃত করেন নাই। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উদ্ধৃত উক্ত শ্লোকে পরে দেখা যায়,……নরহরের্য প্রাপ ভাগীরথী। গৌড়াচার্য্যবরেণ তেন রচিতা লক্ষ্মীধরোক্তেরিয়ং শুদ্ধিঃ কাচন বাসুদেব কৃতিনা বিদ্বজ্জনপ্রীতয়ে॥" দ্বিতীয় চরণে "যঃ প্রাপ ভাগীরথীং" এইরূপ পাঠই প্রকৃত মনে হয়। তাহা হইলে বাসুদেব নরহরি হইতে গঙ্গাতীরবাসী হইয়াছিলেন,ইহা ঐ কথার দ্বারা বুঝা যায়। আমার এইরূপ জানা ছিল যে, বাসুদেবের পিতামহ নরহরি স্থানান্তর হইতে পুত্র মহেশ্বর ও পৌত্র বাসুদেবকে লইয়া নবদ্বীপের নিকটে গঙ্গাতীরবাসী হন। তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যবলে নবদ্বীপে ভট্টাচার্য্যবিশারদ নামে খ্যাত হন। রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায়ও দেখা যায়—"ভট্টাচার্য্যবিশারদো নরহরিঃ খ্যাতো নবদ্বীপকে।" তাঁহার পুত্র মহেশ্বর কেবল বিশারদ নামেই খ্যাত হন। কবিরাজ মহাশয় উক্ত প্রবন্ধে বাসুদেবের পিতার নামই নরহরি বলিয়া তাঁহারই অপর নাম মহেশ্বর বলিয়াছেন। 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে' নগেন্দ্রবাবুও (২৪৪ পৃঃ) "নরহরি (মহেশ্বর)" এইরূপ লিখিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে বাসুদেব নরহরির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কি, তাহা বলেন নাই, ইহাও লক্ষ্য করা বিশেষ আবশ্যক। প্রশ্ন এই যে, ভট্টাচার্য্য-বিশারদ বেদান্তবিদ্যাময় নরহরি তাঁহার পিতা হইলে তিনি উক্ত শ্লোকে তাঁহার পিতৃত্ববোধক কোন শব্দ প্রয়োগ করেন নাই কেন? পিতার পরিচয় বর্ণনে সমস্ত গ্রন্থকারই 'তাত' প্রভৃতি কোন শব্দের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাতে উহা অবশ্য কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে পরে আবার আলোচনা করিব।

পল্লী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

তোমারে যে আমি ভালবাসিয়াছি
কাব্য পড়িয়া নহে,
নহে ক' নিবিড় মমতার লাগি
অন্যে যে কথা কহে।
হয়েছি তোমার সুখ-দুখভাগী
নহে ক' নেহাৎ অভাবের লাগি,
আমার ভক্তি এ অনুরক্তি
হৃদয়-রক্তে বহে।

২

তোমার আদরে মানুষ হয়েছে
মোর পিতা পিতামহ,
তব অণুকণা সে পুণ্যকথা
কহে মোরে অহঃরহ।
তুমি মোর গয়া তুমি মোর কাশী
সকল তীর্থ মিলিয়াছে আসি,
এক দিকে তুমি "ভ্রমরা' আমার
একদিকে কালিদহ।

৩

মোর চোখে তুমি অর্দ্ধেক কায়া
অর্দ্ধেক ছায়াময়ী
স্বরগের সাথে মিতালি পাতাই
তোমার নিকটে রহি।
চৌদিক হ'তে স্নেহের কি ডাক,
ডুবায় অপর শব্দ বেবাক,
অক্ষয় কি যে গড়িয়া তুলিছ
লয়ে এই দেহ ক্ষয়ী।

৪

প্রতিভাদীপ্ত মহতে বৃহতে
হেরি দূরে পুরোভাগে,
ক্ষুদ্র যে আমি উল্লাসে ভাসি,
হিংসা ত নাহি জাগে।
সাগরের তলে শুক্তির মত,
মুক্তারই কথা ভাবি অবিরত,
মহাসাগরের বিশালতা স্মরি
ভরে বুক অনুরাগে।

৫

জয়যাত্রা ও শোভাযাত্রায়
দিই আমি বলিহারী,
আমি তৃপ্তির স্নানযাত্রার
হতে চাই অধিকারী।
নহি উজ্জ্বল বিদ্যুৎ দীপ
আমি কুটীরের মাটীর প্রদীপ,
ক্ষণিকের তরে তুলসীতলায়
ক্ষীণ আলো দিতে পারি।

৬

ভালবাসি হেথা ভক্তিতে জ্বলা
শান্তিতে ধীরে নেভা।
ভালবাসি এই অনটন মাঝে
দিন-অতিথির সেবা।
আছি আমি লয়ে হেথা কোন্ দূরে
দীনতা এবং দীন বন্ধুরে,
খ্যাতি যশ মান জয় যুদ্ধের
খবর রাখিছে কেবা?

৭

আমি নর্ম্মদা মর্ম্মরতটে
বাঁধিতে চাহি না ঘর।
উচ্চ প্রাসাদ অলিন্দ হেরি
ভীত মোর মধুকর।
লেবুর কুঞ্জ, মাধবীর শাখে
ছোট মৌচাক বাঁধিয়া সে থাকে,
কাশ্মীর ডাল কমল-কানন
নয় তার প্রিয়তর!

৮

মোর কাছে তব পথের এ ধূলি
রজের গরিমা পায়,
আমি ভালবাসি গড়াগড়ি দিতে
এ প্রেমের নদীয়ায়।
তিমির সদয় বন্ধুর মত
সরাইয়া দেয় বাজে ভিড় যত,
মুদিত চরণ পঙ্কজে মন
গুঞ্জন ভুলে যায়।

মোহ-মুক্তি

নাটক

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টম দৃশ্য

স্থান···রমণ মিত্রের (ভক্তিভূষণের) বহির্দ্দালান
সিদ্ধিচক্র বা সিদ্ধিসভা

সম্মুখে পূর্ণ-কলস ও কদলীবৃক্ষদ্বয়, উপরে আম্রপল্লব ও পুষ্পাদির টানা —এক দিকে পুরুষগণ, অপর দিকে (অন্দর পথে) স্ত্রীলোকেরা কয়েকজন, খোল-করতালসহ সংকীর্ত্তনে মত্ত

শ্রীভক্তিভূষণ এসে দু'হাত তুলে তন্ময় ভাবে যোগ দিলেন। তাঁকে মধ্যস্থানে নিয়ে চন্দ্রবাবু, হারু, আশু বিশ্বাস ঘিরে সতর্ক ভাবে, বাহুবেষ্টনী মধ্যে রেখে, ঘোরা ফেরা করতে লাগলেন।

কীর্ত্তন গীত

যমুনা জল হতে কেবা উঠি যায়
সিক্ত নীলাঞ্চল গায়।
কেনো ফিরি চায় ?
সে তো শুধু যায় না, সে যে লয়ে যায়,
প্রাণ হরণ করি রেখে যায় কায়,—
কেনো চলি যায় ?
যাও, কেনো ফিরি ফিরি চাও
আহতে আঘাতি তুমি—কিবা সুখ পাও ?
ওই আঁখি ঢল ঢল,
মোর, পরশি হৃদয় তল—
করে যে মরম অধিকার !
ওই অধীর অঞ্চল লুটি,
মোর, যা ছিল নিল যে লুটি,
কিছু যে গো রাখে না আমার !
ওগো যেও না, মোর প্রাণ ফিরায়ে দিয়ে যাও,
মোর মরণে চরণে নাহি নুপুর বাজাও।
আমি না বুঝি চাহিয়াছিনু বদন পানে,
এবে, কেমনে ফিরিব ঘরে হারাণো প্রাণে ?
অবোধ রাখালে রাখো—মিনতি তোমায়।
'যা ছিল নিল যে লুটি'

এই পদটির দ্বিতীয় ফেরতা শেষ হ'তেই শ্রীভক্তিভূষণ সহসা তেউড়ে কেমন হয়ে গেলেন। থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগলেন। পরে উচ্চৈস্বরে "এসো—এসো—জয় শ্রীরাধে, জয় শ্রীরাধারাণী—'জয় শ্রীমতী" বলতে বলতে আর উর্দ্ধে হাত্ড়াতে হাত্ড়াতে, শিবনেত্র হয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে এলেন।—

অবস্থা দেখে সকলেই চঞ্চল হয়ে উঠলেন। চন্দ্রবাবু, উমেশবাবু, আর হারু ভট্টচায্ পতনোন্মুখ প্রভুকে ধোরে বসিয়ে দিলেন। তিনি অভ্যাসগুণে পদ্মাসন হয়ে পড়লেন।—

মেম্বারেরা তাঁর উপর পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলো। কদম একটি মেয়ের খোঁপায় জড়ানো একগাছি মালা তাড়াতাড়ি খুলে নিয়ে প্রভুর গলায় পরিয়ে দিলে।

মেয়েদের দিক হতে "কি হল' গো, কি হবে গো!" শুনতে পাওয়া গেল। মিত্র-গৃহিণীর কান্নার সুর শোনা গেল। হারু বিচলিত হয়ে চন্দ্রবাবুর দিকে চেয়ে বলে উঠলো—"এ কি হ'ল চৌধুরী মশাই ?"

চন্দ্র। আপনারা সব স্থির হোন্, কোনো চিন্তা নেই।

হারু। (ব্যস্তভাবে) প্রভু কি যেন বলচেন···

সকলে উৎকর্ণ

প্রভু। "বড়ো ব্যাকুল হয়ে আসছে, আহা বড় কাতর, বড় ভক্ত—উপবাসী—কিছু বোল না···

হারু। কে আসছে প্রভু ?

প্রভু। (দক্ষিণ দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ)

সহসা ব্যাকুল ভাবে দুইজন বৈষ্ণবের প্রবেশ
বড়টির মুণ্ডিত-মস্তক, তিলক, মালা, দেহ চন্দন-চর্চ্চিত। সুন্দর কান্তি। যুবাটির প্রলম্ব কেশ, দীন ভাব। দেখে সকলে সবিস্ময়ে সচকিত

বৈষ্ণব। (অতি দীনভাবে) এই 'ব্রজ-মন্দির' ? সংকীর্ত্তন এইখানেই হচ্ছিল বাবা ?

আশু। এটা "ব্রজ-মন্দির" নয়। সংকীর্ত্তন এইখানেই হচ্ছিল। আপনারা দয়া করে' বসুন—আমরা···

বৈষ্ণব। (শিষ্যের প্রতি) তবে আমাদের ভুল হয়েছে

বাপ্। (উমেশের দিকে) বাবা, আজ দুদিন 'ব্রজমন্দির' খুঁজে বেড়াচ্ছি। "ব্রজমন্দিরে চললুম" বলে আমাদের রাধা মা চলে এসেছেন···

দীর্ঘনিশ্বাস

শিষ্য। এই স্থানটিই অভিরামপুর কি ?

আশু। হাঁ, এইটাই অভিরামপুর। আমরা এখন বড় বিপন্ন বড় উদ্বিগ্ন রয়েছি বাবা। প্রভু ভাবাবেশে রয়েছেন। পূর্ব্বে আমরা এরূপ অবস্থা তাঁর দেখিনি। বড় ভয় পাচ্ছি···

বৈষ্ণব। কি বললেন—ভাবাবেশ ? কই কই প্রভু ? (দর্শনান্তে) এই যে—জয় রাধারাণী। ধন্য, ধন্য হলাম।

সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত, শিষ্যের তথাকরণ

কি ? ভাবাবেশ ? কে বললে বাপ্ ? এ যে পূর্ণ বেগ্-সমাধির লক্ষণ—"কুটিচক্" অবস্থা। ধন্য হলাম—ভয় আবার কি বাবা। উনি এখন ভব-ভয়-নাশন। জন্ম জন্মান্তরের সাধনালব্ধ সিদ্ধি আজ ওঁর করতলগত। ওঁর কাছেই আমার রাধারাণীজির সংবাদ পাবো। (শিষ্যের প্রতি) হরিকুমার—ওঁর দেহময় দিব্যজ্যোতির খেলাটা লক্ষ্য করো। বহু বাঞ্ছিত অবস্থা—দেবতাদেরও কাম্য···

চন্দ্র। (বিস্ময় ভাব) এইমাত্র প্রভু বলেছিলেন—"ভক্ত ব্যাকুল হয়ে আসছে"···

বৈষ্ণব। আমি প্রভুর সঙ্গে কথা কইতে পারি ?

হারু। (ব্যস্তভাবে) না—না শ্রীহরি কি শ্রীমতী ভিন্ন; অন্য কথা—বিষয়ের কথা—চলবে না বাবা—

বৈষ্ণব। (সহাস্যে) আমি তা জানি—বাপ্ (প্রভুর কর্ণে ধীরে কথন) প্রভো, রাধাপদাশ্রিতে করুণা কুরু—(প্রণিপাত)

প্রভু। (চক্ষু বুজেই) কে—রাধানন্দ এসেছ ? যাও, আপন স্থানে যাও। আমি এখন ব্রজমন্দিরেই রইলুম। আমার প্রিয় ভক্ত আমায় টেনেছে, সে বড় কাতর। সেখানে তুমিই তো আমাকে থাকতে দিলে না; ভুলু মুচির মালা নাওনি—আমাকে বড় লেগেছে···

বৈষ্ণব। সন্তানের অপরাধ হয়েছে মা—অজ্ঞান; বুঝতে পারিনি, ক্ষমা করো জননী। সে বড় অশুচি অবস্থায় এসেছিল দেখে—সংস্কার দোষে···

প্রভু। তোমার যে অবস্থা, তাতে অন্তর দেখবার কথা—কেবল বাহিরটাই দেখেছ, যাও। আমি ব্রজমন্দিরেই থাকবো। ব্রজ একান্ত মনে এই চেয়েছিল যে···

বৈষ্ণব। মা, সন্তানের কত অপরাধ হয়, ক্ষমা করো জননী। তুমি না থাকলে আমি আর ওখানে কি করতে থাকবো !

প্রভু। তবে কিছুদিন শ্রীবৃন্দাবনে থেকে এসো—চিত্ত-শুদ্ধি করে এসে।

বৈষ্ণব। তারপর আসবো ? তারপর পাবো ?

প্রভু। পাবে—দিবসে। রাত্রে আমি ব্রজপুরেই রবো। ভক্তের অন্তিম ইচ্ছা আমাকে রাখতেই হবে—অনাথার শান্তির উপায় করতেই হবে।

বৈষ্ণব। বুঝেছি এও তোমার লীলা লীলাময়ী! এঁরাই সব ধন্য! তবে—তোমার আদেশ পালন করতে চললুম মা। ভুলু মুচিকে পাঠিয়ে তোমার এই কাণ্ড ? আমাকে অপরাধী করলে! যেখানেই রাখ মা—তুমি সঙ্গে থেকো জননী।

প্রভু। থাকবো—

বৈষ্ণব। আর কিছু চাই না—চললুম—

(বৈষ্ণব সাশ্রুনয়নে ভক্তিভূষণের পদধূলি নিয়ে চক্ষু মুছতে মুছতে গমনোদ্যত হতেই)

হারু। সে কি হয় ঠাকুর, উপবাসী সেবা নিয়ে যেতে হবে।

বৈষ্ণব। (কাতরে) ক্ষমা করুন—সে কাজ শ্রীবৃন্দারণ্যে গিয়ে। আপনারা ধন্য—ধন্য সৌভাগ্য আপনাদের—মহাপুরুষকে সযত্নে সেবা করে ধন্য হোন। দেখবেন—নির্ব্বিকল্পে যেতে দেবেন না। এসো হরিকুমার—

শিষ্যসহ প্রস্থান

চন্দ্র। (শশব্যস্তে) কি—কি বলে গেলেন ? 'নির্ব্বিকল্পে' বললেন না ? সেটা তো বুঝি না। বড় প্রয়োজনীয় কথা যে।

হারু! যাও যাও জিজ্ঞাসা করে এস।

হারুর বহির্গমন

হারু। (ফিরিয়া—সবিস্ময়ে) কই কোনো দিকেই

তো দেখতে পেলুম না। কি—অলৌকিক ব্যাপার! অ্যাঁ—

চন্দ্র। (চিন্তা করে')—প্রভু কাল থেকে কতবারই বললেন—"চন্দোর কেবল রাধারাণীকেই দেখছি"—এখন তার কারণ বুঝতে পারলুম। তিনি ওঁর মধ্যে প্রবেশ করেছেন—রয়েছেন। যা শুনলে সবই রাধারাণীর নিজের মুখের কথা।

হারু। অজ্ঞান আমরা, ওর কিই বা বুঝি। কি অলৌকিক কাণ্ড! হাত পা কাঁপচে। দেখ না (অঙ্গুলী নির্দ্দেশ) এখনো সর্ব্বাঙ্গে দিব্যজ্যোতি···

মেয়েরা সব গলা বাড়িয়ে দেখতে লাগলো এবং মাথা নেড়ে এ-ওর সঙ্গে বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে বলাবলি করতে লাগলো। কেউ চোখ মুছলে—কেউ হাত জোড় করলে।

উমেশ। মা বলচেন "ব্রজমন্দিরে" থাকবেন—সে কোথায়?

আশু। তিনি যেখানেই থাকেন, সেইখানেই ব্রজমন্দির।

হারু। আরে না, না, এটা বুঝলে না! এই সহজ কথাটা বুঝলে না—অন্তিমের কথা আর কার? এ আমাদের ব্রজভায়া ছাড়া আর কে? তার অন্তরটা আমি জানি—ভীষণ—ভীষণ আধ্যাত্মিক ছিল যে!

হারু। আমার মামলাগুলোয় এক পয়সা নিত না, অত্যন্ত আধ্যাত্মিক ছিল···

চন্দ্র। থাক্—এখন প্রভু যে এক ভাবেই রইলেন। অনেক্ষণ হয়ে গেল যে! (চঞ্চল হ'য়ে) সেই নির্ব্বিকল্পের আশঙ্কা রয়েছে যে···

আশু। শুনেছি কীর্ত্তনে সমাধি হ'লে কীর্ত্তনেই উত্থান···

চন্দ্র। তাই হোক্—তাই করো—তাই করো উমেশ···

কীর্ত্তন

কোথায় নুপুর বাজে ওই—
আমি শুনি শুনি শুনি গো।
পরশে অবশ করে হৃদে,
রণি রণি রণি গো।
যেন যুগ যুগ হতে
সাড়া দেয় অনাহতে,
আমাতে কি আমি তাতে
ওঠে ধ্বনি ধ্বনি ধ্বনি গো।
কোথায় নুপুর বাজে ওই···

প্রভু উৎকর্ণ

আহা কি শুনালে, কে শুনালে। এ কার অনুভূতি? আমার না তোমার?

প্রভু। যেওনা, যেওনা, আমি থাকতে পারব না।

বলতে বলতে সটান উঠে পড়লেন। চোখ চেয়ে দেখেন—চন্দরবাবু, হারু তাঁকে আগলাচ্ছে

"তোমরা? আমি কোথায়? আমি ব্রজমন্দিরে যাবো।"

চতুর্দ্দিকে চাইলেন

চন্দ্র। আপনি সমাধি চক্রে

প্রভু। ওঃ (ভাব ভেঙে গেল) আমার একি হোলো? (ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কান্না) আমি কি পাগল হলুম।

চন্দ্র। আপনি শান্ত হোন্—স্থির হোন্··

প্রভু। স্থির হবার উপায় নেই। না—আমি পারব না। ব্রজর স্ত্রীকে ডাকো—আমি মাপ চাইবো। আমায় ক্ষমা করুন। আমার দ্বারা হবে না। মন্দের প্রভাব অসীম, কে এ বিষ ছড়িয়েছে জানি না। সবাই বলে অলুক্ষুণে—ভূতের বাড়ি। আমি তাতেও দমিনি চন্দোর। ঠাউরে ছিলুম—তাঁকে বলে ঐ বাড়ীতেই কিছুদিনের জন্যে সভা নিয়ে যাব। কলিতে নাম আর দানই প্রধান, নির্দ্দোষ হয়ে যাবে···

চন্দ্র। বেশতো, তাতে তিনি অমত করবেন না··

প্রভু। আমার সে বিশ্বাস ছিল চন্দোর—

হারু। তবে আবার কি?

প্রভু। আর আমাকে জিজ্ঞাসা কোর না—আমি বলতে পারব না। সে কেউ বিশ্বাস করবে না—সে আধার কই (এই বলে শিউরে উঠলেন); তুমিই রক্ষা করো রাধে, আর পরীক্ষা কোর না। এই দীনের কুটিরেই দয়া করে থাকো—

কাঁদতে লাগলেন

কদম ঝি এগিয়ে এসে বললে

কদম। বউমা এইখানেই উপস্থিত আছেন, সব শুনেছেন। তাঁকে কিছু বলতে হবে না। বলচেন—ও বাড়ী বিক্রির জন্যে আপনি আর ভাববেন না। সে যা হয়···

প্রভু। পাগল বৌ, সরলা! আমার ভাবনা মেটবার কি আর পথ আছে? আমি তো পথ ঠাউরেই ছিলুম। —যখন ভার দিয়েছেন—বাড়ির অপবাদটা শোধন করে উপায় করে দেবো। এখন আর (দীর্ঘনিশ্বাস) যাক্ তিনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমিও বাড়ী বিক্রির কোন কথাতেই আর থাকতে পারব না; ও-কথা মুখে আনবারও আমার আর অধিকার নেই। হারু প্রসাদ উৎসর্গ করে দাও।

কদম। বউমা সবই শুনেছেন। বলচেন, এখন তাঁর মনের ঠিক নেই, ভেবে বলবেন। (নিম্ন কণ্ঠে) এই টাট্‌কা টাট্‌কা কপাল পুড়েছে তায় কেবল কেবল বাবুর নাম হ'ল কি না—তাই···

প্রভু। (তদ্রূপ স্বরে) সেই তো ইচ্ছা করে' গেছে। তাঁর তীব্র ইচ্ছা না থাকলে আর—

কদম। তাই তো।

প্রভু। আমার শরীরের ঠিক নেই, মাথারও ঠিক নেই। হারু সকলকে প্রসাদ বিতরণ করে দাও। মা স্বয়ং এসেছেন, কেউ না বঞ্চিত হয় (ভাব মগ্ন)।

সকলে প্রসাদ মাথায় ঠেকিয়ে নিয়ে চললো।

চন্দোর। দেখুন আমি একটা উপায় ঠাওরাচ্ছি। ওবাড়ী রাধারাণীর জন্যে রাখতেই হবে। চাঁদাতুলে যতটা টাকা সংগ্রহ হয়, বউমাকে···

প্রভু। চন্দর, তুমি কিছুই বোঝনি। সাপ নিয়ে খেলা চলে না। রাধারাণীর তো সে অভিপ্রায় দেখলুম না! তিনি ব্রজর উপর কৃপা করে' তার অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ করতে চান, ওই সঙ্গে বধূর শান্তি। তাই তো মুস্কিলে পড়েছি—বিক্রয়ের কথা যে আসতেই পারে না। কিন্তু এ কথা যে সাধারণকে বলবার নয়। ১৭ হাজার টাকার বাগান-বাড়ী অসহায়া বিধবার ধন। আমার উপর নির্ভর। একি সাধারণ পরীক্ষা আমার ওপর! মুখ ফুটে বলবার জো নেই, বুঝচো তো? ভালো মন্দ লোক তো···

আশু। তা তো বুঝচি। কিন্তু সত্যটা চেপে রাখাও তো দুর্ব্বলতা, বিশেষ দেবাদেশ। আবার এটাও তো বুঝতে হবে—উনি স্বামীপুত্রহীনা, ওঁর অত টাকা থাকা মানেই অশান্তি আর বিপদ পোষা। সে একদিন অন্যের হাতে পড়বেই, তখন যে পাগল হয়ে যাবে? এ মায়ের সেবায় রইলো—স্বামীর ইচ্ছাও পালন করা হ'ল, তাঁর আত্মাও শান্তি পেলে।

প্রভু। আহা—সব বুঝচি, উচিতও তো তাই। পারে তো পর-কাল কিনে নেবে—তাও বুঝচি। কিন্তু আমি বলতে গেলেই পাঁচ জনে পাঁচ রকম্ বোঝাবে, স্ত্রীলোক। তাঁর ভাগ্যে থাকে, মতি শ্রীমতীই দেবেন। যাক্, আমি আর পারচি না যে চন্দোর—

চন্দ্র। চলুন, এখন ভেতরে চলুন। কিছু খাইয়ে, আপনাকে শুইয়ে—বাড়ীতে বলে কয়ে, আমরা যাবো—

প্রভুকে সযত্নে হাত ধরে নিয়ে পুরুষদের প্রস্থান।

অপর্ণা, কদম আর কয়েকটি রমণী তখনো অলক্ষ্যে ছিলেন। প্রভুর কথাবার্ত্তা শুনছিলেন। তাঁরা সামনে এলেন। অপর্ণা একটা আশ্রয় ধরে দাঁড়ালেন। তাঁর সর্ব্বশরীর কাঁপছিল, মাথা ঘুরছিল।

অপর্ণা। কদম। আমি দাঁড়াতে পারচি না, মাথা কেমন করচে, বাড়ী চল্।

কদম। তা আমি অনেক্ষণ টের পেয়েছি। ওঁদের সামনে দিয়ে যেতে পারবে না বলেই—কিছু বলিনি। একটু সামলে নিয়ে চলো···

বিরলা। (সকলে শুনতে পায় এমন স্বরে অলক্তকে) দেবী নিজে চাচ্ছেন, এর ওপর আর কথাই বা কি—তা তো বুঝি না। আমাদের থাকলে—সে ভাগ্যি কি করেছি···

অলক্ত। লোকে তালুক মুলুক লিখে দেয়। জানতো লালাবাবু—

নীরদ। বক্‌চিস্ ক্যানো, ভাগ্যি চাই! আমাদের কি দিয়েছেন যে জন্ম সার্থক কোরবো···

বিরলা। যখন নেই—না-কথা কওয়াই ভালো। তা না তো যার বাড়া নেই দেবতা···নিজের মুখে···গা শিউরে ওঠে! টাকাও সঙ্গে যাবে না—বাড়ীও সঙ্গে যাবে না···

নীরদ। হ্যাঁ—খাবার পরবার দুখ্‌খু থাকলে বটে, মাথাও ঘোরে—কথাও ওঠে—

অলক্ত। দেবতায় চাইলে—ওমা বলো কি! কারধন, দিয়েছে কে বলো ?

কদম। (অপর্ণাকে) প্রসাদ ক্রমেই ভারি ঠেকচে বউ-ঠাকরুণ—সকলেই চলে গেছেন, এইবার চলো রাত হয়েছে—

অপর্ণাকে লইয়া প্রস্থান

বিরলা। দেওয়া কি যার তার কাজ ; একটি কথা কইলে কি ? আমাদের কেবল প্রাণটাই আছে। যাক্—আর থেকে কি হবে, চল আমরাও যাই। একটা কথাও কইলে না। তবু যদি না কপাল পুড়তো। দেখে নিত এই বিরলা বামনীর কথা—সাত ভুতে যদি না খায় তো কি আর বলিচি—

সকলের প্রস্থান

নবম দৃশ্য

স্থান…৺ব্রজলাহিড়ীর বসত বাড়ী

সময়…সকাল ৭টা

উপস্থিত…অপর্ণা (ব্রজর বিধবা পত্নী)

কদম ঝি মুখ ভার করে কাজ করচে

অপর্ণা। কই কিছু বলচিস না যে কদম। আমি ত' কিছু ঠাওরাতে পারলুম না। একটুও ঘুমুতে পারিনি—

কদম। (ভার ভার) আমার সারা রাত নাক ডেকেছে…

অপর্ণা। তুই আমার চেয়েও ভাবচিস্—তা আমি জানি।

কদম। কে বললে, এতোটুকুও না! ওতে ভাববার কি আছে ?

অপর্ণা। তা হলে যে বাঁচতুম। এখন কি করি বল্ দিকি ?

কদম। আমি কি বল্বো ?

অপর্ণা। না—তবু—

কদম। 'তবু' বলো তো—যেমন আছো থাকো—বাগান বাড়ীও যেমন আছে থাক্। বেচেও কাজ নেই—দান-খয়রাত করেও কাজ নেই—

অপর্ণা। রাধারাণীকে দান খয়রাৎ কি বল্ ?

কদম। তবে জিজ্ঞেস করে আমার পাপ বাড়াও কেনো ? তোমাদের ও ধম্মের কথায় আমাকে টেনো না।

অপর্ণা। রাগ করলি কদম ? আমার আর কে আছে যে এই সঙ্কটে তার সঙ্গে কথা কবো।

কদম। আমারই বা কে আছে যার ওপর রাগ করবো ? রাগ করে ফল্ ? রাধারাণীর যদি বিধবার ওই বাড়ীটি না হলে না চলে, তা হলে—দান-খয়রাতের কথাই তো আসে। সে-দিন যা শুনে এলে—সে আর কিসের কথা ? তবু—সে কথা মুখে আনাও তোমার সয় না যে…

অপর্ণা। সমাধি অবস্থার কথা তো, তার নিজের কথা নয়—তাই ভয় হয় যে। তোর কি বিশ্বাস হয় না!—শুনে এতটা লোক কাট হয়ে গেলো!

কদম। এতোটুকুও না। কাট্ কেনো—কয়লা হয়ে গেলেও না।

অপর্ণা। ওমা—বলিস কি! সেই সাধুটি পর্য্যন্ত ওঁর অবস্থা দেখে—মহাপুরুষ বলে'—পায়ের ধূলো নিয়ে—আহা কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেলেন ? ভট্‌চায্যি মশাই সঙ্গে সঙ্গে গিয়েও তাঁদের দেখতে পেলেন না—যেন উপে গেলেন! এসব দেখেও—

কদম। (বাধা দিয়ে) কেনো আমার আর পাপ বাড়াও দিদিমণি! আমার মনকে সারা গঙ্গার জল দিয়ে ধুলেও ও ময়লা যাবে না। বামুন বাড়ী দাসীবিত্তি স্বীকার করেছি, তোমাদের পেসাদ পাবো বলে—। সেই আমার সাধন-ভজন ধর্ম্ম-কর্ম্ম। আমার কাছে ওদের কথা কোয়ো না—তোমার দুটি পায়ে পড়ি। আমি বিশ্বাস করতে পারবো না। ফিরে এসে রাতে ও-কথা উঠতেই—আমার কথা তোমার ভালো লাগে নি ; তাই না বলেছিলে—"বড়ো ঘুম পেয়েছে—শুয়ে পড়ি চল্"। ওই ব্যাপারের পর, ঘুম পাবার কথাই বটে! শুনে আমি মনে মনে হাসলুম,—"তাই ভালো" বলে' উঠে পড়লুম! তোমার ঘুম যা হবে তা জানতুম। কারই বা হয় দিদিমণি!

অপর্ণা। মেয়েরা যা বলছিল—শুনলি তো ?

কদম। ওঃ—সে কথার মূল্য তো ভারি, পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্‌তে সবাই পারে। শুনবো না কেনো—শুনিছি—শুধু তোমার জন্যে—কিছু শোনাই নি! যাদের নেই, চিরকালই তাদের জিভ্ লম্বা। ১৭ হাজার যে কতো, আর কি করে হয়েছিল, তা তো জানা নেই। সেটা জামাই-বাবুই জেনেছিলেন। তোমার বসে পাওয়া ধন বইতো নয়,

তাই তাদের কথায় কান্ দিয়েছিলে, আর তাই নিয়ে এখনো ভাবচো।

অপর্ণা। আমি আজও জানি না কতো—! (হাসি মুখে) অত টাকা নিয়ে কি করবো কদম ?

কদম। তা বটে—ভাবনার কথা বটে! বৈষ্ণবেরা বলছিল না 'টাকা পোষা না আপদ পোষা'! তবে তাঁদের প্রভুটি ৭০ টাকার আপোদ—মাসে মাসে ঘরে ঢোকাতে পরের চাকরি কোরে মরেন কেনো ?

অপর্ণা। তার জন্যে করেন না, শুনেছি "দাস্যভাব" সর্ব্বক্ষণ সজাগ থাকবে বলে'—

কদম। (সাগ্রহে) বলে না কি ? তা আমার মত গোঁসাইবাবুদের বাড়ী বাসন মাজেন না কেনো—এক ডাঁই বাসোন—তাতে দিনে সাতশো বার তাঁর দাস্য ভাব জেগে উঠবে—এক মিনিট মাটি হবে না—বৃথা যাবে না!—ওটা তবে চাকরি নয়—দাস্যভাবের মওলা! বউঠাকরুণ, সাবধান। ওদের পাল্লায় পোড়ো না—পোড়ো না—

অপর্ণা। (একটু বিরক্ত রোষে) ওকি কদম! কাকে কি বলিস ? তোর মুখের যে একটু আগোল নেই—ছিঃ।

কদম। মাপ করো—দিদিমণি! আমি তো আগেই বলেছিলুম—ও-কথায় টেনে আমার পাপ বাড়িও না—

অপর্ণা। থাক্। আমি ভাবচি গ্রামের অনেকেই—কর্ত্তারা পর্য্যন্ত ওঁর ভক্ত। তাদের ঝোঁক্ও যে ওই দিকে! মেয়েদের কথাও তো শুনলি ? অনাথা অসহায়া হয়ে যেখানে থাকতে হয়…

কদম। সেখানে অভক্ত আর একঘোরে হয়ে থাকবে কি করে ? এই না ? নাই বা রইলে। ১৭ হাজার টাকা থাকলে, বাপের বাড়ী আছে, কাশী বিন্দাবন আছে, পুরী আছে। যেখানে ইচ্ছা হয় থাকতে পারো। এখানে তোমার আছে কে ? কি সুখে থাকা ?

অপর্ণা। (দীর্ঘনিশ্বাসান্তে বিষাদমলিনমুখে ধীরে ধীরে করুণকণ্ঠে)—এইখানেই যে আমার সব রয়েছে কদম। এটা যে তাঁর শোবার ঘর। এই ঘরে এলে আমি যে তাঁর প্রতিদিনের প্রত্যেক কথাটি শুনতে পাই। ঐ চেয়ারে তাঁকে দেখতে পাই। (চক্ষু মুছে) একদিন এই পোড়া চোখে একটা কুটো পড়েছিল। তাঁর সে কি ভয়, কি ব্যাকুলতা! কাছারি যাওয়া হল না। আমাকে নিজের চেয়ারে বসিয়ে—কি সন্তর্পণে কতো যত্নে চোখ দেখা! তাঁর সেই স্পর্শ, ঐ চেয়ারে বসলে, আজো আমি পাই। তাঁর সেই ব্যাকুল চোখের ছাপ্, আমার চোখের মধ্যে আজো তেমনি আঁকা রয়েছে যে কদম। (চোখ মুছে) তখন সেই নিয়ে কত না হেসেছিলুম, কত কি বলেছিলুম! আর আজ কুটো নয়—আকাশ ভেঙে পড়েছে—তবু যে একবার দেখচেন না! কোথায় তিনি কদম ?

অপর্ণা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো

কদম অপর্ণাকে কেঁদে একটু হাল্‌কা হতে দিয়ে সরে গেল—পরে

অপর্ণা। (সিক্ত স্বরে) এ ভিটেতে এমন স্থান আছে কি কদম—যেখানে তাঁর পা পড়েনি, যেখানে তাঁর পায়ের ধূলো নেই! এর সবটুকু মাটিই যে আমার মাথার জিনিষ! এর চেয়ে আমার বড়ো তীর্থ কোথায় আছে—কোথায় পাবো ? এ ছেড়ে আমি যাব কি করে—এ যে আমার দেবতার মন্দির কদম—

চোখ মুছলেন

কদম। (অপ্রতিভ ও ব্যথিত ভাবে) দিদিমণি আমায় মাপ করো—আমি টাকাটাই দেখেছিলুম। মাপ করো দিদি, যাও চোখে মুখে জল দিয়ে এসো

অপর্ণা তাই করতে গেল

তাই তো! দিদিমণি ভাব নিয়ে বসে থাকবেন, আর এক-রাশ টাকার জিনিষ—সয়তানে ফাঁকি দিয়ে নেবে। আমার ঘুম গেলো দেখচি! উনি তো দেখচি—এরি মধ্যেই হাত ধুয়ে বসেছেন…

অপর্ণা ফিরে এলো

(অপর্ণার প্রতি) তা একবার দাদাবাবুদের জানাতে তো হবে। ছোটদাদাবাবুর কাজ নয়, হাঁ বড়দাদাবাবু পুরুষ বটে, যেন শঙ্কর মাছের চাবুক—কেটে চলে—

অপর্ণা। তাতে আর আমার কি ? কই একবার কেউ আসতে পারলেন ? বড়দা লিখলেন এখন তিন মাস তাঁর নাগপুর থেকে নড়বার উপায় নেই—তিনি সরকারের উকিল। এলেই বা এমন কি সুবিধে হোতো! এলে আমাকে তাঁর বাড়ী গিয়ে থাকতে বলতেন। আমি এ বাড়ী ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না কদম।

কদম। যাক্, কিন্তু তেমন আর কাকেও তো দেখতে,

পাচ্ছি না যে পরামর্শ নি। আমরা তো তবু মেয়েমানুষ, চন্দোর বাবুটি মেদী মানুষ। আমার তো কাউকেই বিশ্বাস হয় না। তবে শিরোমণি মশাই কি বলেন—শুনলে 'হয় না? ঐ মানুষটিই খাঁটি বলে আমার মনে হয়।

অপর্ণা। (উদাসভাবে) শুনেই বা কি হবে কদম? বলচিস্ যখন—আচ্ছা, ঐ মানুষটির ওপর আমারও শ্রদ্ধা হয়, কিন্তু তিনি ··

কদম। সেই ভালো দিদিমণি, আমি গিয়ে একবার তাঁকে দেখে আসি—

সহসা উৎকর্ণ হয়ে

তাঁর গলা না—হ্যাঁ তাঁরই তো। তিনি বেরোন না তো—দেখি—

প্রস্থান

(পরক্ষণেই ফিরে) আমাদের বড় ভাগ্যি তিনিই আসচেন—

অপর্ণা তাড়াতাড়ি আসন এনে পাতচেন এমন সময় শিরোমণি মশাই গলার সাড়া দিতে দিতে প্রবেশ। গলবস্ত্র হয়ে অপর্ণার প্রণাম।

শিরোমণি। এসো মা এসো (বলেই একটু বিচলিত ভাবে) তোমাকে আর কি আশীর্ব্বাদ করবো মা—ভগবান তোমাকে কৃপা করুন; তুমি যেন তাঁকে ভালোবেসে শান্তি পাও। এদিকে আসতে আর পা ওঠে না মা—

কদম। (কথা বাড়াতে না দিয়ে তাড়াতাড়ি) ওই আপনাদের পুকুরের ওপর বাবু বাগান-বাড়ী করেছিলেন—

শিরোমণি। আহা—আহা—সেকথা আর কেনো মা—

কদম। সে-বাড়ী রেখে আর কি হবে বাবা, দেখবেই বা কে, তাই মিত্তির মশার ওপর বিক্রির ভার দেওয়া হয়েছিল—

শিরোমণি। এখন তাই ভাল মা···

কদম। তিনি তার জন্যে দয়া করে অনেক জায়গায় ঘুরে-ফিরে এসেছেন। সকলেই ও বাড়ী নিতে নাকি ভয় পায়। তারা শুনেছে ওটা ভূতের বাড়ী, তাই নাকি বাবুরও ভোগ হল না—

শিরোমণি। নারায়ণ, নারায়ণ, একথা কে বলে—মিথ্যে কথা। এসব কি কথা!

কদম। তাই তো বললেন। সেদিন ওঁদের সিদ্ধি সভা বা মুক্তি সভা ছিল—তাঁর আজকাল সমাধি হচ্ছে কিনা, সেই অবস্থায় তাঁর মধ্যে দিয়ে নাকি রাধারাণী বললেন—"আমি ওই ব্রজমন্দিরে থাকবো—ব্রজ অন্তিম কালে মনে প্রাণে সেই ইচ্ছা করে গেছে—ভক্তের ইচ্ছা আমি পূর্ণ কোরবো—তার আত্মাকে দুঃখী করতে পারব না। মিত্তির মশার ইচ্ছা ছিল—ঐ বাড়ীতে কিছু দিন নামকীর্ত্তন আর দানের ব্যবস্থা করে ওবাড়ী শোধন করে ভূতের অপবাদ মিটিয়ে, মন্দ লোকের মন্দ অভিপ্রায় সফল হ'তে দেবেন না—

শিরোমণি। তার পর?

কদম। তার পর ভূত-শুদ্ধি আর করতে হল না, রাধারাণী নিজেই ও বাড়ীতে থাকবেন, পূজা, সংকীর্ত্তন আর দানও চলবে। এখন দিদিমণির কর্ত্তব্য কি, সেইটে আপনার কাছে তিনি শুনতে চাচ্ছেন—

শিরোমণি। (মাথা চুলকে, অত্যন্ত বিব্রত ভাবে) মা, আমি কঠোপনিষদের মধ্যেও এত বড় কঠিন সমস্যা পাই নি। যা শুনলুম তাতে বুঝতে পারচি—আমিও তোমাদেরই মত মেয়েমানুষ। সমাধি আমার কখনো হয়নি, তার সঙ্গে পরিচয়ও নেই। ওতে ভক্ত আর বিশ্বাসীর অধিকার থাকতে পারে। আমি ও দুয়ের কোনটাই নই—বেদান্ত নাড়াচাড়াই করেছি। দুই আর দুয়ে চার হয়—তাও বুঝতে পারি, কিন্তু ভক্তি আর সম্পত্তিতে মিশে যে কি হয়, তা বলতে পারি না মা। রাধারাণী তাঁর ইচ্ছাটা বউমাকে জানালেই তো বিষয়টা সহজ হত; আর তার স্মৃতিটা বউমার জীবনটাকে শান্তি দিতে পারতো। তিনি তা করলেন না যে কোনো—এইটুকুই বুঝতে পারলুম না মা—

কদম। আজ ভোরে বার-বাড়ী ঝাঁট দিচ্ছি, চৌধুরী মশাই যাচ্ছিলেন, বললেন—'বুঝতে পেরেছ ঐ সমাধির ব্যাপারটা? ওকে বলে দৈবী পরীক্ষা—ওটা বউমার বিশ্বাসের ওপর রাধারাণী পরীক্ষা করচেন। তাঁর আর অভাবটা কিসের? কৃপা না থাকলে আর—'

শিরোমণি। তা হবে মা। আমাদের মত দুর্ব্বল সংসারীর ওপর মায়ের এ যে বড় কঠিন পরীক্ষা—

অপর্ণা। (পশ্চাত হতে কদমের আঁচল টেনে মৃদু কণ্ঠে) আমার মত পাপীকে তিনি দেখা দেবেন কি করে'—আমার মধ্যে আসবেন কি করে?

শিরোমণি। (শুনতে পেয়ে) সে কি মা, সবই তাঁর

দেহ, সব দেহই তাঁর মন্দির যে! ও কথা যাক্, তোমার ইচ্ছা হয়ে থাকে—ও বাগান-বাড়ী রাধারাণীরই রইলো। তিনি তো আর হাতে করে কিছু নিয়ে যাবেন না, রেজেষ্ট্রী করে নিতেও আসবেন না। তবে—তার বেশি কিছু থাকে তো—তোমার ভায়েদের সামনে হওয়াই উচিত। তাড়াতাড়ি তো নেই। এখন তবে উঠি মা, অতখানি যেতে হবে—একটুতেই হাঁপ ধরে।

অপর্ণা ও কদম প্রণাম করলে

ভগবান শান্তি দিন

প্রস্থান

কদম অপর্ণার মুখের দিকে চাইলে

অপর্ণা। (একটু নীরব থেকে) স্বামীর সখের জিনিষ, দেবতাকে দিতে পারলেই তো স্বস্তি···

কদম। (অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে একটু সামলে) হাঁ—সে তো দেবতাকে দিতে পারবার কথা

অপর্ণা। এও তো তাই···

কদম। (উদাসভাবে) তা—হবে!

অপর্ণা। এটা কি দেবতাকে দেওয়া হবে না?

কদম। তুমি দিলেই হবে। বিশ্বাস থাকলেই হ'ল।

অপর্ণা। সে ভয় তুই করিস নি। আমার যেন কেবল মনে হচ্ছে—ও ঝঞ্ঝাট্ যত শীগ্‌গির মেটে, ততই ভালো। আমি দোটানায় পড়ে থাকতে পারচি না কদম।

কদম। তবে আর ও-নিয়ে ভাবনা কেনো?

অপর্ণা। (তুলসীতলায় প্রণাম) ঠাকুর তুমি আমায় বল দাও

কদম দ্রুত একটা কলসী নিয়ে জল আনতে বেরিয়ে গেল

অপর্ণা। (প্রণামান্তে উঠে চিন্তা) কদম বুঝচে না—চটুচে। রাগ করে' গেলো। আমি ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা অসহায়া। স্বামীর বিষয়ের ওপর ঠাকুর দেবতার নজর! গ্রামের প্রায় সব মেয়ে-পুরুষই ভক্তিভূষণ ঠাকুরের শিষ্য সেবক। একদিকে এই অসহায়ার ওপর তাঁদের ইচ্ছার দাবী—অন্যদিকে সমাধি-বাক্যের প্রভাব। তার ওপর এই ২৩ বছরের ব্রাহ্মণের বিধবা। মা রক্ষা করো। ও-সমাজ কোনদিন আমাদের মুখ চায়নি। দোষ পেলে তো কথাই নেই, না পেলে সৃষ্টি করেও অসহায়াদের সর্ব্বনাশ করে। এই গাঁয়েই তো তা দেখেছি—এর মাঝেও তো সেই সব কর্ত্তারাই রয়েছেন! তখন মা গঙ্গা আমাকে স্থান দিতে পারলেও মরণেও তা মরবে না। মানুষের মুখের পথ ধরে সে যে পর-পারেও পৌঁছুতে চায়! কদম সে কথা ভাবতে চায় না। আমি যখন এ-ভিটে ছাড়তে পারব না, তখন আমার আর কোন্ উপায় আছে?

দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে চোখ মুছতে মুছতে ঘরে চলে গেলেন;

জলের কলসী কক্ষে গর্ গর্ করতে করতে কদমের প্রবেশ

কদম। না—এ আমি সইতে পারব না। এতো শুধু লোকসান নয়—সজ্ঞানে ঠকা! এ যে নির্ব্বোধ সেজে ভাড়াটে-ভক্তির ঢোলের বোল্ শোনা। ১৭ হাজার টাকার বাড়ী—ন দেবায়—ন ধর্ম্মে! সত্যিই ভূতের বাড়ী হবে গা!

সজোরে ঝনাৎ কোরে দোর বন্ধ করলে

ক্রমশঃ

নহে সেতো বসুধার মৃণ্ময়ী কায়া

শ্রীসমরেন্দ্র দত্তরায়

তোমার ধ্যানেতে যবে মগ্ন রই প্রিয়া,
পূর্ণরূপে ধরণীর সব বিস্মরিয়া,
অসীম গগনতলে অপার পুলকে
খুঁজে মরি রূপ-জ্যোতি দ্যুলোকে ভূলোকে,
তখন যে মূর্ত্তি তব মোর প্রাণপুটে
সত্য-শিব-সুন্দরের স্পর্শ হতে ফুটে।

নহে সে তো বসুধার মৃণ্ময়ী কায়া
চিন্ময় আত্মার সে যে চিন্ময়ী ছায়া।
সীমাহীন জীবনের দীপ্ত দীপখানি
জ্বালাতে সে পারে; চির উন্মেষের বাণী
দিয়া নিত্য নবরূপে আশার সঙ্গীতে
ভরে ওঠে চিত্ততল প্রেমমুগ্ধ চিতে।

নারী শিক্ষা সম্বন্ধে আবেদন

শ্রীবীণাপাণি দেবী

আজকালকার এই রাশি রাশি স্ত্রী-শিক্ষা এবং স্ত্রী স্বাধীনতা সম্বন্ধে বিভিন্ন-রূপ মতামতের মধ্যে আমার এই ক্ষুদ্র মত এবং অনুরোধ যে আমাদের এই বিরাট সমাজের কতটুকু কল্যাণ-সাধনের প্রয়াস পাইবে বলিতে পারিনা। তবে সে সম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা করিব। লেখক ও লেখিকা কেহ স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষে, কেহ বা বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন, যদিও ইহা নূতন নয়। জগতের সকল ক্ষেত্রে সেকালের ও একালের, প্রাচীন ও নবীনের এ বিভেদ আবহমানকাল ধরিয়া চলিয়াই আসিতেছে এবং চলিতে থাকিবে। ইহা আশার—কি নিরাশার কথা বলিতে পারিনা। কিন্তু প্রাচীনের সমূলে ধ্বংস ত কই আজ পর্য্যন্তও দেখা গেল না। যদি স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকারে, সামাজিক ও পারিবারিক সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা কিছুমাত্র থাকিত ; যদি প্রাকৃতিক বিধানে নারী সকল ক্ষেত্রেই পুরুষের সমকক্ষ হইবার যোগ্য হইতেন, তাহা হইলে সৃষ্টির প্রথম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজও নারীর পুরুষকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিতে হইত না। প্রাকৃতিক বিধানানুযায়ী বিচার পক্ষে, নারী পুরুষের কার্য্যক্ষেত্র ভেদ হওয়া স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। রাজনীতিক্ষেত্রে, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান সর্ব্বত্রই পুরুষ নারীর উপরে স্থান লাভ করিয়া আছে। অবশ্য তাহার মধ্যে প্রাচীনের বীর রমণী যেরূপ ঝাঁসীর রাণী, যোন্ অফ্ আর্ক এবং অধুনার ম্যাডাম চিয়াং কাইশেক্ ইঁহাদের বিষয় ধর্ত্তব্য নয়। কেননা সে রকম ধরিতে গেলে পুরুষের পৌরুষের উদাহরণ ত আর ওরূপ ছদশটীর মাঝে সীমাবদ্ধ নহে। আমাদের স্ত্রীলোকের মাঝে যে যথার্থ জ্ঞানের প্রতিভা কাহারও মাঝে নাই তাহা বলিনা। বরং কাহারও মাঝে এত বেশী আছে যে তাহা যে কোন পুরুষের পৌরুষত্বকে খর্ব্ব করিতে পারে এবং তাঁহাদের সেই জ্ঞানপ্রতিভাকে যথার্থরূপে প্রকাশের সর্ব্বতোভাবে বিশেষরূপে সাহায্যও করা উচিত।

তবে আমাদের এই সাধারণ স্ত্রীলোকদের যথার্থতঃ চাই কি? চাই উন্নতি। উন্নতি কাহাকে বলিতে পারা যায়? আধ্যাত্মিক উন্নতি বা সামাজিক উন্নতি। উন্নত হইলে মানুষ কি পায়? উন্নত মানুষের জীবন সুখময়—না দুঃখবিড়ম্বিত? অধুনা যে উন্নতির দ্বারা পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়া যাইতেছে সে উন্নতির আমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন আছে কিনা। ইহাই আমাদের অতি উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া নর-নারীর কার্য্যক্ষেত্রকে একীকৃত করা কর্ত্তব্য। ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে স্ত্রী-শিক্ষার যথেষ্টই প্রয়োজন। কিন্তু বিকৃত শিক্ষার ফল কখনও সুফল হইতে পারেনা। নারীকে পত্নী ও মাতা থাকিতে দিয়া তাঁহাদের যত কিছু উচ্চ-শিক্ষার দরকার সেই শিক্ষায় তাঁহাদের শিক্ষিত হইতে হইবে। অনেক আধুনিক শিক্ষিত নরনারী উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও এত সঙ্কীর্ণ মনের দেখিতে পাওয়া যায় যে অনেকে (যাহারা সে হিসাবে একেবারেই অশিক্ষিত) ইঁহাদের তুলনায় যথেষ্ট শ্রদ্ধার পাত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহা কিসের ফল? যে শিক্ষায় মনুষ্যত্বের সম্যক্ বিকাশ হয়না তাহা ঠিক শিক্ষা নহে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ বটে। শিক্ষিতা স্ত্রী সমাজে সংসারে সুশৃঙ্খলা আনিবেন, সন্তানকে সুপালন করিবেন ও সুশিক্ষা দিবেন, ইহাই হইল স্ত্রী শিক্ষার উপকারিতা। আমার মনে হয়, যদি চেষ্টা করিতে হয় তবে যেটা মানুষের সব চেয়ে বড় অভাব—তার জন্য চেষ্টা করা উচিত। যা করিলে এ স্বাস্থ্যহীন ধ্বংসোন্মুখ জাতির স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটিতে পারে—ধর্ম্মোন্নতি ঘটিয়া মনুষ্যত্ব লাভের সহায়ক হয়। সেই শিক্ষার প্রবর্ত্তন জন্য আমাদের সমবেত চেষ্টা ও যত্ন লওয়া কর্ত্তব্য।

প্রাচীনকালে নারীর স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল বলিয়া অনেকে দোষারোপ করেন। কিন্তু ভারতীয় নারী স্বাতন্ত্র্য-বর্জ্জিত না হইয়াও কি যে কোন দেশের নারীর অপেক্ষা কোনও রূপে অবনত ছিলেন? তাঁহাদের ধর্ম্মশিক্ষা এতই প্রগাঢ় ভাবে হইত, যে স্বধর্ম্ম ও সম্মান রক্ষার জন্য তাঁহারা সুখ আশাপূর্ণ অতৃপ্ত মানব জীবনকে সামান্য তৃণের ন্যায় অনায়াসে হাসিমুখে অগ্নিকুণ্ডে প্রদান করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না।

আমার বক্তব্য এই যে, মেয়েরা শিক্ষিতা হউন। পারেন ত পুরুষ অপেক্ষা অধিক শিক্ষা লাভ করুন। কিন্তু তাঁহাদের পুরুষ হইয়া কাজ নাই। তাঁহারা পুরুষের সহকর্ম্মিণী না হইয়া সহধর্ম্মিণী থাকুন, সন্তানের নামে-মাত্র গর্ভধারিণী না হইয়া প্রকৃত মা হৌন, যাতে তাঁদের সন্তান ধর্ম্মশিক্ষার, নীতিশিক্ষার অভাবে কু-সন্তানে পরিণত না হয়। তাঁদের পুরুষ হইয়া কাজ নাই এইটুকু আবেদন।

জগতে পুরুষের সহিত সমকক্ষতা লাভই যে উন্নতির চরমোৎকর্ষ, ইহাই বোধ হয় প্রমাণ নহে। যাহাতে আমাদের জাতির প্রকৃত উন্নতি লাভ হয় তাহাই আমাদের সমবেত চেষ্টা হওয়াই একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। আজ এই উদ্দাম স্বেচ্ছাচারিতায় ইউরোপীয় সমাজই সমগ্র ইউরোপীয় জাতির চিন্তাশীল ব্যক্তির চিত্তে ভয়ের উদ্রেক আনিয়াছে, তাহাও তাঁহাদের দেশেরসংবাদের মধ্যে প্রকাশিত হয়। অথচ আমরা মোহমুগ্ধ অন্ধের মত সেই সর্ব্বনাশী মোহে মত্ত।

আমার আবেদন এই যে নারীরা শিক্ষিতা হউন এবং সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হউন, যে শিক্ষায় আমাদের মহিমান্বিতা নারী—সীতা, সাবিত্রী, সতী, অরুন্ধতী, গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী। সকলে শিক্ষিত হইয়া আজও ভারতের চক্ষে দেবী বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন।

ব্যথার পূজা

শ্রীনিত্যহরি ভট্টাচার্য্য

পাড়াগাঁ, আশেপাশে বনবাদাড়, ডোবা পুকুর। এধারে ওধারে খড়োঘর, পাকা বাড়ী—তারি মাঝে একখানা দোতালা বাড়ী।

বাড়ীখানায় যিনি রয়েছেন—নাম তাঁর শরৎ রায়। কোলকাতাতেই থাকেন—অফিসে চাকরী করেন। মাস তিনেকের ছুটি নিয়ে দেশের বাড়ীতে এসেছেন।

আছে তাঁর স্ত্রী মাধবী—দুটি মেয়ে, আর একটি ছেলে।

কমলা বড়—বিয়ে হয়ে গেছে ; খোকা একটি কোলে পেয়েছে সম্প্রতি। শরীর খারাপ—বাপের সঙ্গে এসেছে এখানে বেড়াতে।

মেজ সলিল—বয়স বছর সাতেক, ছোট অমলা—তার বছর দুয়েকের ছোট।

মিঃ রায় তখন চাএর পেয়ালাটা সবে মুখের কাছে ধরেছেন এমন সময় সলিল কাঁদতে কাঁদতে এসে বলে উঠলো—অমু আমার দাঁত হারিয়ে দিয়েছে—য়্যাঁ, য়্যাঁ···

পেয়ালাটায় একটা চুমুক দিয়ে মিঃ রায় বললেন—কিসের দাঁত হারিয়ে ফেলেছে অমু?

সলিল বললে—কাল রাতে আমার দাঁত পড়ে গিয়েছিল। বড়দি বললে, রেখে দিতে—সকালে ইঁদুরের গর্ত্তে দিলে তবে দাঁত হবে! বালিসের তলায় রেখেছিলাম, অমু দেখছিল, কোথায় ফেলে দিয়েছে—য়্যাঁ, য়্যাঁ···

ব্যাপারটা বুঝে মিঃ রায় তাকে কোলের কাছে টেনে বললেন—এরই জন্যে কান্না! পাগল ছেলে—দাঁত তোর ঠিকই হবে। যেখানেই দাঁত ফেলুক অমু, ইঁদুর ঠিক খুঁজে তার গর্ত্তে নিয়ে যাবে, আর দেখবি ঠিক ইঁদুরের মত ছোট্ট দাঁত হবে।

মুখের দিকে চেয়ে সলিল বললে—বড়দি যে বললে ইঁদুরের গর্ত্তে দাঁত না দিলে আর দাঁত ওঠে না—ফোকলা হয়ে থাকে—

এমন সময় অমলা ঘরে ঢুকে হাসিমুখে বললে—এই নে দাদা, তোর দাঁত পেয়েছি—খাটের পায়ের পাশে পড়েছিল—

সলিল লাফিয়ে গিয়ে তার রাতে পড়ে-যাওয়া দাঁতটা হাতে ক'রে নিলে। বৃষ্টি—রৌদ্রের খেলার মত—চোখের জলের মাঝে তার মুখে হাসি ফুটে উঠলো!

মিঃ রায় বললেন—দেখলি তো, তুই কাঁদছিলি বলে ইঁদুর দাঁতটা খুঁজে খাটের পায়ের কাছে রেখে গিয়েছে। এইবার ইঁদুরের গর্ত্তে দিগে যা।

কি মন্ত্র আছে বাবা বল না, বড়দি বলছিল—বলে সলিল আবার তাঁর কোলের কাছটিতে সরে এলো।

মুস্কিলে পড়লেন মিঃ রায়, বললেন—আমার দাঁত তো সে অনেকদিন আগে পড়েছিল, মন্ত্র ভুলে গিয়েছি—যাও তোমার বড়দির কাছ থেকে জেনে নাওগে—

দুই ভাইবোনে হাত ধরাধরি করে হাসতে হাসতে চলে গেল।

চাএর পেয়ালাটা রেখে দিয়ে—একটা সিগারেট ধরিয়ে মিঃ রায় একদৃষ্টে সেই দিকে চেয়ে রইলেন।

কমলার কাছে এসে সলিল বললে—বড়দি ভাই, দাঁত পেয়েছি, মন্ত্রটা শিগ্গীর করে বলে দাও, ইঁদুরের গর্ত্তে ফেলে দিই।

কমলা তখন তার খোকাকে জামা পরিয়ে দিচ্ছিল, বললে—ইঁদুরের গর্ত্তে দাঁতটা ফেলে দিয়ে তিনবার বলবি—ইঁদুর ভাই, ইঁদুর ভাই, আমার এই ভাঙ্গা দাঁত নিয়ে তোমার মত ছোট দাঁত দাও···

সলিল বললে—তারপর কি করবো?

কমলা বললে—করবি আর কি, চলে আসবি!

একটু চুপ করে থেকে সলিল আবার বললে—কোথায় ইঁদুরের গর্ত্ত আছে দিদি?

নিজের ছোট খোকাটিকে নিয়ে তখন মহাব্যস্ত কমলা। প্রেমের পরম ও প্রথম সার্থকতায় নূতন ছোট অতিথিটি এসে তাহার হৃদয় রাঙিয়ে দিয়েছে, তাতেই সে দিশেহারা, তাতেই সে মশগুল, তারি মাঝে থেকে বললে—ঘুঁটের ঘরে একটা গর্ত্ত দেখে তার সামনে রেখে আসবি।

দুই ভাইবোনে নাচতে নাচতে মনের আনন্দে চললো—যেন কি এক মহামণির সন্ধান তারা পেয়েছে।

নীচে একপাশে একটা ছোট মেটে ঘর আছে—তার মধ্যে থাকে ঘুঁটে, কাঠ, টুকি টাকি সব বাজে জিনিষ! ঘরটা স্যাঁৎসেতে—আলোও কম আসে; তার উপর ক'দিন এক-ঘেয়ে বৃষ্টিতে তারি আওতায় আরো স্যাঁৎসেতিয়ে উঠেছে!

ঘরের মধ্যে ঢুকে একপাশে একটা গর্ত্ত দেখলে, দুই ভাই-বোনের দেখাশুনার ঠিক হলো ঐটাই ইঁদুরের গর্ত্ত, তারপর দাঁতটা গর্ত্তর সামনে রেখে দিদির বলে দেওয়া মন্ত্রটা সলিল বলার সঙ্গে সঙ্গে অমলাও বলতে লাগলো—!

সলিল দাঁতটা সেখান থেকে তুলে নিয়ে বললে—তোর তো দাঁত ভাঙেনি, তুই বলছিস কেন, চুপ কর। তারপর দাঁতটাকে আবার সেখানে রেখে, মন্ত্রটা তিনবার বলে সেইদিকে চেয়ে রইলো।

···ওপর থেকে কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে এসে সলিল দেখলে—দাঁতটা সেইভাবে পড়ে আছে।

ছুটে এলো সে ওপরে দিদির কাছে—বললে—কই দিদি, ইঁদুর তো দাঁত নিয়ে যায়নি—নেবে না দিদি?

কমলা হেসে বললে—হ্যাঁ রে হ্যাঁ নেবে, তুই বুঝি ঘুরছিস ফিরছিস আর গিয়ে দেখছিস! বারে বারে ওর কাছে গেলে ইঁদুর ভয় পাবে—আর দাঁত নেবে না।

সলিল বুঝলে—হবেও বা তাই।

খানিক পরে আবার সে অমলার হাত ধরে দেখতে গেল—তখনও সেটা সেই ভাবে পড়ে।

এবারও সে কমলাকে বললে।

কমলা বললে—তুমি খালি খালি যাচ্ছ, ইঁদুরে কখনও দাঁত নেবে না, দেখিস তোর দাঁতও বেরোবে না।

সলিল বললে—আচ্ছা দিদি, আর দেখবো না, বেরোবে তো? তুমি একবার গিয়ে লুকিয়ে দেখো—ইঁদুর যেন দেখতে না পায়।

কমলা হাসতে হাসতে বললে—আচ্ছা সে হবেখন—তুমি খেলগে যাও।

সলিল চলে গেল কিন্তু থেকে থেকে তার অস্বস্তি হতে লাগলো দাঁতটার জন্যে। জিভটা ভাঙ্গা দাঁতটার খালি জায়গাটায় ঠেকাতে লাগলো। ঘুরে ফিরে মনে হতে লাগলো, মন্ত্রটা আস্তে বলেছিলাম, গর্ত্তের মধ্যে থেকে ইঁদুর তো শুনতে পেয়েছিল? না, মন্ত্র ঠিক শুনতে পেয়েছে, এতক্ষণে দাঁতটা নিশ্চয়ই নিয়ে গেছে!

ঘরের মধ্যে এক ফাঁকে এসে ছোট আরসিটা নিয়ে মুখখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে—হাঁ করে, দাঁতগুলো বের করে, তারপর ভাঙ্গাজায়গাটায় খুব ভাল করে দেখতে লাগলো যদি এতক্ষণে একটুখানি বেরিয়ে থাকে! আঙুলটা সে খালি জায়গায় দিয়েও বিশেষ কিছুই বুঝতে পারলে না। বাড়ীর চাকর মধু বলেছে—বুড়ো—ফোকলা বরকে কেউ বিয়ে করবে না!

না, দিদি হয়তো দেখতে ভুলে গেছে—নিশ্চয়ই ইঁদুরে দাঁত নেয়নি।

আপন মনে গুটি গুটি করে এসে চারদিকে একবার তাকিয়ে গর্ত্তটার সামনে দাঁড়ালো। দেখলো দাঁতটা যেমন ছিল তেমনি রয়েছে, শুধু লাইনবন্দি ভাবে খুদে লাল পিঁপড়ের দল গর্ত্তর ভিতরে ও বাইরে যাওয়া আসা করছে।

সলিল বুঝলে—পিঁপড়েগুলো ইঁদুরটাকে কামড়াচ্ছে···এদেরই জন্যে সে বাইরে এসে তার দাঁত নিয়ে যেতে পারছে না।

একটা কাঠি নিয়ে সে পিঁপড়েগুলোকে নেড়ে ছাড়িয়ে দিতে লাগলো, তারপর ছোট একটা ইঁট নিয়ে বিজয় গর্ব্বে সেগুলোকে ঘসে ঘসে মেরে ফেলতে লাগলো।

কি করছিস ভাই দাদা?—বলে অমলা সেখানে এসে দাঁড়ালো।

সলিল তখনও পিঁপড়েগুলোকে মেরে চলেছে। তারি মাঝ থেকে উত্তর দিলে—ইঁদুরটা কিছুতেই দাঁতটা নিয়ে যেতে পারছে না, শালা পিঁপড়েগুলো গিয়ে কামড়াচ্ছে কি না তাই, তুইও একটা ইঁট নিয়ে মার।

দুই ভাইবোনে আপন মনে বিজয়-উল্লাসে তাই করে চললো।

খাবার সময় হয়ে গেল—মা বাড়ীময় খুঁজে নীচে এসে দেখলে ঘুঁটের ঘরের মধ্যে দু'জনে উপুড় হয়ে বসে পিঁপড়ে মারছে।

মা বললে—এখানে এই সাপ খোপের এঁদো ঘরের মধ্যে

বসে কি হচ্ছে শুনি? ভাতটাত আজ খেতে হবে না—না কি!

সলিল বললে—পিঁপড়েগুলোকে মারছি মা—এদের জন্যে ইঁদুরটা আমার দাঁত নিয়ে যেতে পারছে না।

মা হাত ধরে তুলতে তুলতে বললে—চ খাবি চ। ওরকম ভাবে বসে থাকলে বুঝি ইঁদুর আসে! হ্যাঁরে, বসে বসে এতগুলো পিঁপড়ে মারলি দুজনে—পাপ হবে দেখবি···ব'লে হাত ধরে দু'জনাকে তুললে···!

সলিল বললে—দাঁড়াও, ঐ দেখ দুটো লাল পিঁপড়ে গর্ত্তের ভেতরে ঢুকছে, ও দুটোকে মেরে খাব।

মা ধমকে উঠে বললে—না, পিঁপড়ে মারতে হবে না—এমন পাগল ছেলে কোথাও দেখিনি। বলে দু'জনের হাত ধরে নিয়ে গেল।

উপরে এসে মা কমলাকে বললে—ওখানে বসে দু'জনে পিঁপড়ে মারছিল। পিঁপড়েগুলো নাকি ইঁদুরকে কামড়াচ্ছে, তাই ওর দাঁত নিয়ে যেতে পারছে না।

কমলা বললে—আবার তুই ওখানে গিয়েছিলি, দেখিস না, ইঁদুর কিছুতেই তোর দাঁত নেবে না—বেশ হবে ফোকলা হয়ে থাকবি।

সলিল ভাতের থালা সরিয়ে দিয়ে গুম হয়ে বসলো।

মা বললে—খেয়ে নে—

সলিল কাঁদতে কাঁদতে বললে—কেন বড়দি বলছে ফোকলা হয়ে থাকবি—য়্যাঁ, য়্যাঁ—

মা হেসে ভাত মেখে দিতে দিতে বললে—না, ফোকলা হয়ে কেন থাকবি, ইঁদুরের মত বেশ ছোট্ট দাঁত বেরোবে—নে, খেয়ে নে, দুপুরে আজ একটা ভাল গল্প বলবো।

সলিল খেতে লাগলো কিন্তু মন তার পড়ে রইলো—সেই মেটে ঘরে—গর্ত্তের মুখে সেই ভাঙ্গা দাঁতটার উপর। ইঁদুরের উপর। পিঁপড়েগুলোকে মেরে ফেলেছে, এতক্ষণে ইঁদুরে নিশ্চয়ই দাঁতটা নিয়ে গেছে।

এক সময় হঠাৎ বলে উঠলো—মা, কখন আমার দাঁত বেরোবে?

মা হাসতে হাসতে বললে—বেরোবে, ঠিক বেরোবে। একটা দাঁত ভেঙ্গেই এই, সব দাঁতগুলো যখন একটা একটা করে পড়বে, তখন দেখছি পাগল করে মারবি বাবা! আস্ত ভাতগুলো যে গিলছিস—চিবিয়ে খা—

কমলা বললে—ওর মন এখন পড়ে রয়েছে ওখানে, খাওয়াটা হলে হয়, এখনি ওখানে গিয়ে ঘুরঘুর করবে।

আস্তে আস্তে কমলা উঠে গেল। নীচের সেই ঘরে এসে দাঁতটা গর্ত্তর মুখ থেকে তুলে নিয়ে ঘরের এককোণে ফেলে রেখে ঘুঁটে একখানা চাপা দিয়ে রাখলে।

খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে সলিল খানিকটা এঘর ওঘর করে বেড়াতে লাগলো, তারপর আস্তে আস্তে নীচে নেমে গেল।

একটু পরে হাসিমুখে লাফাতে লাফাতে এসে বললে—বড়দি, ইঁদুরে আমার দাঁত নিয়ে গেছে, পিঁপড়েগুলোকে মেরে ফেলেছি, এবার ঠিক নিয়ে গেছে। দেখলে?

কমলা হাসতে হাসতে বললে—যাক, নিয়ে গেছে তো—আর যেন ওখানে গিয়ে বসে থেক না!

একদিন, দু'দিন করে পাঁচদিন গেল—সলিলের দাঁতের কোন লক্ষণই দেখা দিল না। দিনের মধ্যে এক ফাঁকে অন্তত একবারও সে ঘরের মধ্যে থেকে ঘুরে এসেছে!

সেদিন সকাল থেকে আবার বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। মা বারণ করেছে ঘর থেকে বেরোতে—বৃষ্টিতে ভিজলে অসুখ করবে, অমুর সঙ্গে বসে লেখাপড়া করবে। পাশের ঘরে কমলা নিজের ছেলের ভিজে ক্যাঁথা সব কি করে শুকোবে তাই নিয়ে ব্যস্ত···। পোড়া বৃষ্টিরও যেমন বিরাম নেই···ছেলেটাও তেমনি আজ দিনবুঝে যেন বাদ সেধেছে!

রান্নাঘরে মা রান্না নিয়ে ব্যস্ত। চালে ডালে চড়িয়ে-দিয়ে আনাজগুলো কুটছে। বৈঠকখানা ঘরে বাবা পাড়ার দু-চারজন বন্ধুদের সঙ্গে জমাটি আড্ডা বসিয়েছেন। অমু সেলেটের উপর "ক, খ, গ, ঘ" মক্স করে চলেছে!

সকাল থেকেই সলিলের দাঁতটার জন্য মনটা উসখুস করছে: এতদিনেও দাঁতটা বেরোল না। তবে কি ইঁদুর মন্ত্র শুনতে পায়নি!

অমুকে বললে—যাবি অমু, একবার ওখানটায় দেখে আসি। লুকিয়ে যাব আর দেখেই চলে আসবে।"

একে অমুর "খ" লেখাটা ঠিক হচ্ছিল না, মেজাজ খারাপ ছিল, তাই বললে—না, বড়দি বকবে—

সলিল বললে—বড়দি ত ও ঘরে—দেখতে পাবে না—

অমু বললে—আমি যাব না, তুমি গিয়ে দেখে এস।

আপনমনে সলিল চললো। চালের ঘরের গা ঝরে জল পড়ছিল! সলিল হাত বাড়িয়ে ধরলো—টপটপ করে হাতের উপর জল ঝরে পড়তে লাগলো! বাড়ীর পিছনটায় ব্যাঙেরা সব একঘেয়ে মনের আনন্দে গান গেয়ে চলেছে। শিশুমন সব ভুলে গিয়ে একমনে শুনতে লাগলো! নিজে নিজেই বলে উঠলো—"আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেব মেপে"! অমুর কথা মনে হলো—ডেকে আনি, বেশ দু'জনে জল ধরবো, তখনি মনে পড়লো দাঁতের কথা।

ঘরের মধ্যে ঢুকে সে একটুখানি গর্ত্তটার সামনে বসলো, তারপর ঘাড় নীচু করে গর্ত্তটার ভিতর দেখবার চেষ্টা করলো। ভিতরটা অন্ধকার, কিছুই দেখতে পেল না—কেবল গর্ত্তটার প্রায় মুখের কাছে, একটু ভিতরে কি একটা চকচক্ করছিল।

সলিল ভাবলে বোধ হয় তার দাঁত—ইঁদুরটা নিয়ে গিয়ে ফেলে রেখেছে। নীচু হয়ে ভিতরটায় আঙুল দিতেই—যন্ত্রণায় চাৎকার করে উঠে আঙুলটা বের করে নিলে তারপর চীৎকার করতে করতে বাইরে আসতে গিয়ে চৌকাঠের কাছে পা পিছলে পড়ে গেল।

ঠিক সেইমুহূর্ত্তে রান্নাঘরে মা থালায় করে কোটা আনাজগুলো কড়ায় চাপান তেলে দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ বুকটা কেমন করে উঠে হাত থেকে থালাটা পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই সলিলের মা-রে, দিদি-রে চীৎকার কানে এলো।

বৈঠকখানা ঘর থেকে বাবা, উপর থেকে মা, কমলা, চাকর, মধু সকলেই ছুটে এলো। মা সলিলকে বুকের উপর তুলে নিয়ে কেঁদে উঠলো—ওগো, কি হলো—কি হলো বল না, এ রকম করছে কেন?

সলিল তখন যন্ত্রণায় কাঁদছে, বললে কোন রকমে—ইঁদুর গর্ত্ত থেকে আঙুলে কামড়ে দিয়েছে···

বন্ধু ক'জন চেঁচামেচিতে ছুটে এসেছিল, তারা দেখে বললে—সাপে কামড়েছে বলে মনে হচ্ছে।

সাপের খোঁজে ঘরের মধ্যে ঢুকতে যাবে, ঠিক সেই সময় সকলের চোখের সামনে দিয়ে ঘর থেকে একটা কেউটে সাপ বেগে বেরিয়ে বাড়ীর পিছনে বনবাদাড়ের দিকে চলে গেল।

সলিলকে কোলে করে উপরে আনা হয়েছে। ডাক্তার এসে কাটাকুটি—কত কি করলে। সাপের ওঝার তুক-তাক মন্ত্র কোন কিছুরই ফল হলো না। ক্রমে তার দেহ অবশ হয়ে নেতিয়ে আসতে লাগলো।

কমলার মনে পড়লো দাঁতটা সে সরিয়ে রেখেছিল। সব ফেলে ছুটে গিয়ে ঘরের কোণ থেকে দাঁতটা নিয়ে এসে সলিলের অন্য একটা হাতে দিতে দিতে বললে—এই নাও ভাই, তোমার দাঁত, আমি রাক্ষসী লুকিয়ে রেখেছিলাম। ওরে, যে ভয়ে রেখেছিলাম, তাই তো হলো রে···

দাঁতটা হাতে নিয়ে যন্ত্রণার মাঝেও সলিলের মুখে খুব ক্ষীণ একটু হাসি যেন ফুটে উঠ্‌লো! হাতখানা তুলতে গেল, পারলে না।

সমস্ত নিস্তব্ধ। নিস্তব্ধ বনানী—নিস্তব্ধ বাতাস। আকাশও নিস্তব্ধ। ধরেছে সবে সমস্ত দিনের অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। গুমটে আবহাওয়ায় যেন এক আসন্ন প্রলয়ের সূচনা দিচ্ছে। ঝিঁ-ঝিঁ পোকা, ব্যাঙেরা সব আনন্দের কি দুঃখের এক ঘেয়ে গান গেয়ে চলেছে।

যে মার দেহের প্রতি অণুপরমাণু দিয়ে তৈরী সলিলের দেহটা—সেই মারই বুকের তলায় সেটাকে ফেলে রেখে তার ভিতরের বদ্ধ পাখীটা মুক্তি পেল নিশীথিনীর ঐ মুক্ত বুকে।

ছোট্ট সলিলের ছোট্ট সেই দাঁতটা রূপার ফ্রেমে বাঁধানো—নীচে লেখা "স্মৃতি"! ছোট একটা জলচৌকির উপর পেতে বসান হয়েছে সেইখানে—যেখানে সে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে—নিষ্পাপ নির্ভীক মন নিয়ে ঘুর ঘুর করে বেড়াত—মৃত্যু যেখানে এসে তার প্রথম স্পর্শ দিলে—সেইখানে—সেই স্মৃতিবাসরে···

কত দিন, মাস, বরষ কেটে যায়। আবার সেই দিন আসে···

সেই দিনের সেইখানটিতে ঝরে পড়ে চোখের জল বাপ-মার দুজনারই—স্মৃতির দুয়ার খুলে।

শান্ত, মৌন ভক্তের মত দু'জনাই বসে থাকে সামনে রেখে মালায় সাজানো—বাঁধানো সেই দাঁতটা···

পাথরে বাঁধানো দেউড়ি গড়ে উঠেছে সেই আবর্জ্জনা ঘরের অস্তিত্ব মুছে নিয়ে।

মন্দিরের মত পবিত্র—শ্মশানের মত নিস্তব্ধ করুণ—ছমছমে তার ভাব।

তারি মাঝে খোলা একটু মাটির বুকে বেড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে একটা শিউলি গাছ···! ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ে শিউলি ফুল—পাথরের ঐ দেউড়ির বুকে!

কেউ দেখে না, কেউ জানতেও পারে না—শুধু পারে বাপ মা সেদিন—যেদিন বদ্ধ ঘরের দুয়ার খুলে তারা আসে স্মৃতির বেদীমূলে!

কোলকাতা থেকে এসে তারা ঐ দিনটা ওইখানে কাটিয়ে যায়—স্মৃতির বাতি জ্বালিয়ে।

ছোট্ট মুখের মিষ্টি কটি কথা যেন শুনতে পায়—কই দিদি, ইঁদুর তো দাঁত নিয়ে যায় নি, নেবে না দিদি? কবে দাঁত বেরোবে? পিঁপড়েগুলোকে মারছি মা, এদের জন্যে ইঁদুরে আমার দাঁত নিয়ে যেতে পারছে না! আচ্ছা, আর যাব না দিদি, তুমি একবার গিয়ে লুকিয়ে দেখে এস, ইঁদুর যেন দেখতে না পায়···

প্রলয়ের বাঁশী

শ্রীনকুলেশ্বর পাল বি-এল্

হে মোর অন্তরতর! হে চির-সুন্দর!
এক হাতে গড়ি বিশ্বে সৃষ্টি অনুপম
অন্য হাতে ভাঙ্গ নিরন্তর।

এ যেন পুতুলখেলা চির নব নব;
নিখিল ভুবনব্যাপী খেলাঘরে তব।
মধুর মাধবীরাতে জোছনার হাসি;
ছড়ায়ে বিশ্বের বুকে শুভ্র মুক্তারাশি;—

যবে গায় মিলনের গান
আকুল করিয়া মুগ্ধ বিরহীর প্রাণ?
সহসা বাজাও তব সর্ব্বনাশা বাঁশী
আঁধার ঘনায়ে আসে, কৃষ্ণ মেঘরাশি

উড়ায়ে পিঙ্গল জটা যেন মহেশ্বর;
ধ্বংসের খেলায় মাতে কাঁপায়ে অম্বর,
মুহুর্মুহু ঝঞ্ঝাবাত অট্ট-অট্ট-হাসি
সম্বর, সম্বর তব প্রলয়ের বাঁশী।

তোমার সৃষ্টিরে তুমি হে শ্যামসুন্দর!
নিতি নিতি কেন গড়ি ভাঙ্গ নিরন্তর?

কেন?

শ্রীপরেশনাথ সান্যাল

চাঁদের আলোয় বসুধা যখন ঘুমায়ে পড়ে,
তখন কেহ কি জাগিয়া দেখেছ গভীর রাতে;
দেখেছ পরীরা উড়িয়া বেড়ায় আকাশ ভরে
খুঁজিয়া পেয়েছ ঘুম কেন নাই নয়নপাতে?

শুন নাই বুঝি বনের কিনারে চরণধ্বনি
শকুন্তলার হৃদয় সেথা যে গুমরি কাঁদে?
চমকি ওঠনি সহসা বনের বেদনা শুনি,
ভাল ক'রে বুঝি দেখনি চাহিয়া রাতের চাঁদে?

সেদিন কি জানি ঘুম ভেঙে গেল সহসা কেন,
চেয়ে দেখি আলো—চাঁদের আলোয় ভুবন ভরা;
মনে হ'ল রাতি অনেক দেখেছি—দেখিনি হেন
চাঁদ যেন নেমে হৃদয়ে আমার দিতেছে ধরা।

ঘর ছেড়ে ছুটে বাহিরে আসিনু উঠিনু ছাদে,
আকাশের নদী ভরে গেছে রূপে আলোর বানে;
বুঝিলাম মানে এমন নিশীথে কাহারা কাঁদে,
বনের দেবীরা উতলা কেন যে আলোর গানে।

সেরাইকেলা ভ্রমণ

শ্রীকাননগোপাল বাগ্‌চী

কর্ম্মব্যস্ত জীবনের পর অবকাশ এলেই ভ্রমণের ইচ্ছা জেগে উঠা স্বাভাবিক। এবার পূজাতেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। পূজা আরম্ভ হতেই সেরাইকেলায় চলে এলাম—তবে নিছক ভ্রমণের জন্যে নয়, তার সঙ্গে এখানকার ভূতত্ত্বেরও কিছু পরিচয় জানতে। ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন কাজ করতে হলেই সে-দেশের পথ ঘাট, নদী নালা, বন জঙ্গল সমস্তই পায়ে চলে দেখতে হয়। কাজেই এই ভাবে শুধু ভূতত্ত্ব নয়,

জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি—সেরাইকেলা

সেখানকার ভূপ্রকৃতি ও অধিবাসীদেরও সঙ্গে ঘটে ঘনিষ্ঠ পরিচয়। কোন দেশকে জানতে হ'লে সমস্ত অঞ্চল পায়ে হেঁটে কষ্ট করে না বেড়ালে কিছুই বুঝতে পারা যায় না। কোন জাতির পরিচয় নিতে হলে, তার ভেতরের তথ্য অবগত হ'তে হলে প্রথমে আত্মীয় বা বন্ধুজ্ঞানে তাদের সঙ্গে মিশতে হয়। হঠাৎ গিয়ে দু-পাঁচ মিনিটের আলাপে আমরা তথ্যসংগ্রহের যে চেষ্টা করি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা হয়ে পড়ে অসম্পূর্ণ বা ভ্রমাত্মক।

বি-এন্-আর লাইনে জামসেদপুর ছাড়িয়ে খড়্‌কাই নদী অতিক্রম করলেই সেরাইকেলা রাজ্যে পৌঁছুন যায়; উড়িষ্যা স্টেটস্‌এর অন্তর্গত হলেও ভূপ্রকৃতির দিক্ থেকে একে ছোটনাগপুরের মধ্যেই ধরা চলে। বাঙ্গলা দেশ ছাড়িয়ে ট্রেন যেই ছোটনাগপুরের মধ্যে প্রবেশ করে, দুপাশের দৃশ্যে জেগে উঠে নূতন এক ছবি। দিগন্তবিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রের পরিবর্ত্তে উপস্থিত হয় উঁচু নীচু মালভূমি—শালের বনে আচ্ছাদিত, আর তারই বুকচিরে মাথা জাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বহু ডুঙরি বা টীলা। কোলভাষায় এদের বলে "বুরু"। বনের ভিতর দিয়ে ডুঙরিকে প্রদক্ষিণ করে এঁকে-বেঁকে বয়ে চলেছে অসংখ্য ছোট ছোট পাহাড়ে নদী। গ্রীষ্মের সময় এরা সব শুকিয়ে যায়, কিন্তু বর্ষার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয় এদের কল্লোলিত জীবন। আয়ু এদের অল্প, কিন্তু যৌবনের উচ্ছ্বাসে এরা ভরপুর। পাহাড়ের গা বয়ে পাথরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় এই সব নদী অসংখ্য জলপ্রপাত ও আবর্ত্তনের সৃষ্টি করে, যার ফলে শক্ত শক্ত পাথরের উপর গোল গোল ছিদ্রের উৎপত্তি হয়, যাকে "পট্ হোল" (pot holes) বলা হয়। সে সময় এদের বেগ অত্যন্ত প্রখর হয় এবং আঘাত খেয়ে জলে যে শব্দ হয় তাতে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠে। জ্যোৎস্না রাত্রে বা সন্ধ্যার নিস্তব্ধতায় এই শব্দ সত্যই অনুভবনীয়।

বাঙ্গলা বা বিহারের একটানা সবুজপ্রান্তর ছাড়িয়ে এসে প্রথমেই আমাদের যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে হচ্ছে এখানকার বিচিত্র ভূমি। কোথাও এর উপর জন্মেছে ঘন বন, আবার কোন স্থানে শীর্ণ উদ্ভিদ্ অতি কষ্টে প্রাণধারণের চেষ্টা পাচ্ছে—"স্ট্রাগল্ ফর্ দি এক্সিস্টেন্স-এ"র মূর্ত্ত প্রতীক্। শুধু এই নয়, কোন স্থান একেবারেই তৃণশূন্য। এর মূলে রয়েছে জমির উপাদানগত পার্থক্য—উপাদান আবার কতকাংশে নির্ভর করে উৎপত্তিগত পার্থক্যের উপর। ছোটনাগপুরের জন্ম-ইতিহাস অতি প্রাচীন। সে আজ প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগের কথা—পৃথিবীর অভ্যন্তর হতে আগ্নেয় উৎপাতের ফলে গলিত পাথর উপরে এসে

জমাট বেঁধে সৃষ্টি করে উঁচু এক পর্ব্বতের। পরবর্ত্তী যুগে তাপ, জল ও বাতাসের প্রভাবে আরম্ভ হয় তার ক্ষয় ও পলির পর পলি সঞ্চিত হয়ে পাথরের গঠন করে। এইভাবে উঁচু পাহাড় এসে পরিণত হয় নাতি-উচ্চ এক মালভূমিতে। অবশ্য এর ঠিক পরেই আর একদফা আলোড়ন, আগ্নেয় উদ্ভেদ ও বিচ্যুতির নিদর্শন এর বুকে সঞ্চিত দেখা যায়। তবে বহুদিন ধরে এ অঞ্চল একেবারেই শান্ত অবস্থায় আছে—এমন কি, বিহার যখন ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত—বাঙ্গলাও যখন বাদ পড়ে নি—ছোটনাগপুর সে সময় একেবারেই নির্ব্বিকার।

এই সব বিভিন্ন উপাদানের পাথর অল্পবিস্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েই গড়ে তুলেছে ডুঙ্‌রি, তলদেশ ও নীচু অধিত্যকা বা টাঁড়। প্রকৃতিগতবৈষম্য আমাদের কতখানি প্রভাবান্বিত করে, সেরাইকেলার বিভিন্ন স্থান ভ্রমণে তা বিশেষভাবেই উপলব্ধি করা যায়। পাহাড়ে দেশ বলে এখানকার অধিবাসীদের সাধারণত পরিশ্রম করতে হয় বেশী। বাঙ্গলা দেশের মত কোন রকমে চাষ দিয়ে দুটো বীজ ছড়িয়ে দিলেই ফসল উৎপন্ন হয় না। পাথর কেটে জমি তৈয়ারী করে সার দিয়ে অত্যন্ত যত্নে আবাদ করতে হয়। গ্রীষ্মের সময় একেবারেই বৃষ্টি হয় না বলে এবং ঢালু প্রকৃতির জন্য এ সব জমিতে জল না জমায় বর্ষা ভিন্ন অন্য সময় চাষ দেখা যায় না। পাহাড়ে নদী ভিন্ন ছোট বাঁধ বা কুয়োই গরমের সময় জল সরবরাহ করে।

এখানে প্রধানত তিন শ্রেণীর অধিবাসী দেখা যায়। এক শ্রেণী—অধিকাংশই কোল ও সাঁওতাল—পাহাড়ের কোলে বা জঙ্গলে বাস করে। এরা অপেক্ষাকৃত অসংস্কৃত এবং পূর্ব্ব রীতিনীতি অনেকাংশে বজায় রেখেছে। এর প্রধান কারণ হ'ল, এ সব স্থানের দুর্গমতা ও অনুর্ব্বর জমি। এখন আর এরা পাতার পোষাক পরে না বটে, তবে পাতার ছাতা ইত্যাদির প্রচলন আছে। অল্প স্বল্প কৃষিকার্য্য ও সামান্য পশুপালন করলেও বনের স্বাভাবিক উৎপত্তি হতে এরা যথেষ্ট সাহায্য নেয়। তীরধনুকের ব্যবহার এদের ভিতর প্রচুর এবং তা দিয়ে শীকারও ভাল করে। সরিষা বা তিলের চাষ নেই বলে বনের নিম, করঞ্জ, রেড়ী বা মহুয়া বিচির তেলই এরা ব্যবহার করে। তেল তৈয়ারীর জন্য ঘানির সাহায্য এরা নেয় না—প্রাচীন কালের "সুরুম পাটাই" যথেষ্ট। দুটো তক্তার মাঝে, বিচিগুলো গুঁড়িয়ে ভাপিয়ে দিয়ে, খুব জোরে চাপ দেয় ও তাতেই তেল বেরিয়ে আসে। একেই সুরুম পাটা বলে।

বন হতে বাবুই ঘাস, গাছের ছাল বা বাঁশ ইত্যাদি আহরণ করে এনে তাই দিয়ে দড়ী, মাদুর, বাঁশের ঝুড়ি ইত্যাদি প্রস্তুত করে; তার বিনিময়ে সমতলপ্রদেশ হতে এরা কাপড়, নুন, তামাক ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিষ নিয়ে আসে। এই সুযোগেই যা বাহিরের সভ্যতার সঙ্গে আদানপ্রদান। প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ থাকায় প্রাকৃতিক সারল্য এরা এখনও বজায় রেখেছে এবং ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদের মনেও বিভিন্ন ভাবের উদয় হয়। ধান কাটা হয়ে গেলে পর, সমস্ত দিক্ ধ্বনিত করে

হো-দের শ্মশানদিরি বা সমাধি স্থান

বেজে উঠে মাদল ও বুয়াং, আর তার সঙ্গে তালে তালে পড়তে থাকে নরনারীর সম্মিলিত পা। এর সঙ্গে তোয়েলার সুরে সুর মিলিয়ে গ্রাম্য সঙ্গীতের আওয়াজ প্রাণে একটা আবেশ এনে দেয়। অন্যান্য পাহাড়ে জাতির মত এদেরও শোক বা আনন্দ উভয় উৎসবেরই অপরিহার্য্য অঙ্গ হ'ল নাচ আর গান। বাজনার তালে তালে নিটোল স্বাস্থ্যবান অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন বেশ প্রীতিপ্রদ মনে হয়।

কোল বা সাঁওতালদের গয়না বা প্রাচীর-চিত্রেও আমরা প্রকৃতির প্রভাব দেখতে পাই। ওদের মাথার গয়না হ'ল সবুজ পাতা আর সময়োচিত ফুল। হাতে বা পায়ে অনেকে পরে খাড়ু ও পাহুড়। দেওয়ালে হাতী, বিভিন্ন

পাখী, জ্যামিতির চিত্র, আয়না ইত্যাদি সৌখীন জিনিষ আঁকা থাকে। কেউ কেউ হাতে ও পায়ে লতাপাতা বা ফুল এই সবের চিত্র উল্কি দিয়ে এঁকে রাখে।

এদের গানের কবিতাগুলিও খুব সরল ছোট এবং আশ-পাশের বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত। সেরাইকেলা শহরের মাইল ছয়-সাত দক্ষিণে খড়কায়ের তীরে 'কোপে' নামক একটা গ্রাম থেকে সংগৃহীত একটা কোল গানের নমুনা দিচ্ছি।

"পুকুরে আনিয়ে বারিপদ রাজা হোন হুরাতনা হি
হুরং আয়ুং আয়ুংতে সারোইকোলা রাণী হোন্ হিজুলেনা॥"

বাঙ্গলাতে অনুবাদ করলে এটার মানে হয়ঃ—

"পুষ্করিণীর ধারে বারিপদার (ময়ূরভঞ্জের)
রাজপুত্র গান গাইতেছিলেন।
সেই গান শুনতে শুনতে সেরাইকেলার
রাজকন্যা সেখানে উপস্থিত হলেন॥"

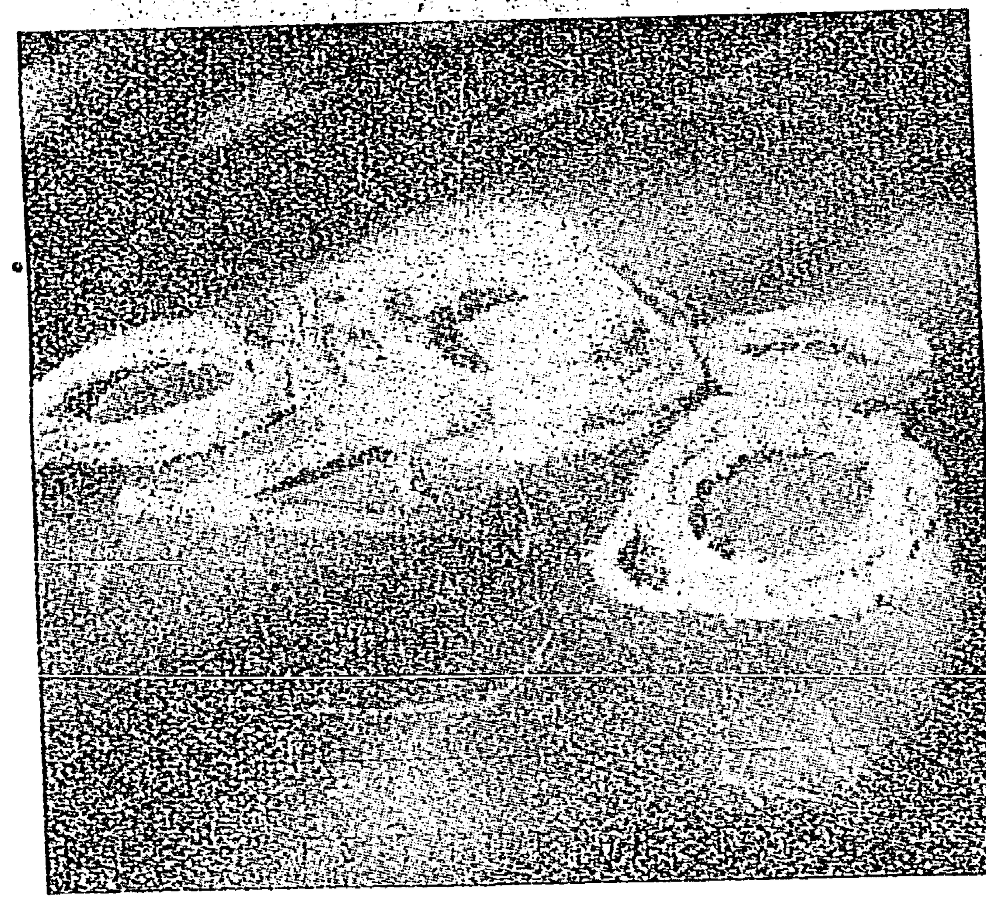

সেরাইকেলায় নির্ম্মিত দড়ি

এদের বিবাহ ইত্যাদি এখনও পূর্ব্বপ্রথায়ই অনুসৃত হয়—আজকাল হিন্দুপ্রভাবিত গ্রামগুলোতে এর ব্যতিক্রম হচ্ছে। কোন কোল যুবক যদি কোন অনূঢ়া যুবতীর সিঁথিতে সিন্দুর ঘষে দিতে পারে বা কোন উপায়ে তাকে হরণ করে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়, তা হ'লেই সে ঐ যুবতীকে বিবাহ করতে পারে। অবশ্য এই ব্যাপারটা খুব সহজেই সম্পন্ন হয় না এবং সময়ে সময়ে অভিভাবকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেই এ নিয়ে খুন জখমও হয়ে যায়। তবে আজকাল এই প্রথা অনেকটা কমে আসছে। "দুপুং" নামের একটা সাঁওতাল গ্রামে 'প্রধান' বলে একটা সাঁওতাল বললে যে, তার ছেলে ও মেয়ের বিবাহের সময় সে নিজেই সম্বন্ধ ঠিক করেছিল। এটা সম্ভবত হিন্দুসভ্যতার প্রভাব। এই সব ক্ষেত্রে উভয়পক্ষকে যৌতুকাদি—গরু ছাগল ইত্যাদি দিতে হয় এবং বিবাহ উৎসবে প্রচুর ব্যয়ে হাঁড়িয়া ও মাংসের ভোজ দিতে হয়।

কেউ মারা গেলে পর এখনও এরা সমাধির উপর পাথরের স্মৃতিচিহ্ন খাড়া করে রাখে। কোন কোন আধুনিক স্মৃতিচিহ্নের উপর সমাধিস্থ ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জীবনীও লেখা দেখতে পাওয়া যায়। তাতে, সে কোথায় কাজ করত—কত বয়সে মারা যায়—কি অসুখ হয়েছিল—লেখাপড়া জানত কি না—কি প্রকৃতির লোক ছিল—সমস্ত বৃত্তান্তই বর্ণিত থাকে। কেউ মারা গেলে আট দিন ধরে এরা অশৌচ পালন করে। এই সময়ের মধ্যে মাছ বা মাংস খাওয়া নিষেধ, তবে মদ বা হাঁড়িয়া খাওয়া যেতে পারে। আট দিন পর কামান হয়ে গেলে বন্ধু ও আত্মীয়দের নিমন্ত্রণ করে সকলে একসঙ্গে মাছ বা মাংস খায় এবং নাচগান করে। শবানুগমন করে নারী ও পুরুষ সকলেই—তবে শব বহন করে কেবল পুরুষেই। গ্রামের সব কোলকেই একটি সমাধিক্ষেত্রে—"শ্মশানদিরি"—সমাধিস্থ করে না। ভিন্ন ভিন্ন "কিলি" বা গোত্রের জন্য নির্দ্দিষ্ট শ্মশানদিরি আছে। এদের কিলির নাম হেমব্রোম্, তোপে ইত্যাদি। কোন এক কিলির আদিবাস যদি দূরের ভিন্ন গ্রামে হয় ও সেখানেই আদি "শ্মশানদিরি" থেকে থাকে, তা'হলে কেউ মারা গেলে তাকে নিকটস্থ স্থানে সমাধিস্থ করে, সুবিধামত অস্থি আদি-শ্মশানদিরিতে দিয়ে আসে। মৃত ব্যক্তির সম্মান ও পদমর্য্যাদার তারতম্য অনুসারে তার উপরের পাথরেরও আকার ও গঠনের পার্থক্য হয়ে থাকে।

কোল-সাঁওতালদের ভিতর এখনও প্রকৃতি পূজার প্রাধান্য দেখা যায়। "হাসুবঙা" অসুখের দেবতা, বুরুর দেবতা, শস্যের দেবতা ইত্যাদি কত যে দেবতা আছে তার ঠিক নেই! সমাধি ও পূজা ইত্যাদি ব্যাপারে এরা অনেকটা আসামের খাসিদের মত হলেও সামাজিক একটা পার্থক্য দেখি মেয়েদের সম্মান বা পদমর্য্যাদায়। খাসিদের মধ্যে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় নারী ও পুরুষ সব বিষয়েই তার নিম্নস্থান পেয়ে থাকে। এখানে কিন্তু পুরুষই মালিক—স্ত্রী গৃহকর্ত্রী মাত্র। তবে স্ত্রী-স্বাধীনতা এদের ভিতর পর্য্যাপ্ত পরিমাণেই রয়েছে। এরা পূর্ব্ব প্রথাকে কতদূর আঁকড়ে

থাকতে চায় তার একটা উদাহরণ দিই। আজকাল দেশলাই এত সস্তা ও সুলভ হলেও এখনও এরা কাঠে কাঠ ঘসে আগুন তৈয়ারী করে। সজনে বা পাকুড়ের শুক্না ডাল ঘসে দু আড়াই মিনিটেই আগুন জ্বালাতে দেখেছি। এ ছাড়া লোহার দণ্ড দিয়ে পাথরের (কোয়ার্টজ) উপর আঘাত করেও এরা আগুন জ্বালায়।

যে সব অধিবাসীরা পাহাড় জঙ্গল ইত্যাদি দুর্গম স্থানে থাকে তাদের ভিতর অন্য সভ্যতার প্রভাব অত্যন্ত আস্তে সঞ্চারিত হচ্ছে। তবে হিন্দু লোকালয়ের নিকটে বা সেরাইকেলা শহরের আশপাশে যে সব কোল বা সাঁওতাল

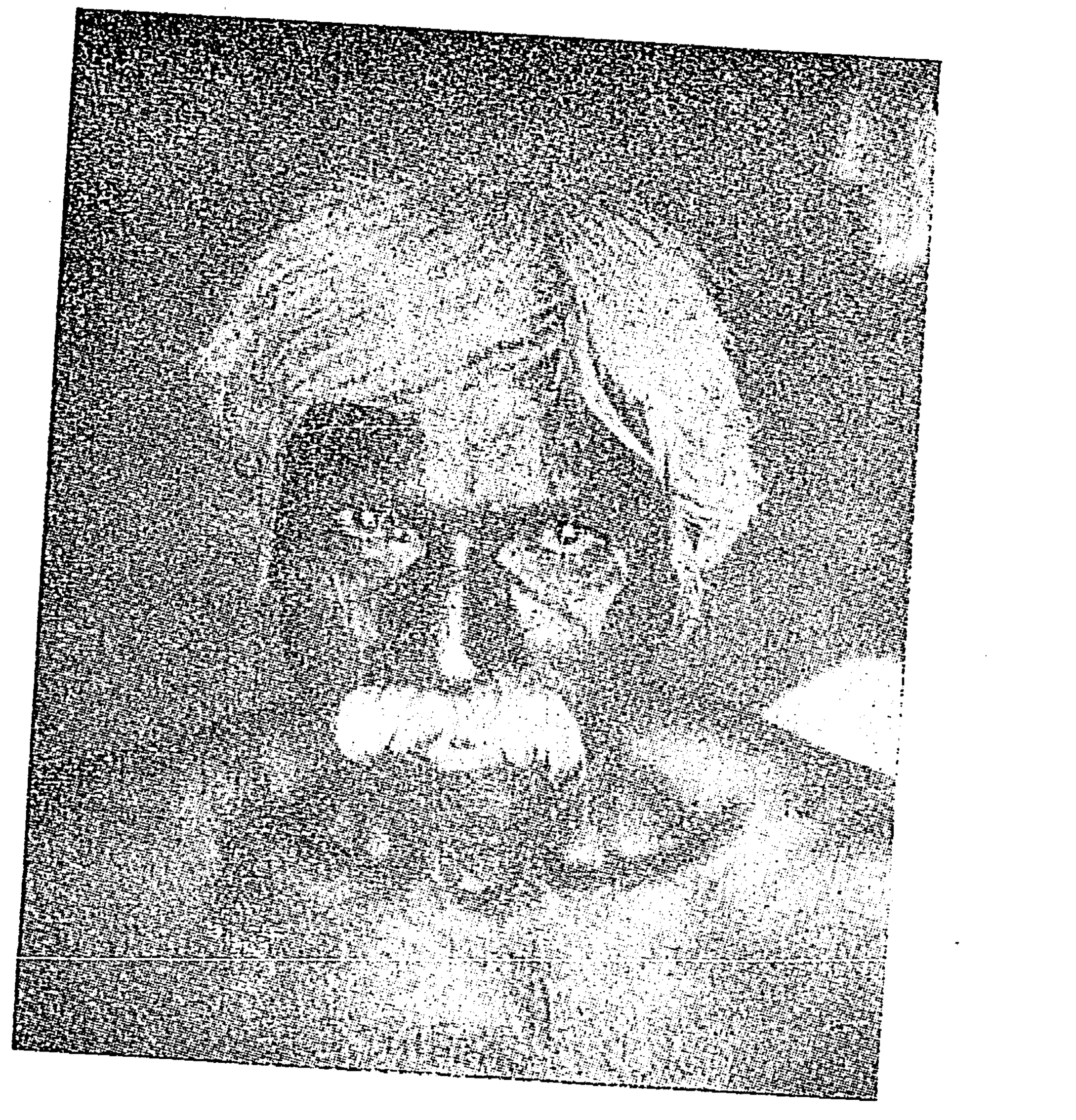

হো অধিবাসী, সেরাইকেলা

থাকে তারা অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে এবং তাদের উৎসবেও বাঙ্গলা গান ইত্যাদি প্রবেশ করেছে। নরডিতে একটি কোলের বাড়ী "করম নাচ" দেখতে গিয়ে সমস্ত গানই বাঙ্গলাতে হতে শুনলাম। এই উৎসবে কিন্তু কোল ছাড়া অন্যান্য জাতিও—যেমন লোড় ইত্যাদি যোগ দিয়ে একসঙ্গে নাচছিল। ধীরে ধীরে কোল-সাঁওতালদের ভিতরও লেখাপড়া শিক্ষার একটা আগ্রহ দেখা যাচ্ছে এবং অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি এ বিষয়ে উৎসাহিত করে। সেরাইকেলা হাই স্কুলেও মাঝে মাঝে কোল ছাত্র দেখা যায়। কোল-সাঁওতালরা—সাধারণত স্বাস্থ্যবান, সরল ও সাহসী হয়। ঘরদোর বা জিনিষপত্রও এরা বেশ পরিচ্ছন্ন রাখে।

আমোদের ভিতর এরা নাচগান, শিকার, মাছধরা ও মুরগী লড়াই করাতে ভালবাসে। প্রতি শুক্রবারে সেরাইকেলায় সাপ্তাহিক বাজার-হাট-উপলক্ষে বহু গ্রাম থেকে দলে দলে লোক মুরগী নিয়ে আসে। তাদের পায়ে ধারাল সরু ছুরী বেঁধে দিয়ে ছেড়ে দেয়। পরস্পর যুদ্ধ করে কোন একটি মুরগী আহত বা পরাস্ত হলেই যার মুরগী জিতবে সে দুটোই পায়। লড়ায়ের পূর্ব্বে অবশ্য দেখে নেওয়া হয় মুরগী দুটো সমান জোরের কি না। এই সময় "রেস" খেলার মত মুরগীর উপর বাজি রাখাও হয়ে থাকে। এই কোল-সাঁওতাল ভিন্ন অনেক নিম্নস্তরের হিন্দুও এই মুরগী লড়ায়ে যোগ দেয়।

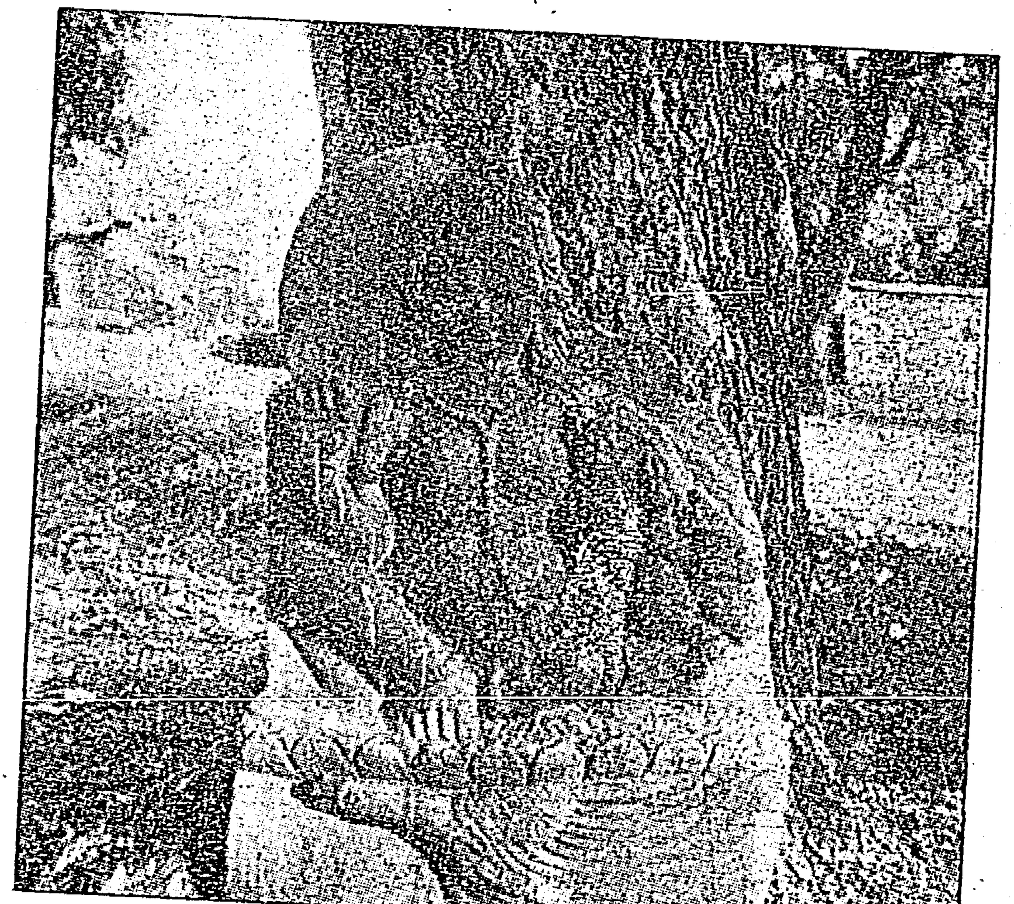

ব্রহ্মময়ী মূর্ত্তি, ইউপুকুরে প্রাপ্ত

এই তো গেল পাহাড় বা জঙ্গলে, অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে প্রকৃতির উৎপন্নের উপর নির্ভর করে যারা থাকে তাদের কথা। এদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হচ্ছে যারা চাষবাস করে খায় ও অপেক্ষাকৃত উর্ব্বর স্থানে বাস করে। চাষ করতে হলেই চায় কৃষির উপযোগী জমি, পশু পালন ইত্যাদি। এ সবের জন্য এদের অনেক সময় ব্যাপৃত থাকতে হয়, ফলে এরা হয়ে আসে অনেকটা শান্ত ও সঙ্ঘবদ্ধ। কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থান—টাঁড়—বেছে নিয়ে জলের কাছে এরা বসবাস করে। এতে চাষের কাজের সুবিধা হয়। এদের ভিতর সরল জীবনের মাধুর্য্য অনেক কমে

এসেছে—যদিও সম্পূর্ণ অপসারিত হয় নি। এর প্রধান কারণ হচ্চে, বর্ত্তমান সভ্যতার সঙ্গে সংঘাত। উৎপন্ন দ্রব্য বিনিময়ের জন্য প্রায়ই এদের শহর বা ব্যবসায় ক্ষেত্রে আসতে হয় এবং সেই সঙ্গে যান্ত্রিক সভ্যতার ভাবধারাও তাদের ভিতর বিস্তার লাভ করে। নিজেরা চায করে সরিষা বা তিল উৎপন্ন করে বলে এদের বনজ নিম বা করঞ্জের উপর নির্ভর করতে হয় না এবং সভ্যতার ধাপে কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার চিহ্নস্বরূপ এখানে দেখা যায় ঘানির প্রচলন। যাঁতা অপেক্ষা এতে তেল সহজে ও অল্প সময়ে তৈয়ারী হয়—তবে কলের মত প্রয়োজনাতিরিক্ত হয় না। এক সময় এই সব ঘানির অত্যন্ত আদর ছিল এবং তেলও বেশ খাঁটি ও সুস্বাদু হ'ত। অধুনা কলের তেল—

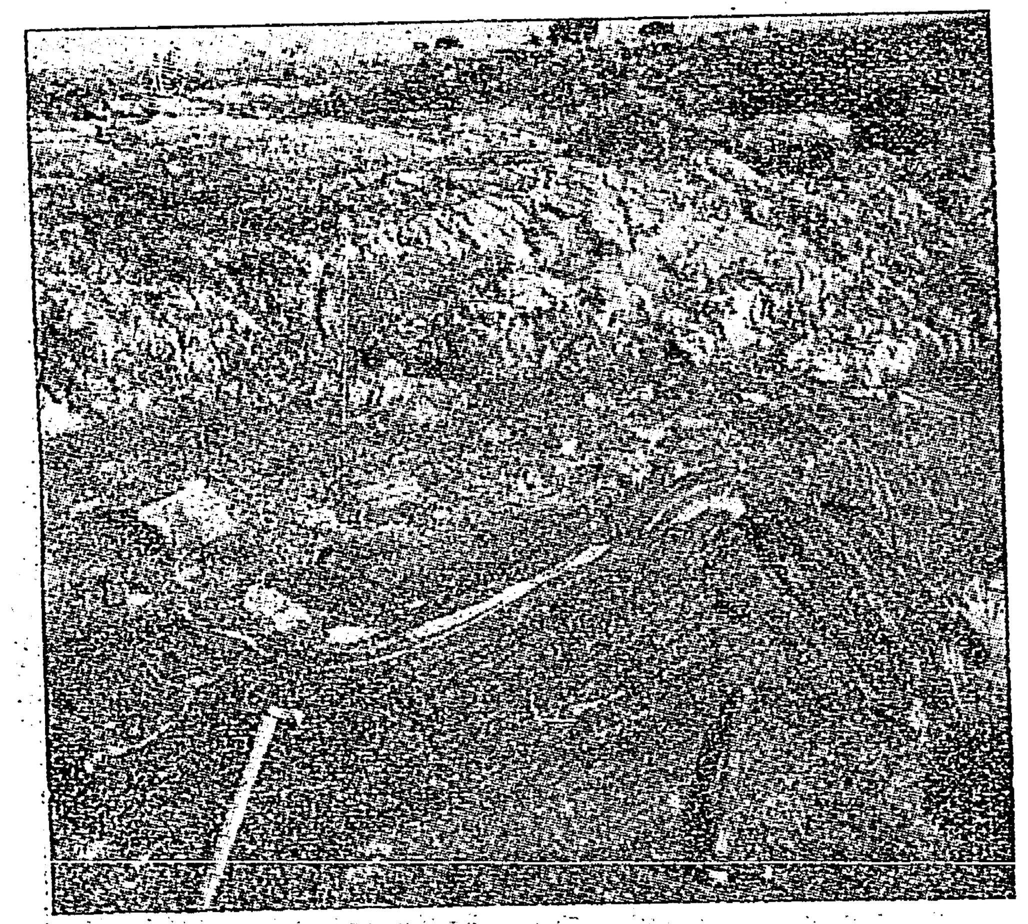

আগ্নেয় উৎপাতের ফলে আলোড়িত পাথর স্তম্ভ

সস্তা দামের জন্য ঘানির ব্যবহারকে প্রায় লোপ পাওয়াতে বসেছে।

এই অবস্থায়, চিন্তাধারা ও রুচির ভিতরও অনেক পরিবর্ত্তন এসে গেছে। প্রকৃতিপূজা কিছু কিছু অবশিষ্ট থাকলেও কল্পনার তৈয়ারী দেবদেবীরই প্রাধান্য লক্ষিত হয় উপাসনার মধ্যে। শস্যলাভের জন্য জমির পূজা বা অমঙ্গলের হাত থেকে ত্রাণ পেতে "মঙ্গলা আশার" উপাসনা করিলেও এরা কালী, দুর্গা ইত্যাদিরও পূজা করে।

এদের পোষাক, সঙ্গীত, গয়না ইত্যাদিতেও নিসর্গ থেকে দূরত্ব অনুভব করা যায়। বনের পাতা বা ফুলের পরিবর্ত্তে দেখা যায় রূপা বা সোনার গয়না—নিসর্গের কবিতার স্থান দখল করে দেবদেবী সম্বন্ধে রচনা ও পোষাকের ভিতর ফুটে ওঠে উৎকর্ষের একটা সূচনা। প্রাচীর-চিত্রেও এরই প্রমাণ পাই যখন দেখি—হাতী বা পাখীর পরিবর্ত্তে স্থানলাভ করেছে দেবদেবীর মূর্ত্তি বা মানুষ, সাইকেল ইত্যাদির চিত্র। কৃষিজাত দ্রব্যের বিনিময়ে এখানকার লোক নিয়ে আসে প্রয়োজনীয় কাপড়, ছাতা, যন্ত্রপাতি ও বিলাসসামগ্রী। এ অবস্থাটা যেন শহুরে সভ্যতার পথে প্রথম সোপান।

এর পরই আমরা এখানে দেখতে পাই আধুনিক জনপদ—পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার সঙ্গে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে বিরাজ করছে। একটি জন্মলাভ করেছে মজুর বসতি-হিসাবে আদিত্যপুরে। এর উৎপত্তি সম্ভব হয়েছে নিকটস্থ টাটা কোম্পানীর জন্য। এখানকার অধিবাসীরা চাষ আবাদ বা বন জঙ্গলের উৎপত্তির কথা চিন্তা করে না—যেন প্রকৃতির সঙ্গে কোনই সম্বন্ধ নাই। দৈহিক শ্রমের বিনিময়েই তারা সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু লাভ করে।

দ্বিতীয় জনপদ যা ভূপ্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন নয়, সেটি হচ্ছে সেরাইকেলা শহর। আধুনিক জনপদ হিসাবে বিচারালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, গ্রন্থাগার, মিউনিসিপ্যালিটি ইত্যাদি সমস্ত প্রতিষ্ঠানই আছে। ব্যবসায় ক্ষেত্র ও শাসনকেন্দ্র হিসাবেই এর গুরুত্ব। মাত্র দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখলেই এর চলে যায়—পানীয় জল ও বিভিন্ন স্থান হতে গমনাগমনের সুবিধা। চাইবাসা, সিলি, চক্রধরপুর বা জামসেদপুরের সঙ্গে ভাল ভাল রাস্তা দিয়ে এর যোগ রয়েছে।

সেরাইকেলার বিশেষত্ব হ'ল হিন্দু কৃষ্টি। পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত দুর্গম ছিল বলে বহিঃশত্রু বা মুসলমানদের অধীনতায় একে কোন দিনই আসতে হয় নি। তবে এ যে একেবারেই বাইরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল না, তার প্রমাণ পাই এখানে উড়িয়া, বাঙ্গলা ও হিন্দী তিন কৃষ্টিরই প্রভাব হতে। এখানকার ভাষা, চিন্তাধারা বা উৎসবাদি লক্ষ্য করলেই এ বিষয় আরও স্পষ্ট হবে। এখানকার উড়িয়াতে প্রচুর বাঙ্গলা বা হিন্দী কথা মিশান আছে এবং কটক অঞ্চলের উড়িয়া হতে এ অনেক পৃথক। কটকে মাকে বলে 'বউ', বাবাকে বলে "ননা"। কিন্তু এখানকার উড়িয়াতে মাকে 'মা'ই বলে, আর বাবাকে বলে বাবা।

এরূপ বহু প্রভেদ আছে। এখানকার পূজা-পার্ব্বণেও উড়িয়া, বাঙ্গলা ও আদিম অধিবাসীদের প্রভাব দেখা যায়।

দশ বা বার বছর অন্তর এখানে "দেশ সাঁতাল" বা 'পাউড়ী মেল্' বলে একটা উৎসব হয়। মুক্ত প্রান্তরে সেরাইকেলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা পাউড়ীর পূজা উপলক্ষে রাজ্যের সমস্ত পুরুষ জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে একত্র হয়ে উপাসনা করে। এ উপলক্ষে একবার প্রায় এক হাজার ছাগল ও আট-নয়টি মহিষ বলী হতে দেখেছিলাম। এই উৎসবের পৌরহিত্য করে ব্রাহ্মণ নয়—আদিম অধিবাসী। এ উৎসব আদিম অধিবাসীদের প্রভাবেরই পরিচায়ক নয় কি? এখানে উড়িষ্যার প্রভাব দেখি রথযাত্রা উৎসবে। সকল শ্রেণীর লোকই এ উপলক্ষে আমোদ

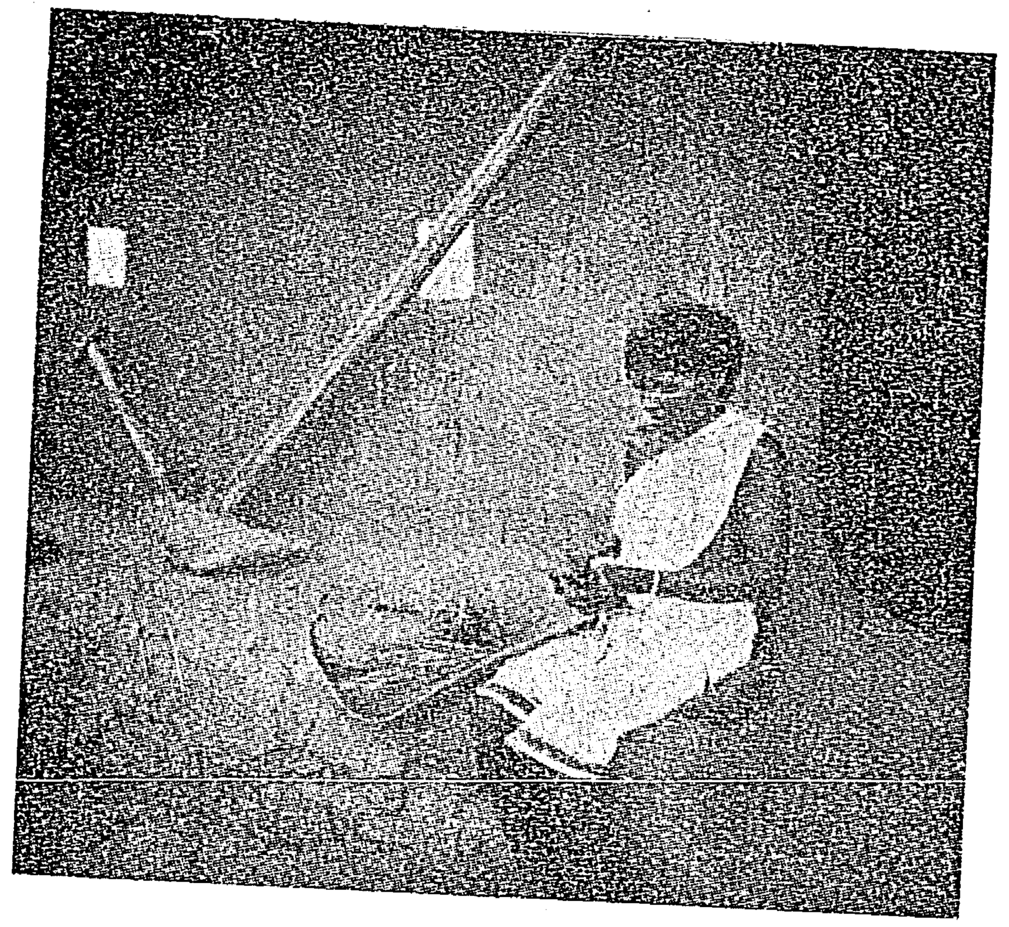

কোন মেয়ে মাছুর বুনিতেছে

করে ও যোগ দেয়। পুরীর গজপতির মত সেরাইকেলার মহারাজও প্রথমে রথ স্পর্শ করেন ও তারপর সকলে রথ টানে। মহাসমারোহে দশ পনের দিন ধরে 'মেলা' ইত্যাদি সহ দুর্গা পূজা আবার পরিচয় দেয় বাঙ্গালী প্রভাবের। দোলযাত্রাও বাদ যায় না। সুতরাং দেখা যায় এখানকার সামাজিক জীবনে সকল কৃষ্টিই অল্প-বিস্তর প্রভাব রেখে গেছে।

কিন্তু সকল সভ্যতার সংমিশ্রণ সত্ত্বেও সেরাইকেলায় কয়েকটি কলা আধুনিক পাশ্চাত্য প্রভাব হতে এখনও মুক্ত থাকতে পেরেছে। এর সম্যক্ প্রমাণ এখানকার ছৌ নৃত্য। আদিযুগ হতে এই নৃত্যকলা মুঘল বা পাশ্চাত্য প্রভাবকে দূরে রেখে এসেছে। চৈত্র মাসের শেষে, বসন্তের যাদু স্পর্শে প্রকৃতিতে যখন সজীবতার স্পন্দন বয়ে চলেছে, সেই সময় মুক্তপ্রাঙ্গণে, আদি নাগরা ও বাঁশির সহযোগে বিভিন্ন ভাবব্যঞ্জক এই নৃত্য সকলের মনেই প্রচুর আনন্দ সঞ্চার করে। রাজাপ্রজা, সকলেই জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে এতে যোগ দান করে—ফলে সকলের মধ্যে গড়ে ওঠে একটা একতা ও মৈত্রীর ভাব। এই নাচের ভিতরও আবার হিন্দু প্রভাবই সুপরিস্ফুট। নাচের আখ্যানভাগ হয় নিসর্গ কিংবা হিন্দু গ্রন্থ হতে নেওয়া।

কিছুদিন পূর্ব্বে ইটাপুকুর বলে একটা গ্রামে কতকগুলি হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি—সপ্তমাতৃকা পাওয়া গেছে। এ থেকে অনুমান হয়, হয়ত নয় শতক থেকে এখানে হিন্দু কৃষ্টি বিদ্যমান।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার জন্য ছোট-

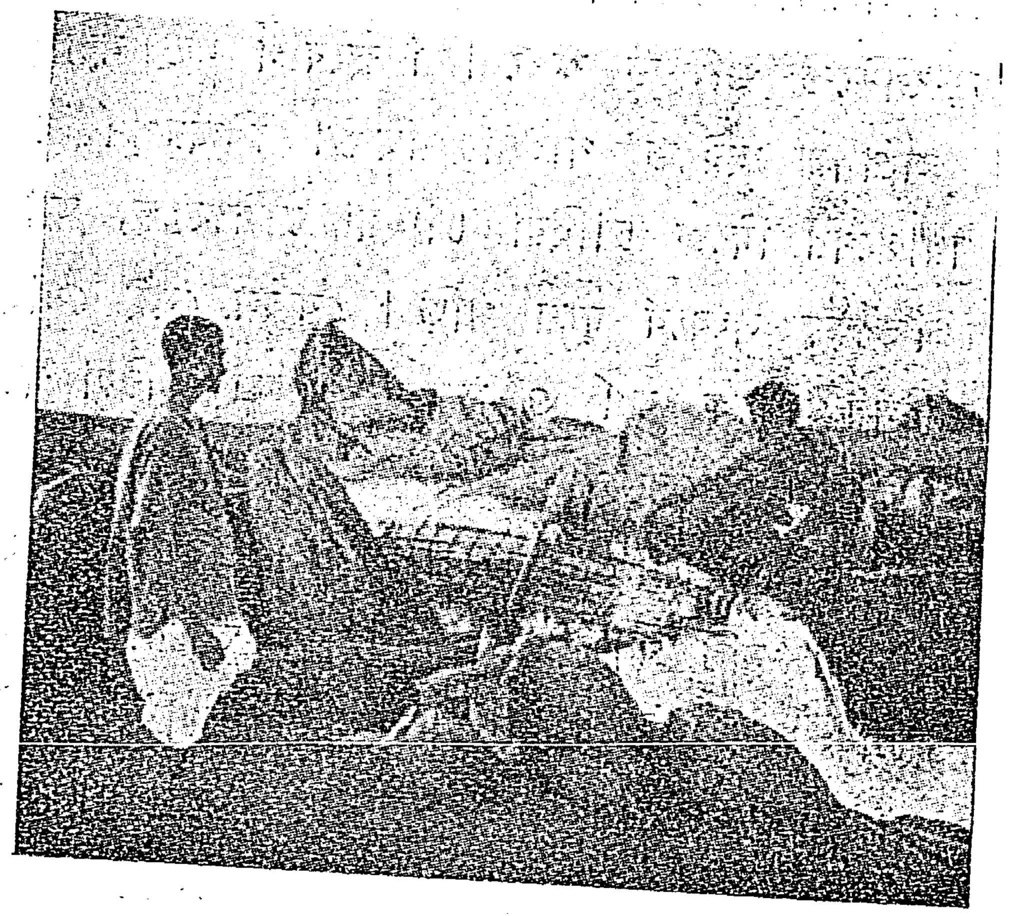

নদীতে বাঁধ দিয়ে মাছধরা

নাগপুরকে তুষারহীন প্রাচ্যের নিউজিল্যাণ্ড বলা হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক রমণীয়তার উপরও এখানকার আকর্ষণের বস্তু হচ্ছে বিচিত্র রত্নসঞ্চয়। সেরাইকেলাতে প্রচুর এসবেস্টস্ রয়েছে—এক একটি অংশুর দৈর্ঘ্য প্রায় চার পাঁচ ফিট্ হয়ে থাকে। এছাড়া সোপ্ স্টোন, কায়েনাইট, গ্যালিনা, ক্রোমাইট ইত্যাদি মাণিকও অল্প-বিস্তর পাওয়া যায়।

শিল্পের ভিতর তসরের কাপড়, কাঁসার বাসন, রূপার গয়না ও সোপ্ স্টোনের পাত্রাদি প্রস্তুত হয়। মানুষের রুচি ও চাহিদার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে এই শিল্পগুলিও যদি কালোপযোগী করে নেওয়া যায় তা হ'লে এদের এখনও ভবিষ্যৎ আছে, তা নইলে কোন রকমে আর কিছুদিন গ্রাম্য-অধিবাসীদের জন্য টিকে থেকে শেষে হয় ত এরা বিনষ্ট হয়ে যাবে।

অনুকর্ষ

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী

(১)

শ্রীবৃন্দাবনে সেবাকুঞ্জের অপরিসর গলির ভিতরে এক মহতী জনশ্রেণী-সংঘর্ষের মধ্যে একটি নাতি বৃহৎ কীর্ত্তনের সম্প্রদায় ধীরে ধীরে সেবাকুঞ্জকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে ক্রমে পরিসর পথের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। সম্প্রদায়টি যত অগ্রসর হইতেছে জনসমাগম ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। দর্শকদিগের অত্যন্ত মুগ্ধাবস্থা। ক্রমবর্দ্ধিত জনতায় তাহারা এক একবার পেষিত হইবার মত অবস্থায় পড়িতেছে তবু কাহারো সরিবার চেষ্টামাত্র নাই। মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে কখনো বা সুযোগ মত মধ্যস্থলের দিকে অগ্রসর হইতে পাইয়া দ্বিগুণ বিস্ময়পূর্ণ নেত্রে কীর্ত্তনীয়াগণের দিকে চাহিয়া চাহিয়া চলিতেছে, আবার তখনি ভিড়ের সংঘর্ষে দূরে পড়িয়া কেবল সেই মোহময় সুর তালের দিকে কর্ণ ও মনকে একত্র করিয়া দলের অনুসরণ করিয়া যাইতেছে।

কীর্ত্তনের মাঝখানে এক অপরূপ দৃশ্য। এক গৈরিকধারী তরুণ উদাসীন-মূর্ত্তি কীর্ত্তনের ভাষা ও ভাবের অনুরূপে দুইহস্তে এবং সর্ব্বাঙ্গেই যেন তাহার অভিনয় করিতে করিতে পদের পর পদ গাহিয়া চলিয়াছেন। যখন পদের ভাব বৃদ্ধির জন্য স্থানে স্থানে "আখরের" মূর্চ্ছনা তুলিতেছেন তখন মৃদঙ্গ শব্দ এবং তাঁহার সঙ্গীগণের কণ্ঠস্বর উদ্দাম হইয়া উঠিয়া সেই জনপ্রবাহকে তরঙ্গের পর তরঙ্গে যেন অধীর উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে। গায়ক গাহিতেছিলেন—

"মাধব বহুত মিনতি করি তোয়!
দেই তুলসী তিল দেহ সঁমপিলঁ দয়া জানি ছোড়বি মোয়।"

ইহার পরে 'আখরে'র অমৃত বর্ষণ—

"আমায় দয়া ছেড়না হে!
আমি পতিত অধম বলে আমায় দয়া ছেড়না হে!
আমি ভুলে থাকি বলে তুমি আমায় ভুলনা হে!"

গায়কের মুখ উত্তেজনাধিক্যে সিন্দূরবর্ণ ধারণ করিয়াছে। অমৃত নদীর মত সুদীর্ঘ বিশাল নয়নযুগল হইতে অবিরত প্রবাহিত জলের ধারা যেন তরঙ্গের পর তরঙ্গে সেই লোচন নদীর প্রান্তসীমার আরক্ত কুল এবং দীর্ঘ কৃষ্ণপক্ষযুক্ত তটরেখা উল্লঙ্ঘন করিয়া একেবারে বন্যার মত অতি শুভ্র বালুকা বেলার ন্যায় প্রশস্ত বক্ষে যেন ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। সুদীর্ঘ সুগৌর দেহ ভাবের পর ভাবের আবেগে কণ্টকিত, ঘন ঘন কম্পিত, ক্ষণে ক্ষণে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত বাহু দুটি দর্শকদিগের চক্ষে যেন সমৃণাল মৃণালিনীর তুলনাকে মনে পড়াইয়া আবার কখনো বিদ্যুৎ বিভ্রমের মত ফিরিতেছে ঘুরিতেছে।

"গণইতে দোষ গুণ লেশ নাহি পাওবি
যব তুঁহু করবি বিচার।
(ওহে শত দোষের আকর আমি,
অদোষ দরশি তুমি! আমার বিচার তুমি কর—
আর কারে দিওনা ভার, আমার বিচার তুমি কর!)
তুহুঁ জগত নাথ জগতে কহায়সি জগ বাহির নহি মুই ছার"
(আমি কি জগৎ ছাড়া, ওহে জগতের নাথ, আমার নাথ
আমার নাথ!)

গায়ক সম্বিতহারা হইয়া বার বার পড়িয়া যাইবার মত হইতেছেন আর সঙ্গীরা সতর্ক ভাবে তাঁহাকে রক্ষা করিতে করিতে মৃদঙ্গ করতালের দ্রুত উচ্চ সঙ্গতে তাহাদের সমবেত 'দোহারিয়া' পালি গানে মূল গায়কের ভাবকে যেন মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিতেছে।

দীর্ঘ উচ্ছ্বাসের পর গায়ক যখন মাঝে মাঝে স্তব্ধভাবে যেন নিজের মধ্যে ডুব দিয়া রহিতেছেন, সঙ্গীরা তখন পদের বা আখরের কোন এক স্থানের ধুয়া ধরিয়া গাহিয়া চলিতেছে, আর দর্শকেরা সেই অবসরে তরুণ সন্ন্যাসীর ললাটে ও সর্ব্বাঙ্গে চন্দনের তিলক আঁকিয়া ও লেপন করিয়া কেহ বা সুন্দর সুপ্রশস্ত বক্ষেও সুগৌর কম্বুকণ্ঠে দীর্ঘ দীর্ঘ ফুলের মালা লম্বিত করিয়া দিতেছে। গায়কের ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই, নিজের মনে তিনি যেন একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

চারিদিকে দর্শকের অস্ফুট কলরব ও কথোপকথনের শব্দ সেই সময়ে ফুটিয়া উঠিতেছে "কে ইনি? আর কখনো কোন কীর্ত্তনে তো এঁকে দেখা যায় নি!" কেহ বলিতেছে "এতদিন শ্রীবৃন্দাবনে আছি কখনো এ মূর্ত্তি তো চক্ষে পড়ে নি।" "এ কীর্ত্তন দলটি তো আচার্য্য প্রভুর কুঞ্জের সম্প্রদায়! এঁরা ওঁকে কোথায় পেলেন?" ক্বচিৎ কেহ উচ্চারণ করিতেছে "আমি এঁকে একদিন খুব ভোরে শ্রীযমুনায় স্নান করতে গিয়ে দেখেছি, বালির মধ্যে এমন ভাবে প'ড়ে আছেন, দেখে মনে হ'ল সমস্ত রাত্রি ঐ মাঠের মধ্যে চড়াতেই প'ড়ে আছেন! দেখে যা মনে হল—" কেহ বলিতেছে "শ্রীগোবিন্দের মন্দিরে চকিতের মত একবার এই মূর্ত্তিটি চোখে পড়েছিল, তখনি কিন্তু বিদ্যুতের ন্যায় চলে গেলেন। হাতে তখন একগাছি দণ্ড। সেই দণ্ড হাতে গৈরিক কাপড়ে আর ঐ বর্ণে সে চলে যাওয়ার দৃশ্য এখনো আমার যেন চোখে ভাস্‌ছে! বিদ্যুতের মতই সে চলন—"

সেবাকুঞ্জের গলির ভিতরে যাত্রীতোলা বাড়ীগুলির মধ্যে একখানি অপেক্ষাকৃত সুন্দর সুশ্রী অনতিক্ষুদ্র গৃহ। সেই গৃহের দ্বিতলের গবাক্ষে বসিয়া এক বর্ষীয়ান্ বারে বারে গবাক্ষ পথে মস্তক বাহির করিবার বিফল প্রয়াসের সঙ্গে সম্মুখের পথে আগত কীর্ত্তনের অনুসঙ্গী জনতাকে দেখিতে দেখিতে একমনে অদূরাগত সেই মধুময় সঙ্গীত শুনিতে-ছিলেন। তাঁহার নিকটে একটী কিশোরী দাঁড়াইয়া; ক্ষণে ক্ষণে বর্ষীয়ান্ উচ্ছ্বসিত ভাবে তাহার দিকে ফিরিয়া বলিতেছিলেন "শুনছিস্ ললিতে শুনছিস্? তোর গানের মাষ্টারের যে ভারি প্রশংসা, মেলা পদক ঝোলে তার বুকে, এমন কীর্ত্তন গাইতে পারে সে? এ শ্রীবৃন্দাবনের কীর্ত্তন বুঝেছিস্? এই সেবাকুঞ্জেরই কোন সেবকের দল হবে বোধহয়। বিদ্যাপতির "আত্ম নিবেদনের" পদটিকে কি জীবন্ত করেই এঁরা গাইছেন। কোন্ ভাগ্যবানেরা এমন করে শ্রীরাধাশ্যামের সেবা করছে না জানি। লোকের যে শেষই হয় না—কি মজা করে এরা পেছু হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে কীর্ত্তনীয়াদের দেখ্‌তে দেখ্‌তে চলেছে দ্যাখ্, আমাকে একবার নাম্‌তে দে ললিতে।"

কিশোরী স্থিরভাবে সমস্ত মনকে যেন শ্রবণের পথেই প্রেরণ করিয়াছিল। এইবার একখানি হস্তপ্রসারণে বৃদ্ধের গতিরও যেন বাধা জন্মাইয়া মৃদুস্বরে উচ্চারণ করিল—"পিষে যাবে দাদু।"

জনতার মধ্যে ক্রমে কীর্ত্তনের কয়েকটি পতাকা, হরিনামাঙ্কিত ধ্বজা, সঙ্গে সঙ্গে দুই একজন কীর্ত্তনীয়াকেও গবাক্ষ হইতে দৃষ্ট হইল। "ঐ ঐ দেখা গিয়েছে—ললিতে দ্যাখ্ দ্যাখ্ দলের মাঝখানে—" বৃদ্ধ গবাক্ষপথে একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িলেন এবং কিশোরীও তাঁহার আগ্রহে আগ্রহান্বিত ভাবে তাঁহার পার্শ্বে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল। "একি সাক্ষাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবৃন্দাবনে কীর্ত্তনে নেমেছেন! দ্যাখ্ ললিতে—" ললিতা মৃদুস্বরে বলিল "ইনিই প্রধান গাইয়ে তা দেখ্‌ছ। এক একবার এঁরই গলা শোনা যাচ্ছিল বোধ হচ্চে!" কীর্ত্তনসম্প্রদায়ের মধ্যস্থল তখন ঠিক্ সেই গৃহের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। সম্মুখেই সেই অপরূপ গায়ক মূর্ত্তি! দুই পার্শ্বের গৃহ হইতে এবং সম্মুখ পশ্চাৎ হইতে ও লাজ বৃষ্টি হইতেছিল; সেই সঙ্গে স্ত্রীকণ্ঠের উলু শব্দে জনতার ঘন ঘন হরি ধ্বনি! তাহার মধ্যস্থানে সেই দীর্ঘায়ত চম্পকগৌর দেহ, অপূর্ব্ব ভাবময় মুখমণ্ডল, দর্শকের দেহে মনে বিদ্যুৎ সঞ্চারকারী ঘন ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত বাহুযুগল! কীর্ত্তন চলিতেছে—

"কিয়ে মানুষ পশু পাখী যে জনমিয়ে অথবা কীট পতঙ্গে
করম বিপাকে গতায়তি পুনঃ পুনঃ মতি রহু তুয়া পর সঙ্গে!"

ক্রমে গবাক্ষ পথের সম্মুখ হইতে সে দৃশ্য অপসারিত হইল। চোখের সম্মুখে চঞ্চল জনতার অধীর স্রোত, কানে আসিতেছে সেই ভাবময় সুরের ও ভাষার ইন্দ্রজাল "শ্রীচরণ সঙ্গছাড়া করো না হে! যেখানে প্রসঙ্গ তোমার —আমার মতিরে সেই সঙ্গ দিও! যেখানে যেমনে থাকি, তোমারে না ভুলি যেন!"

ক্রমে উত্তাল কলরোলে সেই কণ্ঠধ্বনি ক্ষীণ হইয়া আসিতেই অবশ বৃদ্ধ সহসা যেন লাফাইয়া উঠিয়া দ্রুতপদে কক্ষ এবং নিকটস্থ সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিতে করিতে পশ্চাতে সেই কিশোরীর আর্ত্তকণ্ঠ শুনিলেন "এতক্ষণ কেন উঠ্‌লে না দাদু, কীর্ত্তনের দল যে অনেক দূরে চলে গেছে! এই ভীড় ঠেলে কি করে পৌছুবে!" সে কথা বৃদ্ধের মনের কর্ণ স্পর্শ করিল না, কিন্তু বহিঃকর্ণে আবার বাজিল "আমিও যাব তাহ'লে—আমিও।"

সেই জনতরঙ্গের মধ্যে নামিয়া মাতামহের হস্ত ধরিয়া

চলিতে চলিতে জনতার দেহ সংঘর্ষে কিশোরীর ভাবান্তর উপস্থিত হইল। অত্যন্ত বিচলিত ও লজ্জিত ভাবে চারিদিকে চাহিতেই দেখিতে পাইল তাহাদের আশে পাশে অনেকগুলি রমণীই সেই কীর্ত্তনে আকৃষ্টা হইয়া চলিতেছে। অনেকগুলি বয়োবৃদ্ধা, যুবতী, কিশোরী ও বালিকা সবই সে দলে আছে। তাহাদের মধ্যে যে বিপ্লব চলিতেছিল জনতার মুখে মুখেও সেই আন্দোলন চলিতেছিল "এ কি মানুষে কীর্ত্তন কর্‌ছে! এই শ্রীবৃন্দাবনেও তো এমন বস্তু কখনো দেখিনি—এমন কীর্ত্তনও কখনো শুনিনি! মহাপ্রভুই কি এসেছেন আবার শ্রীবৃন্দাবনে?" কিশোরী ক্রমে বুঝিল তাহাদের মত নবাগত কতকগুলি ব্যক্তিও সেই দলের মধ্যে আছে, তাহারা অধিকতর ব্যাকুল ভাবে যাহাকে নিকটে পাইতেছে তাহাকেই বৃন্দাবনবাসী জ্ঞানে গায়কের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া ঐ ভাবেরই উত্তর লাভ করিতেছে। কিশোরী একটু পরেই দেখিল তাহাদের অনুচরবৃন্দ সবেগে জনতার মধ্যে পথ করিয়া অগ্রসর হইতেছে এবং তাহাদের সমবেত চেষ্টায় কিছুক্ষণ পরে তাহাদের হস্তরচিত ব্যূহের মধ্যে মাতামহের সহিত আশ্রয় লাভ করিয়া সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

ভীড় ঠেলিয়া অনেকক্ষণ পরে তাহারা যখন কীর্ত্তনের নিকটস্থ হইল তখন গায়ক পদের শেষ করিতেছেন—

"ভনয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর—
কহিলে কি বাঢ়ব কাজে
সাঁজক বেরি সব কোই মাগয়ি—
হেরইতে তুয়া পদ লাজে!"

(আমি লাজে বদন তুল্‌তে নারি, কি বলে দাঁড়াব কাছে, লাজে চরণ হের্‌তে নারি! জীবনের সাঁঝ ঘনাইছে! কি বলে দাঁড়াব কাছে—লাজে চরণ হের্‌তে নারি!) অনুচরগণের বাহুবন্ধন ব্যূহ হইতে একেবারে ছিট্‌কাইয়া গিয়া বৃদ্ধ গায়কের চরণতলে পড়িলেন! সেই কিশোরীর দেহও যেন নিজের অজ্ঞাতে তাহার অভিভাবকের অনুসরণ ও অনুকরণ করিতেই সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি হস্ত তাঁহাদের ধরিবার জন্য প্রসারিত হইল তাই রক্ষা, নহিলে তখনি তাঁহারা জনতার চরণতলে পিষ্ট হইয়া যাইতেন। মুহূর্ত্তে জনতার মধ্যে একটা "গেল গেল হায় হায়" শব্দ উঠিয়া পড়িয়াছিল। জনমণ্ডল সহসা তাহাদের প্রত্যেকেরই যেন গতিরোধ করিয়া 'কোথায় কি হইল' দেখিবার জন্য দাঁড়াইতেই কীর্ত্তনের নিকটস্থ জনমণ্ডলী সেই বৃদ্ধের দৃষ্টান্তেই যেন সংসজ্ঞ হইয়া গায়কের চরণে প্রণত হইয়া গেল, কেহবা শুইয়া পড়িয়া সেখানের ধূলিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। ভাবই ভাবের দ্যোতক! বৃদ্ধকে তাহার অনুচরেরা সেখান হইতে উঠাইবার চেষ্টা করিতেই তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন—

"ললিতে—ললিতে—চরণ ছাড়িস্‌নে! বড় ভাগ্যে দেখা পেয়েছি এই সাঁঝের বেলায়—এই অবেলায়! তোদের তো সে লজ্জার দিন আসে নি—সময় আছে তোদের, তা যেন হেলায় হারাস্‌ নে! প্রভুর চরণে পড় এসে—আমার যে দিন কেটে গেছে সব"।

ভাববিহ্বল অনেকগুলি নর নারী বৃদ্ধের এই কথায় ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ললিতা তাহার বিহ্বল মাতামহের দেহ অনুচরেরা যেদিকে সরাইতেছিল নিঃশব্দে সেই দিকেই ফিরিল কেবল একটা অজানা উত্তেজনায় তাহার দেহটা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল এবং চোখেও খানিকটা জল আসিয়া পড়িতেছিল মাত্র। তাহার বৈষ্ণব মাতামহের ভাবপ্রবণতার বিষয় সে অনেকটাই জানিত, কিন্তু আজিকার ব্যাপারটি সম্পূর্ণই নূতন।

* * * *

বৈকালে পূর্ব্বোল্লিখিত গৃহের সেই কক্ষে সেই কিশোরী হস্তে একখানি বৈষ্ণব পদাবলী পুস্তক, নিকটে বর্ষীয়ান্ একটী শয্যায় শুইয়া ছিলেন। এক হাতে তাঁহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে অন্য হাতে বইয়ের পাতা উল্টাইয়া কিশোরী বলিতেছিল "দাদু, কীর্ত্তন গাইয়ে ঠাকুর কিন্তু গানে ভুল করেছেন। এই দ্যাখ ঐ পদের শেষটায় কি লেখা আছে—

'ভনয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর তরইতে এ ভবসিন্ধু
তুয়া পদ পল্লব করি অবলম্বন তিল আধ দেহ দীনবন্ধু'

তিনি যা গাইলেন শেষটায়, সেটুকু তো এই পদটার শেষে র'য়েছে—

'যতনে যতেক ধন পাপে বাঁটায়নু মেলি পরিজনে খায়
মরণ কো বেরি কৈ নাহি পুছয়ি করম সঙ্গে চলি যায়।'

বৃদ্ধ ক্লান্ত চক্ষু না খুলিয়াই বলিলেন "আমার জন্যে—ওরে আমার জন্যেই ওটুকু গেয়েছেন! ও কি ওঁদের ভুল? ও যে কৃপা!"

"নাঃ তোমাকে আর পারা যায় না দাদু, সবই বাড়াবাড়ি তোমার! না হয় বল যে ভাবের ঝোঁকে মনের বেগে গেয়ে গেছেন, ওঁরা অত কবির হুকুমে লাইন্ মিলিয়ে গাইবার পাত্র নন্! যেখানে যা মনে আসবে তাই গাইবেন! তা না—তোমার উপরই কৃপা!" কিশোরী মৃদু হাসিল, বৃদ্ধ একটুও বিচলিত না হইয়া একই ভাবে উত্তর দিলেন "তাই তো! ঠিক্ তাই! আমার জন্যই ওটুকু তখন ওঁর মনে এসেছিল"! "বেশ! তোমারি জিত্ দাদু! হ'ল তো?"

(২)

অদূরে অনতিউচ্চ গোবর্দ্ধনগিরি যেন কোন অজানা বস্তুর রক্ষণকার্য্যে দীর্ঘ প্রাচীরের মতই কয়েক ক্রোশ ব্যাপিয়া তাহার দেহ বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। এই পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাত্রীদল চলিয়াছে। অতি প্রত্যূষে তাহারা রাধাকুণ্ড গ্রাম হইতে রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড নামা দুইটি বিস্তৃত সরোবরকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রশস্ত পথে দলে দলে যাত্রা করিতেছে, সার্দ্ধ তিন ক্রোশব্যাপী এই গিরিদেহের পরিক্রমায় সপ্তক্রোশ পথ অতিবাহন করিয়া আবার শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড প্রদক্ষিণ করিয়া তাহারা রাধাকুণ্ড গ্রামে ফিরিবে।

এই পরিক্রমার দৃশ্য অতি সুন্দর। দলে দলে স্ত্রীপুরুষ বালবৃদ্ধযুবা ধনী দরিদ্র গৃহী উদাসীন বৈষ্ণব ভিখারী ভিখারিণী প্রভৃতি সকল ব্যক্তির একমুখী যাত্রার এক সম্মিলিত উৎসব। নানা দেশবাসী এই দলে আছে। বিচিত্রবর্ণের ঘাগ্‌রা ওড়না উড়াইয়া অঙ্গের ভূষণ ও পাদালঙ্কারের ঝঙ্কার তুলিয়া ব্রজবাসিনী মহিলার দল চলিয়াছেন, মুখে তাঁহাদের চির-আদরের চিরনিত্য যুগল কিশোর 'ব্রজলালি' এবং ব্রজ'লালের' রূপ গুণ ও লীলার জয়গান। ততোধিক শব্দসমষ্টি সৃজন করিয়া মাড়োয়ারী মহিলারা চলিয়াছেন। মাদ্রাজী উড়িয়া বাঙালি নারীর দল অপেক্ষাকৃত নিঃশব্দে চলিতেছে। খঞ্জনী বাজাইয়া বাঙালী বৈষ্ণবের দল চলিয়াছেন। মুখে তাহাদের প্রভাত-মঙ্গল আরতির পদ, "জয় মঙ্গল আরতি গৌর কিশোর মঙ্গল আরতি জোড় হি জোড়" (যুগলকিশোর) কোন দল গাহিতেছেন "জয় জয় রাধে শরণ তুহারি! ঐছন আরতি যাঁউ বলিহারী!" কেহ বা মৌন ধরিয়া জপ করিতে করিতে চলিয়াছেন। সেই যাত্রাদলের মধ্যে ডুলি, গোযান এবং অশ্ববাহিত টাঙ্গার ও অভাব নাই। অশক্তরা তাহাতে আরোহণ করিয়াই পরিক্রমা দিতেছে। এই পরিক্রমণ কার্য্য বারোমাসই চলে, তবে শ্রীহরিশয়নের চারি মাস এবং তাহারও মধ্যে রাধা দামোদরের প্রিয় কার্ত্তিক-মাসে এ উৎসব মাসব্যাপী ভাবেই চলিতে থাকে।

হেমন্তের প্রভাত-স্নিগ্ধ বায়ুতে জয় গান গাহিতে গাহিতে যাত্রীদল 'কুসুম সরোবর' অতিক্রম করিয়া গোবর্দ্ধন গ্রামের নিকটস্থ হইল এবং সেখানে 'মানসী গঙ্গা' নামে একটী বৃহত্তর দীর্ঘিকায় স্নানান্তে "গিরিরাজের" "মুখারবিন্দ" পূজা করিয়া আবার অভীষ্ট পথে দলে দলে যাত্রা করিল।

একটা বৃহৎ দলের পশ্চাতে জনতার একটু দূরে দূরেই আমাদের পূর্ব্বদৃষ্ট বর্ষীয়ান্ ব্যক্তি চলিতেছিলেন, পার্শ্বেই তাঁহার দৌহিত্রী সেই কিশোরী—কয়েকজন অনুচরও অগ্রে পশ্চাতে চলিয়াছে। বৃদ্ধের ও কিশোরীর একেবারে কাছে কাছে তাঁহাদের রাধাকুণ্ডের "ব্রজবাসী" অর্থাৎ পাণ্ডা আর বৃন্দাবনের 'ব্রজবাসীর' একজন ছড়িদার! এই ধনী যজমান্‌কে ক্ষণকালও হাতছাড়া করিতে শ্রীবৃন্দাবনের 'ব্রজবাসী' নারাজ! এখানে সর্ব্বতীর্থেই স্থানীয় 'ব্রজ-বাসীর' দল আছেন, তবুও তিনি তাঁহার নিজস্ব অনুচর একজন সর্ব্বস্থানে সর্ব্বদাই ইহার সঙ্গে রাখিতেছেন। রাধাকুণ্ডের ব্রজবাসী চারিদিকের পরিচয় দিতে দিতে চলিয়াছেন। শ্রীসমৃদ্ধ গোবর্দ্ধন গ্রামের কথা, সেখানে রাজা মহারাজাদিগের কীর্ত্তি, প্রাসাদতুল্য "ছত্র," ধরমশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অনর্গল ভাবে বকিয়া চলিতেছেন ও সেজন্য গোবর্দ্ধন "মানসী গঙ্গা" তীর্থের ব্রজবাসী বড়ই অসুবিধায় পড়িতেছেন। তিনিও সঙ্গ ছাড়েন নাই। মানসী গঙ্গাকূলস্থ গিরিরাজের 'মুখারবিন্দ' পূজা যে তাঁহার মত শেঠের পক্ষে উপযুক্ত হয় নাই এ বিষয়ে তিনি মাঝে মাঝে বড়ই ক্ষোভ জানাইতেছেন। বুঝা যাইতেছে আর কিছু আদায় না করিয়া তিনি ছাড়িবেন না। কোন বাঙালী যাত্রী 'মানসগঙ্গার' নামে ভাব জন্মাইয়া জ্ঞানদাসের পদ ধরিয়াছে "মানস গঙ্গার জল, ঘন করে কল, কল দুকুল

বহিয়া যায় ঢেউ। গগনে উঠিল মেঘ, পবন বাড়িল বেগ, তরণী রাখিতে নারে কেউ। দ্যাখ সখি নবীন কাণ্ডারী শ্যামরায়।" তাহারই সঙ্গী কেহ তাহার সহিত দোহার দিতেছে। "মানস সুরধুনী দুকুল পাথার, কৈছ নে সহচরী হোয়ব পার।"

যাত্রীরা ক্রমে বালুময় প্রান্তরে পড়িলেন। দক্ষিণে 'গ্রেনাইট্' প্রস্তরের অনতি উচ্চ গিরি শ্রেণীর স্থানে স্থানে অপূর্ব্ব চিক্কণতা! প্রভাত রৌদ্রে তাহার মিশ্র শ্যামকান্তির উজ্জ্বল শোভা আবার স্থানে স্থানে তরু গুল্ম লতাচ্ছন্ন বনময় দেহ! পথের বায়ুরাশি ক্রমে গভীর এবং প্রান্তর ছায়াদানের উপযুক্ত বৃক্ষবিরল হইয়া আসিতেছে দেখিয়া বর্ষীয়ান্ কিশোরীর পানে চাহিলেন "ললিতে এইবার গাড়ীতে ওঠ্!" বলিয়া তিনি পশ্চাতে অনুসরণকারী টাঙ্গা নামক অশ্বযানের দিকে চাহিলেন। নাতিনী প্রতিবাদ জানাইল "এইটুকু হেঁটেই? কাকার সঙ্গে যখন এদেশ ওদেশ বেড়াতে যাই তখন কত যে হাঁটি তাতো জান না দাদু!" "তা হোক্, তোর কাকা এবার আমার ওপর দয়া করেছে যখন, তখন তার 'দায়' আমার মনে রাখ্তে হবে ত'! অসুখ বিসুখ করে যদি, ওঠ্ বাপু তুই!"

"কিছুতেই না দাদু! আমাদের দৌড়াদৌড়ি আর হাঁটার সম্বন্ধে তোমার আন্দাজই নেই। তুমিই বরং ওঠো, তোমারি কষ্ট হবে। তোমাদের 'এ টাঙ্গা'য় বৃন্দাবন থেকে রাধাকুণ্ড এই বত্রিশ মাইল আসতেই আমার হাড় গোড় চূর্ণ হয়েছে! ওতে আর আমি সহজে উঠ্ছি না! তুমিই বরং এইবার ওঠো দাদু!"

পাণ্ডারাও সমস্বরে একথার অনুমোদন করিলেন এবং একঠো 'বয়েল্' গাড়ী কেরায়া করিলে যে 'মাঝির' কষ্ট হইত না এ বিষয়ে ক্ষোভ জানাইয়া বালিকার মুখে কলহাস্যের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। উভয়পক্ষকে বাধা দিয়া বৃদ্ধ সম্মুখস্থ একটি দৃশ্যে সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট করিলেন। কয়েকটি ব্যক্তি অষ্টাঙ্গ প্রণামের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ভুলুণ্ঠন করিতে করিতে পরিক্রমার পথে চলিয়াছে। ঊর্দ্ধে প্রসারিত হস্তদ্বয় যেখানের ভূমি স্পর্শ করিতেছে, তাহারা সেই সেই স্থানে এক একটি দাগ কাটিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেছে এবং সেই দাগের উপর দাঁড়াইয়া আবার পথের মধ্যে শুইয়া পড়িতেছে। কেহ কেহ বা তাহারি মধ্যে ধূলায় সর্ব্বাঙ্গ অবলুণ্ঠিত করিয়া লইল। মৌনভাবে কেহ জপে রত কেহ বা গভীর স্বরে এক একবার হাঁক দিয়া উঠিতেছে—'জয় গিরিরাজকী, জয় গিরিধারীলালকি!' বৃদ্ধকে স্তব্ধভাবে সেই দৃশ্যে আকৃষ্ট দেখিয়া সকলেই দাঁড়াইতে বাধ্য হইলেন। ললিতা সত্রাসে বলিয়া উঠিল "এম্নি ক'রে এরা সাত ক্রোশই চলবে নাকি? এই কাঁটা আর এই বালিও যে তেতে উঠবে ক্রমে! এত পথ কি করে যাবে এরা?' 'ব্রজবাসী' হাস্যমুখে উত্তর দিলেন "যত দিনে হয়! পাঁচ, সাত, দশ, যে'দিনে যে পারবে! কষ্ট কি এদের হয় দিদি? গিরিরাজের মহিমায় কত বুড়া অন্ধ আতুর এমনিভাবে 'পরকম্মা' দেয়! রাধাকুণ্ডবাসী কত বৈষ্ণব বাবাজী, কত মাতা, নিত্য তাঁরা এই পরকম্মা দিচ্ছেন!"

"এমনিভাবে নাকি? কি সর্ব্বনাশ!" "না তাঁরা পায় দলেই দেন্, কত লোক মানসিক করে এইভাবে পরকম্মা দেয়—আর জীবনে একবার এইভাবে প্রণিপাতের সঙ্গে "প্রদচ্ছিনা" অনেকে ইচ্ছা করেও করেন।" বৃদ্ধ গভীর দৃষ্টিতে নাতিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "এ দেখেও কি এই স্থানে যানবাহনে উঠ্তে ইচ্ছে করে রে? আমরা তো চির অক্ষম, তবু দেখি কতটুকু পারি।" রাধাকুণ্ডের ব্রজবাসী নিজের শাস্ত্রজ্ঞান প্রকটিত করিবার জন্য বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ! শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই গিরিরাজের মহিমা প্রকাশ করে এঁর পরিক্রমার কথাই বলেছেন—উপবাস বা পায়ে হেঁটে কষ্ট করার কথা বলেননি! বরং বলেছেন 'স্বলঙ্কৃতা ভুক্তবন্তঃ স্বনুলিপ্তা সুবাসসঃ, প্রদক্ষিণঞ্চ কুরুত গোবিপ্রানলপর্ব্বতান্'। আর গোযানের বিধিও ঐখানে দেওয়া আছে, কিনা—'অনাংস্যনডুদ্যুক্তানি তে চারুহ্য স্বলঙ্কৃতাঃ!' অনডুহযুক্ত কি না বৃষবাহিত যান।" কিশোরী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল "ও দাদু! তবে আর কি! লাড্ডু খেতে খেতে পরকম্মা'ই বিধি যখন তখন আর ভাবনা কিসের! তুমিও একটা অনডুহ্ যুক্ত বয়েল্ গাড়ীতেই ওঠো দাদু—'হয়' যানে আর কাজ নেই! ওদাদু! ভাগ্যে সেবার তুমি আমায় খানিকটা সংস্কৃত উপক্রমণিকা পড়িয়েছিলে, তার কতকগুলো রূপ এখনো আমার মনে আছে। ব্রজবাসী ঠাকুরের 'অনডুহ্' কে তাইতো চিন্তে পারলাম! ওর রূপ শুনবে দাদু—"অনড্বান্ অনড্বাহৌ অনড্বাহঃ" কিশোরীর কলহাস্য

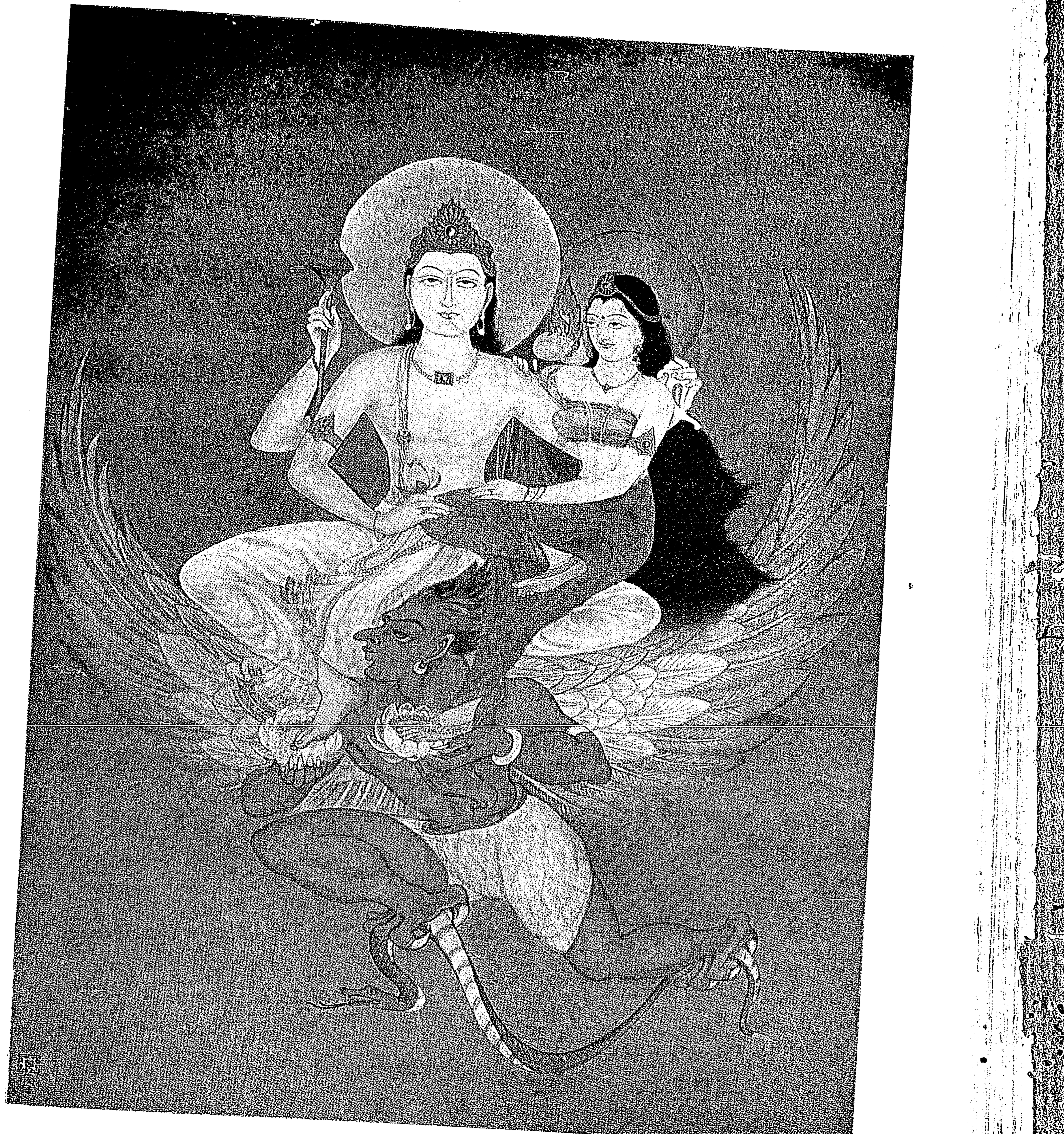

শিল্পী—শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার রায়

লক্ষ্মীনারায়ণ

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

COLOURED ILLUSTRATION

ঝঙ্কারে ব্রজবাসীকে লজ্জিত দেখিয়া বৃদ্ধ ব্যস্তভাবে নাতিনীকে নিজপার্শ্বে আকর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "ঠাকুর ও পান চিবুতে চিবুতে প্রদক্ষিণ তোমাদের 'লালা' তোমাদের জন্যই ব্যবস্থা করে গেছেন! আমরা অমনি বুকে হেঁটে এ সৌভাগ্য পেলেও বর্ত্তে যাব।" ব্রজবাসী তখন মহা উৎসাহে "হাঁ হাঁ শেঠজী,—সে তো ঠিক্ কথাই আছে, গিরিরাজের এমনি মহিমা" ইত্যাদি বলিতে বলিতে চলিলেন। "যত সাধু মহাত্মা সব এইদিকেই বাস করেন। যাঁরা ঠিক্ ভজন করতে চান তাঁরা তো সহর বৃন্দাবনে বাস করেন না, এই গিরিরাজের চারি পাশে কত যে কঠিন ভজনকারী সাধু মহাত্মা আছেন, দিনান্তে তাঁরা একবার মাধুকরীতে বাহির হন্। গোবর্দ্ধন গ্রামে কি অন্য সব গাঁয়ের ব্রজবাসীর ঘরে শুখ্না রুটির টুক্রা মাত্র তাঁরা পান্।" ললিতার ললিত-হাস্য কখন্ থামিয়া গিয়াছিল। সে শুনিতে শুনিতে বলিয়া উঠিল, "সেই যে দাহু আমরা সন্ধ্যাবেলায় বৃন্দাবনেও দেখ্লাম ঝোলা নিয়ে এক এক জন বৈরাগী বেরিয়েছেন কিন্তু কারুর কাছে তো তাঁরা ভিক্ষা করছেন না, কোথায় যান্ তাঁরা? কে তাঁদের ভিক্ষা দেয়?"

"ব্রজবাসীদের দুয়ার ছাড়া তাঁরা আর কোথাও দাঁড়ান্ না! তাও প্রত্যহ একই বাড়ীতে নয়! আজ এপাড়ায় কাল অন্য পাড়ায়! মুষ্টি অন্ন বা রুটির টুকরা ছাড়া তাঁর অন্য কিছু নেন্ না। দিনের বেলায় যারা মাধুকরী করে তারা প্রায় সকল স্থানেই এ ভিক্ষা নেয় কিন্তু ওঁদের কথাই আলাদা! তাঁরা এক এক জন—"

বৃদ্ধ বলিলেন, "শুনেছি ব্রজের বনে বনে এমন সব ভজনী বৈষ্ণব আছেন যাঁদের সহজে দর্শনই মেলে না। তাঁরা এমন এমন স্থানে আছেন যার দু-চার ক্রোশের মধ্যে লোকালয়ই নেই! অতি কঠোর বৈরাগ্য তাঁরা সাধনা করেন, অনাহারেই তাঁরা বেশীর ভাগ থাকেন।"

ব্রজবাসী অধীরভাবে বাধা দিয়া বলিল, "নেই, নেই মহারাজ! রাধারাণীর এই ব্রজভূমে কেউ উপাসী থাক্বেন না। যেখানে যে মহাত্মা থাকুন না কেন ব্রজবাসী তার তল্লাস রাখ্বেই! দু-চার ক্রোশের কি তারা তোয়াক্কা রাখে! তারা সাধুদের রাত্রির আহার 'বিয়ালু' পর্য্যন্ত পৌঁছে দেয়। ব্রজবাসীদের 'আধা দুধ আর আধাপুত' সাধু সন্তদের সেবার জন্যই আছে। কোন মহাত্মা যদি এমন করেই থাকেন যে কেউ তাঁর তল্লাস পাব না, তাহলে তিনিই তাঁর খবর্দারি করেন যিনি শ্রীগীতায় বলেছেন 'তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেম বহাম্যহং।' এদেশে এবিষয়ে অনেক কাহিনী লোকের মুখে মুখে আছে যদি শোনেন মহারাজ—"

কিশোরী তাঁহার বক্তৃতার স্রোতে বাধা দিয়া অতি অধীর-ভাবে বলিল, "দাহু, তুমি বৃন্দাবনেই সমস্ত সময়টা কাটিয়ে দিলে, আজমীর জয়পুরও গেলে না, ঐ সব 'বনে' বেড়াবে বলেছিলে তাই বা কৈ গেলে! আমার তো ছুটি ফুরিয়ে এল, কিছু দেখা হ'ল না আমার! ঐ সব সাধু একজনও দেখ্তে পেলাম না।" বৃদ্ধ চারিদিকে চাহিয়া সনিশ্বাসে বলিলেন, "তাঁদের দেখার সৌভাগ্য কি সকলের হয় ললিতে! যদিই ক্বচিৎ কারো দর্শন মেলে, চকিতে তিনি লুকিয়ে যান্! কোন্ ভাগ্যে সেদিন কীর্ত্তনের মধ্যে যাঁর দর্শন পেয়েছিলাম সারা বৃন্দাবন খুঁজে আর খুঁজিয়েও তো আর তাঁর সন্ধান মিল্লো না।"

পাণ্ডা মধ্য হতে বলিল, "সে সব বনে দিদি, বন পরিক্রমার সময় না হলে মানুষ চলে না। ভাদ্র মাসে যখন মহাবন যাত্রায় রাজার লোকের 'পর্কম্মা' চলে তখনি যাত্রীদের নিয়ে আমরা সেই সঙ্গে চলি। তখন সঙ্গে হাট বাজার চলে, হাসপাতাল চলে, পুলিশ চৌকিদারের ফাঁড়ি চলে, তবে তো লোক যেতে পারে। তার পরে আবার 'গোঁসাই-বনযাত্রা' তাতে তো বিষম ধুম চলে। কত—"

বৃদ্ধ নাতিনীর ক্ষোভপূর্ণ মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "আস্ছে বছর তোকে ভাল ক'রে এদিকের সব দেখাতে আন্ব।'

"হ্যাঁ, আস্ছে বছর বলে আমার পরীক্ষা! আমি তখন এই সব বেড়াতে পাব কি-না! কাকা এইই বড় আস্তে দিচ্চিলেন! তোমায় কি বলে তারা তা তো জান না! বলে সে বোষ্টম বোরেগীর সঙ্গে ও কোথায় যাবে! কতকগুলো বাজে জিনিষ ঢুকিয়ে ওর মন বিগ্ড়ে দেবে ছেলেবেলা থেকে, এই কাকার মত, তা জান? কাকিমা যাই কত বল্লেন তাই শেষে নরম হয়ে এবারের ছুটিতে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন।"

"আর আমি যে তোর মাবাপ-হারা অবস্থা থেকে বুকের রক্তে তোকে মানুষ করেছি! আমার রাধাগোবিন্দের

আরতির সময় তুই যে কত নাচ্‌তিস কত গান গাইতিস্ ছোট্টটি হ'তে! বড় সাধেই যে তোর 'ললিতা' নাম দিয়েছিলাম। তোর বাবার উইলের জোরে সে আমার বুক থেকে তুই পাঁচ বছরেরটি হতেই কেড়ে নিয়ে তার নিজের রুচির মত শিক্ষা দিচ্চে! তা দিক্, আমি কিন্তু জানি ও নাম বৃথা যাবে না! তুই—"

দূরে পর্ব্বত ক্রোড়ে ঘন সুগভীর সারি গাঁথা বনশ্রেণী! ব্রজবাসী সেই দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এইবার আমরা শ্রীগোবিন্দ কুণ্ডে পৌছাব।"

(৩)

চারিদিকে বন, সম্মুখের অপেক্ষা পশ্চাতে গভীরতর। কুণ্ডের চতুর্দ্দিকই প্রস্তর চত্তর ও সোপান শ্রেণী দ্বারা গ্রথিত। সেই সোপানের একদিকে একটু গভীর বৃক্ষ-রাজির নিম্নস্থ চত্তরে একজন রক্তবস্ত্রধারী সন্ন্যাসী বসিয়া আর একজন ব্রহ্মচারীবেশী বয়োধিক ব্যক্তি নিকটে দাঁড়াইয়া কথোপকথনে নিযুক্ত। ব্রহ্মচারী বলিতেছিলেন ঃ

"কতদিন পরে দেখা! শ্রীবৃন্দাবনের পথে কীর্ত্তনের মধ্যে দেখে আনন্দে আত্মহারা হ'লেও তোমার সে ভাবের মধ্যে উৎপাৎ করতে কাছে গেলাম না! পরদিন অনেক কষ্টে যেখানে উঠেছ তার খোঁজ পেয়ে সেখানে উপস্থিত হতেই মহান্ত বাবাজীর মুখে শুন্‌লাম, ভোরেই তিনি বেরিয়ে গেছেন! কত লোক তাঁর সন্ধানে এসে ফিরে যাচ্চে। কে কোথায় থাকেন কিছুই তিনি জানেন না! হঠাৎ এসে আবার হঠাৎই চলে গেছেন।" ভাব্‌লাম আবারও হারালাম বুঝি! এখানে এসে রাধারাণীর কৃপায় যে আবার তোমায় দেখ্‌তে পাব এ একবারও ভাবিনি!"

"তুমি আমায় এখনো খুঁজ্‌ছ ব্রহ্মচারী! তোমার ওপর তোমার রাধারাণীর এ কি বিড়ম্বনা!" সন্ন্যাসী হাসি মুখে এই উত্তর দিলে ব্রহ্মচারী একটু ম্লানভাবে বলিলেন, "এ বিড়ম্বনা রাধারাণী কবে হ'তে আমার উপরে বিধান করেছেন তা কি মনে আছে? না, তাও ভুলে গেছ?" "তা ভুল্‌লে যে অকৃতজ্ঞ হব তাঁর দুয়ারে। অকৃতজ্ঞত্ব এক, গুরুদ্রোহ দুই, দুটি অপরাধই যে আমায় স্পর্শ করবে।" "ও কথা থাক্; কাশী হতে বৃন্দাবনে কবে এলে? বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের শেষে এই বৃন্দাবনের ভেকধারীদের মধ্যে কাশীর বিখ্যাত বৈদান্তিকাচার্য্যের প্রিয়তম ছাত্র দণ্ডধারী যতির এই আবির্ভাব? শুধু তাই নয়, বৈষ্ণব বৈরাগীর কীর্ত্তনের মধ্যে ঐ রকম ক'রে মেতে যাওয়া এবং লোকসমাজকে মাতানো?" তরুণ উদাসীন গভীর দৃষ্টিতে ক্ষণেক বনভাগের দিকে চাহিয়া থাকিয়া উভয় করযোড়ে কাহারো উদ্দেশে যেন ললাট স্পর্শ করিলেন। উদ্দেশে কাহাকে এইরূপে প্রণাম নিবেদন করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "তোমার চিরকৃপা দৃষ্টিই এই অধমের উপর আছে যে!" দুই পদ অপসৃত হইয়া ব্রহ্মচারীও সেই ভাবে ললাটে যুগ্ম কর স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "অপরাধ দিও না। তোমার উপর আজীবনই মহাত্মা সাধুর কৃপাদৃষ্টি আছে। এর বেশী আর কিছু ব'লে তোমায় বিরক্ত করব না।"

"না, বলো না! তুমি আমার খোঁজ না রেখেছ কবে? কাশীর কথাও অনেক জান দেখ্‌ছি।"

"এমন কিছু না, তবে গত কুম্ভের ফেরত্ কয়েকজন কাশীর দণ্ডী শ্রীবৃন্দাবনে এসেছিলেন, তাঁদেরই মুখে তাঁদের আচার্য্যদেবের এক সকল বিষয়ে অদ্ভুত মেধা সম্পন্ন এবং অপরূপ দর্শন তরুণ ছাত্রের কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল এ তুমি!"

"তাই আমাকে শ্রীবৃন্দাবনে দেখে অত আশ্চর্য্য হয়েছিলে বুঝি?"

"আরও বিস্মিত হয়েছিলাম, তুমি আমার প্রভুপাদের কাছে তাঁর সাধনসম্পত্তির প্রধান উত্তরাধিকারী হয়েও বেদান্ত পড়্‌তে গিয়েছ শুনে!"

"আমাকে তাহলে তুমি ভুলে গিয়েছিলে! ভুলে গিয়েছিলে আমার প্রথম জীবনের সেই সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার কথা! তার যেন জগতে যত কিছু জ্ঞাতব্য বোদ্ধব্য আছে সবই জানবার—পাবার দরকার ছিল তখন। এখনি কি সে ক্ষুধা মিটেছে? কি জানি।"

"সত্য, তোমাকে বুঝি ভুলেই ছিলাম। উপস্থিত এখন শ্রীগোবিন্দকুণ্ডেই বাস হবে কি?" "কিছুই জানি না। তবে চিরদিনের যে গূঢ় সাধটি অতৃপ্তই আছে এখনো—বৃন্দাবনে—" "গভীর বনে? আমাকে সঙ্গে নেবে ভাই? আমি দেখব তোমার সে সাধনসাফল্য—" "ব্রহ্মচারী, যে শিশুকে তুমিই সহায় হয়ে একদিন ঘরের বাঁধন কাটিয়েছ আজ তাকে আবার এ কি বাঁধনে বাঁধ্‌তে যত্ন করছ?

আত্মবিস্মৃত হয়ো না ভাই।" ব্রহ্মচারী ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া পরে মৃদু মৃদু বলিলেন, "এ কি একা আমারই? আমি যে তোমার অনেক জানি। অন্য কথা থাক্—এই যে বৃন্দাবনে তুমি দুটি দিন যে ঠাকুরবাড়ীর মহান্তের আশ্রয়ে ছিলে তারও তোমার জন্য কি ব্যাকুলতা! সন্ধান পেলে তোমার সংবাদ অবশ্য জানাতে কি অনুরোধ! তুমি যেখানে যাবে যোগমায়া সেইখানেই তোমার জন্য স্নেহবক্ষ বিস্তার করবেন।" "তাই বল, তিনি যোগমায়া, মহামায়া নন্। সেই সাধু মহান্তটিই কি আমার কম হিতৈষী! সেই কীর্ত্তনের পরে কি যে একটা উন্মাদনা এসেছিল যাতে একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য করেই ফেলেছিল। সে ক'দিন পরমস্নেহেই আমাকে তিনি পালন করেছিলেন আর তাঁরই শিক্ষার মৃদু কশাঘাতে আমার বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসে। সেই উন্মাদনার সময় বুঝি কি সব বলে সেই কুঠুরীর মধ্যে প'ড়ে প'ড়ে চেঁচিয়েছিলাম—তাহারই উত্তরে তিনি পরমপ্রশান্তমুখে বলেছিলেন, "আর কেন 'দাও দাও আরও দাও' বলে কাঁদ্‌ছ বাবা, প্রাপ্তির আর তোমার কি বাকি আছে? অত লোকের প্রশংসার পূজা, অত চোখের ঐ দৃষ্টি, এর চেয়ে জগতে পাবার বেশী আর কি আছে?"

ব্রহ্মচারী একেবারে যেন লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "বল কি! অতদিনের বৈরাগ্যাশ্রয়ী বৃদ্ধ মহান্ত! তাঁর মুখে এই কথা? কি সর্ব্বনাশ!" তরুণ সন্ন্যাসী শান্তমুখে বলিলেন, "অত উতলা হয়ো না। সত্যই হয়ত মনের কোন কোণে ঐ বাসনাটি লুকানো ছিল! নৈলে অমন ক'রে কীর্ত্তনে নাচ্‌তে গেলাম কেন? না, প্রতিবাদ করো না। ভবিষ্যতের জন্যও তো সতর্ক হ'তে পারব এ উপদেশে। এটি তাঁর কশাঘাত হ'লেও শিক্ষকেরই বেত্রাঘাত। আমার উপকারই করেছেন তিনি।" ব্রহ্মচারী মৃদুস্বরে কেবল একবার 'অদোষদর্শি মনই ধন্য।' এই কথা বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। "এখানে কি থাক্‌বে দু-চার দিন?

"থাক্‌তেও পারি আবার যে কোন মুহূর্ত্তে চলে যেতেও পারি।"

কুণ্ডের অপর তীরে যাত্রীদের কোলাহলশব্দ নিকট-তর হইতেছিল। কোন ব্রজবাসী পাণ্ডার গম্ভীর কণ্ঠ তাহার ধনী যজমানকে গোবিন্দকুণ্ডের ইতিহাস এবং মাধবেন্দ্র পুরীর এই গোবিন্দকুণ্ড তীরস্থ জঙ্গলেই যে গিরিধারী গোপালপ্রাপ্তির ঘটনা তাহা বুঝাইতে বুঝাইতে আসিতেছিল, "বাবু, আপনাদের কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তো পড়া আছে! এ সেই স্থান, সেই শ্রীগোবিন্দ কুণ্ড—সেই গিরিধারী গোপালের প্রকট স্থান—" কোথা হইতে একটি কিশোর কণ্ঠে বিদ্রোহের আভাস প্রকাশ পাইল, "শুধু স্থান দেখালে কি হবে—সে গোপাল দেখাও! তিনি তো শুনি নাথদ্বারে—মুসলমানের ভয়ে তোমাদের ঠাকুর দেশ ছেড়ে পালায় এই তো তাঁর মুরোদ!" ব্রহ্মচারী ও উদাসীন সন্ন্যাসী উভয়ে উভয়ের মুখপানে চাহিয়া মৃদু হাসিলেন। ব্রজবাসী ব্যাকুলও ব্যস্তভাবে "আরে দিদি" বলিয়া কি প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, ইতিমধ্যে সেই কণ্ঠ-স্বরের উত্তেজনা কুণ্ডের তীরে তীরে বাজিয়া উঠিল, "হ্যাঁ দাদু, তিনিই বোধ হচ্চে। গাছের ফাঁকে যেটুকু দেখা যাচ্চে!" সঙ্গে সঙ্গেই একটি গম্ভীর আকুল কণ্ঠ "এমন ভাগ্য কি হবে! তুই আগে ছুটে যা ললিতে, অন্তর্দ্ধান হ'য়ে যাবেন এখনি।"

উভয়ে তীক্ষ্ণ চক্ষে চাহিয়া দেখিলেন কুণ্ডের অপর তীরে একটি সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ, সঙ্গে কতকগুলি অনুচর এবং দলের সর্ব্বাগ্রে একটি সুবেশা সুন্দরী কিশোরী কুণ্ডকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাদের দিকেই যেন ছুটিয়া আসিতেছে। বিস্মিত ব্রহ্মচারী তরুণ উদাসীনের পানে ফিরিয়া চাহিতে গিয়া দেখিলেন সে স্থান শূন্য! তিনি কখন বনের মধ্যে কোন্ দিকে অদৃশ্য হইয়াছেন। ব্রহ্মচারী কর্ত্তব্যমূঢ় হইয়া স্তব্ধ-ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন।

(ক্রমশঃ)

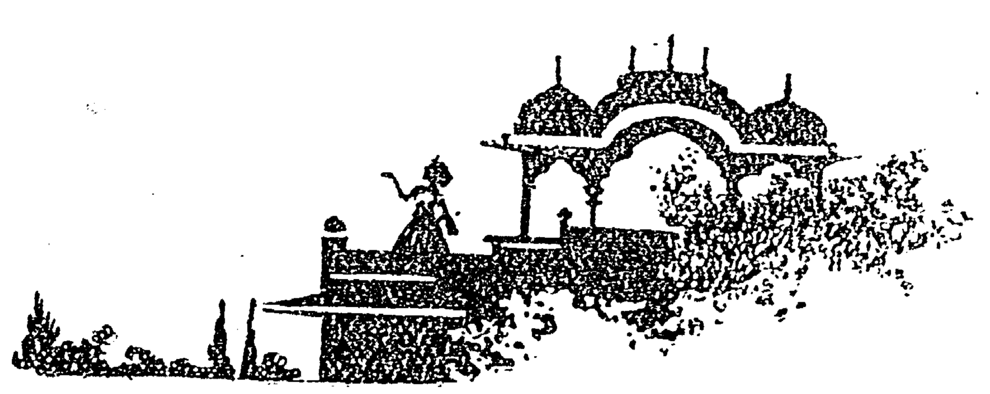

হে সমুদ্র, হে অনন্ত

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্য, এম্, এস্-সি

(১)

হে সমুদ্র, হে অনন্ত, বারিধি সুনীল,
জলদমন্দ্রিত স্বরে অব্যক্ত ফেনিল
কাহারে কি কহিছ, অপরূপ ভাষে !
ঢেউগুলি দিবারাত্রি কিসের প্রয়াসে
ধরণীর কূলে কূলে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে ;
সেই সব বৃথা চেষ্টা তোমার অন্তরে
করে কিগো ক্ষোভ-সৃষ্টি, হে বিরাট্ জল,
তাই বুঝি এত কথা—অশান্ত চঞ্চল।

(২)

কেন ক্ষোভ তব ?—অতীতে একদিন
তোমার গহ্বর মাঝে সুযুপ্তি বিলীন
ছিল এই ধরা-পৃষ্ঠ ; মাতৃত্ব-বেদনা
প্রতিটি শিরায় তব তুলিল মূর্চ্ছ না—:
আকাশের সাথে তব হইল বিচ্ছেদ
তখনি ধরার জন্ম, সুরু হ'ল ভেদ।
তারপর বহুকাল কেটে গেছে কত
আজো তারে ঘিরি তুমি রয়েছ সতত।

(৩)

আজও ছিঁড়েনি নাড়ী—রক্ত চলাচল
আজও তেমনি আছে,—সেই অবিকল
অতীতের একদিন—গর্ভলীন ধরা
তেমনি তোমার সাথে অষ্টপৃষ্ঠে ঘেরা।
তেমনি সকল আছে, তাহার আকাশে
তোমার সুনীল জল, তার ছায়া ভাসে।
তাহার বাতাস সাথে তোমার মেঘেরা
নিরন্তর হাসে খেলে করে চলা ফেরা।

(৪)

সেই সব ; তবু কেন অন্তরে তোমার
জাগিছে বিয়োগ-ব্যথা ? বিচ্ছেদের ভার
কেন বা অসহ এত ? তাহারে বেষ্টিয়া
কেন এই মায়াজাল ? অনন্ত ধরিয়া
উঠিছে ডুবিছে শুধু তরঙ্গের মালা
একের পরেতে আর ; এক সুরে ঢালা
তোমার বক্তব্য-রাশি ; অব্যক্ত গুঞ্জন
ভাষাহীন অর্থহীন শুধু আলোড়ন।

(৫)

"আমারে ফিরায়ে দাও আমার ধরণী"
বুঝি তব অন্তরের লক্ষ লক্ষ বাণী
কহিছে এই কথা তরঙ্গিত সুরে ;
তাই বুঝি লক্ষ বাহু ধরি ধরণীরে
জোর করি নিতে চায়।
কিন্তু, হে অপার,
তোমার ধরণী আর নাহি যে তোমার
তাহারো কর্ত্তব্য আছে, দূর হতে দূরে
বাঁধা সে অনন্তের চিরন্তন সুরে।

(৬)

তাহারে ডাকিছে তারা অনন্ত আকাশে ;
প্রভাতে অরুণালোক সান্ধ্য ছায়ে মিশে'
রচিছে তাহার পথ,—তাহার আহ্বান
ছেয়ে গেছে দিগন্তে, বিশ্ব ভরা প্রাণ
হয়েছে আচ্ছন্ন তাহে ; অই নীহারিকা
বহে তার প্রাণধারা ; আলোক-বর্ত্তিকা
অই ছায়াপথ মাঝে তাহার স্বপন
অনন্ত কাল ধরি রয়েছে গোপন।

(৭)

দিক হতে দিগন্তরে এসেছে আহ্বান,
চলে সে কর্ত্তব্য পানে দিন রাত্রিমান,
নাহি অবসর ;
"কে কোথায় আছিস্ ওরে
এই বেলা চল্—যেতে হবে বহুদূরে,
ফেলে দিয়ে ভাররাশি—আয় ওরে আয়—"
মায়ের আহ্বান শুনি যাত্রী বাহিরায়
যাত্রী তারা সুদূরের,—অনন্তের পথে
চলে তারা চিরদিন কর্ত্তব্যের রথে।

(৮)

চলে আর চলে তারা—কত না নূতন
কত কি আসিল পথে,—যাহা পুরাতন
কত কি শেষ হ'ল ; জন্ম মৃত্যু লয়
এই নিয়ে নিত্য নব হয় পরিচয়
অনন্ত পথিক সনে ; ক্ষয় ক্ষতি লাজ
ঢেকে রাখে বক্ষ মাঝে বর্ম্মাবৃত সাজ ;

দুর্জ্ঞেয় অনন্ত মাঝে কি রহস্য তরে
যাত্রিদল চলে শুধু অনন্ত গহ্বরে।

(৯)

এ পথে মুক্তি নাই,—শেষ নাই কভু,
যাত্রিদল চলিয়াছে—চলিয়াছে তবু
অনন্ত অলক্ষ্য পানে দিবস রজনী ;
কখনো হতেছে ভুল, অজ্ঞাত সরণী
আনিছে বিপদ কত ,—তবুও এ চলা
শেষ নাই—শেষ নাই, আবেশ-বিহ্বলা।
আলো তারে ডাকিতেছে, ডাকিছে আঁধার
প্রাণ তারে চাহিতেছে, বিশ্ব দরবার।

(১০)

জগতে যত না আলো—যত প্রাণ আছে,
ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিটি অণু তাহারে ডাকিছে ;—
তাহার আহ্বান-বাণী গ্রহে উপগ্রহে,
বাতাস বারতা তার বক্ষে করি' বহে ;—
ধরণীর প্রতি কণা—শিলা, লতা পাতা
পেয়েছে অনন্ত হতে অনন্ত বারতা,
অনন্ত যাত্রার কথা ; অনন্ত উদ্দেশে
চলেছে ধরণী তাই সীমাহীন দেশে।

(১১)

চলিয়াছে—এ চলার হবে না তো শেষ,
প্রভাতে উষার আলো দিয়েছে নির্দ্দেশ—
সায়াহ্নে জোছনা রাতে চাঁদিনীর আলো
তার পথ দীপ্ত করি' সাজিয়াছে ভালো ;
অন্ধকার অমানিশি রুদ্ধ পথ 'পরে
জ্বলেছে তারার দীপ থরে বিথরে।
বাতাসে দেখালো পথ নিশ্চিহ্ন অম্বরে,
সাধ্য নাই এ চলায় বাধা সৃজিবারে।

(১২)

হে সমুদ্র, হে অনন্ত, তোমার ধরণী
তোমার আশ্রয়মুক্ত, হে মাতঃ জননী !
তাহার কর্ত্তব্যপথ টানিছে তাহারে
যাত্রারম্ভ চলিয়াছে বিশ্ব দরবারে।
শেষ নাই, হে মাতা, তুমি বুঝি তাই,
ধরণীরে বুকে বাঁধি ফিরিছ সদাই,
তার সঙ্গে দিকে দিকে পথ পথান্তরে
টানিছ সবলে তারে আপন অন্তরে।

(১৩)

দিন যায়, রাত্রি আসে, আকাশের তারা
কাহার ইঙ্গিতে যেন সব দিশেহারা
চেয়ে থাকে কার মুখ পানে ; শুধু তুমি
তোমার বিরাট শিশু পৃথিবীরে চুমি'
কাটাও সমস্ত ক্ষণ ; তোমার ক্রন্দন
আনিয়াছে এই বিশ্বে অদ্ভুত স্পন্দন ;
তুলিতেছে মহাধ্বনি ব্যথা অবিরল
লক্ষ মুখে এক ভাষা বাণী অচপল।

(১৪)

অথবা আমারি ভুল—ধরণীর বুকে
অনাচার, অত্যাচার, সেই সব দুখে
দুলিছে তোমার বুক ; মৌন বেদনা
আর্ত্তের কাতর কণ্ঠ দিতেছে যন্ত্রণা ;
তোমার বিরাট বক্ষে ক্ষুব্ধ আন্দোলন
অসহায় দুর্ব্বলের করুণ ক্রন্দন,
তোমার উদার প্রাণে তোলো এই ধ্বনি
শঙ্খের নির্ঘোষ সম দিবসরজনী।

(১৫)

অত্যাচারে জর্জ্জরিত ক্লান্ত, শ্রান্ত, দেহ
যাহাদের অবিচারে কাঁদে নাই কেহ,
ঈশ্বর যাদের মূক—অন্ধ যার বিধি
বধির অদৃষ্টে যারা সেবে নিরবধি,
সেই সব ভাষাহীন নির্য্যাতিত দল
সমস্বরে ঘোষে ব্যথা ; তরঙ্গিত জল
ক্ষুব্ধ, রুষ্ট, লক্ষ প্রাণে ঊর্দ্ধে তুলি হাত
নিষ্ঠুর বিধিরে বুঝি দিতেছে সম্পাত।

(১৬)

তাহাদের ভাষা নিয়া, মূক বারি রাশি,
তুমি বুঝি শব্দময়, উঠিছ উচ্ছ্বসি।
তাহাদের কর্ম্মক্লান্ত দিবসরজনী,
তাহাদের ব্যথা দ্বন্দ্ব, দুঃখ শোক গ্লানি,
সফেন জলোচ্ছ্বাসে, রুদ্ধ গরজনে
বলিছ ধরণী-পারে, প্রলয় নিঃস্বনে।
স্তব্ধ, ক্ষুব্ধ বারিধির এ মহাগর্জ্জন
নির্য্যাতিত দুর্ব্বলের করুণ ক্রন্দন।

(১৭)

অথবা—অতীতের কোন্ এক দিন
বিরাট ব্রহ্মাণ্ড মাঝে ক্ষীণ, অতিক্ষীণ
একটি শব্দ মাত্র জন্ম নিল যবে
সেই হ'তে সমুদ্রেতে, নাহি জানি কবে,
হইতেছে প্রতিধ্বনি ; সেই শব্দটুকু
বিরাট পৃথিবী বক্ষে স্পন্দে ধুকুধুকু ;
সেই শব্দ ছড়ায়েছে গ্রহ-উপগ্রহ
প্রতিধ্বনি সাগরেতে তারি অহরহ।

(১৮)

অথবা—কি জানি কবে কোন্ মায়া-বলে
সৃষ্টির প্রথম শব্দ নীলাম্বুর জলে
বাঁধা পড়ি গেল,—কি জানি কেমন ক'রে
নিয়ত উঠিছে শব্দ সেই এক সুরে।
প্রতিদিন হেরিতেছি এই নীল জল
সুনীল—সুদৃশ্য নীল—নিয়ত চঞ্চল,
উদ্ধত বিদ্রোহভরা লক্ষ ফণা তুলি
গর্জ্জিছে বারিধি বক্ষ; শুনেছি কেবলি।

(১৯)

বহুরূপে বহুবার হেরেছি তোমায়
হেরেছি প্রভাত বেলা; হেরেছি সন্ধ্যায়;
প্রখর মধ্যাহ্নদীপ্ত উষ্ণ বেলাভূমি
তোমার জলোচ্ছ্বাস গিয়াছে যে চুমি';
হেরিয়াছি তারাহীন নিস্তব্ধ নিশীথে,
হেরিয়াছি জ্যোৎস্নালোকে একান্ত নিভৃতে;—
সেই তব নীল জল,—প্রলয় গর্জ্জন
বিশ্বের বিদ্রোহ ভরা ক্রুদ্ধ অচেতন।

(২০)

প্রভাতে নবীন সূর্য্য রক্তরাঙা জলে
স্নান করি' বাহিরায় ফোটাতে কমলে,
আকাশে পূবের শেষে তোমার তরঙ্গে
সূর্য্যেরে স্পর্শ করি' খেলে কত রঙ্গে;—
মধ্যাহ্নে উত্তপ্ত রবি মুহূর্ত্তের তরে
হেরে নিজ প্রতিবিম্ব তব বক্ষ পরে;
মুহূর্ত্তেতে বেড়ে যায় তব আলোড়ন
আসিল জোয়ার জলে—প্রলয় গর্জ্জন।

(২১)

সূর্য্য যায় ডুবে—দিগন্তের অস্তাচলে
রক্ত-রাঙা যাত্রা-পথ তব নীল জলে।
কমল মুদিল আঁখি; জাগিল চকোর,
চাহিয়া আকাশ পানে রহিল বিভোর।
তোমার সুনীল জল আর নীলাকাশ
পরিহিত জোছনার শুভ্র রৌপ্য বাস;
তোমার তরঙ্গ শীর্ষে চূর্ণীকৃত জল,
দিগন্তে ছিটায়ে পড়ে অস্থির চপল।

(২২)

পরিপূর্ণ অন্ধকারে হিংস্র বারিরাশি
অশান্ত গর্জ্জনে শুধু উঠিছে উল্লাসি,'
ধরণীর প্রান্ত 'পরে মুহুর্মুহু ঘাতে
জলে ওঠে ঝিকিমিকি কি জানি কি হতে,—
মাথাতে মুকুটমালা—দুরন্ত রাক্ষস
বুঝি বা গ্রাসিতে চায়, ধরণী বিবস,
ভীষণ গর্জ্জন শুনি'; শুধু অন্ধকার—
আকাশ সাগর আজি সব একাকার।

(২৩)

আবার দেখেছি তোমা শান্ত ছোট মেয়ে
নীলাম্বর—জননীর কোলটুকু ছেয়ে
বুঝি-বা শান্তির কোলে; স্তব্ধ মাধুরিমা
আকুল বিস্ময়ে হেরি প্রশান্ত নীলিমা।
তখনো পাতিলে কান দূর হতে দূরে
মনে হয় ভেসে আসে কোন্ এক সুরে
তোমার অমোঘ বাণী—অস্পষ্ট গুঞ্জন,
কোন্ এক মহামুনি ধ্যান নিমগন।

(২৪

প্রভাতে ঝিনুক, শঙ্খ, ঢেকে থাকে বেলা,
তাই নিয়ে মোরা শুধু করে থাকি খেলা;
জানি না কত না ব্যথা তব নীল জলে
শুক্তির বুকেতে হীরা কেমনে বা ফলে;
জানি না বিরাট বক্ষে কত ব্যথা পেলে
একটি প্রবাল সৃষ্টি কত অশ্রুজলে;
জানি না তোমার কথা; তীরে বসি শুনি
অনন্তকালের তরে উঠিতেছে ধ্বনি।

(২৫

জানি না তোমার সুখ, দুঃখ-ইতিহাস
বিস্মিত শ্রবণে শুনি তব কলভাষ;
জানি না কতকাল এই মত করে
থেমে যাবে সব গতি নিস্তব্ধ নীরবে।
বসে থাকি বেলাভূমে, চক্ষে হেরি জল
মনোরম, কমনীয়, অশান্ত, চপল;
বসে থাকি আর শুনি তব স্ফুটধ্বনি
বুঝি না অর্থ কি যে;—তবুও তো শুনি।

(২৬)

মনে হয় বুঝি সাগর, দুয়ারে তোমার
এসেছে আহ্বান বাণী বাঁধা টুটিবার;
মনে হয় আকাশের লক্ষ তারা বুঝি
চাহিছে তোমার স্পর্শ; পথ খুঁজি খুঁজি
তুমি বুঝি চলিয়াছ অনন্তের পানে,
তোমার চলার গতি আনন্দে ও গানে
বুঝি-বা পথিক রূপ; তোমার ধেয়ান
তোমার গর্জ্জনে বুঝি পাইল পরাণ।

(২৭)

তোমার সুনীল জলে জোয়ার সঞ্চার
বুঝি-বা অলক্ষ্য পানে প্রেমের প্রচার;
তোমার ভাটার জল, অস্ফুট গুঞ্জন
বুঝি-বা প্রেমিক-মনে বিরহবেদন।
যাই হোক হবে কিছু, একা আমি তীরে
চেয়ে থাকি জল পানে বিস্ময়ের ঘোরে,
ও কি কথা, ও কি সুর—কি হবে কি জানি,
সুনীল সমুদ্র মাঝে অব্যক্তের ধ্বনি।

জগন্নাথদেবের অদ্ভুত দারুমূর্ত্তির পরিচয়

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়

শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বলরাম, সুভদ্রা ও জগন্নাথের অদ্ভুত মূর্ত্তি-গঠনের রহস্যধারা প্রত্নতাত্ত্বিক ও দার্শনিকের গবেষণার বিষয়। এ বিষয়ে গবেষণা করিলে দেখা যায় যে, অনার্য্য, হিন্দু ও বৌদ্ধ তত্ত্বের ত্রিধারার মধ্যে ইহা উজ্জ্বলভাবে বিকশিত হইয়া রহিয়াছে।

আদিম মানবসভ্যতার প্রথম বিকাশে মানবের চিত্র অঙ্কন বা মূর্ত্তি গঠনের প্রথম নমুনা হইতেছে—সোজা। সরল ও গোলাকৃতি রেখাপাত—পুতুলের আকৃতিতে মানবের প্রতিকৃতি। ইহা হইতে জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি কল্পনা এবং বৃক্ষপূজার মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রথম সূত্রধারার নিদর্শন পাওয়া যায়; সেই প্রথম ভাবধারার বিশেষত্ব আজ পর্য্যন্ত জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে মন্দিরের নানা পূজা ও উৎসবের পদ্ধতিতে।—

১। পাণ্ডারা যে বেত্রগুচ্ছ সকলের গাত্র ও মস্তকে স্পর্শ করায় তাহা অনার্য্যদিগের শক্তিপ্রেরণ বা শক্তি-সঞ্চালন পদ্ধতির সাক্ষ্য; সাধারণত অনার্য্যমণ্ডলীর মোড়ল তাহার প্রতিনিধির অঙ্গে ভৌতিক দণ্ড (magical wand) দ্বারা এইরূপে শক্তি সঞ্চারিত করে।

২। রথের সময় যে সকল অশ্লীল গান সারথির দ্বারা গীত হয় তাহা অনার্য্যদের অশ্লীল গানের (evil songs) দ্বারা ভূত প্রেত (evil powers) বিতাড়নের ব্যবস্থা মনে করাইয়া দেয়।

৩। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে রেশমী দড়ি দিয়া আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন ও হেঁচ্‌কা টানের মধ্যে অনার্য্যদিগের জাবজন্তু পূজায় পূজার সামগ্রীকে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়ার সাদৃশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। বিশেষত শবরবংশীয় দৈত্যপতি পাণ্ডা দ্বারা এই অনুষ্ঠানটি বরাবর চলিয়া আসিতেছে বলিয়া ইহাকে অনার্য্যমূলক মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।

৪। জগন্নাথদেবের নবকলেবর নির্ম্মাণ ও তৎসংক্রান্ত সমুদয় অনুষ্ঠান, এমন কি, মূর্ত্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠাও আদিম শবরজাতীয় দৈত্যপতি পাণ্ডাদের দ্বারা সম্পন্ন হয়; এবং মূর্ত্তির বাম অংশ তাহাদের চিরাগত আদিম অধিকার। মূর্ত্তি সম্বন্ধে আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রাচীন দ্রাবিড়সভ্যতার সংস্পর্শে লিঙ্গপূজার (Phallus worship) ধারা অনুসারে লিঙ্গমূর্ত্তির অনুপাতে ইহা পরিকল্পিত এবং শিবশক্তিধারার ত্রিশূলের চিহ্ন ইহার মধ্যে বিকশিত; বিশেষত, সুদর্শন চক্রটি দেখিলেই (worship of Phallic emblem without Ograpatta)—প্রাচীন দ্রাবিড়সভ্যতার লিঙ্গপূজার সংজ্ঞা বলিয়া প্রতীত হয়।

আর্য্য-সভ্যতার আগমনে বিষ্ণু বা নারায়ণ পূজার প্রবর্ত্তনের মধ্যেও যথেষ্ট অনার্য্য সংস্পর্শ রহিয়া যায়। জগন্নাথদেবের প্রাণপ্রতিষ্ঠায় ব্যবহৃত গুপ্ত নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণের কৌস্তভ মণি বা নীল মণিটি (ডিম্বাকৃতি, Blue Sapphire) নীলাচলের নীলমাধবের স্মৃতিরই উদ্রেক করে। অনার্য্য-দেবতার প্রতীক এই মণি আর্য্যদেবতার দারুব্রহ্মের হৃদয় অভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত হইয়া আর্য্য-অনার্য্যের মিলনের ক্ষেত্র প্রশস্ত করিয়া দেয়।

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নই প্রথম মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ভোগরাগাদির ব্যবস্থা করেন। ইন্দ্রদ্যুম্নের যুগ ভারত-ইতিহাসে প্রাচীন অন্ধকারের যুগ; তাহার ক্ষীণ আলোক-ধারা হিন্দুর সনাতন ঐতিহ্য (tradition)-এর মধ্যে পর্য্যবসিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইন্দ্রদ্যুম্নের যুগকে কিম্বদন্তী বা পরিকল্পিত গল্পের (myth) অধ্যায় বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীসম্মত ভূগর্ভের খননকার্য্যের দ্বারা তাঁহাদের এই মত খণ্ডিত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভূগর্ভের গভীরতা ও ঊর্দ্ধ-নিম্নভাগের তারতম্য বিশ্লেষণ দ্বারা আদি, অন্ত ও বর্ত্তমান যুগের নিদর্শন নির্দ্ধারিত করেন।

শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রের বর্ত্তমান মন্দিরের বহির্ভাগের চতুস্পার্শ্বস্থ ভূমি পরীক্ষা করিলে ইহা উপলব্ধি হয় যে, অন্য একটি সভ্যতার স্তর ভূগর্ভে নিহিত রহিয়াছে—

প্রথমত, পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে কপালমোচন শিবমন্দির শঙ্খক্ষেত্রের দ্বিতীয় আবর্ত্তের শাস্ত্রোক্ত অতি পুরাতন

ক্ষেত্র। জগন্নাথমন্দিরস্থ বিমলামন্দির হইতে একশত ফিট্ দূরে সদর রাস্তার অপর পারে ভূগর্ভনিম্নে ইহা বিদ্যমান ও ঐ রাস্তাটির কুড়ি ফিট্ নিম্নে ইহা অবস্থিত।

দ্বিতীয়ত, পাঞ্জাবী মঠে (মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে) একটি কূপখননের সময় নিম্নস্থ আর একটি কূপের সহিত তাহার যোগাযোগ হয় এবং নিম্নে সভ্যতার একটি স্তরের কয়েকটি নিদর্শন দেখা যায়। কিন্তু মঠওয়ালা তাহা পাথর দিয়া বাঁধাইয়া বন্ধ করিয়া দেয়।

তৃতীয়ত, পুরীর সর্ব্বপ্রাচীন জলাশয় মার্কণ্ডেয় ও ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর ও মন্দির এবং যমেশ্বর মন্দির বর্ত্তমান রাস্তা হইতে প্রায় কুড়ি ফিট্ নিম্নে অবস্থিত। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, ইন্দ্রদ্যুম্নের যুগ মৃত্তিকাস্তরের মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে। বৌদ্ধযুগের কথা কহিতে গেলে প্রথমেই সম্রাট অশোকের নাম করিতে হয়। কলিঙ্গ-রাজের সহিত সম্রাট্ অশোক আট বৎসর স্থলে ও জলে ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ করিয়া খৃঃ-পূঃ ২৬১ সালে কলিঙ্গ বিজয় করেন। কলিঙ্গের ভয়াবহ যুদ্ধই অশোকের চরিত্রকে সহসা পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়; এই যুদ্ধই কলিঙ্গের পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়বলকে নষ্ট করিয়া ফেলে—এই যুদ্ধে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কলিঙ্গ পদাতিক বন্দী হয়। যুদ্ধক্ষেত্রেও এক লক্ষ কলিঙ্গ সৈন্য নিহত হয়; এবং ঐ সংখ্যার তিন গুণ লোক শত্রু কর্ত্তৃক তাড়িত, লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হয়। কলিঙ্গদেশকে অমানুষিক অত্যাচারে ধ্বংস করার জন্য বৌদ্ধধর্ম্মের অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত অশোকের হৃদয় অনুশোচনায় দগ্ধ হইয়াছিল। তিনি সেই জন্যে একদিন মৈত্রী, সাম্য ও করুণায় সমস্ত কলিঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়াছিলেন এবং শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দ্বারা ঐ ধর্ম্ম চারিদিকে প্রচারিত করিয়াছিলেন। সেই সময় জগন্নাথদেবের মন্দির বৌদ্ধধর্ম্মের অন্যতম কেন্দ্রস্থল হইয়া পড়িয়াছিল এবং ত্রিমূর্ত্তিটি ত্রিরত্নে পরিণত হইয়া বহুকাল বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতীক বলিয়া পরিচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানের ত্রিমূর্ত্তিটি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘের ত্রিরত্নের সহিত চমৎকার মিলিয়া যায়।

বৌদ্ধ শাস্ত্রোক্ত বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ এই ত্রিরত্নের সংজ্ঞার চিহ্ন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা আকৃতির মধ্যে রূপান্তরিত এবং এইরূপ অদ্ভুত মূর্ত্তিত্রয়ের বিশেষত্ব বৌদ্ধ স্মৃতিকাষস্তের অনুকরণে পরিকল্পিত। আরও অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের ধর্ম্মসংজ্ঞাটি স্ত্রীলিঙ্গ বা সুভদ্রা; এবং দেবতাত্রয়ের ভ্রাতা-ভগ্নী সম্বন্ধ বৌদ্ধধর্ম্মের মেরুদণ্ড ভ্রাতৃত্ব ও ভগ্নীত্ব ভাব (brotherhood and sisterhood) হইতে উদ্ভূত। জগন্নাথমন্দিরের স্থাপত্যের মধ্যেও বৌদ্ধ প্রভাব সুস্পষ্ট; কারণ, স্তূপ ও সংঘারামের সদৃশ পরিকল্পনায় শ্রীমন্দির গঠিত। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্যেই হিন্দুর জাতিভেদ প্রথায় কুঠারাঘাত করিয়া অন্ন মহাপ্রসাদ বিতরণ করিবার প্রণালী ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায় এবং এখনও দশ অবতার মূর্ত্তির কল্পনার মধ্যে উড়িষ্যায় বুদ্ধ মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি পরিকল্পিত অঙ্কন-রীতির মধ্যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রবল প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। স্থাপত্য ও মূর্ত্তি পরিকল্পনা ব্যতীত উৎসব-পদ্ধতিকেও বৌদ্ধরীতি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছিল, যথা—রথোৎসব। রথোৎসবটি পূর্ব্বকালে দন্তোৎসব নামে কথিত হইত। রথোৎসবের বৌদ্ধ সম্পর্ক সম্বন্ধে বিখ্যাত পরিব্রাজক ফা-হিয়ানের গ্রন্থেও বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের সন্ধিক্ষণে।

ফা-হিয়ান্ চীন সম্রাটের আদেশক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের তত্ত্ব অনুসন্ধানে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং নানাস্থান পরিভ্রমণপূর্ব্বক কোস্থান (তারতার এর অন্তর্গত খোটান্) নামক নগরে উপনীত হয়েন। খোটান্ তখন বৌদ্ধরাজ্য ছিল; তথায় রথযাত্রা দর্শন করিয়া তিনি স্বীয় গ্রন্থে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। এদেশের ন্যায়ই খোটানেও রথোৎসব হইত। পুরুষোত্তমক্ষেত্রের ন্যায় প্রতি বৎসর নূতন রথ নির্ম্মিত হইত এবং রথযাত্রার পূর্ব্বদিন রাজপথ পরিষ্কৃত হইয়া চন্দ্রাতপ ও পুষ্প-তোরণাদিতে পরিশোভিত হইত। নগরপ্রান্তে চতুর্দ্দশ হস্ত পরিমিত উচ্চ চারি চক্র-বিশিষ্ট রথ নির্ম্মিত হইয়া সপ্তরত্নে ভূষিত ও কৌষেয় চন্দ্রাতপ, পতাকা ও নানা মণি-রত্নগ্রথিত ঝালরাদির দ্বারা সুশোভিত হইত। ভূপতি কর্ত্তৃক সম্মানিত মহাযানপন্থী পাণ্ডাদের দ্বারা বাহিত হইয়া তিনটি দেবমূর্ত্তি রথোপরি নীত হইতেন এবং মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইলে মহাসমারোহে রথাকর্ষণ আরম্ভ হইত। উৎসবের সমস্ত অঙ্গই পুরুষোত্তমের প্রথার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ; কেবল সেখানে রথোৎসব চতুর্দ্দশ দিবসব্যাপী হইত; জগন্নাথদেবের রথযাত্রা নয় দিন স্থায়ী হইয়া থাকে।

সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মের ব্যাখ্যার মধ্য দিয়া জগন্নাথ পূজায় বৌদ্ধপ্রভাব ও অদ্ভুত মূর্ত্তির বৈশিষ্ট্য যে প্রামাণ্য রূপে প্রকাশ পায় তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এবং আমাদের দেশের আধুনিক যুবক সম্প্রদায় জগন্নাথদেবের কিম্ভূতকিমাকার মূর্ত্তি দর্শনে নানারূপ বিদ্রূপ করেন এবং ইহা হিন্দুদের অসুন্দর ও নিম্নতর মনোবৃত্তির পরিচয় দান করে বলিয়া ধারণা করেন। কিন্তু এই ধারণা কত দূর ভ্রমাত্মক, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়।

জগন্নাথদেবের অদ্ভুত দারুমূর্ত্তিত্রয় হিন্দু দার্শনিক ও যোগীদের অপূর্ব্ব অবদান; অরূপের মধ্যে রূপের পরিকল্পনা, অসুন্দরের মধ্যে সুন্দরের সমাবেশ, অন্ধকারের মধ্যে আলোকের রেখাপাত, অব্যক্তকে ব্যক্ত করিবার দার্শনিক ইঙ্গিত—এই দারুমূর্ত্তির মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে। সেই রহস্যধারা উপলব্ধি করিতে হইলে যোগীদের অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন এবং সবিশেষ অনুধাবন আবশ্যক।

এই অদ্ভুত মূর্ত্তির পরিকল্পনার মধ্যে কয়েকটি বিষয়বস্তুকে প্রথমে বিচার করিতে হইবে—

প্রথমত, হিন্দুদের কাষ্ঠনির্ম্মিত মূর্ত্তি গঠনের তাৎপর্য্য কি? উৎকৃষ্ট মুগী (chlorite) সবুজ প্রস্তরে বা স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু-পদার্থে মূর্ত্তি গঠন না করিয়া ক্ষণভঙ্গুর নিকৃষ্ট কাঠের মূর্ত্তি গড়িবার কারণ কি? বিশেষত স্থায়িত্বের দিক দিয়া যখন দারুমূর্ত্তির কোনই মূল্য নাই।

দ্বিতীয়ত, কাষ্ঠমূর্ত্তির গাত্রে রেশমী কাপড় জড়াইয়া তিনপ্রকার বিভিন্ন বর্ণের তিনটি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবার প্রয়োজন কি? মূর্ত্তিগুলি বিশালকায় করিবারই বা কারণ কি?

তৃতীয়ত, হিন্দুরা তাহাদের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাদের (presiding deities) সুন্দর কারুকার্য্যশোভিত মনোরম মূর্ত্তি গঠন না করিয়া এইরূপ কারুকার্য্য ও মনোহারিত্ববিহীন কিম্ভূতকিমাকার মূর্ত্তিতে কল্পনা করার অর্থ কি?—বিশেষত যখন আমরা উড়িষ্যার স্থাপত্যের মধ্যে হিন্দু শিল্পীদের অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি গঠনে সবিশেষ দক্ষতার অসংখ্য পরিচয় পাইয়া থাকি?

চতুর্থত, রথোৎসবের মধ্যে হিন্দুর মৌলিকতা কোথায়?

প্রথমত, অপঃ হইতে নারায়ণ সংজ্ঞার উৎপত্তি; সমুদ্রের বিশাল নীলাম্বুরাশির অন্তবিহীন চিত্রের মধ্যে আর্য্যদিগের নারায়ণ মূর্ত্তির পরিকল্পনা। বারিরাশির উপর কাষ্ঠভেলা ভাসমান অবস্থায় থাকিতে পারে—পাথর বা ধাতুপদার্থ স্বাভাবিক থাকিতে পারে না। প্রলয়কালে যখন ব্রহ্মাণ্ড সলিল-সমাধিতে নিমগ্ন তখন মৃত্যুঞ্জয় বীর মুনি মার্কণ্ডেয় বটবৃক্ষের উপর ভাসিতে ভাসিতে দুর্দ্দশাগ্রস্ত অবস্থায় নীলাচলে আসিয়া ব্যাকুলচিত্তে জগৎনাথের শরণাপন্ন হইয়া আশ্রয় ভিক্ষা করেন। তখন দারুব্রহ্মরূপ জগন্নাথ প্রলয়-সলিলের মধ্য হইতে উঠিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দান করেন। কিম্বদন্তী ব্যতীত কাব্যের দিক দিয়া বলা যায় যে, এই মহাসমুদ্রের নীলাম্বুরাশির মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে কাষ্ঠনির্ম্মিত ভেলা যেরূপ সম্বল, সেইরূপ সংসার-

রথে জগন্নাথদেব, পুরী

সাগর পার হইতে হইলে কলিকালে একমাত্র কাণ্ডারী—দারুব্রহ্ম। সুতরাং দেখা যায়, নীলাম্বু সাগরের পারে দারুমূর্ত্তি অসীমের ইঙ্গিতস্বরূপ হিন্দুদের আরাধ্য দেবতা রূপে বিরাজিত রহিয়া জীবনের পরপারে উত্তীর্ণ করিবার একমাত্র যান বা উপায় সূচিত করিতেছেন।

দ্বিতীয়ত, তিনি পুরুষোত্তম নামে এই শঙ্খক্ষেত্রে বিরাজমান। যোগীদের অন্তর্নিহিত হৃদয়গুহার মধ্যে যে অগ্নি জ্বলিতেছে, সেই অগ্নির ত্রিরূপের মধ্যে অন্তরতম মূর্ত্তি হইতেছে পুরুষোত্তম (অর্থাৎ পুরুষ, পুরুষতর, পুরুষতম)।

পুরুষোত্তমের মূর্ত্তিত্রয় যোগীদের ধ্যানের মধ্যে উপলব্ধির বিষয়; ইহাদের রহস্যময় তত্ত্ব লুক্কায়িত রহিয়াছে ধ্যানযোগীর অন্তর্দৃষ্টির গভীর অভিব্যক্তির মধ্যে ;—

"ডুব্‌, ডুব্‌, ডুব্‌, রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেমরত্ন ধন॥
খুঁজ্‌, খুঁজ্‌, খুঁজ্‌, খুঁজলে পাবি হৃদয়মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্‌, দীপ্‌, দীপ্‌, জ্ঞানের বাতি হৃদে জ্বলবে অনুক্ষণ॥"

"Concentrate in the heart: go deep and far, as far as you can. A fire is burning in the deep quietude of the heart. It is a divinity in you—your true being."

—*Aurobindo.*

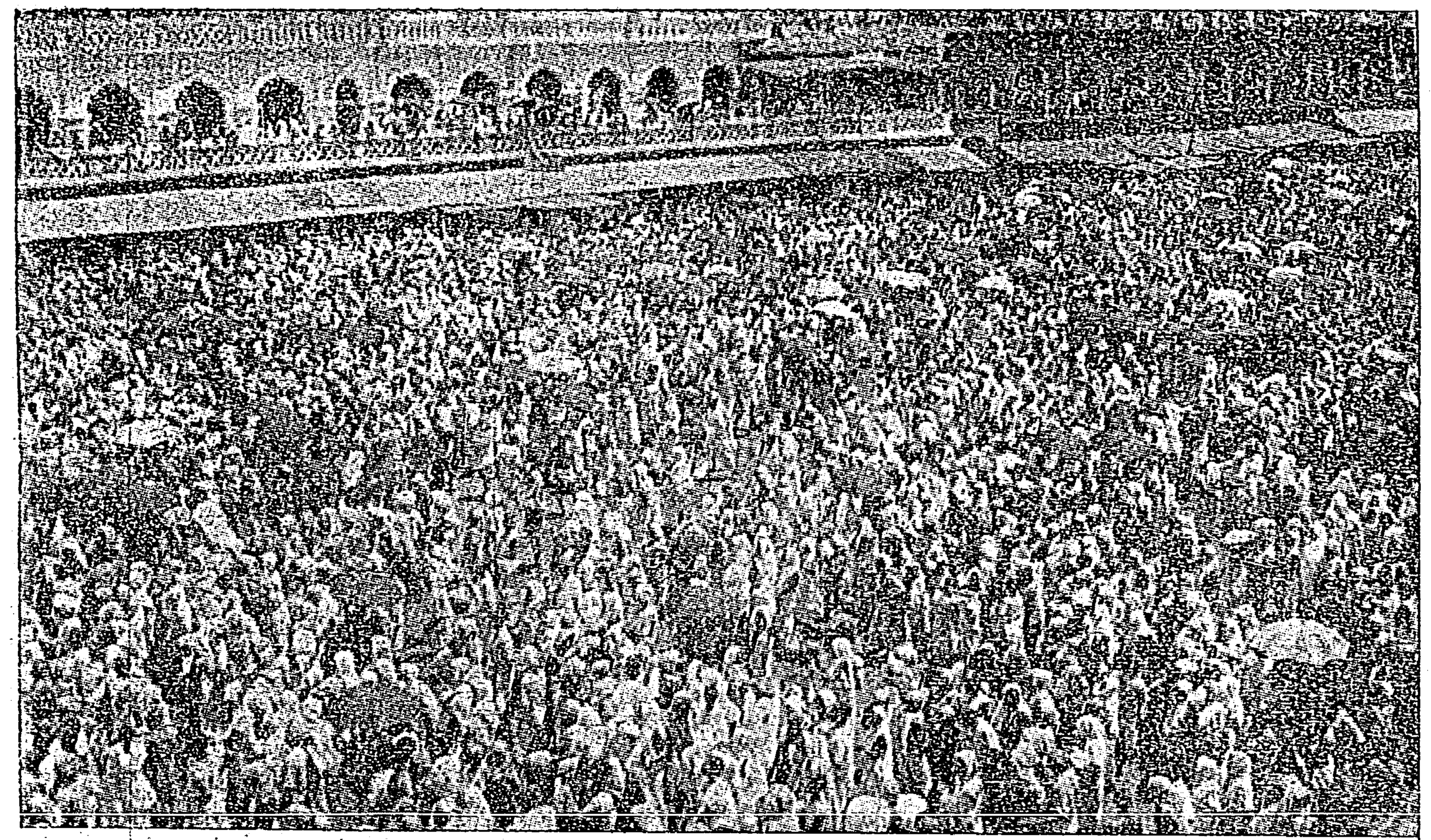

পুরীতে রথোৎসবের ভীড়

যোগীরা হৃদয়ান্তর মধ্যে নিরলম্বভাবে গভীর ধ্যান করিতে করিতে স্বতই দেখিতে পান একটি উজ্জ্বল দীপশিখা মানবের অন্তরতম প্রদেশে—হৃদয়ের অভ্যন্তরে জ্বলিতেছে; এই শিখার আলোক প্রথমে শুভ্রবর্ণে যোগীর সম্মুখে দৃষ্টিগোচর হয়; ক্রমে আরও গভীর প্রদেশে আবির্ভূত হয়—সোনালীবর্ণে; আরও গভীরতম অন্তর্প্রদেশে প্রতিভাত হয় ঘন নীলবর্ণে।

"তস্য মধ্যে বহ্নিশিখা অনীর্যোর্দ্ধা ব্যবস্থিতঃ।
নীলতয়োদ্‌ মধ্যস্থাদ্‌ বিদ্যুল্লেখেব ভাস্বরা॥
নীবারশূকবৎ তন্বী পীতা ভাস্বত্যনূপমা।
তস্য শিখায়াঃ মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ।
স ব্রহ্ম, স শিবঃ, স হরিঃ, সেন্দ্র,
সোঽক্ষরঃ পরমস্বরাট্‌।"

—নারায়ণ উপনিষদ্‌।

দার্শনিক দিক্‌ দিয়া এই মূর্ত্তিত্রয়ের ব্যাখ্যা হৃদয়ে নিহিত বহ্নিশিখার পর্য্যায়ে যেরূপ পরিকল্পিত, অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক মতে ফায়ার বা অগ্নির জোন্‌ বা মণ্ডলের তিনটি স্তরবিভাগের দ্বারাও তেমনই সমর্থিত। এই তিনটি স্তর যথাক্রমে আউটার্‌ জোন বা বহির্ভাগ, মিডল্‌ জোন বা মধ্যভাগ এবং ইনার জোন বা অন্তরতম ভাগ। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে,আউটার জোন বা বহির্ভাগের রং হোয়াইটিশ বা শুভ্রবর্ণ, মিডল্‌ জোন বা মধ্যভাগের রং ইয়লইশ বা হরিদ্রাবর্ণ, ইনার জোন বা অন্তরতম প্রদেশের রং ব্লুইশ বা নীলাভ। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক যাহা স্থূল দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছে, হিন্দুযোগী তাহাই সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে উপলব্ধি করিয়া মূর্ত্তিত্রয়ের মধ্যে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, যথা বলরাম—শুভ্রবর্ণ, শুভদ্রা—হরিদ্রাবর্ণ ও জগন্নাথ—কৃষ্ণনীল।

তৃতীয়ত, প্রাচীন শিল্পীর সর্ব্বান্তরের শিল্পসাধন সেই পরমপুরুষের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া জীবনকে সার্থক করিতেন এবং শিল্পের সাধনার মধ্যে ডুবিয়া গিয়া রূপের মধ্যে অরূপের সন্ধান রাখিতেন। সেই জন্য তাঁহাদের অন্তরতম প্রদেশের অভীষ্ট দেবতাকে তাঁহারা শুধু উপলব্ধি করিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহাকে রূপকলা দিয়া প্রকাশ করিবার ধৃষ্টতা তাঁহাদের ছিল না। যে সত্যম্‌, শিবম্‌, সুন্দরের মধ্যে ডুবিয়া গিয়া কবি, দার্শনিক, চিত্রকর, শিল্পী ও যোগী নিজের অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে—রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের অতীত পরমপুরুষের মধ্যে; যাঁহার হস্ত-পদ-চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা পঞ্চেন্দ্রিয়াদি সৃষ্টির সর্ব্বত্র আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, যাঁহার উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয় সর্ব্বদা আমাদের অন্তরাত্মার

মধ্যে জাগ্রত হইয়া রহিয়াছে, সেই অঙ্গুষ্ঠমাত্র সাক্ষীস্বরূপ পুরুষোত্তমই আমাদের আরাধ্য দেবতা। যিনি হিন্দুদের জগন্নাথ বা জগৎনাথ (the universal God), সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লইয়া তিনি প্রকাশিত! সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মধ্যে তিনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবরূপে বিরাজিত ও সত্ব, রজঃ, তম গুণের সমন্বয়ে বিকশিত—ঋক্‌ সাম যজুর্ব্বেদের ধ্বনির মধ্যে তিনি ওঙ্কাররূপে স্থাপিত; মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীর সম্মিলিত মহাশক্তিত্রয়ের ক্রিয়াশীল অদৃশ্য গতির মধ্যে তিনি উদ্ভাসিত। যিনি মহাকাল ভৈরবরূপে এই জগৎকে ধারণ করিয়া জন্ম-মৃত্যু-স্থিতির মধ্যে লালিত পালিত ও ধ্বংস করিতেছেন, যিনি ভীষণ হইতে ভীষণতর, করুণাময় ও পতিতপাবন—ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, পাপী-ধার্ম্মিক, আলোক-আঁধার, অমৃত-হলাহল—সমস্তই ধারণ করিয়া জগৎনাথ নামে এই কলিতে দারুব্রহ্মরূপে জীব-জগৎকে ত্রাণ করিবার জন্য আবির্ভূত—তাঁহার এই অপূর্ব্ব চিত্র শিল্পী ও যোগীদের অন্তর্দৃষ্টি হইতে উদ্ভাসিত। শিল্পী তাহার সৌন্দর্য্যসুষমার রূপসম্ভার ফুটাইয়া তুলিয়াছে মন্দিরের বহির্ভাগে, ভিতরে কোন খানেই রূপকের স্থান নাই, কারণ সেখানে সে অরূপের সাধনায় নিমগ্ন, যাহার কতকাংশের আভাস আউট্‌লাইন্‌ বা নক্সা মাত্র আঁকিতে পারে, পূর্ণরূপ দিতে কোন দিনই পারে না।

হিন্দু যোগীদের প্রাণবস্তু প্রাণায়াম-পদ্ধতির মধ্যেও মূর্ত্তিত্রয়ের সুসমঞ্জস ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্রাণায়াম-প্রণালী অনুসারে, ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঞ্চরণপ্রক্রিয়ায় জীবের হৃদয় অভ্যন্তরস্থ প্রাণের গতি ও ধ্বনি স্ফূর্ত্ত হইয়া থাকে। এই নাড়ীত্রয় পূরক, কুম্ভক ও রেচক গতিতে বাম, মধ্য ও দক্ষিণে ধারাবাহিকরূপে চলিয়াছে; সুতরাং শ্রীমন্দিরে অদ্ভুত দেবমূর্ত্তিত্রয়ের সংস্থাপন পরিকল্পনার মধ্যেও এই তিন নাড়ীর গতিবিভঙ্গ লীলায়িত। অধিকন্তু এই নাড়ীত্রয়ের বর্ণসংজ্ঞা যথাক্রমে, শ্বেত, স্বর্ণ ও নীলাভ। দৃশ্যত হিন্দুদের যোগসম্মত দেহের সঞ্জীবনী নাড়ীত্রয়ের গতিও এই অদ্ভুত মূর্ত্তিত্রয়ের রহস্যের মধ্যে পর্য্যবসিত। কুলকুণ্ডলিনীর তীব্র শক্তি জাগ্রতরূপে যোগীদের হৃদয় অভ্যন্তরে স্ফূরিত হইয়া থাকে—যোগী শিল্পীরা তাহারই ইঙ্গিত মন্দিরের গুহাতিগুহ্য অভ্যন্তরে স্থাপন করিয়াছেন।

হস্তপদবিহীন মূর্ত্তি নির্ম্মাণের কারণ—শিল্পীদের সুন্দর মূর্ত্তি নির্ম্মাণে অক্ষমতা নহে; ইহার প্রকৃত কারণ হিন্দুরা প্রথমে পৌত্তলিক ছিলেন না। তাঁহারা নিরাকার

পুরীর রথ— ফটো—সি, ব্রাদার্স এণ্ড কোং

পরব্রহ্মের উপাসনা করিতেন। উত্তরমীমাংসায় হস্তপদ-রহিত সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মের উপাসনা বিহিত আছে। নিরাকার উপাসনাতে শ্রদ্ধা কমিয়া আসিলে সাধকের হিতার্থে ওঙ্কারযন্ত্রানুযায়ী জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। ওঁকার নিরাকার ব্রহ্মের হস্তপদ বিহীন পূর্ণ মূর্ত্তি ও ত্রিগুণাত্মক বলিয়া জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম এই ত্রিমূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে।

পুনরায়,

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।"—গীতা

জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি ধ্যানযোগে যোগী হৃদয়মধ্যে দর্শন করিয়া ব্যক্ত করিতেছে—

"অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষঃ মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি"
—কঠোপনিষদ্।

সেই অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পরমপুরুষ হইতেছে শ্রীপুরুষোত্তমের ধ্যানস্থ ছায়াচিত্র—যাহা দর্শকের নিকট দূর হইতে দিবীব-চক্ষুরাততম্-রূপে প্রতিভাত হইতেছে। এই সম্পর্কে মন্দিরের গঠন-সংস্থাপন লক্ষ্য করিবার বিষয়—

প্রধান মন্দিরটি গম্ভীরা বা ভগবানের স্থান।
দ্বিতীয় মন্দিরটি জগমোহন বা ভক্তের স্থান।
তৃতীয় মন্দিরটি নাটমন্দির বা উপাসনার স্থান,
এবং চতুর্থ মন্দিরটি ভোগমন্দির বা নিবেদনের স্থান।

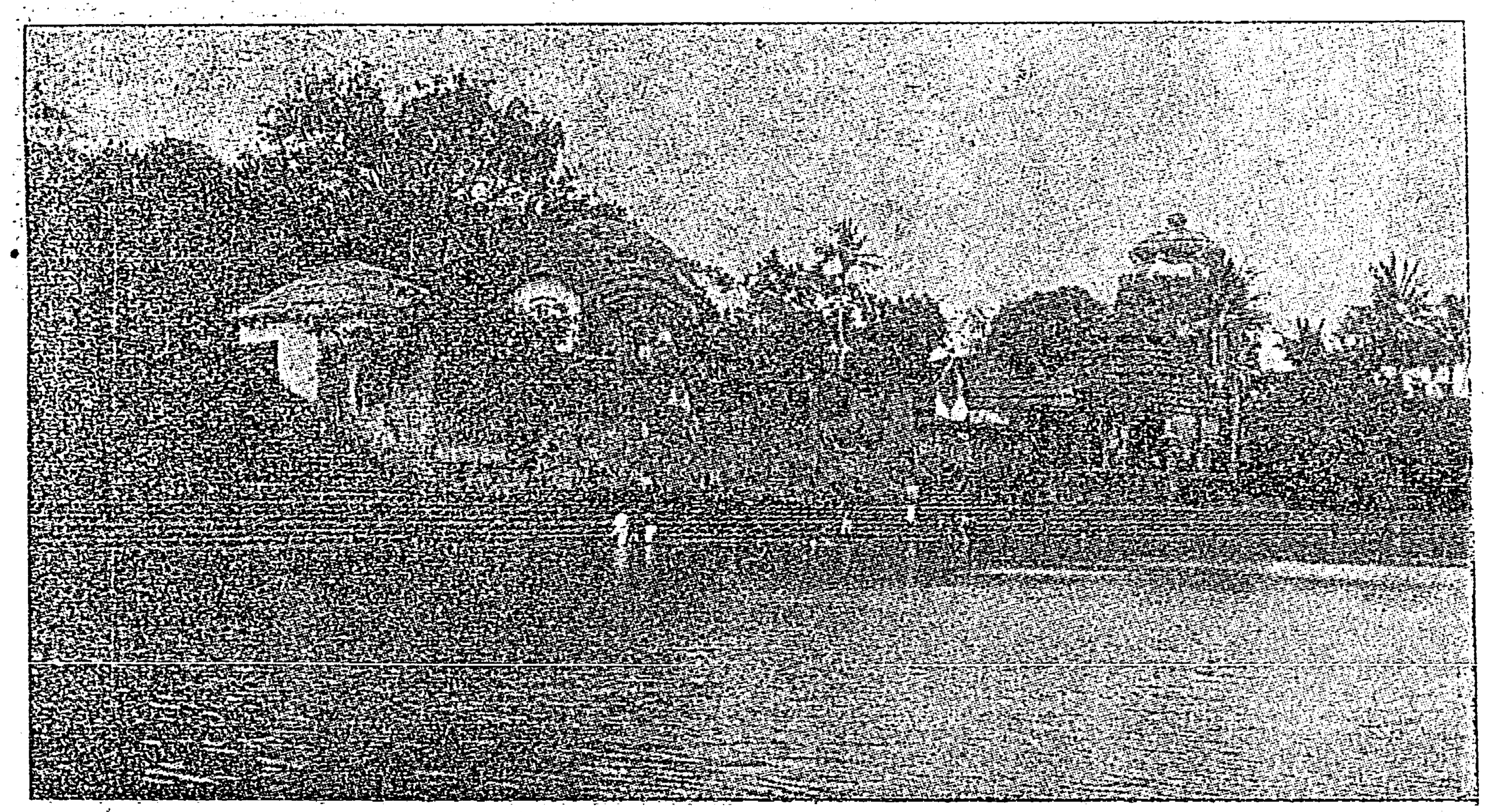

মার্কণ্ডেয় সরোবর ও মন্দির—পুরী

গম্ভীরা হইতে বিশাল চক্ষু-বিশিষ্ট দারুব্রহ্মের অঙ্গুষ্ঠমাত্র চিত্রের দ্বারা ভক্তের হৃদয়ে বিস্ময়, ভক্তি ও আনন্দের উৎস সৃজন করিতেছে। জগমোহন হইতে সেই বিশাল দারুব্রহ্ম মূর্ত্তি দেখিয়া সাধক নাটমন্দিরে তন্ময়ভাবে ধ্যানমগ্ন হইয়া সমাধিপ্রাপ্ত হইতেছে এবং সর্ব্বশেষে ভোগমন্দিরে আত্মসমর্পণ যোগে নিজেকে জগৎনাথের নিকট বিশ্বের হিতার্থে নিবেদন করিতেছে। বোধ হয় এই জন্যই শ্রীচৈতন্যদেব মহাপ্রভু গরুড় স্তম্ভের নিকট হইতে জগন্নাথ-দেবের অরূপ রূপের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া দরদর আনন্দাশ্রুপাতে ধরণী প্লাবিত করিতেন। অপর অনেক সাধক মহাপুরুষেরাও যে দূর হইতে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া আত্মহারা অবস্থায় সমাধিপ্রাপ্ত হ'ন তাহার ভূয়োভূয় ঘটনাবলী দেখা যায়।

চতুর্থত, শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ এবং পুরীধামের শ্রেষ্ঠ উৎসব বলিয়া পরিগণিত হয়; এই পুণ্যতম উৎসব দর্শনের জন্য মুক্তিকামী ও ভক্ত লক্ষ লক্ষ হিন্দু নরনারী ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে পুরীধামে আসিয়া থাকেন। পুরাণে উক্ত আছে—

যে পশ্যন্তি জগন্নাথং রথস্থং কমলেষণং।
তেষাং নাস্তি পুনর্জন্ম সংসারে সর্ব্বদুঃখদে॥
রথারূঢ়ং জগন্নাথং ভক্ত্যা পশ্যতি যো নরঃ।
ছিনত্তি ভগবাৎতস্য জৈমিনে ভববন্ধনং॥

অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীজগন্নাথদেবকে রথে অবস্থিত দেখিতে পান, এই দুঃখময় সংসারে আর তাঁহাদের জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যে মানব ভক্তি সহকারে রথারূঢ় জগন্নাথদেবকে দর্শন করে, ভগবান তাহার ভববন্ধন ছিন্ন করেন।

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি,
শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি,
মনঃ প্রগ্রহমেব চ।
—কঠোপনিষদ্।

শরীর মানিবে রথ, আত্মা রথী তার।
মন রশ্মি, সূত বুদ্ধি রথ সে চালায়॥

বিজ্ঞান সারথির্যস্ত, মনঃ প্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি—তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥
—কঠোপনিষদ্।

বিজ্ঞান সারথি যার বসি রথোপরে
অশ্ব রশ্মি মন যাঁর ধৃত সদা করে॥
শ্রীবিষ্ণুর সেই পদ লাভ হয় তার।
যার পারে ভগবতি নাহি রহে আর॥

হিন্দু দার্শনিকদের মতে—"রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে"; ইহার গভীর রহস্য ও তাৎপর্য্য এই যে, আমাদের হৃদয়-রথের অন্তরতম প্রদেশে যে বামনরূপ জগন্নাথ

মহাপ্রভু অধিষ্ঠান করিতেছেন সাধক তাহাকে দর্শন করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় এবং পুনর্জন্মের আবর্ত্তন হইতে পরিত্রাণ পায়।

রথযাত্রা উৎসব শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন হইতে মথুরাযাত্রালীলা বলিয়া বৈষ্ণব সাধকেরা অভিহিত করেন—গুপ্ত বৃন্দাবন বা রাসলীলা রাখালবেশে সাঙ্গ করিয়া তিনি ভ্রাতাভগ্নীকে সঙ্গে করিয়া কংসকে ধ্বংস করিবার জন্য মথুরাপুরী যাত্রা করিতেছেন। রাজধর্ম্ম পালন ও ধর্ম্ম-সংস্থাপনে ব্রতী আদর্শ গৃহীর এই চিত্র পুরীধামে রথ-উৎসবের মধ্যে সূচিত হইতেছে।

আষাঢ়ের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়াতে রথযাত্রা আরম্ভ হয়; ঐ দিবস শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা রথে চড়িয়া বড়দাণ্ড রাস্তা দিয়া এক মাইল দূরবর্ত্তী গুণ্ডিচা বাড়ীতে গমন করেন। এই গুণ্ডিচা বাড়ীতেই জগন্নাথদেবের প্রথম মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া কথিত আছে। গুণ্ডিচাবাড়ীতে তাঁহারা সাত দিন অবস্থান করেন এবং পুনরায় রথারোহণ করিয়া শ্রীমন্দিরে ফিরিয়া আসেন। প্রতি বৎসর নূতন রথ প্রত্যেক দেবমূর্ত্তির জন্য নির্ম্মিত হয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ—ইহা পঁয়তাল্লিশ ফুট উচ্চ এবং ইহার প্রত্যেক দিকের বিস্তার পঁয়ত্রিশ ফুট, ইহা ষোলটি চাকার উপর অবস্থিত এবং প্রত্যেক চাকার পরিধি সাত ফুট। রথোৎসব উপলক্ষে রথখানি রঙীন কাপড় ও ঝালরাদির দ্বারা পরিশোভিত হয়।

রথোৎসবের মধ্যে হিন্দুর মৌলিকত্বার তাৎপর্য্য খুঁজিতে গেলে দেখা যায় যে ইহার পরিকল্পনা অতি প্রাচীন এবং হিন্দুদের সৌর উপাসনার তত্ত্ব ইহাতে বিকশিত। (সৌর উপাসনা উড়িষ্যার অতি প্রাচীন পূজা; উড়িষ্যার সর্ব্ব-প্রাচীন সূর্য্য ও চন্দ্রমূর্ত্তি খণ্ডগিরির অনন্ত গুহায় পরিদৃষ্ট হয়। অনন্ত গুহা ২০০-২৫০ খৃঃ-পূঃ অব্দে খোদিত বলিয়া পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করেন।) রথের উপর সূর্য্যদেবের যাত্রার রূপক হিসাবে হিন্দুধর্ম্মে রথোৎসবটি একটী প্রধান উৎসব বলিয়া পরিগণিত হয়। অধিকন্তু উত্তরায়ন হইতে দক্ষিণায়ন-পথে সূর্য্যের গতি সৌরজগতের জ্যোতিষতত্ত্ব অনুসারে আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে রথোৎসবের সৃজন করিয়াছে। রথের উপর হইতে ভগবানের দিবীব-চক্ষুরাততম্ জলন্ত দৃষ্টি ভক্তের নিকট সূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর-রূপে পরিলক্ষিত হয়।

জগন্নাথাদি ত্রিমূর্ত্তির ভাবকল্পনায় বিভিন্ন ধর্ম্মধারায় বিভিন্ন রূপ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে এবং ভক্ত তাহার আপন ভাবের দ্বারা ইহাকে ধারণা করিয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্র অনুযায়ী এই ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে সুভদ্রা (মহামায়া) হইতেছেন একানংশা এবং বলরাম ও জগন্নাথদেব হইতেছেন আবরণ-দেবতা—(দ্বার দেবতাদ্বয়)।

তন্ত্রমতানুযায়ী জগন্নাথদেব দক্ষিণ-কালিকা, বলরাম ভৈরব ও সুভদ্রা—ভুবনেশ্বরী। দক্ষিণকালিকার রূপ কালীঘাটের কালীমূর্ত্তির সহিত মিলিয়া যায়, ভৈরবের বর্ণ

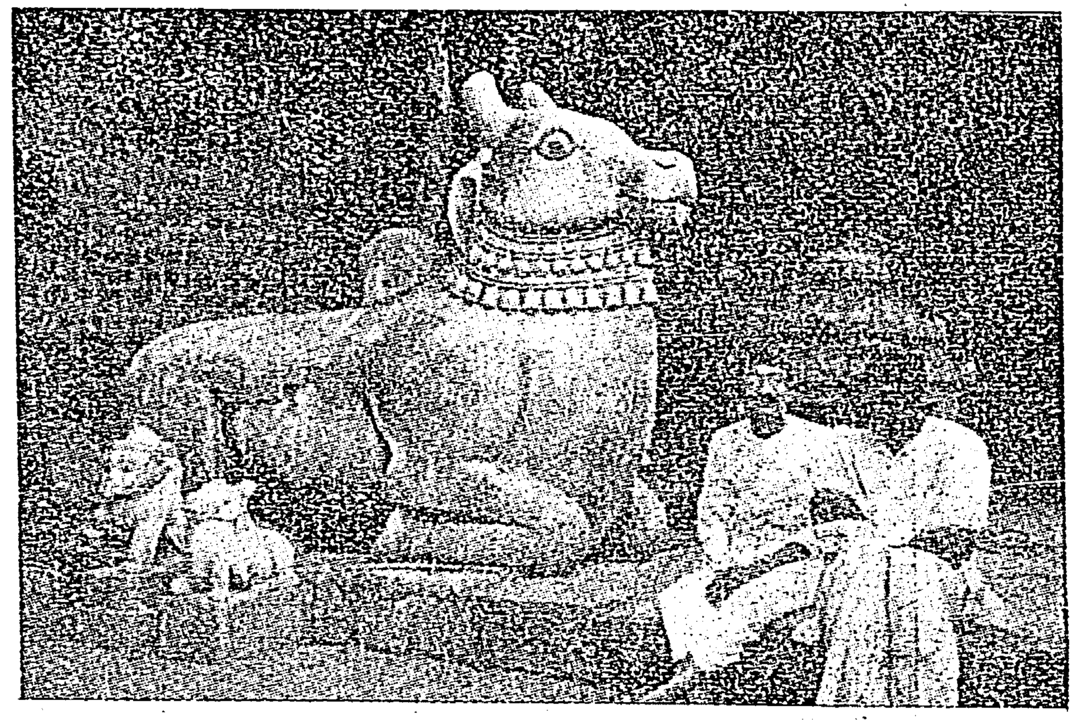

কপালমোচন শিবমন্দিরের বৃহৎ বৃষভ বাহন—পুরী

শুভ্র এবং ভুবনেশ্বরী হরিদ্রাবর্ণা। দ্বৈতবাদী বেদান্ত অনুসারে—

জগন্নাথ— পরমাত্মা বা পরমপুরুষ
সুভদ্রা— প্রকৃতি
বলরাম— শুদ্ধজীব

শঙ্করাচার্য্য মত অনুযায়ী—

জগন্নাথাদি ওঙ্কাররূপক, অ, উ, ম্ এই তিন অংশে বিভক্ত।

বলরাম— অ
সুভদ্রা— উ
জগন্নাথ— ম্

রামানুজ সম্প্রদায় অনুযায়ী—

অনন্তং শেষ দেবাখ্যং।
সুভদ্রা লক্ষ্মী সংজ্ঞকম্।
বাসুদেব জগন্নাথং।
চতুর্দ্ধা মূর্ত্তয়ে নমঃ

অর্থাৎ এই ত্রিরত্ন শেষনাগের কোলে লক্ষ্মীনারায়ণরূপে উদ্ভাসিত ও সুদর্শন চক্র ইহাদের রক্ষী।

উড়ম্ব তন্ত্রশাস্ত্র অনুযায়ী—

জগন্নাথ— মহাকালী।
সুভদ্রা— মহালক্ষ্মী।
বলরাম— মহাসরস্বতী।

এই ত্রিমহাশক্তির বর্ণ যথাক্রমে কৃষ্ণ, কাঞ্চন ও শুভ্র;

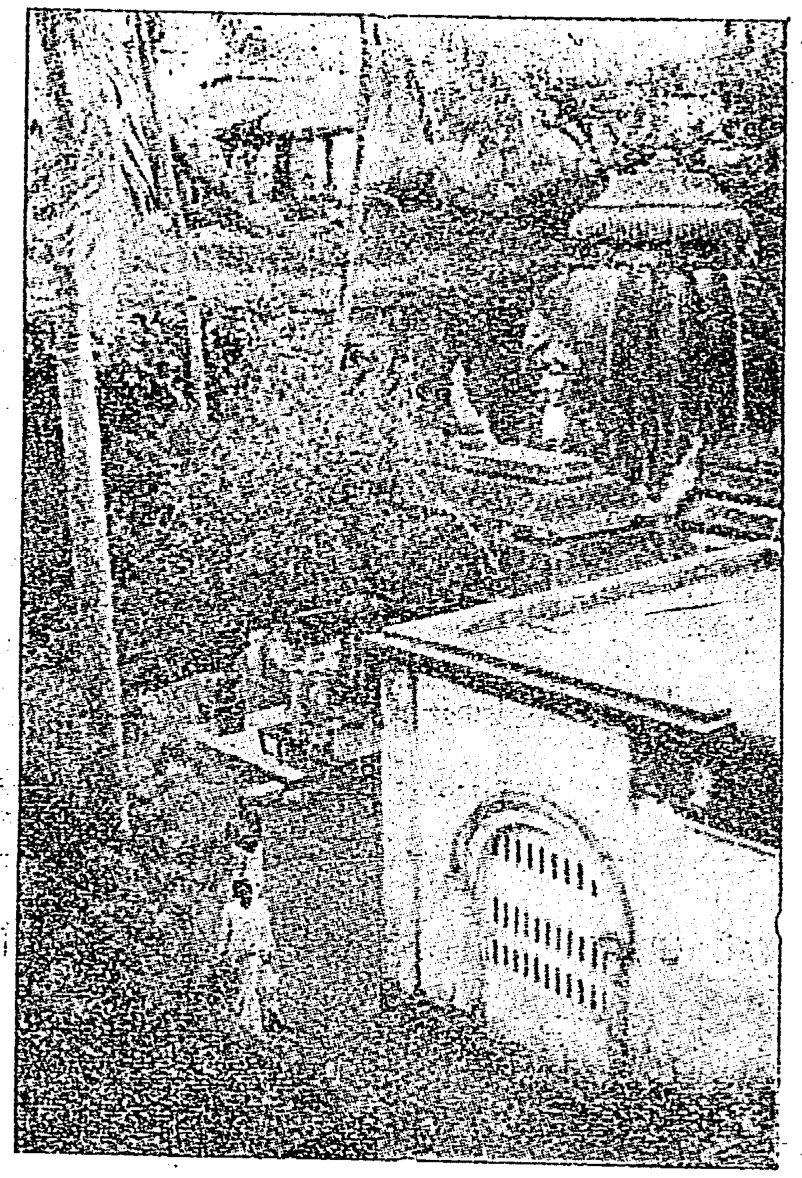

নিম্নস্তরে কপালমোচন শিবমন্দির—পুরী

সুতরাং মূর্ত্তিত্রয়ের রূপকল্পনার সহিত এই বর্ণত্রয়ও আশ্চর্য্যরূপে মিলিয়া যায়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত সাধনপন্থানুযায়ী 'দিব্য-লীলা প্রসঙ্গে, শ্রীকৃষ্ণের বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য (আদি, মধ্য ও অন্ত) লীলা কলিকালে গুপ্তভাবে এই নীলাচলে প্রকটিত হইতেছে; এই ভাবের লীলা রসিকজনই কেবল জগন্নাথের মধ্যে আস্বাদন করিয়া ধন্য হইতেছে। বাল্যে—ভ্রাতাভগ্নীর মধুময় স্নেহ-প্রীতি ভাব; যৌবনে—বৃন্দাবনধামে রাধাকৃষ্ণের রসময় প্রেমের ভাব; বার্দ্ধক্যে—সারথিবেশে রথের উপর মধুর সখ্যভাব এবং শোকতাপ ব্যাধিমরণগ্রস্ত মানবের কল্যাণার্থ গীতার অমৃতময় বাণীর ঝঙ্কার।

যে পুরুষোত্তম এই মহাতীর্থে দারুব্রহ্মরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন, তিনি ত্রিসংখ্যক নিম্ববৃক্ষ মাত্র এবং ইনি সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের উজ্জ্বল ত্রিরত্ন—সমস্ত হিন্দুধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিয়া বিরাজিত রহিয়াছেন এই ত্রিমূর্ত্তি—অনার্য্য, শবর, আর্য্য সভ্যতার স্তরে স্তরে বিকশিত বৈদিক, তান্ত্রিক, বৌদ্ধ, জৈন, গাণপত্য, সৌর, শৈব, বৈষ্ণব সমস্ত ধর্ম্মের ও নানা সম্প্রদায়ের নানারূপ অলঙ্কারে সুসজ্জিত রহিয়াছেন। আমাদের এই পুরুষোত্তমের একধারে বিশাল বারিরাশির মধ্যে অনন্ত জ্ঞানের তরঙ্গনিচয়, অন্য দিকে আকাশভেদী উচ্চ মন্দিরের শৃঙ্গে ভক্তি ও বিশ্বাসের উড্ডীয়মান ধ্বজা, আর মধ্যে নীলাচলের সমতলক্ষেত্রে আসিয়া মিশিয়াছে পঞ্চভূত এক বিশাল অন্তহীন অবস্থায়। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্ সমস্তই মহানের আকারে এখানে বিরাজমান—বায়ুব্রহ্মের সীমা নাই, শব্দব্রহ্মের সীমা নাই, বালিব্রহ্মের সীমা নাই, তেজোময় সৌরকরের সীমা নাই—সমস্তই অসীম, সমস্তই মহান—আর এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বিরাজিত ঐ বৃহৎ দারুব্রহ্ম ও অন্নব্রহ্ম—একটি অব্যক্ত, অন্যটি ব্যক্ত—একটি পুরুষ, অন্যটি প্রকৃতি—একটি সাক্ষি-স্বরূপ, অন্যটি প্রাণস্বরূপ—একটি জ্ঞান, অন্যটি ভক্তি, একটি পটেনশিয়াল্ বা বৃক্ষ শক্তি, অন্যটী কিনেটিক্ বা বীজশক্তি!

শিশু-চৈতন্য ও ফ্রয়েড

শ্রীজনরঞ্জন রায়

মনীষী সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের চিন্তাধারা মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ নামে খ্যাত হইয়াছে। তাঁহার দরদী অন্তর্দৃষ্টি দিয়া তিনি শিশুদের অপরিপুষ্ট চৈতন্য আঘাত-ব্যাঘাতে কিরূপ ক্ষুণ্ণ হয় তাহা দেখিয়াছেন এবং তাহা পুনস্ফুরণের উপায় কি তাহারও নির্দ্দেশ দিয়াছেন। আজ সামান্যভাবে তাহাই আমাদের আলোচনার বিষয়। শৈশব হইতে কৈশোর আমাদের আলোচ্য কাল।

তিনি এই মগ্নচেতনার আধারের একটি কল্পিত ছবি দিয়া তাহার ক্রিয়ার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যেন আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে দুইটি ঘর আছে। ছোট ঘরে রাজপাট, সেখানে আছেন রাজা। আর অত বড় ঘরে রাজদর্শনপ্রার্থীর দল ভিড় করিতেছে। সিংহাসনে জ্ঞানরাজ বিরাজ করিতেছেন। দর্শনপ্রার্থীরা সব কুপোষ্য অজ্ঞান। তাহারা রাজার কাছে আবেদন-নিবেদন লইয়া দরবার করিতে যাইতে চায়। কিন্তু রাজদ্বারে যে পাহারা আছে সে প্রত্যেকের আবেদন পরীক্ষা করিতেছে। যাহার আবেদন নামঞ্জুর করিতেছে সে রাজ-সন্দর্শন পাইতেছে না। এইরূপে অনেকেই জ্ঞানসান্নিধ্য লাভে বঞ্চিত হইতেছে। তবে ফাঁকি দিয়াও কেহ কেহ প্রবেশ করিতেছে। কারণ, এই সব মায়াবীরা ছদ্মবেশ গ্রহণে পটু। আবার প্রহরীকে নিদ্রিত বা সজাগ নহে দেখিলে তাহারা রাজপাটে গিয়া তাণ্ডব সুরু করিতেছে। যাহাদের দরখাস্ত বাতিল হয় তাহারা দল বাঁধে, বিদ্রোহ করিতেও ছাড়ে না।

এই রূপকটি ভাঙিলে আমরা কি পাই? আমরা পাই যে আমাদের মনোরাজ্যে অনেক রকম চিন্তা, স্বপ্ন, আকাঙ্খা প্রকাশ পায়। কিন্তু সবগুলি জ্ঞানপুষ্ট নয়। অজ্ঞানপ্রসূ যাহা কিছু তাহা দেহমনকে বিকারগ্রস্ত করে।

জ্ঞানবাদী হিন্দুর নিকট এই রূপকটি জ্ঞান-বিবেকের সহিত রিপুগণের দ্বন্দ্বের একটা কাহিনী। সে দ্বন্দ্ব চিরদিন চলিতেছে। সেখানেও বিবেক দ্বারী আর রাজা জ্ঞান। বিবেকের তাড়নায় রিপুগণ সন্ত্রস্ত। তবুও রিপুগণ বিদ্রোহ করে।

এতদিন পর্য্যন্ত এই বিদ্রোহীদের সেই এক অমোঘ দাওয়াই দেওয়া হইতেছিল অর্থাৎ প্রহার করা হইত। মূর্চ্ছিত শিশুকেও প্রহার করা হইত অথবা কটু ধুম বা নিশাদলের তীব্র গন্ধে তাহার সম্বিৎ ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা হইত। কিন্তু দেখা গেল, এই সব হিংস্র উপায়ে রোগের বীজ নষ্ট হয় না। আবার সে চুরি করে, মিথ্যা কথা বলে, আবার তার মূর্চ্ছা হয়। মানুষের দৃষ্টি তখন অন্য দিকে ফিরিল। সে অহিংস উপায় অনুসন্ধান করিল। কৃত্রিম প্রণালীতে রোগীকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করিয়া তাহার রোগের কথা জানিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। অবৈজ্ঞানিক রোজা সরিষা-পড়া দিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন রোগীর কাছে ভূতের খোঁজ লইতে লাগিল। বৈজ্ঞানিক ডাক্তার 'পাস্' দিয়া হিপ্নোটাইজ-করা রোগীর নিকট তাহার হিষ্টিরিয়ার কারণ জানিতে লাগিলেন। ফ্রয়েড এইভাবে হিপ্নোটাইজ না করিয়া অব্যাহত সংস্থিতি প্রথার প্রবর্ত্তন করেন।

কৈশোরেই ভগবানের বৃন্দাবন-লীলা হইয়াছিল ইহা যে চির-সত্য। সেই গোপীকুল-মন-ব্যাকুলকারী মুরলীধর ফ্রয়েডকেও দর্শন দিয়াছিলেন নবকিশোররূপে। কৈশোরে যৌনরস স্ফুরণের সঙ্গে শিশুদেহে নব-সৃষ্টির সূচনা হয়। ফ্রয়েড-বিজ্ঞানের ইহা একটা বিশিষ্ট অংশ। আমরা এই গঠনকালকে তিনভাগে বিভক্ত করিতে পারি। প্রথম প্রীতি প্রণয় অনুভূতির কাল। দ্বিতীয় অবস্থায় সে আপন দেহের বিকর্ষণে মোহিত হয়। সে তখন দেহকে সাজায়। তাহার আত্মগৌরব ও আত্মপ্রতীতি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বন্ধু হয় তখন সমলৈঙ্গিকগণ। বালকেরা বালিকাদের ছায়া এড়াইয়া চলে, বালিকারাও বালকদের দৃষ্টির আড়ালে থাকিতে চায়। তৃতীয় অবস্থায় ভিন্নলৈঙ্গিকদের মধ্যে আকর্ষণ প্রবল হয়। তখন বালকবালিকাদের মধ্যে একটা উচ্ছ্বাসময় প্রণয় দেখা দেয়। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নিকটেও তখন বালকবালিকারা স্নেহের দাবী লইয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু এই প্রবন্ধে এ সব কথা অতি বিস্তার করিয়া বলা চলিবে না। তথাপি প্রসঙ্গত দুইটা কথা বলিয়া ফেলিলাম। ইহা ফ্রয়েড সাহিত্যের মাদকতা।

এখন আমরা কয়েকটি প্রধান প্রধান অবস্থার কথা আলোচনা করিতেছি:

স্বপ্ন—বিবেক দ্বারী ঘুমাইয়াছে। তাই ভূতের নৃত্য আরম্ভ হইয়াছে। জ্ঞান ইহাদের বাগ মানাইয়া রাখিতে পারিতেছেন না—অবস্থা এই প্রকার। এ বিষয়ে ফ্রয়েড-পন্থীদের অ-পূর্ব্ব অনুশীলনের আলোচনা করিবার লোভ ত্যাগ করিতে হইল। আমরা শুধু শিশুর ঘুমন্ত অবস্থায় ভয় পাওয়ার বিষয় লইয়া আরম্ভ করিতেছি। ইহা একটা রুদ্ধ ভয়ের প্রতিক্রিয়া। প্রহার, তিরস্কার বা ভূতের গল্প শুনিয়া শিশুর মনে যে দারুণ ভয় সঞ্চিত থাকে স্বপ্নাবস্থায় তাহা উহাকে অভিভূত করিয়া প্রবলভাবে অভিব্যক্ত হয়।

কখনও শিশু স্বপ্নে 'পড়িয়া গেলাম' বলিয়া চীৎকার করে। তাহার কারণ খুঁজিলে দেখা যায়, সে কোনও গুরুজনকে অসম্মান করিয়াছিল তজ্জন্য অনুশোচনা আসিয়াছে।

স্বপ্নাবেশ শিশু ঘুমের ঘোরে বেড়ায়, অঘটন ঘটায়। ইহা স্নায়ুবিকার। অসহ দুঃখ শোক বা অপমানে স্নায়ু দুর্ব্বল হইলে এরূপ অবস্থা হয়। সজ্ঞানে থাকা কালে আঘাতপ্রাপ্ত যে সকল স্নায়ু নিষ্ক্রিয়-প্রায় ছিল গার্ড

সাহেবের ঘুমের সুযোগে তাহারা প্রতিশোধ নিতে চাহিল। ইঞ্জিনের হাতল ধরিয়া দিল তাহারা টানিয়া, চলিল গাড়ি। তা সে যেখানে গিয়া ধাক্কা খাইয়া চূর্ণ হউক না কেন।

সুতরাং শিশু কবে কোন্ আঘাত পাইয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। পরে স্নেহ-সদয় ব্যবহারে তাহার অন্তরের সেই ব্যথা দূরীভূত করিতে হইবে। ইহাই প্রতিকার। আর তাহা করিতে হইবে অভিভাবক ও শিশুর শিক্ষককে।

'দিবা-স্বপ্ন',—এইরূপ স্বপ্নবিলাসী যুবকেরাই হয় বেশী। কোন কোন শিশুরও যে না থাকে তা নয়। কাহারও অবস্থা হঠাৎ মলিন হইলে সে পূর্ব্ব অবস্থা স্মরণ করিয়া এরূপ করিতেছে ভাবিতে হইবে। সে অনুচিত দুরাশা করে সেই পূর্ব্ব অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে। বড়াই করিয়া অনেক মিথ্যা কথা বলে।

এই অবস্থায় শিক্ষক ও অভিভাবক তাহাকে পরিশ্রম করিতে উৎসাহিত করিবেন। ভবিষ্যৎ জীবনে সে স্বীয় চেষ্টায় আবার দশজনের একজন হইয়া উঠিবে এইরূপ আশা দিবেন। তাহাকে আলস্যবিমুখ করা ফলপ্রসূ হইয়া থাকে।

দুরাচার—কৈশোরেই ইহা অধিক হয়। এই উচ্ছৃঙ্খলতা তাহার রক্তে সঞ্চিত পাপের বীজাণুসকলের প্রকটলীলা—এরূপ মনে করা সঙ্গত হইবে না। তাহা দেহের কোন নিয়মিত ব্যবহার ত্রুটির পরিণাম ফল। যৌন-পিপাসার জন্য ইহা ঘটে। তাহার আত্ম-সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া না পড়ে অভিভাবককে তাহা দেখিতে হইবে।

মিথ্যা কথা—যে শিশু অধিক মিথ্যা কথা বলে মনে করিতে হইবে তাহার অলীক কল্পনার বাহুল্য ইহার কারণ। তাহার মন অসুস্থ না থাকিলে সে এইরূপ বলিত না। নাটকীয় মিথ্যা ও তাজা মিথ্যা কথা সে তখনই বলে যখন সে তাহার আত্ম-অহঙ্কারে দারুণ আঘাত পায়। কোথায় সে আঘাত পাইল তাহা খুঁজিয়া দেখিয়া প্রতিকার করিতে হইবে। অনেক সময়ে সে নিজে তাহার মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করে এবং কল্পিত রাজ্যে বিচরণ করিতে গিয়া একটা মিথ্যার পরিপোষক বহু মিথ্যা কথা বলে। তাহার ভ্রম ঘুচাইবার ভার অভিভাবক ও শিক্ষকের।

চুরি—না বুঝিয়া এ কাজ কেহ করে না। কিন্তু ইহাও ভুল বুঝা। ইহা ঠিক 'দুধের তৃষ্ণা ঘোলে মিটান।' যাহা সে পাইতে পারে না তাহার পরিবর্ত্তে আর কিছু পাইয়া ভুলিয়া থাকার মত। যৌনপ্রবৃত্তির অতৃপ্তি সে পরের একটা কিছু গ্রহণ করিয়া সাময়িক তৃপ্তি পায়। এই ধরণের ছেলেরা পরে গুণ্ডার দল গড়ে। বিদ্যালয়ে ভাল ছাত্র-সমিতি থাকিলে ইহারা সুনিয়ন্ত্রিত হইতে পারে।

অতি-বিজ্ঞতা—কামপ্রবৃত্তিকে দমন করিয়া রাখিতে গিয়া এই অবস্থা দাঁড়ায়—ইহাই ফ্রয়েড-তত্ত্ব। এ ক্ষেত্রে অভিভাবককে তাঁহার দায়িত্ব চিন্তা করিতে হইবে।

অতি-শুচিতা—মনের গুপ্ত পাপকে ঢাকিতে গিয়া এরূপ হয়। তাহার অন্তর হইতে ইহা করায়। বারে বারে সে হাত-পা ধোয়, কখন কি মাড়াইবে ভাবিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া চলে। তাহার মনে কোন্ পাপের স্মৃতি আঘাত করিতেছে অভিভাবককে অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতিবিধান করিতে হইবে। নতুবা তাহার অশৌচাতঙ্ক যাইবে না।

অতি-উৎসাহ—জটিল ন্যূনতার অভিমানে ইহা হয়। সে নিজের 'ওজন' অপরের কাছে বাড়াইতে গিয়া এরূপ আচরণ করে। যে খেলার প্রতিযোগিতায় সে কখনই জিতিতে পারিবে না, যে পড়া সে আধঘণ্টায় কখন মুখস্ত করিতে পারিবে না তাহার জন্য প্রাণপাত করিয়া লাগিয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষক ও অভিভাবক শিশুকে নিবৃত্ত করিবেন। সে যতটা ভারবহনে সক্ষম তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবার জন্য তাহাকে প্রেরণা দিতে হইবে।

অতি-বিষন্ন ও খিটখিটে—স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া আসিলে ছেলেরা অতি-বিষন্ন হইয়া পড়ে।

নিজের অবস্থায় অসন্তুষ্ট ছাত্রেরা প্রায়ই খিটখিটে হয়।

এরূপ উভয় অবস্থায় শিক্ষক ও অভিভাবককে মমতাপূর্ণ ব্যবহার দ্বারা শিশুর মনে শান্তি আনিতে হইবে।

অতি-ভয়—কোন কাজের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফল। যেমন ঐ ছুরিটি দিয়া শিশুটি পেন্সিল বাড়ে না। তাহা দেখিলে মনে করিতে হইবে সে কোন দিন ঐ ছুরিতে পেন্সিল বাড়িতে গিয়া হাত কাটিয়াছিল। ছেলে ঐ বিড়ালটা দেখিলেই পালায়, ঘরের গাড়িতে চড়িতেও কাঁদিয়া ওঠে। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে বিড়ালটা তাহাকে কবে কামড়াইয়াছিল, অথবা গাড়ি হইতে কবে সে পড়িয়া গিয়াছিল—ইত্যাদি। অভিভাবকের কর্ত্তব্য ছেলের প্রতি জোর না দেখাইয়া তাহাকে ভালভাবে বিশ্বাস করাইয়া দেওয়া যে, সে সাবধান হইয়া পেন্সিল বাড়িলে হাত কাটে না, গাড়ি হইতে ঝুঁকিতে গিয়াই সে পড়িয়া গিয়াছিল, বিড়ালের লেজ ধরিয়া না টানিলে সে কামড়াইত না—ইত্যাদি। এই ভাবের অতি-ভয় ধরা পড়িবামাত্র তাহার ভয় ঘুচাইবার চেষ্টা করা উচিত।

ছেলেদের বাড়ী-পালান দোষের গোড়াতেও এই অতি-ভয় থাকে। অভিভাবক কবে তাহাকে নির্ম্মমভাবে মার ধর করিয়াছিলেন, তাই অভিভাবক বাড়ী আসিবার সময়ে সে বাড়ী ছাড়িয়া পালায়। অভিভাবক ইহাকে আদরযত্ন দ্বারা ভয় ভাঙ্গিয়া দিবেন।

তোতলামির কারণও অতি-ভয়। পিতার তাড়া খাইয়া ভয়ে সে কবে ভাল করিয়া কথা উচ্চারণ করিতে পারে নাই। সেই হইতে সে তোতলা হইয়া গিয়াছে। প্রতিকার—অভিভাবকের আদরযত্ন।

বেঁয়ো। ছেলে ডান হাতের কাজ বাঁ হাতে করিতেছে। ইহা দেখিলে মনে করিতে হইবে পিতার প্রতি শিশুর দারুণ অভিমানের অভিব্যক্তি।

যৌবন আসিবার সঙ্গে তোতলামি ও বেঁয়ো স্বভাব প্রায়ই চলিয়া যায়।

পল্লবগ্রাহীর ন্যায় আমরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনস্তত্ত্বদর্শীর নির্ণীত বিষয়ের আলোচনা সমাপ্ত করিতেছি। চিন্তানায়ক ফ্রয়েডের অবদান নব সৃষ্টির ন্যায় গণ্য হইবে। আমরা ফ্রয়েড-আলোকপাতে দেখাইবার চেষ্টা করিলাম যে, শুধু ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারাই শিশু-মনে বৈলক্ষণ্য দেখা দেয়। সকল ক্ষেত্রেই প্রতিকার অভিভাবক ও শিক্ষকদের হাতে। কারণ, অনেক সময়ে তাঁহাদেরই অসম ব্যবহারে শিশু-মনকে আহত করে। শৈশব-উদ্যানে তাঁহারাই মালী। বাগানের মালী অতি ক্ষুদ্র গাছটিকেও মরমী জনকের ন্যায় প্রাণ ঢালিয়া যত্ন করে। অভিভাবক ও শিক্ষককেও তেমনি শিশুদেহের ১০৭-টি মর্ম্মের প্রতি সমভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ, অপরিণতজ্ঞান শিশু তাহার মর্ম্মব্যথা প্রকাশে অক্ষম। অভিভাবক মর্ম্মগ্রাহী হইবেন, কিন্তু তাঁহাকে মর্ম্মকাতর হইলে চলিবে না। কারণ অতিস্নেহে অনেক ছেলে ঘরবোলা ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। আবার কৈশোরের চঞ্চলতাকে ক্ষমাশীল চক্ষে দেখিতে হইবে। তখন রূপরসগন্ধের যে প্রবাহ হঠাৎ আসিয়া পড়ে তাহাতে সে আত্মবিহ্বল হয়। তাহাকে সে সময় উচ্ছৃঙ্খল বলা চলে না। যে উচ্ছৃঙ্খল তাহার মস্তিষ্কবিকার থাকে। কিন্তু কৈশোরের ব্যাকুলতা স্বাভাবিক।

বিপিন ডাক্তার

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত এম-এ

নিতান্ত আকস্মিকভাবেই চাকরীটা জুটে গেল। দুই দিন ভরে আত্মীয়-অনাত্মীয় শুভানুধ্যায়ীদের শুভ-সংবাদটা দিয়ে বেড়ালাম এবং সেই প্রসঙ্গে বিপিন ডাক্তারের বাড়ীতেও এক দিন হাজির হলাম।

বিপিন ডাক্তার অমায়িক লোক। বয়স ষাটের কাছাকাছি।

সারাজীবন সাবজজগিরির হাড়ভাঙা খাটুনির পর অবসর গ্রহণ করেছেন। হাঁ, তবু এ শহরে সবাই তাঁকে বিপিন ডাক্তার বলেই চেনে ও ডাকে। জীবনভরে মামলার রায় লিখে আঙুল পাকিয়েছেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে হোমিওপ্যাথির ফাইল নেড়ে হাতও পাকিয়েছেন বেশ। পাড়ায় ও বাইরে ডাক্তার-হিসাবে বিপিন রায়ের প্রসিদ্ধি জজিয়তীর চেয়ে কম নয়, বরং বেশী।

বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে বিপিন ডাক্তার একখানা বই পড়ছিলেন। আমার সাড়া পেয়েই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন: হেল্‌লো ব্রাদার, এসো—এসো।

প্রায় উঠে তিনি আমায় বসতে বললেন। 'থাক্-থাক্' বলতে বলতে আমি পাশের চেয়ারখানা টেনে নিলাম।

স্মিতহাস্যে বিপিন ডাক্তার শুধালেন: তারপর, খবর কি বাবুজী?

বিনয়ে বিগলিত হয়ে বললাম: আজ্ঞে, একটা সুখবর নিয়েই এসেছি।

আত্মপ্রসাদের হাসি ঠোঁটে মেখে বললেন: তাই বলো। আমার দেওয়া পাল্‌সিটিলায় কখনো ফল না হয়ে পারে! তোমার বাবা তো সেদিন তাচ্ছিল্য করে ওষুধ নিতেই চায় না। এখন দেখলে তো ব্রাদার। তা-কেমন আছে তোমার বোন?

ছোট বোন মিনুর অসুখের কথা শুনে বিপিন ডাক্তার ব্যবস্থা দিলেন পাল্‌সিটিলা। বাবা য়্যালোপ্যাথির পরম ভক্ত। ওষুধ নিতে নারাজ। বিপিন ডাক্তারও নাছোড়বান্দা। অগত্যা ওষুধ বাবাকে আনতেই হল। কিন্তু মিনুর মুখে তা ওঠে নাই। তার জন্য য়্যালোপ্যাথিরই ব্যবস্থা হয়েছিল।

কিন্তু এ ইতিহাস আমি আপনাদের জানিয়ে রাখলাম নেপথ্যে। দেখবেন, বিপিন ডাক্তারের কানে যেন এ কথা না যায়। এদিকে বিপিন ডাক্তারের কথার ঢেউয়ে আমার আসল বক্তব্যের নৌকা যে বানচাল হবার জোগাড়। তাকে আগে সামলাই।

কোনমতে বললাম: আজ্ঞে, মিনু এখন বেশ ভাল আছে। কিন্তু, আমি বলছিলাম অন্য কথা।

বিপিন ডাক্তার হতাশভাবে বললেন: কি কথা আবার?

: আজ্ঞে, নতুন চাকরী হয়েছে আমার।

: কংগ্রাচুলেসন্‌স্ মাইডিয়ার ব্রাদার: বিপিন ডাক্তার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। হাতের বই ছুঁড়ে ফেলে আমার দিকে হাতবাড়িয়ে দিলেন। জজিয়তি কায়দায় কয়েকটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন: আরে, এতক্ষণে বলতে হয় সে কথা। তারপর কি খবর, হঠাৎ কোথায় হ'ল চাকরী? কত মাইনে? বল—বল।

আমার মনে তখন উত্তরে হাওয়া বইছে। কথা ঝাপসা হয়ে আসছে সেই বাতাসের দৌরাত্ম্যে। কোন মতে কেটে কেটে দিলাম চাকরীর বিবরণ। আকস্মিক প্রাপ্তি, চাকুরীর স্থায়িত্ব, মাইনের গুরুত্ব, পদমর্যাদার উচ্চতা—কাঁপা গলায় একে একে বললাম সবই। বিপিন ডাক্তার আনন্দের অতিশয়তায় হাতপা ছুঁড়তে লাগলেন।

ধাপে ধাপে ক্রমে আলাপের তীব্রতা নীচে নেমে এল।

বিপিন ডাক্তার পিঠ চাপড়ে বললেন: চিয়ারিও মাই বয়, উইস্ ইউ অল সাক্‌সেস্। কিন্তু বাবুজী, চেহারাটা তোমার বড্ড কাহিল, এইবারে ওটাকে বাগাতে হবে কিন্তু।

রামধনুর দেশ হতে এক নিমেষে যেন সাহারা মরুভূমিতে পপাত হলাম। নিজের শারীরিক স্বাস্থ্যহীনতা

সম্পর্কে একটা লজ্জাকর হীনতাবোধ-সংস্কারের যাতনা আমার ছিল। তাড়াতাড়ি দোষ ঢাকবার চেষ্টায় বললাম: এবার নিশ্চয় চেষ্টা করব। আপনি তো সব জানেন ডাক্তারবাবু। কি হাড়ভাঙা খাটনী এতদিন খেটেছি। স্কুলের মাস্টারী আর ট্যুইশনী ক'রে এতবড় একটা সংসার চালিয়ে আসছি দিনের পর দিন। না আছে উপযুক্ত আহার, না আছে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম। এতে কি কারো শরীর টিকতে পারে। আপনিই বলুন ডাক্তারবাবু?

আমার কাতর আহ্বানে বিপিন ডাক্তারের মনে সত্যি আঘাত লাগল। সহানুভূতিভরা নরম গলায় তিনি বললেন: তা কি আর আমি জানি না নারাণ, সবি জানি ভাই, সবই জানি। শশীনাথের ভাগ্য ভাল, তাই তোমার মত ছেলে পেয়েছে।

বিপিন ডাক্তার অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে পড়লেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তাই বলে নিজের শরীরকে তো কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। পরে বড় অনুতাপ হয়। এই তো আমাকেই দেখ না। প্রথম জীবনে কষ্ট আমিও বড় কম পাই নি। কলেজে যখন পড়তাম, বিকেলে টিফিন ছিল দুপয়সার রুটি, নয় তো চিড়ে। তাও সবদিন জুটতো না। খালি পেটে ইডেন গার্ডেনের রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে এক পয়সার চিনেবাদাম খেতে কত ইচ্ছে হয়েছে, পারি নাই। তারপর অনেক টাকা রোজগার করেছি। আজ চারদিক থেকে টাকা আসছে। খাবারের আজ অভাব নেই। কিন্তু যে খাবে সে আজ মরেছে। বুড়ো পেট বলে—এটা খেও না, বেতো শরীর বলে—ওটা খেও না।

বিপিন ডাক্তারের এ রূপ কোন দিন দেখি নাই। সদাহাস্যময় সদালাপী বৃদ্ধ। ছেলেবুড়ো সকলের তিনি এক বয়েসী। তাই স্তম্ভিত হলাম। নির্বাক বিস্ময়ে মুখ তুলে চাইলাম। অনাগত জীবনের বেদনা তাঁর মুখের রেখায় রেখায় ঝরে পড়ছে। করুণ!

আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনেকটা সামলে নিয়ে বিপিন ডাক্তার বললেন: তাই বলছি ব্রাদার, নিজের প্রতি অবিচার করো না। এইবারে ভাল চাকরী-বাকরী হ'ল। নিজেও ভোগ কর, দশজনের ভোগেও লাগাও। নইলে নিজেকে উজাড় ক'রে দিয়ে যতই ঢালো, সংসার-কুমীরের এ বিরাট হাঁ তুমি কোন দিন ভরাতে পারবে না। সে আরো চাইবে। আরো বড় হাঁ ক'রে তোমাকেই গিলতে আসবে।

*   *
*

নতুন চাকরী নিয়েই ব্যস্ত আছি।

অনেক দিন বিপিন ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয় নাই। বিকেলের দিকে তাই বেরিয়ে পড়লাম।

বাইরেই বিপিন ডাক্তারের বড় ছেলে সত্যবাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি উকীল। শুধালাম: ডাক্তারবাবু বাড়ীতে আছেন সত্যবাবু?

: না, তিনি তো বাইরে গেছেন। বোধ হয় পার্কে বেড়াচ্ছেন।

: আজকাল তাঁর শরীর যাচ্ছে কেমন?

ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে সত্যবাবু বললেন: একই রকম। কারো কথা শুনবেন না। ওষুধ এনে দিলে খাবেন না। পথ্যাপথ্যের বিচার নেই। বুড়ো বয়সে কখনো এমন করলে রোগ সারে!

সত্যবাবুর কথাগুলো সত্য। তবু কেমন ভাল লাগল না। বিপিন ডাক্তারের সন্ধানে পার্কের দিকে পা বাড়ালাম।

কিন্তু পার্কে তাঁর সন্ধান পেলাম না। এদিক-ওদিকে অনেক খুঁজলাম। কোথাও দেখা মিলল না।

*   *
*

আর একদিন বিকেলে হাজির হলাম বিপিন ডাক্তারের বাসায়। শুনলাম: বেলা পড়বার আগেই তিনি পার্কে গেছেন।

এক-পা দু-পা ক'রে পার্কে এলাম। সন্ধ্যার এখনও দেরী আছে। লাল আকাশের ছায়া পড়ে পাশের নদীর জলে শোভিত রাঙা ছিটে লেগেছে। ওপারের দিগন্তবিস্তৃত ধানের ক্ষেত আসন্ন সন্ধ্যার বন্দনায় নতশির।

পার্কে জনতার বিচিত্র পদক্ষেপ। নানা ভঙ্গী, নানা ব্যঞ্জনা। একদল ছেলে বেলুন উড়িয়ে খেলা করছে। পাশের বেঞ্চিতে বসে একদল বুড়ো তাই দেখছে। জীবনের বেলুন তাদের কালের বাতাসে ফেটে চুপসে গেছে। রঙ নেই, মোহ আছে।

কিন্তু কোথায় বিপিন ডাক্তার? সারা পার্কটা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলাম। তাঁর দর্শন পেলাম না।

ওপাশে কিসের একটা জটলা। অনেকগুলি লোক জড় হয়েছে। গেলাম। সেখানেও নাই।

অনেক দিন দেখা হয় না। চাকরী হবার পর সেই যে দেখা হয়েছিল—

একখানি ব্যথাতুর মুখ মনে পড়ল। আর একবার ঘুরে যাই পার্কটা, যদিই বা দেখা হয়।

কিন্তু দেখা হল না।

বিক্ষুব্ধ মনে অগত্যা বাড়ী ফিরতে হ'ল।

কি মনে ক'রে বড় রাস্তায় না গিয়ে নদীর ঢালু পাড়ের পথ ধরলাম। অনেক দিন এ পথে হাঁটি নি। বড় চমৎকার পথ। ঠিক নীচেই নদী। জল খুব অল্প। কেমন একটা নীল তার রং। বাঁ দিকে উঁচু পাড়। তার উপর সুরকির লাল রাস্তা। নীচ থেকে দেখা যায় না। কিন্তু মোটরের শব্দ, এমন কি পথচারীদের উচ্চ হাসিটি পর্য্যন্ত কানে আসে।

খানিকটা দূরে নদী ও পাড়ের রাস্তার ঠিক মাঝামাঝি একটা ছোট বটগাছ। নীচে একটা লোক বসে আছে। নদীর দিকে পিছন ফিরে গাছের আবডালে। সহজে কারো নজর সেখানে যায় না। উঁচু পাড় আর গাছের মাঝে ঠিক এমনি জায়গাতেই সে বসেছে।

আর একটু এগিয়েই চিনলাম—লোকটি বিপিন ডাক্তার। কৌতূহল হ'ল। আস্তে আস্তে তাঁর পিছন দিক দিয়ে এগিয়ে গেলাম।

আশ্চর্য! বিপিন ডাক্তার আপন মনে চিবিয়ে চিবিয়ে কি যেন খাচ্ছে!

আরও কাছে গিয়ে বললাম: এই যে ডাক্তারবাবু, কেমন আছেন?

বিপিন ডাক্তার চমকে কেঁপে উঠলেন। মুখে অপরাধীর বিহ্বলতা। চোখে যেন ক্ষমা-প্রার্থনার দৃষ্টি।

তাঁর সামনে গিয়ে বললাম: কি করছেন এখানে বসে? এ কি! এ যে চীনেবাদাম?

বিপিন ডাক্তারের সামনে একরাশ চিনেবাদামের খোসা। ডান পাশে দুটি মুখখোলা বাদামের ঠোঙা।

মুখে করুণ হাসি টেনে বিহ্বলভাবে বিপিন ডাক্তার বললেন: এই—বসে বসে দুটো চীনে বাদাম খাচ্ছিলাম ব্রাদার। বড় ভাল জিনিষ—পুষ্টিকর। আর খেতেও বেশ। ছোটবেলা থেকেই চিনেবাদাম আমি বড় ভালবাসি।

বাধা দিলাম: কিন্তু এখানে—এই রাস্তার পাশে আপনি—

ছোট ছেলের মত আব্দারের সুরে বললেন বিপিন ডাক্তার: তা ছাড়া আর উপায় কি ভাই। বাড়ীতে যে ওরা খেতে দেয় না। মুখে একটা কিছু দিয়েছ কি সবাই তেড়ে আসবে হৈ হৈ ক'রে।

আলাপ জমাবার জন্য বললাম: আপনার ভালর জন্যেই তো আসে। বুড়ো বয়সে এসব ভাজাভুজি খেলে যে ব্লাডপ্রেশার বেড়ে পড়বে।

বিপিন ডাক্তার সহসা ধনুকের ছিলার মত বেঁকে উঠলেন। রুক্ষস্বরে বললেন: হ্যাঃ, ব্লাডপ্রেশার বাড়বে। দুটো বাদাম খেলেই ব্লাডপ্রেশার বেড়ে যাবে। যত সব! আরে বাপু, আমি যে সারাজীবন কিছু খেলাম না, তবে আমার ব্লাডপ্রেশার হ'ল কেন?

স্বরের রুক্ষতা ক্রমেই ভিজে উঠল: দিনরাত শুধু ঐ এক কথা। ব্লাডপ্রেশার আর ডিস্‌পেপ্‌সিয়া। আরে বাবু, না খেয়ে তো তোদের জন্য সব করলাম এতদিন। আজ দুটি খেয়ে না হয় ব্লাডপ্রেশারেই আমি মরব। তাই বলে দিনরাত এই সর্দারী।

মাঝপথে বিপিন ডাক্তার চুপ করলেন। হয়তো কথা আর বেরুল না।

আমিও চুপ। বুঝলাম, কথা বলা সঙ্গত নয়। সব মানুষেরই অল্পবিস্তর এমন একটি উত্তেজনাপ্রবণ স্থান আছে, যেখানে আঘাত লাগলে শান্ত পর্বতের মুখেও আগ্নেয়গিরি উৎসারিত হয়ে ওঠে। বেশ বুঝলাম, বিপিন ডাক্তারের সেই স্থানটিতেই আমি আঘাত করেছি।

দুজনেই চুপ।

বিপিন ডাক্তার মুখ নীচু করে ডান হাতে বাদামের খোসাগুলো নাড়াচাড়া করছে।

এক সময় বললাম: উঠি ডাক্তারবাবু, সন্ধ্যা হয়।

মাথা তুলে বিপিন ডাক্তার বললেন, একদিন বাড়ীতে যেও।

পথে থেমে অনেকদিন আগেকার একটা ছবি মনে পড়ল। ইডেন গার্ডেনের পথে বেড়াতে বেড়াতে একটি তরুণ ছেলে পাশের চিনেবাদামওলার দিকে ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

পিছন ফিরে তাকালাম। বিপিন ডাক্তার আবার চিনেবাদাম ভোজনে মন দিয়েছে।

ইতিহাসের উপর রান্নাঘরের প্রভাব

শ্রীসুবলচন্দ্র ভড়

মানব-জীবনের উপর খাদ্যের যথেষ্ট প্রভাব আছে। রাসায়নিক খাদ্যই ফরাসী-বিপ্লবের কারণ এবং ভবিষ্যতে জার্মানীতে ঐ একই কারণে সাংঘাতিক রাষ্ট্রবিপ্লব হতে পারে। পেঁয়াজ খাওয়ার জন্য নেপোলিয়ন একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন। বৃটেনের এই পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যের মূল হচ্ছে শালগম। প্রধানত খাওয়ার পরিবর্ত্তনের জন্যই বানরের কুশ্রী মুখ মানুষের সুশ্রী মুখে রূপান্তরিত হয়েছে। মোটর-চালকেরা বেশী পরিমাণে সবুজ তরি-তরকারী খেলে মোটর দুর্ঘটনা অনেক কমে যাবে—আধুনিক খাদ্যবিৎগণের এইরূপই মত।

ব্যাপারটা বিশ্বাস হচ্ছে না কি? কিন্তু সত্যই—প্রথম যেদিন ইভ্ নিষিদ্ধ আপেল ভক্ষণ করে স্বর্গরাজ্য থেকে বিতাড়িত হন—মানব-ইতিহাসের সেই আদিমতম যুগ হইতেই খাদ্য অতি বিচিত্র ঘটনার জন্য দায়ী।

পেঁয়াজ দিয়ে ভেড়ার মাংস খেয়েছিলেন বলে নেপোলিয়ন লিপজিগ-এর যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন। পেঁয়াজ খাওয়ার দরুণ পরিষ্কার ভাবে চিন্তা করবার শক্তি তাঁর কমে গিয়েছিল। মাংস সংরক্ষণের জন্য মসলা খুঁজতে বেরিয়েই কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন।

১৯০৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের বিজয়ের মূল হচ্ছে দুধ ও টাটকা শাকসব্জী! যুদ্ধের আগে জাপানের সৈন্যদলের প্রায় সিকি অংশ সব সময়েই বেরিবেরিতে ভুগতো—কলে ছাঁটা, লাল খোলা বাদ দেওয়া চাল খাওয়ার দরুণ।

সুইডেন থেকে গাজর আমদানী ক'রে ইংলণ্ড গরু ও ভেড়াদের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করেছিল। ফলে নিজেদেরও কখনও খাদ্যের অভাব হয় নি। সেই জন্যই ইংরেজ আজ পৃথিবীর সিকি অংশ শাসন করছে।

মিশরের মমীর দাঁত পরীক্ষা করে বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করেছেন যে, খৃষ্টের জন্মের ৪০০০ বছর আগে থেকেই মিশরের অধঃপতন সুরু হয় এবং তার মূল কারণ ভাইটামিনশূন্য খাবার খাওয়া।

ক্লিওপেটার জন্য সুন্দর খাবার তৈরী করায় পুরস্কার স্বরূপ মার্ক এন্টনি তার পাচককে একটা শহর দান করেছিলেন।

রোম সাম্রাজ্যের ধ্বংসের অন্যতম কারণ রোমক রাজাদের পেটুক স্বভাব। কথিত আছে যে, রাজা গায়িয়ুস্ জুলিয়াস্ ভেরাস্ ম্যাক্সিমাস্ প্রত্যহ আধ মণ মাংস ও ছয় গ্যালন মদ খেতেন। এরূপ গুরুভোজনের ফলে রোমানদের ভুঁড়ি হল ও বুদ্ধিও কিছু কমে গেল। দিদিয়াস যখন সম্রাট হলেন তখন বিপদ বুঝে তিনি নিয়ম করে অতি-ভোজন নিবারণ করতে চেষ্টা করলেন! কিন্তু রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিগণ ক্ষুধা কমাতে রাজী হলেন না। ফলে ছ' মাসের মধ্যেই দিদিয়াস গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ দিলেন। এরূপ অতিভোজনের জন্যই রোমানরা পরে একদল ক্ষুধার্ত্ত জার্মান অসভ্যদের কাছে পরাজিত হয়েছিল।

আজ জার্মানীর খাদ্য-অন্বেষণই ইতিহাসে নব নব অধ্যায়ের সৃষ্টি করছে। জার্মানীর চেকোশ্লোভাকিয়া-বিজয়, অনেকেরই মতে ইউক্রেনীয় গম ক্ষেতগুলির জন্য। ডানজিগ ও পোলাণ্ড-করিডর দাবীও অনুরূপ কারণেই। জাপানের চীনবিজয়ও প্রধানত হলদে ধানগাছের জন্য।

জার্মানী রাসায়নিক খাদ্য নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছে। তারা কাঠের মণ্ড থেকে রুটি চিনি এমন কি চকোলেট পর্য্যন্ত তৈরী করছে। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের ভাগ্যে যা ঘটেছিল, জার্মানীর ভাগ্যেও কি তাই ঘটবে? ফরাসী রাজারা পরিত্যক্ত জঞ্জাল থেকে জিলাটিন-জাতীয় এক রকম খাদ্য দিয়ে চাষাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে চেয়েছিল। ফলে ক্ষুধার্ত্ত চাষারা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ফরাসী বিপ্লবের সূচনা করলে।

"জার্মানরা প্রচুর আলু খেত বলে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের জার্মান-বিপ্লব সফল হয় নি" খাদ্যবিৎ Ludwig Andreas Feuerbach এই মত পোষণ করেন।

খাদ্য-পরিবর্ত্তনের ফলে আমাদের মুখের গঠনও যথেষ্ট পরিবর্ত্তিত হয়েছে। কাঁচা বা আধপোড়া মাংস ছেড়ে সুসিদ্ধ মাংস ও নরম খাবার খেতে শিখেই প্রাগৈতিহাসিক মানুষের পেশীময় চোয়াল ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হয়ে বর্ত্তমান মানুষের এত সুন্দর মুখে রূপান্তরিত হয়েছে। চর্ব্বণ করবার মাংসপেশী যথেষ্ট দুর্ব্বল হয়েছে এবং দাঁত ক্ষুদ্রকায় ও ঘনসন্নিবিষ্ট হয়েছে—মুখ ডিম্বাকার হয়েছে ও সুদৃশ্য চিবুকের আবির্ভাব হয়েছে। নরম খাবার খাওয়ার দরুণ মাথার খুলিতে কম চাপ পড়ায় মাথা গোল ও কপাল উন্নত হ'য়েছে ও কোটরাগত চোখ একটু উপরে এসেছে। খাদ্য-পরিবর্ত্তনের ফলে সুদূর ভবিষ্যতে মানুষের চেহারায় আরও অনেক পরিবর্ত্তন আসতে পারে। তখনকার মানুষ মিউজিয়মে আমাদের চেহারার মডেল দেখে হয়ত ঘৃণায় মুখ সেঁটকাবে। খাদ্য-বিষয়ে মানুষ ক্রমেই জ্ঞান লাভ করছে এবং ভবিষ্যতের মানুষ আমাদের তুলনায় শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে অনেক বড় হবে এরূপ আশা করা যায়। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের কঙ্কাল পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে তারা নিকৃষ্ট খাদ্যের জন্য রিকেট ও বাতে ভুগত। খাদ্যের গুণাগুণ আবিষ্কৃত হওয়ায় অনেক দুরারোগ্য রোগ বিতাড়িত হয়েছে। আয়োডিনযুক্ত খাবার গলগণ্ডকে (Goitre) এবং পাতিলেবু ও চুণ

স্কার্ভিকে দমন করেছে। দুধ যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা কমিয়ে এনেছে (ভারতে নয়)। খর্ব্বদৃষ্টি ও নৈশ অন্ধত্বের কারণ নিকৃষ্ট খাদ্য। মোটর-চালকেরা শালগম ও সবুজ তরিতরকারী খেলে মোটর-দুর্ঘটনা অনেক কমে যাবে।

দুর্ভিক্ষের সময় ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সুইডেনের চাষারা গাছের ছাল খেয়ে থাকে। এখনও আফ্রিকার সন্তানসম্ভবা রমণীরা ছাই ভক্ষণ করে (ছাইএর মধ্যস্থিত ক্যালসিয়াম বা চুণ সন্তানের দাঁত ও হাড় গঠনের সহায়তা করে)।

আফ্রিকার অসভ্য অধিবাসীরা পূর্ব্বে শত্রু বধ করে তাদের পুড়িয়ে খেত। বর্ত্তমান কালের মানুষও ছাগল, ভেড়া, গরু, মুর্গী ছাড়াও কুকুর, বিড়াল, হাতী, ঘোড়া, বাঘ সিংহ সবই খেয়ে থাকে, ব্যাঙের ঊরু ও কুমীরের জিব খাদ্যবিলাসীর ডিসে শোভা পায়। আরসোলা ও ফড়িংএর ন্যায় ক্ষুদ্র পতঙ্গেরাও নিস্তার পায় না।*

* ইংরেজী থেকে।

স্বর্গ

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

স্বর্গ নহে যে কবি-কল্পনা, এইখানে এনিমেষে
আছে মোরে ঘেরি, বুঝালে আমারে শুধু মোরে ভালবেসে।
ধূলায় অন্ধ দুচোখে
যেন সুধা দিয়ে ধুয়ে দিলে বালি মলা আঁখি মেলি ঊষালোকে।
এ ধূসর ধরা ধূলিগুণ্ঠন খানি
সহসা কি নিল টানি?
ত্রিদিব কান্তি উথলিল চৌদিকে,
রাখিলে যখন আঁখি অচপল মোর পানে অনিমিকে।

তুমি আর আমি অজ্ঞাতসারে এ জীবনধারা দিয়া
একটি শ্লোকের দুইটি চরণ রচিনু কি না জানিয়া?
কোথায় আসিয়া দুজনে
মিলাব ছন্দ মিত্রাক্ষরে নয়ন রাখিয়া নয়নে?
আনন্দ ঘন একি নব জাগরণী!
পুরাতন এ ধরণী
গুণ্ঠন তার সহসা কি দিল ফেলি?
নন্দন শোভা হেরি চৌদিকে তোমাপানে আঁখি মেলি!

সাড়া

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

ঢেউ পরে ঢেউ দোলালাগে
আমার বালুকা সিকতায়,
বুঝি তুমি স্মরিছ আমায়
তোমার নিগূঢ় অনুরাগে।

নয়নে স্বপনছবি জাগে,
চিরমৌন তোমার হিয়ায়,
প্রেমকম্প্র সুর মূর্চ্ছনায়
বাজে বীণা ভীম পলশ্রী রাগে।

আঁখি মুদি শুনি সে ঝঙ্কার।
নিথর পাষাণ ওঠে কাঁপি,
বিদরি মূর্চ্ছার হিম ঝাঁপি
সুপ্ত ফণী মেলে ফণা তার।

মোর অন্তঃসলিলার ধারা
তোমা পানে ধায় বন্ধহারা।

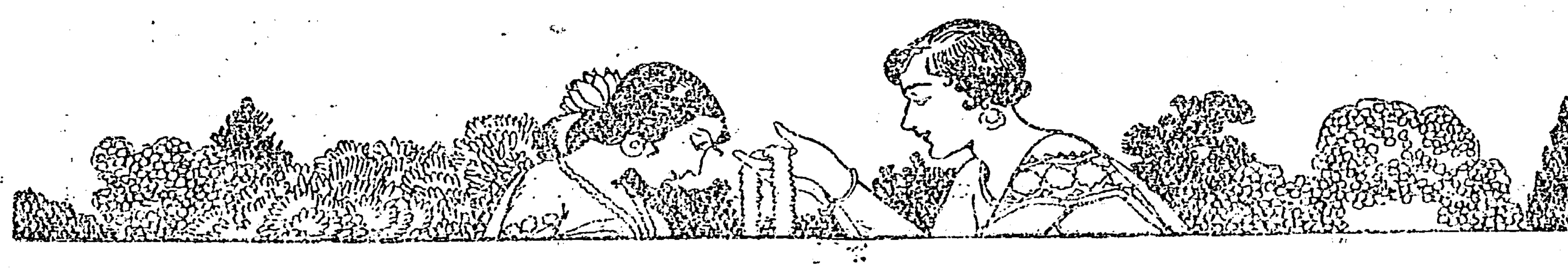

সঙ্গীতবিকাশ

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল বি-এস্‌-সি (গ্লাসগো), এ-এম-আই-ই

কোনো বিষয় শিক্ষা করতে গেলেই, সেটিকে এমন ভাবে আরম্ভ করা উচিত যাতে কোনো নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে সেটি প্রথম সোপান রূপে খাপ খেয়ে যায়। প্রত্যেক বিষয়ের আরম্ভ শক্ত এবং অনেক ক্ষেত্রেই সেটিকে আরও শক্ত ক'রে দেওয়া হয় অনর্থক কতকগুলি জটিল বিষয়ের অবতারণা ক'রে, অথবা নীরসভাবে শিক্ষার্থীর কাছে সেটিকে প্রকাশ ক'রে। শিক্ষাপ্রণালী সেই জন্যে হওয়া উচিত এমন—যাতে শিক্ষার্থীর ভাল লাগে এবং তার আরও শিখতে ইচ্ছা করে। এই আদর্শটিকে সামনে রেখে আমি "সঙ্গীতবিকাশ" লিখেছি। গতানুগতিক পন্থায় দীর্ঘ বিশ বৎসর কাল সঙ্গীত শিক্ষা করেছি, অনেক ছাত্রছাত্রীকে সঙ্গীত শিখিয়েছি, তাদের ভালমন্দ লাগার বিষয়ে সহানুভূতি ও মনোযোগের সহিত দৃষ্টি রেখেছি। এতে আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, আগে গান পরে জ্ঞান। ছোট ছেলেদের বর্ণপরিচয় শেখাবার আগে যদি তাদের কথা বলতে না দেওয়া হয় তা হ'লে তাদের কি অবস্থা হয় অনুমান করাই শক্ত। এও দেখেছি যে, যে ছেলেমেয়েরা ঘরে আয়া বা বাপ-মা'র কাছে ইংরেজী বলতে শিখেছে তারা অনেক পাশ করা গ্র্যাজুয়েটদের চেয়েও ভাল ইংরেজী বলতে পারে এবং যখন তারা গতানুগতিক শিক্ষা দ্বারা জ্ঞান অর্জ্জন করে তখন তার ব্যবহার তারা সহজ ও সুন্দরভাবেই করতে পারে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এমন কেন না হবে? কেন ছেলেরা স-র-গ-ম না শিখে গান আগে শিখবে না? কেন তারা গান শিখে তাদের ইমন, কাফি, বাগেশ্রী, ভৈরবী ইত্যাদি বলে চিনবে না, যেমন তারা লোক দেখে তাদের মা, বাবা, দাদা বা মেসোমশায় বলে চেনে, অথচ এসব কথার বানান শেখে না বা মানে জানে না।

সঙ্গীত-শিক্ষাপদ্ধতি যদি স্বাভাবিক ও সরস হয় তা হ'লে সঙ্গীতশিক্ষা ভাষাশিক্ষার চেয়ে কঠিন হওয়া উচিত নয়। 'অ' থেকে চন্দ্রবিন্দু পর্য্যন্ত স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ শেখা অপেক্ষা বারটি সঙ্গীতের স্বর শেখা শক্ত হবে কেন? সঙ্গীতে ভাল শিক্ষক ও সুচিন্তিত শিক্ষাপদ্ধতির একান্ত অভাব। এ অভাব পূরণ করা তখনই সম্ভব হবে, যখন নূতন প্রণালীতে উপযুক্ত সঙ্গীত-শিক্ষক তৈরী করতে বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপিত হবে, কিংবা উপযুক্ত গ্রামোফোন রেকর্ডের দ্বারা সহজ ও উপভোগ্য সুরগুলির গান সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ সুপ্রচারিত হবে। হয়ত এসব আদর্শবাদীর স্বপ্ন, কিন্তু যদি এদেশে সঙ্গীত কখনও ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় তা হ'লে সেটা কখনই সঙ্গীতশাস্ত্রের বেড়াজালের মধ্য দিয়ে হবে না—গানের সুমিষ্ট আবেদনের মধ্য দিয়েই হবে। এই ভারতবর্ষের পঁয়ত্রিশ কোটি লোক, কোন না কোন কথিত ভাষার সাহায্যে নিজের মনের ভাব অপরকে বোঝাচ্ছে। তার মধ্যে কয়জন বর্ণপরিচয়ের ধার ধারে এবং তারও কত অল্পাংশ ব্যাকরণ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে? কেন তবে গান গেয়ে বা গানের সুর গেয়ে লোকে ভাববিনিময় করবে না? কেন সুরের জন্যে এ অত্যাচার—যে তার বিকাশের পূর্ব্বে তাকে নিজের বর্ণপরিচয় ও ব্যাকরণের শিকল পায়ে পরে লোক-সমাজে আসতে হবে? এর একমাত্র উত্তর এই যে সমাজ, শাসনকর্ত্তা ও অভিভাবকেরা সঙ্গীতের বহুল প্রচার চান না। কিন্তু যুগ যুগ ধরে ত এ অত্যাচার, পীড়ন ও অনুশাসন অবাধে চলবে না এবং চলতে পারে না। তাই বিদ্রোহবার্ত্তা বহন ক'রে আমার এই "সঙ্গীতবিকাশ" প্রকাশ করলাম। শুধু শিক্ষার্থীদের জন্যে নয়, শিক্ষকদেরও জন্যে। আমার একান্ত অনুরোধ যেন শিক্ষকেরা আমার "সঙ্গীত বিকাশ" এর এই গানগুলি আয়ত্ত ক'রে শিক্ষার্থীদের শেখান এবং যেমন ভাবে বিষয়গুলির ক্রমবিকাশ হবে সেই ভাবেই শিক্ষার্থীর সামনে ধরে দেন। কিন্তু সম্যক জ্ঞানের অধিকারী না হয়ে কেউ যেন শিক্ষা দিতে চেষ্টা না করেন; কারণ তাতে শিক্ষার্থীর বিশেষ অপকার হবার সম্ভাবনা।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের স্বরলিপি ব্যবহার

উত্তর ভারতের সঙ্গীত-পদ্ধতিকে সাধারণত হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-পদ্ধতি বলে। এটি শিক্ষা করতে হ'লে, হয় পণ্ডিত

ভাতখণ্ডে, নয় পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর রচিত বইয়ের সাহায্য নেওয়া একান্ত আবশ্যক। পণ্ডিত ভাতখণ্ডের মতই বহুল প্রচার লাভ করেছে, অনেক কারণে—সে বিষয়ে বিচার করা এখন অনাবশ্যক। অতএব আমরা পণ্ডিত ভাতখণ্ডেরই পদানুসরণ করব। তাঁর রচিত বহু গান শিক্ষার্থীর জন্য অপরিহার্য্য। তিনি চণ্ডীদাস, তানসেন প্রভৃতির মত নিজের নাম পরিষ্কারভাবে কোন গানে দেননি; চতুর শব্দ ভণিতা হিসাবে ব্যবহৃত হতে দেখলেই বুঝতে হবে যে সে গানটি তাঁর রচিত। আমাদের উদ্দেশ্য সরল, সরস হিন্দুস্থানী গানের প্রচার। বাংলা ভাষায় বাঙ্গালীর লেখা সঙ্গীতের বইএর বাজারে অভাব নেই। প্রয়োজন হলে পরে কবি অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত ও দ্বিজেন্দ্রলালের গান, কথা ও সুরের ব্যাখ্যা সহ প্রচার করব, যদি ইতিমধ্যে কোন সুরসিক এই কাজটিকে সুসম্পন্ন না করেন। আমি স্বরলিপিতে হিন্দী বর্ণ ব্যবহার করেছি একটি বিশেষ কারণে—বাংলায় সা রে গা মা লিখলে শিক্ষার্থীরা ভাষা পড়ার মত প'ড়ে মুখস্থ করে। আমি চাই, স্বর লেখা দেখলেই লোকে সেটা গাইবে সুর ক'রে—বই পড়ার মত পড়বে না। ইংরেজী স্বরলিপির সঙ্কেত-চিহ্ন এই কারণেই উদ্ভাবিত হয়েছে এবং আমাদের দেশের ব্যাণ্ডওয়ালারা, এক অক্ষরও লেখাপড়া না শিখে তা দেখে করনেট, ক্লারিওনেট, বাঁশী ইত্যাদি অবাধে বাজায়। হিন্দী স্বরলিপিও বাঙালী ছেলেদের মনে সুরসংশ্লিষ্টছাপ রাখবে, এই আমার উদ্দেশ্য এবং স্বরলিপি যেন সর্ব্বদা সকলে সুর ক'রে বলেন। প্রথম প্রথম ভুল হলেও পরে ঠিক সুর নিজ হতেই বেরোবে।

উপক্রমণিকা

সঙ্গীত (সম + গীত) বলতে বোঝায়—নৃত্য, গীত ও বাদ্য। কিন্তু সাধারণত 'সঙ্গীত', গীত শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় এবং দুর্ভাগ্যক্রমে যারা গান শিখবার উপযোগী নয়, তারা যেন সঙ্গীত-রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত হয়েছে এই ভেবে নেয়, অথবা তাদের এই কথাই বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এটা কিন্তু একেবারেই ভুল। যাদের কণ্ঠস্বর ফ্যারিন্‌জাইটিস্, ডিপ্‌থিরিয়া বা গলনালী অথবা শব্দযন্ত্রের কোন গোলযোগের জন্য গানের অনুপযোগী হয়ে পড়ে অথচ তাদের কান সুর গ্রহণের বা সুরের প্রভেদ বুঝতে সক্ষম থাকে তাদের স্বরযন্ত্র, যথা—সেতার, এস্রাজ বা সোজা বাঁশী সহজেই শেখান যেতে পারে এবং তারা সুর-রাজ্যে প্রবেশ ক'রে সহজেই সঙ্গীতরস আস্বাদনের অধিকারী হতে পারে। যাদের কাণ কোন কারণে, সুর গ্রহণের বা সুরের প্রভেদ বুঝতে অক্ষম তারা তবলা ইত্যাদি বাদ্য শিখতে পারে। অনেক সময় এও দেখেছি যে, যে-কোনো বিষয় শিক্ষার্থী সহজে শিখতে পারে, সেটা শিখতে শিখতে এবং তাতে উৎকর্ষ লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের অন্য দিকগুলি তারা নিজেরাই শিখে নিতে পারে। যেহেতু অন্য বিষয়গুলির সঙ্গে তার স্বভাবতই পরিচয় হতে থাকে, যথা—তবলা-বাদককে গান শুনতেই হয়, গায়ক বা সেতার বাদককে তবলা শুনতেই হয় এবং এই সাহচর্য্যে পরস্পর পরস্পরের মোটামুটি বিষয়গুলি অনায়াসে জেনে নেয়। অতএব সঙ্গীতশিক্ষার মুল মন্ত্রই হ'ল 'এক সাধে সব সধে, সব সাধে সব যায়।" অর্থাৎ একটা জিনিসের সাধনা করলে সব তাতেই সিদ্ধি লাভ হয়, পরন্তু এক সঙ্গে সব বিষয় সাধনা করলে সর্ব্বস্বই যায়, অর্থাৎ কিছুই হয় না। অনেক ক্ষেত্রে শিশুদের অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়ে বড় বড় বিকট তালের গান শেখান হয়। পরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোক-সমাজে সেই গান গাইয়ে অভিভাবকেরা নিজেদের গৌরবান্বিত বোধ করেন। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বাল্যের কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে অনেকেই পারে না। আমরা সব দিক বজায় রেখে খেলার ছলে, উৎসবের মধ্য দিয়ে, "সঙ্গীতবিকাশ"-এ সকলের সহানুভূতি সহকারে অগ্রসর হব।

শিক্ষার্থীর উপযোগিতা

সর্ব্বপ্রথমে দেখে নিতে হবে, শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যের অবস্থা কিরূপ; তার শরীর তথা বায়ুযন্ত্র, শব্দযন্ত্র, কণ্ঠনালী অথবা নাসারন্ধ্র পরিশ্রম করলে অসুস্থ হবার ভয় আছে কি-না। যদি লেশমাত্র এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে, তা হ'লে একটু অপেক্ষা ক'রে তাকে সুস্থ ও সবল ক'রে তারপর সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করা উচিত। অনর্থক তাড়াতাড়ি ক'রে অনেক শিক্ষার্থীকে বিপন্ন হতে দেখেছি। এ বিষয় অবহেলা যাতে না হয় সে বিষয়ে অভিভাবক ও শিক্ষকের দায়িত্ব সমান। স্বাস্থ্যের বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে এইবার তাকে

তিনটি সাধারণ বিষয়ে পরীক্ষা করতে হবে। (১) দুটি বা তিনটি বিভিন্ন স্বর গাইলে বা বাজালে শিক্ষার্থী তার সঙ্গে কণ্ঠস্বর মেলাতে পারে কি-না। যদি পারে, তা হ'লে তার গান শেখা হতে পারে। (২) দুটি স্বর গাইলে বা বাজালে যদি শিক্ষার্থী প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়েও বলতে পারে কোন্‌টি উঁচু বা কোন্‌টি নীচু তা হ'লে তার যন্ত্রশিক্ষা হতে পারে। (৩) কোনো সোজা ছন্দের গান গেয়ে বা বাজিয়ে তাল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি শিক্ষার্থীও ঠিক মত তাল দিতে পারে তা হ'লে সে নৃত্য ও তবলা প্রভৃতি যন্ত্র শিখতে পারে। মনে রাখতে হবে, আমাদের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর ভগবানদত্ত ক্ষমতার আবিষ্কার ও বিকাশ করা। যা তার নেই সেটা তার মধ্যে প্রবেশ করানো মানুষের অসাধ্য এবং এ বিষয়ে সময়, অর্থ ও শক্তির অপচয় করার কোনো মানেই হয় না, বরং শিক্ষার্থীকে সঙ্গীত-বিমুখ ক'রে দেওয়া হয়। সাধারণত শিক্ষার্থীর দশ বৎসর থেকে বার বৎসর বয়সের মধ্যে সঙ্গীতে প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ ও শেষ করা উচিত। তাই ব'লে দশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে ছেলেরা একেবারে গান গাইবে না, এমন নয়। খেলার ছলে, আনন্দ ক'রে, যতটুকু তারা শিখতে চাইবে সেটা অনায়াসে তাদের শিখতে বা গাইতে দেওয়া উচিত। মনে রাখতে হবে, খিদে না পেলে, জোর ক'রে খাওয়ালে যেমন অজীর্ণ হয়, তেমনি গান না পেলে জোর ক'রে গাওয়ালে অযথা পরিশ্রমই হয় এবং এ গান গাওয়া দম দেওয়া কলের কার্য্যকলাপের মত প্রাণহীন হয়—শিশুর সাবলীল খেলার মত আনন্দদায়ক হয় না। শিক্ষার্থী প্রকাশ্যে গান গাইবার উপযোগী তখনই হয় যখন সে নিজে হতে সে ক্ষমতা অর্জ্জন ক'রে নিজেকে তার উপযুক্ত মনে করে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে লোকের সামনে গাইতে বাধ্য ক'রে অথবা ইচ্ছা থাকলেও বারণ ক'রে, অনেক অভিভাবকই শিক্ষার্থীর উপর অত্যাচার করেন। এই কারণে অনেক ক্ষেত্রে যোগ্য শিক্ষার্থীকেও সঙ্গীতের অনুপযোগী হয়ে যেতে দেখেছি। এ বিষয়ে সুবিবেচনা করতে আমি তাঁদের সাগ্রহে মিনতি করছি।

হিন্দী উচ্চারণ ও তার বাংলায় লিখন-পদ্ধতি

সাধারণত লোকের মনে সুন্দর ও সরস ছবি আঁকা যায় তার চোখ অথবা কানের সাহায্যে। চোখ ছবি, গতি ও বর্ণ-বৈচিত্র্য দেখে সৌন্দর্য্য উপলব্ধির সহায়তা করে। কাণ গ্রহণ করে ভাষা ও সুর। ভাষা আবার তখনই আনন্দদায়ক হয় যখন সেটা সুউচ্চারিত ও সুব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষার উচ্চারণ বাঙালীদের শেখাতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। কিন্তু হিন্দী বা উর্দ্দূর উচ্চারণের বিষয় কিছু বলা কর্ত্তব্য। Easyর উচ্চারণ বাঙালীর মুখে 'ঈজী' শুনলে যেমন কষ্ট হয় বা স্কুল, স্কুল-এর উচ্চারণ পাঞ্জাবীর মুখে 'সুকুল' বা 'সুটুল' শুনলে ভাল লাগে না, সেই রকম বাঙালীর মুখে বিকৃত হিন্দী উচ্চারণ মনক্ষোভের কারণ হয়। বাঙালী ইংরেজী, জার্মান, ফরাসী ইত্যাদি বিদেশী ভাষা অনায়াসে আয়ত্ত ক'রে সুন্দরভাবে উচ্চারণ করতে পারে, তখন কেন সে হিন্দী ভাষা ভাল ক'রে উচ্চারণ করতে পারবে না বা করবে না? সামান্য চেষ্টাতেই হিন্দী উচ্চারণ শেখা যায়। বাংলা ও হিন্দী স্বরবর্ণের উচ্চারণ প্রায় এক, শুধু তফাৎ মুখ্যত 'অ'-এর উচ্চারণে। বাংলাতে 'অ'-এর উচ্চারণ হয় ball কথার 'a'-র উচ্চারণের মত। হিন্দীতে 'অ' "अ" উচ্চারিত হবে cup শব্দের 'u'-র উচ্চারণের মত, এইটুকু স্মরণ রাখলে স্বরবর্ণ উচ্চারণের সমস্ত গণ্ডগোল চুকে যাবে। বাংলায় 'ঐ' উচ্চারিত হয় 'অই' বা 'ওই'। "ऐ" হিন্দী ঐ উচ্চারিত হয় "अए" হিন্দী অ+এ, অ+ই নয়। মনে রাখতে হবে, হিন্দীতে 'অ'-র উচ্চারণ সর্ব্বদা cup শব্দের 'u'-র মত ছোট ও চাপা হবে—কাপ, কিন্তু কওপ হবে না। এই উচ্চারণটি আমরা 'অ্য' দিয়ে বোঝাব। আবার "ऐसा"-র উচ্চারণ 'আয়সা' বা 'এইসা' হবে না। হবে cup কথার 'u'-এর উচ্চারণ, পরে 'এ' এবং তারপরে 'সা'। আমরা লিখব 'অ্যএসা'। দন্ত 'স'-এর উচ্চারণ 'soon'-এর 's'-এর মত হবে। 'শ'-এর উচ্চারণ shame-এর 'sh'-এর মত হবে। 'ই'-র উচ্চারণ 'fit'-এর 'i'-এর মত হবে। 'ঈ'-র উচ্চারণ 'bee'-এর 'ee'-র মত হবে। 'উ'-র উচ্চারণ 'put'-এর 'u'-এর মত ছোট হবে—boot-এর 'oo'-র মত দীর্ঘ হবে না—ওটা 'ঊ'-র উচ্চারণ। হ্রস্ব ও দীর্ঘের সঠিক উচ্চারণের উপর হিন্দুস্তানী ভাষার সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অতএব এ বিষয়ে খুব বেশী দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক। হিন্দিতে 'স'-র উচ্চারণ 'শ' ও 'ষ'-র উচ্চারণ থেকে একেবারে আলাদা

হবে। 'ব'-এর উচ্চারণ হিন্দীতে দুরকম হয়। এক 'bell'-এর 'b'-এর মত, আর 'well'-এর 'w'-র মত। এই দ্বিতীয় উচ্চারণের জন্য আমরা উড়িয়া ৱ ব্যবহার করবো। হিন্দিতে হসন্তর ব্যবহার নেই বললেই চলে। আমরা বলি রাম্, ওরা বলে রাম্য (সাবধান, রাম্য নয়—রাম+অ্য)। হিন্দি গান গাইবার সময় 'ন্দ' ওঁ+দ্য ভাবে উচ্চারিত হয় (ওংদ্দ নয় তা বলে—নাকী সুরে 'ও' আর হিন্দী প্রথায় দ্ উচ্চারণ হবে।) সেইভাবে 'সুন্দর' উচ্চারিত হবে সো-উঁদ্যর্য ইত্যাদি। সাবধান, য-ফলা দেখে বাংলা বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগের উচ্চারণের মত যেন উচ্চারণ করা না হয়। ঐ রকম উচ্চারণের জন্যে আমরা হিন্দি গান বা ভাষা বাংলায় লিখতে উপযুক্ত চিহ্ন ব্যবহার করব। যথা—'হ্য', 'হ্ম' উচ্চারিত হবে না, 'hum'-এর 'hu'-এর মত হবে। হিন্দি গানে যুক্তাক্ষরের ধমক দিয়ে উচ্চারণ নেই বললেই চলে। অতএব ধর্ম্ম, গর্ব্ব ও কীর্ত্তির পরিবর্ত্তে ধরম, গরব ও কীরতই ব্যবহৃত হয়। এটা হয়ত লজ্জার কথা যে আমাকে হিন্দি শেখাবার জন্যে ইংরেজী উচ্চারণের সাহায্য নিতে হচ্ছে। কিন্তু কি করব, লিখে বোঝাবার মত এর চেয়ে ভাল উপায় আর পাওয়া গেল না। উর্দ্দু উচ্চারণের সম্বন্ধে প্রয়োজন হলে পরে আলোচনা করব।

স্বরলিপি ও তার ব্যবহার

শুনে যা করা উচিত তা দেখে করতে চাইলে, প্রয়োজন হয় তখন সংকেত বা ইসারা। রেলের ড্রাইভারকে স্টেশন মাস্টার চেঁচিয়ে শোনাতে পারে না যে রাস্তা পরিষ্কার আছে। তাই তার টেনে একটি সিগ্‌ন্যালের হাত নীচু করে সেটি জানিয়ে দেয়। চেঁচিয়ে চুপ কর যখন বলা চলে না, তখন নিজের বন্ধ মুখের উপর আঙুল রেখে ইসারায় বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এই রকম কত সংকেতই আমাদের ব্যবহারিক জীবনে চলে। এমন কি, ভাষাও লিপিবদ্ধ করা হয় নানা দেশের বিভিন্ন প্রকারের সাংকেতিক অক্ষরের দ্বারা। এইরূপেই স্বর ও (সুরের বর্ণমালা) লিপিবদ্ধ হয় কতকগুলি সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে; ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে পাঁচটি শোয়ানো লাইন টেনে তাতে ফোঁটা দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সুর বোঝান হয়। আমাদের দেশের মত তাদেরও স্বরের নাম আছে। কিন্তু তা নিয়ে তারা আর মাথা ঘামায় না।

আমাদের দেশের সঙ্গীত-পণ্ডিতেরা এক সময় সংকেত-চিহ্ন প্রচলিত করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তাঁরা সফলকাম হন নি। আমরা নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখাটা যুক্তিসঙ্গত মনে করেছি এবং তাই আমাদের স্বরগুলির নাম (ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ)-এর পরিবর্ত্তে স্বরলিপিতে সা রে গা মা পা ধা ও নি ব্যবহারই শ্রেয় মনে করেছি। কিন্তু কেন যে করেছি তা বোঝা যায় না। কারণ, যদি স্বর-নামের আদি অক্ষর থেকে এগুলি গ্রহণ করা হয়ে থাকে তাহলে 'সা'-র পরিবর্ত্তে 'ষ', 'রে'-র পরিবর্ত্তে 'ঋ', 'মা'-র পরিবর্ত্তে 'ম', 'পা'-র পরিবর্ত্তে 'প' ও 'ধা'-র পরিবর্ত্তে 'ধৈ' ব্যবহার করাই উচিত ছিল। হিন্দিতে এই স্বরগুলি সা রি গ ম প ধ নি লেখা হয়। কিন্তু তাতেও উচ্চারণকরবার সময় গা মা পা ধা-ই বলা হয়—বোধ হয় সংস্কারের দাবী গ্রাহ্য ক'রে। আমরা শুধু সংকেত-চিহ্ন হিসাবে (উচ্চারণের দিকটা গায়কের উপরে ছেড়ে দিয়ে) সংস্কার ও সত্যের মাঝামাঝি পথ বেছে নিয়ে **स र ग म प ध न** ব্যবহার করব এবং আমরা হিন্দি পদ্ধতিতেই চলব। কারণ আমাদের ইচ্ছা, শিক্ষার্থীকে এমনি ভাবে তৈরী করা—যাতে সে আমাদের বই লেখা আয়ত্ত করার পর পণ্ডিতজীর বইগুলি ব্যবহার করতে পারে। এখন মোট সাতটি হিন্দি বর্ণশিক্ষা করতে হবে মাত্র। যারা এত বড় একটা বিদ্যা আয়ত্ত করবার জন্যে এটুকুও করতে কুণ্ঠিত তাদের সঙ্গীত শিখতে যাওয়াই বিড়ম্বনা। আমার ইচ্ছা বাঙালীকে তৈরী করা এমনি ভাবে—যাতে বাঙলার বাইরের সম্পদেরও সে অধিকারী হতে পারে। এইবার আরও দু-তিনটি স্থূল বিষয়ের চিহ্ন ঠিক করতে হবে। প্রথম একই স্বরের বিভিন্ন স্থান নির্দ্দেশক, দ্বিতীয় একটি স্বরের স্থায়িত্ব জ্ঞাপক অর্থাৎ মাত্রা নির্দ্দেশক।

(১) কেবলমাত্র সাতটি স্বর, যথা—স র গ ম প ধ ন-তে যদি আমাদের সব গান গাওয়া যেতে পারত তা হ'লে এক স্বরেরই দুরকম ব্যবহার প্রয়োজন হত না। কিন্তু সাধারণত আমাদের সা-এর চেয়েও নীচের দিকে স্বর নামাতে হয় এবং নি-এর চেয়েও অনেক উপরে উঠতে হয়। সাধারণ গানে ষোলটি স্বর ব্যবহৃত হয়, যথা:—

ম প ধ ন { স র গ ম প ধ ন } স র গ ম প।
এতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তিনটি ম, তিনটি প এবং অন্যান্য প্রত্যেকটি স্বর দুবার ক'রে আছে। স্বরলিপিতে কোনো স্বরের উল্লেখ করলেই স্বভাবতই মনে জাগতে পারে যে এর মধ্যে কোন্‌টি লাগবে। বাঙলা ও হিন্দি স্বরলিপিতে ব্র্যাকেটের মধ্যে যে স্বরগুলি রয়েছে সেগুলির সঙ্গে কোন চিহ্নই ব্যবহার হয় না। ব্র্যাকেটের পূর্ব্বের স্বরগুলির নীচে বাঙলাতে হসন্ত ও হিন্দিতে বিন্দু এবং ব্র্যাকেটের পরের স্বরগুলিতে বাঙলাতে রেফ্‌ ও হিন্দিতে উপরে বিন্দু ব্যবহৃত হয়। কোনো কোনো পণ্ডিত স্বরলিপিতে তিন লাইন স্বর ব্যবহার ক'রে স্বরের স্থান নির্দ্দেশ করেন, যথা:—

স র গ ম প
স র গ ম প ধ ন
ম প ধ ন

কিন্তু এ নিয়ম সুপ্রচারিত হয় নি।

(২) স্বরের স্থায়িত্ব—ইংরেজীতে বিন্দুর আকার বদলে স্বরের স্থায়িত্ব বোঝায়।

বাংলাতে (ক) দণ্ডমাত্রিক (অর্থাৎ স্বরের মাথায় খাড়া দাঁড়ি দিয়ে), (খ) শূন্যমাত্রিক (অর্থাৎ প্রত্যেকটি স্বর একমাত্রা এবং অতিরিক্ত মাত্রাগুলির জন্যে এক একটি শূন্য) ও (গ) আকারমাত্রিক (অর্থাৎ শূন্যর পরিবর্ত্তে আকার ব্যবহার) এই তিন প্রথাই চলেছিল। তার মধ্যে আকার মাত্রিকেরই প্রভাব বেশী। শূন্যমাত্রিক লুপ্ত হয়েছে, কিন্তু দণ্ডমাত্রিক এখনও জোর ক'রে অল্পবিস্তর টিকে আছে। হিন্দিতে শূন্য এবং দণ্ডের পরিবর্ত্তে (—) ব্যবহার হয়। বিভিন্ন প্রথাগুলির দৃষ্টান্ত নীচে দিলাম। আমরা হিন্দি মতেরই অনুসরণ করব।

|||
সা = সা ০ ০ = সা । । = सा ——
(দণ্ড) (শূন্য) (আকার) (হিন্দি)

প্রত্যেকটি তিন মাত্রা।

যদি শুধু এই সাতটি "শুদ্ধ" (সাধারণ বা স্বাভাবিক) স্বরই আমাদের সঙ্গীতে লাগত তা হ'লে মোটামুটি স্বরলিপি লেখার জন্যে যা জ্ঞাতব্য ছিল তা বলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের র গ ধ ন কোমল ও ম তীব্র (কড়ি বা চড়া)ও ব্যবহার করতে হয়। পাশ্চাত্য প্রথায় কোনো স্বরের পূর্ব্বে ফ্ল্যাট চিহ্ন '♭' বসালে কোমল ও শার্প চিহ্ন '♯' বসালে তীব্র বুঝায়। দণ্ডমাত্রিকে স্বরের মাথায় △ বসালে কোমল ও ⌐ বসালে তীব্র বোঝায়। শূন্যমাত্রিকে 'গা' কে 'গো' 'রে'-কে 'রো' ইত্যাদি লিখে কোমল ও 'মা'-কে 'মী' লিখে তীব্র বোঝান হত। আকারমাত্রিকে প্রত্যেক স্বরের জন্য স্বতন্ত্র অক্ষর ব্যবহৃত হয়। হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে স্বরের তলে একটি ছোট লাইন দিয়ে কোমল ও মাথায় একটি খাড়া দাঁড়ি দিয়ে তীব্র বোঝান হয়। বিভিন্ন প্রথার শুদ্ধ ও বিকৃত (কোমল ও তীব্র) স্বররূপ নীচে দিলাম।

△ △ △ ⌐ △
দণ্ড—সা ঋা ঋা গা গা মা মা পা ধা ধা নি নি।
আকার—সা ঋা রা জ্ঞা গা মা হ্মা পা দা ধা ণা না।
হিন্দী—स रि रि ग ग म म प ध ध नि नि।
এই সম্পর্কেও আমরা হিন্দি প্রথাই ব্যবহার করব।

সুন্দরভাবে স্বরলিপি করতে গেলে আরও কতকগুলি চিহ্নের প্রয়োজন হয়। সেগুলি নীচে দিলাম। কিন্তু যত সূক্ষ্ম স্বরলিপিই হোক্ না কেন, গানের সঠিক ছবি সেটা হতে পারে না, তবে স্বরলিপির উদ্দেশ্য হচ্ছে গানের সুরকে যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করা। গায়ক সুরের কাঠামটি স্বরলিপি থেকে নিয়ে গানকে নিজের ক্ষমতা মত রূপ দেন। আমরা আগেই দেখেছি যে, (১) নীচে লাইন দিলে কোমল স্বর বোঝায়, (৩) নীচে বিন্দু দিলে মন্দ্র-সপ্তকের স্বর বোঝায়, (৴) কোন চিহ্ন না থাকলে মধ্য-সপ্তকের শুদ্ধ স্বর বোঝায়, (২) উপরে খাড়া লাইন দিয়ে তীব্র ম লেখা হয়, (৬) (ড্যাস)—দিয়ে একটি মাত্রা কাল পূর্ব্বের স্বরের স্থায়িত্ব বোঝায়। উপরন্তু—(৭) ( )-এর মধ্যে কোনো স্বর দিলে, তার পরের স্বর, সেই স্বর, তার আগের স্বর ও আবার সেই স্বর এই চারটি এক মাত্রায় বোঝায়। যথা—
(प)=धप मप, (सा)=रसानसा, (ध)=नधपध ইত্যাদি। (৮) S চিহ্ন দিয়ে গানের ভাষার 'আ' 'ই' ইত্যাদি স্বরবর্ণের জের বোঝানো হয় এক মাত্রায়।

(৯) স্বরের উপরে ও পূর্ব্বে ছোট স্বর লিখে "গ্রেস্‌নোট্‌" বা 'ক্যণ' বোঝায়—প্রথম শিক্ষার্থী এগুলি না শিখলে বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না।

আমি এটা পরিষ্কার করে দিতে চাই যে প্রত্যেক পদ্ধতির স্বরলিপিই গুণসম্পন্ন, কোনটিই হীন নয় এবং প্রত্যেকটি নিজের ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ ক'রে সঙ্গীতের প্রচারে প্রচুর সাহায্য করেছে। মতভেদ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব্বগামী স্রষ্টাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন শিক্ষার মূল মন্ত্র।

গান ও গাইবার বিষয় কতকগুলি আবশ্যকীয় কথা

পরে কতকগুলি গান দেওয়া হ'ল। এই গানগুলি শুধু শিক্ষার্থীকে সনাতন সঙ্গীতের প্রবেশিকা হিসাবে শেখাবার জন্য। আমার মোটেই উদ্দেশ্য নয় যে শিক্ষার্থী অন্য কোনো গান শিখবে না। সহজ সুন্দর বাংলা গান, কীর্ত্তন, বাউল, রামপ্রসাদী, ভাটিয়ালী ইত্যাদি বয়সোপযোগী ভাষা বিশিষ্ট রেকর্ড সঙ্গীতও শেখার একটা দাম আছে। তাতে শিক্ষার্থীর কোনো ক্ষতি হয় না, উপরন্তু একটা স্বাধীনতার আনন্দ ও স্বাভাবিকতার উল্লাস স্ফুরিত হয়। এটা শিক্ষার্থীর সঙ্গীতমুখী বৃত্তিগুলি ফোটাবার কাজে বিশেষ সহায়তা করে, এমন কি নকল ক'রে বেসুরো উদ্ভট তান দিলেও প্রথম শিক্ষার্থীকে বারণ করা উচিত নয়। আমাদের সঙ্গীত-বিকাশের কারখানায় এই সব জিনিষগুলি কেটে ছেঁটে হীরা তৈরী হবে। কিন্তু নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে শিক্ষার্থীকে বুঝিয়ে তাকে গন্তব্য পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। (১) মুখ খুলে তার স্বাভাবিক স্বরে তাকে গান গাওয়াতে হবে। উঁচু সুরে গান গাইলে (বিশেষত, শিক্ষার সময় যখন এককালীন শব্দযন্ত্রকে অনেকক্ষণ কাজ করে যেতে হয়) গলনালী ও তার চারিদিকের শিরাগুলিকে অনর্থক পরিশ্রান্ত ক'রে দেওয়া হয়। গলার শির ফোলা, মুখ লাল হওয়া, চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসা—এগুলি অস্বাভাবিক এবং যাতে এগুলি না হয় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। এমন কি, কথাবার্ত্তায়ও যতদূর সম্ভব তাকে চেঁচামেচি করতে বারণ করা উচিত। প্রথম শিক্ষার্থীকে শিক্ষা উপলক্ষে কখনও এককালীন আধঘণ্টার বেশী গাইতে দেওয়া উচিত নয় এবং একবার গাওয়ার পরে চার-পাঁচ ঘণ্টা বিশ্রাম দিয়ে (তারপর প্রয়োজন হ'লে) আবার গান গাওয়ানো যেতে পারে। মুখ নীচু ক'রে, (যথা—হারমনিয়মের দিকে তাকিয়ে) বা বুকে হাঁটু চেপে (যথা—তম্বুরা নিয়ে) গান করলে কণ্ঠনালী ও শ্বাসযন্ত্রের উপরে অযথা চাপ পড়ে। দাঁড়িয়ে, চেয়ারে বসে অথবা সোজা হয়ে স্বাভাবিক ভাবে ব'সে গান করা ভাল। আমার মতে দাঁড়িয়ে গান করা, সম্ভব হলে সব চেয়ে ভাল। প্রয়োজন হ'লে হারমোনিয়ম বা তম্বুরা কোন উঁচু জায়গায় (টেবল চেয়ার ইত্যাদির) উপর রেখে কাজ চলতে পারে। বসলে শরীর স্বভাবতই অল্পবিস্তর সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তাতে শরীরের ভিতরকার যন্ত্রগুলির স্বাভাবিক অবস্থা থেকে যায় না—আবার, সোজা হয়ে বসাও একটা কষ্টকর ব্যাপার। তাই, আমার মতে দাঁড়িয়ে গান করাই সবচেয়ে ভাল। (২) শিক্ষার্থীকে "সহজে যা জীর্ণ হয়" এমন রকম খাবার খাওয়াতে হবে। কারণ, পরিপাকযন্ত্রের সঙ্গে স্বরযন্ত্রের নিকট-সম্বন্ধ আছে। মৌরী, সুপারী, ধনে প্রভৃতি শক্ত ধারাল মসলা গলাকে ক্ষত বিক্ষত করে। তাতে পরে ময়লা জ'মে একটা পরদা গোছের পড়ে যায়, যেমন—ধারাল চিরুণী দিয়ে মাথা আঁচড়ালে মাথার চামড়া লাঙ্গল চষা জমির মত হয়ে যায় এবং তাতে আরও বেশী ক'রে ময়লা জমবার সুবিধা হয়। এই ময়লা পরদার জন্যে গল-নালীর স্বাভাবিক সঙ্কোচন ও প্রসারণ অনেকটা বাধা পায় এবং সহজ সুরসৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটে। পান খেলে জিব মোটা হয় এটা সর্ব্বৈব ভুল। সুপারী, বেশী চুণ খয়ের ও মসলার জন্যে এই রকম পরদা পড়ে। তার জন্যে পানের মত একটা অপূর্ব্ব ভাল জিনিষকে ত্যাগ করতে বলা হয়। আমার মতে প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে খাবার পরে একটি ক'রে অল্প চুণ খয়ের এবং নামমাত্র মিহি সুপারী দিয়ে পান সেজে খেতে দেওয়া উচিত। অবশ্য পরে দেখতে হবে যেন সে মুখটা ধুয়ে ফেলে। তা না হলে দাঁতের পেছন দিকে ময়লা জমবে। সিগারেট বিড়ি ইত্যাদিও একই কারণে সঙ্গীত-শিক্ষার্থীর অনুপযোগী। পরিণত বয়স্ক শিক্ষার্থী, প্রয়োজন হ'লে হুঁকো খেতে পারেন। তবে যতদূর সম্ভব খুব জোরে টেনে না খাওয়াই ভাল। নাসারন্ধ্র পরিষ্কার রাখা উচিত এবং নাকে সরষের তেল দেওয়া এবং সম্ভব হ'লে

নাসাপান প্রভৃতিতে উপকার দর্শে। যাদের সর্দ্দিকাশীর ধাত তাদের গরম জলে নুন দিয়ে অথবা লবণাক্ত চায়ের জল দিয়ে প্রত্যহ দুবার গলগলা (gargle) করা একান্ত উচিত। দৈহিক কাজের জন্যে যে রকম অল্পবিস্তর ব্যায়াম প্রয়োজনীয়, স্বরযন্ত্রের কাজের জন্যে সেই রকম মুখ-গহ্বর, নাসারন্ধ্র ও বায়ুযন্ত্রের ব্যায়ামও একান্ত প্রয়োজনীয়। দৌড়ান, খেলা ও অন্যান্য দৈহিক পরিশ্রম, যাতে মানুষ হাঁপিয়ে পড়ে, সেটা পরিমিত ভাবে, শরীরের শক্তির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে করাই যুক্তি সঙ্গত। কিন্তু এই রকম পরিশ্রমের পর তিন-চার ঘণ্টা বিশ্রাম না নিয়ে কদাচ সঙ্গীত শিক্ষা করা উচিত নয়। এ বিষয়ে ডাক্তারের মত নেওয়াই শ্রেয়। শোবার সময়, হাতপা সমস্ত আলগা ক'রে নাক দিয়ে মনে মনে গুণে পাঁচ থেকে আরম্ভ করে ক্রমশ বাড়িয়ে বিশবার পর্য্যন্ত দীর্ঘ নিশ্বাস নেওয়া উচিত। যখন আর নিশ্বাস নেওয়া যায় না তখনই ধীরে ধীরে নিশ্বাস ছাড়বে, কদাচ নিশ্বাস এক সেকেণ্ডও বন্ধ করে রাখা উচিত নয়। আবার নিশ্বাস নিতে যত গোণা হবে—ছাড়তে তার চেয়ে যেন অন্তত পক্ষে চার বেশী গণা হয়। সাবধান, ছাড়বার সময় তাড়াতাড়ি গুণে ফাঁকি দিলে চলবে না। (৩) শিক্ষার্থী গান গাইবার সময় জিভ চামচের ভিতর দিকটার মত (concave) করে রাখবে। এই কথাটি পরিষ্কার ভাবে না বুঝে, স্বর সাধনার সময় অনেকে 'আ' না বলে 'অ্যা' বা 'অ' উচ্চারণ করে। হাঁ করলেই কচ্ছপের পিঠের মত জিভ উঁচু হয়ে আছে, কিংবা দুপাটি দাঁতের ফাঁকে বেরিয়া আছে, দেখতে কদর্য্য লাগে। তবে সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, জিভ মুখে ঠিক ভাবে থাকলে মুখ-গহ্বর reflector-এর কাজ করে এবং মুখ ঠিক ভাবে খুললে (অর্থাৎ এমন ভাবে যাতে দুপাটি দাঁতের মধ্যে একটি আঙ্গুল সহজে প্রবেশ করান যেতে পারে) ছোট স্বরও অনেক দূর পর্য্যন্ত শোনান যায়। যেমন মোটরের আলো reflector-এর সাহায্যে সহস্রগুণ উজ্জ্বলতা লাভ করে। (৪) সম্ভব হ'লে, মুদ্রাদোষ নিবারণের জন্য আরসির দিকে তাকিয়ে গান করা ভাল নিয়ম।

আত্মনির্ভর

রসরাজ অমৃতলাল বসু

যেটেরা পূজার রাতে বিধাতা ললাটে।
'সুখে থাক' এই কথা লিখেছেন শাঁটে॥
চঞ্চল ইন্দ্রিয় অঙ্গ খুঁতখুঁতে মন।
সহজ সুখের পথে ফেলে না চরণ॥
দোলায় দুলিতে মন দোল খায় তার।
ঈশ্বরনির্ভর ভুলে বিদ্রোহ সঞ্চার॥
রসনা ফুটিতে কথা, বলে 'হামি হামি'।
'হামি' 'হামি' হ'তে হ'তে শেখে 'আমি' আমি॥'
মায়ের কোলেতে দুধ খেতে নাহি চায়।
নিজে মুখে মাটী তুলে কাঁদিয়ে ভাসায়॥
মায়ের আঁচল ভুলে আমি বুলি শিখে।
হাত ধ'রে হাঁটাইতে ছোটে অন্য দিকে॥
টলিয়া হাঁটিতে ছুটে আছড়িয়া পড়ে।
তবু না মায়ের কোলে আদরেতে চড়ে॥*

* অসিভূষণ বসুর সৌজন্যে।

আবহমান

শ্রীঅমল মুখোপাধ্যায় বি-এল্

আজিকার ভালোবাসা—নাহি জানি কোথা আদি তার!
সে কোন্ আদিম দিনে সময়ের উৎস-মুখ হ'তে
প্রাণের আনন্দ লয়ে ভেসে এল বহি শঙ্কাভার
এ মোর প্রথম প্রেম মুক্তধারা জীবনের স্রোতে।

তাই মোর বক্ষঃ-তটে যুগান্তের তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস—
অন্তরে গুমরি ওঠে শত-কোটী প্রেমিকের ব্যথা,
আমার চুম্বনে ঝরে অতীতের মদির-নির্য্যাস,
মনের মন্দিরে জাগে চিরন্তন জীবন-দেবতা।

হে সুন্দর, সনাতন! যুগ-জয়ী তোমারি এ দান
অন্তর ছাপায়ে মোর অন্তরের পানে বহি যায়;
হয় তো আমারো প্রেমে ভবিষ্যৎ প্রাণের সন্ধান
গোপনে ভাসিছে সেই দুর্নিবার অজস্র ধারায়!

এমনি চলিছে স্রোত, এমনি বহিবে এর পর—
আজিকার ভালোবাসা বুকে ধরে কি চির-স্বাক্ষর!

ঘরের কাব্য

শ্রীমতিলাল দাশ

১

শরতের সোনালি রোদ উছলে পড়ছে—মন আজ খুশী। ছুটি—অনেক দিনের ছুটি। নিত্যাভ্যস্ত পথে আর ঘানি টানতে হবে না—তাই বেপরোয়া ফুর্ত্তিতে মনকে ভাসিয়ে দিলাম।

বাতায়নের ফাঁকে চোখে পড়ে নারিকেল-শাখা—ঝাউয়ের বন। ওর চিকণ-পাতার আড়ালে হলুদ-পাখী ডাকছে—একটা খোকা হোক, একটা খোকা হোক—

এলা এসে পাশে দাঁড়াল—তরুণী বধূ।

শোনো পাখী কি বলছে!

ওর মুখে জাগল ভ্রূকুটি—রক্তিমগণ্ডে রক্ত-রেখা বেশ মানাল; কিন্তু কাব্য-ভোগের অবসর হ'ল না—গর্জ্জন এল—'তুমি আমায় অপমান করছ?'

অবাক হয়ে ভীতকণ্ঠে বললাম—আমি!

তুমি—তোমাদের অসভ্য মনোভাব—কিছুতেই যাবে না।

জড়িতকণ্ঠে বললাম—'আমার দোষ কি? বনের পাখী গাইছে আপন মনে—আমি ত শেখাইনি—'

'বনের পাখী যেমন বেয়াদপ—তুমিও তেমনই—'

রোদের আলো যেন নিষ্প্রভ হয়ে ওঠে—বুকে যেন শেল ফোটে—দুঃসহ দুর্ব্বার শেল।

উদ্যানের ফরিয়পসিল তার পুষ্পের অর্ঘ্য সাজিয়েছিল—সে ফুল যেন ম্লান হয়ে চাইল।

পাখীর মধুর সুর যেন বেসুরা লাগল।

বেয়াদপি—তা অনেকটা সত্য। এলার কথা রূঢ়, সে আঘাত দেয়—প্রাণের তারে ব্যথা বাজায়, কিন্তু তার দোষ নেই—তার সঙ্গে সর্ত্ত ছিল—আমরা হব দুজনে শুধু বন্ধু—প্লেটোনিক বন্ধু।

কিন্তু নর ও নারী—তারা কি শুধু বন্ধু হতে পারে?

আকাশের তারা তাদের মনে জাগায় পিপাসা—বনের পাখী তাদের সাথে শত্রুতা করে—কাননের ফুল তাদের আকুল করে—বাতাস তাদের মনে দেয় দোলা।

চিন্তায় বাধা পড়ল, এলা বলল—'এসব বাঁদরামি না ক'রে যে বইটা লিখবে বলেছিলে তাতেই হাত দাও না কেন?'

সদুপদেশ—বন্ধুর সদুপদেশ—প্রণয়িনীর নয়।

ম্লানমুখে চাইলাম; বললাম—'আচ্ছা দেখি—'

'আচ্ছা দেখি নয়—কুঁড়েমির চেয়ে কাজ ভাল—'

নীতিকথা—কাব্যসম্মত নয়—তবু নীতিকথা—স্কুলে ও কলেজে অনেক হজম করেছি, কিন্তু ওদের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া বোধহয় চলে না।

কাগজ ও কলম বাহির করিলাম। এলা খানিক আশ্বস্ত হয়ে চলে গেল। কিন্তু মন বসে না, ভাবের ছন্দ কথার সাথে মিল পায় না।

ভাবছি আকাশ-পাতাল—তার নেই সূত্র—তার নেই জটা। এলা সুন্দরী—সর্ব্বনাশীর মত ওর মোহিনীরূপ—ও যে আকর্ষণ করে বিহ্বল করে—ও বোধ হয় তা জানে না। বুদ্ধি ওর নিরঙ্কুশ।

ছুটির দিনটা এমন কলহে আরম্ভ হ'ল—এর পরিণতি কোথায়? কে জানে!

কাজের দিনে হয় ত ভুলে থাকা যায়, কিন্তু ছুটির দিনে—না—বিদায় নিতে হবে—যেতে হবে হয় কাশ্মীরের জাফরাণ খেতে, না হয় গোপালপুরের বালু-বেলা-তীরে।

নির্ম্মল তড়াগ তীরে আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে বসে থাকা—আর যে পারুক—আমি পারব না।

চুক্তি—তা ঠিক। কল্পনায় যা ছিল সহজ, কাজে তা সম্ভব নয়।

উপায় কি? হয় ত ব্যবধান—হয় ত—না, এ 'হয়ত'র শেষ নেই।

কাশ্মীর—লোকে বলে ভূস্বর্গ—ওখানেই যাব।

২

চুক্তির ইতিহাসটা হয় ত জানা ভাল।

বন্ধু অচলের বিয়েতে প্রীতিভোজনের নিমন্ত্রণে এলার সঙ্গে পরিচয় হয়। বন্ধুপত্নী অচলার লজ্জারুণ মুখের পাশে এলার দৃপ্ত মহিমা আমায় মুগ্ধ ক'রে দেয়। এলা তখন এম-এ পড়ছে—গোপন আলাপের একটা সুযোগ ঘটে কয়েক দিন পরে।

আমার প্রণয়-নিবেদন শুনে এলা বলল—সে নারীত্বের গৌরবের জন্য জীবন উৎসর্গ করবে—বিয়ের বাঁধন তার জন্যে নয়।

আমি বললাম—'বন্ধন নয়, তুমি চল আমার ঘরে—শুধু আষাঢ়ের রজনীগন্ধার সৌরভের মত—তুমি হবে বন্ধনহীন।'

এলা বলল—'সে হয় না, আপনি বন্ধু নিয়ে তৃপ্ত হতে পারবেন না। আপনি চাইবেন আপনার হৃদয়-গেহিনী, আপনার শয্যাসঙ্গিনী—আপনার সন্তানের জননী—'

যৌবনের অন্ধমোহে বললাম—'না, না, তুমি আমি হব শুধু বন্ধু—দুজনের থাকবে জীবনে চলবার সমানাধিকার, বর্ব্বরতার বন্ধন তোমায় আমায় নয়—তুমি হবে শুধু সহচর—আনন্দের দূত—'

অচলা কখন ধূমকেতুর মত রসভঙ্গ করতে উপস্থিত হ'ল—সে শুনল, বলল—'আমি জানি এটা এলার বৃথাযুক্তি। নভেলিয়ানা নিয়ে দিন কাটে না—তবে ভাববেন না যোগেশবাবু, এলার মন মাখমের মত—ও যেদিন গলবে, প্রেমের বান যখন ডাকবে—তখন ওর উচ্ছ্বাসেই প্রাণান্ত হবে আপনার।'

এলা অচলার কথায় ক্রোধান্বিত হ'ল—সগর্ব্বে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল—'দেখলেন, এসব ফাঁকা কথার কাজ নয়—আপনি প্রতিজ্ঞা করুন—'

তাই প্রতিজ্ঞা করলাম।

কিন্তু তখন কি জানি? বাসনার নাগপাশের অপ্রতিহত শক্তি তখন অজ্ঞাত—কল্পনার রসে তখন কাব্যবনে বিচরণ করি—কাজেই অজ্ঞানে চুক্তি করলাম।

এলা নির্ম্মম—সেদিনের সে চুক্তিকে সে কঠোরভাবে আঁকড়ে আছে।

বুঝি না—নারী চির-রহস্যময়ী। স্নেহের চিরন্তন নির্ঝর যারা বুকে বয়, তারা এত নিষ্ঠুরতা কোথায় পায়? সৃষ্টির যে সনাতন ডাক পুরুষকে মদমত্ত করে, নারী কেমন ক'রে তার আহ্বানকে তুচ্ছ করে?

সমস্যা সমস্যাই রয়ে যায়—পাষাণী এলা পাষাণীই থাকে। বাঁচবার জন্য খেয়াল চাই—আমার কোনও খেয়াল নাই। জীবন একান্ত ফাঁকা ঠেকে।

পৃথিবীর নিত্যদিনের যাতায়াতের মাঝে সৌন্দর্য্য নাই—খেয়ালী তার খেয়ালের রঙে অতিপরিচিতকে রঙীন করিয়া তোলে—সে খেয়াল কোথায় পাই?

এলা সুখে আছে। পদ্মপাতার মত সে নির্লিপ্ত—তাকে আসক্তির সলিল আসক্ত করে না—সে দিব্য স্ফূর্ত্তিতে চলে। অনেকে আমার দুঃখ জানে না—বিষাদের এই ইতিহাস পড়ে না—তারা আমাকে বিদ্রূপ করে। বলে আমি দুঃখবাদী—মিথ্যাই দুঃখ গড়ি।

কিন্তু জীবনব্যাপী এই নির্ভরসার সম্মুখে কে সুখবাদী হ'তে পারে, বুঝি না—যে পারে সে হয় অতি-মানব, নয় অ-মানব; আমি দেবতা নই—আমি সংসারের একান্ত অতি-সাধারণ রক্ত মাংসের মানুষ—

৩

চাকর সাধুই দিন-চলার সঙ্গী—

সন্ধ্যারাতে অঙ্গমর্দ্দন করে, আর পৃথিবীর খবর বলে।

ওকে বলি—'কাশ্মীর যাব।'

সাধু প্রশ্ন করে—'মা, জীব?'

চুপ করিয়া থাকি—বলি—'না।'

সাধু বলে—'একটা গাড়ী কেনো বাবা—তারপর—'

উত্তর পায় না। গাড়ী কেনার আগ্রহ নেই। জিজ্ঞাসা করি—'তোর মা কি করছে?'

'মা সভা করিথিলা—বনমালী গাড়ী নি আইলা—মা চলি গেলা—'

দুঃখনিবারণী সভা—শহরের মহিলাদের অধিনায়িকা এলা—সকলের দুঃখ নিবারণ হয়—ঘরেই শুধু ব্যথার অনল দাউ দাউ জ্বলে।

সাধু বলে—'মা বলিথিলা, মা কাশ্মীর জীব—আমি কোথায় থাকিবু—আমি বাসায় রইবু না—আমি জীব—'

অনেকদিনের পুরাতন ভৃত্য। বলি—'কখন বলল?'

'কাল বলিথিলা।'

কিন্তু এ কি অন্যায়!

গৃহেই রচনা করেছে অপ্রীতির জগদ্দল বিহার—আর কেন, এবার মুক্তি দাও।

সাধু বলে—'আমি রইবু না বাবা—আমি জীব—'

সাধু অকস্মাৎ সন্ত্রস্ত হয়—এলার পদধ্বনি। সাধু পলায়।

এলা পাশে এসে বসে—সন্ধ্যার অন্ধকারে জ্যোতির্ম্ময়ী পরীর মতন।

আমি ভয়ে ভয়ে বলি—'সভা কেমন চলছে?'

এলা কথা বলে না—চুপ করেই থাকে।

জিজ্ঞাসা করি—'কি কাজ করলে আজ?'

'সে সব কথা থাক, তুমি তা হ'লে কাশ্মীর যাবে?'

'হাঁ, বিনয় তার গাড়ীটা বেচবে—কমদামেই পাব—গাড়ী নিয়েই বেরিয়ে পড়ব—তেপান্তরের পথে—যাত্রী—'

'তারপর?'

'তারপর ত কিছু নেই—যেখানে রাত হবে, সেখানে বাঁধব বাসা—পরদিন ভাঙব সে নীড়—চলব পথের পানে—নির্ব্বন্ধ অনাসক্তিতে—'

'অভিনয় করছ?'

'অভিনয় কোন জন্মেও করিনি এলা, কিন্তু সে কথা কেন বলছ?'

'আমি কি তোমার পথের কাঁটা হয়েছি?'

'সে প্রশ্ন অবান্তর এলা?'

'অবান্তর?'

'অবান্তর নয় কি—তুমি শক্তিময়ী—আমি দুর্ব্বল—আমি পালাতে চাই—তুমি থাক তোমার সাম্রাজ্যে সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্ঞী—'

'উপহাস করছ?'

'মোটেই না।'

'তবে?'

'আমি চুক্তি রাখতে পারছিনে এলা—'

মুক্তাকান্তির মত হাসি—অন্ধকারকে দীপ্ত করে—সে বলে—'তাই বুঝি যাচ্ছ কাশ্মীরী বধূর চিত্ত-জয়ে—'

'সে শক্তি নেই, তাই আঘাত করতে পার তুমি।'

'শক্তি নেই, বল কি—যুগে যুগে পুরুষ বহুগামী—'

ব্যথিত কণ্ঠে বলি—'এ তোমার সভা নয় এলা—'

'আমি কি তোমায় ভালবাসিনে?'

'জানিনে।'

এলা কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল—'বেশ, যে ভালবাসে তার কাছেই যাও।'

দুর্জ্ঞেয় রহস্যের কূলে হতবুদ্ধি হয়ে থাকি।

আকাশের পথে গ্রহের ভ্রমণ চলে—রাশিচক্রের আবর্ত্তন অগ্রসর হয়। বাতাস ফুলের গন্ধ আনে।

বলি—'এ কি এলা? আমায় ক্ষমা করো। কিন্তু তুমি কাঁদছ কেন?'

'যদি আমায় ভালবাসতে বুঝতে—'

এ কি নিষ্ঠুর পরিণাম!

'আমি কি তোমায় ভালবাসিনি?'

এলা চুপ করে—পরে বলে—'না, বাসনি। তুমি বীর, তুমি হবে দিগ্বিজয়ী—তুমি ভিক্ষুক হয়ে চাইবে কেন—তুমি জয় করবে—'

এ কি হেঁয়ালি! ভয়ে বলি—'এলা, তোমার কি অসুখ করেছে?'

'হাঁ, অসুখই করেছে। আমি তোমায় কোথাও যেতে দেব না।'

এই বলে সে কাছ ঘেঁসে এসে বসল—বলিল—'তুমি কোথাও যেতে পাবে না।'

অন্ধকারে আলো জ্বলল—এলাকে বক্ষে টেনে নিয়ে বললাম—'তুমি বিজয়িনী!'

এলা আলিঙ্গনের আবেশে এলাইয়া পড়িল, বলিল—'না, না, তুমি আমায় মান দিও না—লাঞ্ছনা দিয়ে আপন করে নাও।'

জাপান

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

(২)

পাহাড়ী কাঠের কাঠামো, টালিখোলার চাল, মাতুরের মেজে আর কাগজের বেড়া—এই নিয়ে জাপানীদের ঘর। অবশ্য এ বর্ণনা দিয়ে আসল বস্তুটির আন্দাজ করা শক্ত—যেমন খড়, মাটি ও রং বল্‌লে প্রতিমার পরিচয় জানা যায় না। অথচ এই কয়টি জিনিসের সুষ্ঠু সামঞ্জস্যের যে সৌন্দর্য্য, তা' এর চেয়ে বেশী কথায় বর্ণনা করতে গেলে হয়তো ভাষার বাহাতুরি দেখানো যেতে পারে, কিন্তু বর্ণনীয় বস্তুটিকে চোখ যে-রকম দেখে ঠিক তেমনটি করে উপস্থিত করা চলে না। প্রতিমার রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে ভাষা বড় জোর 'অতসীপুষ্পবর্ণাভা' 'নবদুর্ব্বাদলশ্যাম' প্রভৃতি কতকগুলি মামুলি বাঁধাবুলি ছাড়া আর এমন কিছু যোগান দিতে পারে না, যা দিয়ে প্রতিমার সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণভাবে চোখের সামনে ফুটে ওঠে—লেখক যতই শক্তিমান্ হোক্—ভাষা যতই সমৃদ্ধ হোক্—ছবির যে সৌন্দর্য্য তুলির টানে টানে রেখায় রেখায় ফুটে উঠে' নয়ন-মন মুগ্ধ করে—ভাষা সে সৌন্দর্য্যকে একমাত্র 'সুন্দর' ছাড়া আর কোন বাক্যে আজ পর্য্যন্ত প্রকাশ করতে পারে নি। মনের সব-কিছু ভাব, সব-কিছু সৌন্দর্য্যবোধ অক্ষরের রেখা অঙ্কনে প্রতিফলিত করবার দাবী কোন ভাষাই আজ পর্য্যন্ত কর্‌তে পারে নি। সেই অক্ষম ভাষার সাহায্য নিয়ে জাপানের এই ছবির মত বাড়ীগুলির ছবি আঁকতে গিয়ে শুধু যদি নিজেকেই হাস্যাস্পদ কর্‌তুম্ তাতে বিশেষ আপত্তি ছিল না—যদি না খেলো করা হ'তো ভাষাকে! তার অসম্পূর্ণতার জন্য আপশোষ করতে পারি, কিন্তু তার অপমান করতে পারি না।

তা'ছাড়া, বর্ণনার শোভাযাত্রা তার জন্যই সাজানো চলে—যার অলঙ্কার আছে, আয়োজন আছে, আড়ম্বর আছে। যা' নিঃস্ব—একমাত্র রিক্ততার মাধুর্য্য ছাড়া আর কোন পুঁজিই যার নেই, তার সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি করা চলে, কিন্তু উপন্যাস করা চলে না। গোলাপ বেলা মল্লিকা নিয়ে কবিতার পর কবিতা রচনা হয়েছে। এমন কি, কণ্টকিতা কেতকী পর্য্যন্ত কাব্যের তোষাখানায় সযত্নে তোলা আছে—বাদ্‌লা দিনের ব্যবস্থিত সঞ্চয়! কমল-কুমুদশুদ্ধ সমারোহের খাতিরে সূর্য্য-চন্দ্র পতিলাভ করেছে; সে বিবাহোৎসবে কাব্যরসিকেরা ভূরিভোজন ক'রে আসছেন আবহমান কাল থেকে, তবুও তাঁদের বদ্‌হজম হয়নি। কিন্তু কল্‌মি-ফুলের দিকে কেউ কখনও ফিরেও তাকায় নি—কারণ তার আড়ম্বর নেই। সারা আকাশের ছায়াপথ ঘুরেও কবিরা তার জন্য একটি বরও যোগাড় করতে পারেন নি। আদর পেয়েছে কুন্দ-কামিনী, কিন্তু নেবুফুল অনাদৃতই রয়ে গেছে, কারণ তার আড়ম্বর নেই। সীতার মর্ম্মন্তুদ দুঃখে যুগ-যুগান্তর ধরে' কত কবির অশ্রুর বন্যা বয়ে গেছে—কিন্তু উর্ম্মিলা চিরদিন কাব্যের উপেক্ষিতা। তাজমহলের মর্ম্মর-স্বপ্ন সারা তুনিয়াকে বিমুগ্ধ করেছে তার ঐশ্বর্য্যের সমারোহে, কিন্তু সিরাজ-মহিষী লুৎফার সমাধি-পাশে দীপ জ্বালাতে মাসে ছ'আনার বেশী বরাদ্দ নেই। রাজপ্রাসাদের নিখুঁত বর্ণনায় ভাষার যাতুকরেরা হয়রাণ হ'য়ে গেছেন, কিন্তু পর্ণকুটীরের দরিদ্রতা চিরকাল পঙ্গু করেছে তাঁদের উৎসাহকে। তুনিয়া আড়ম্বরের পূজারী; দরিদ্র সারল্যকে সে সত্য সত্যই ভালবাস্‌তে পারে না', তাকে সে অনুকম্পা করে শুধু নিজের উদারতার গৌরব বাড়া'তে!

জাপানের এই বাড়ীগুলির আড়ম্বর নেই, কিন্তু সৌষ্ঠব আছে। এই আয়োজনহীন সরলতার সৌন্দর্য্যই তার বড় বিশেষত্ব। কোথাও তার আতিশয্যের চিহ্নমাত্র নেই। কি ভিতরে, কি বাইরে, কোথাও তার এতটুকু রং নেই, বার্নিশ নেই, পালিশ নেই। অথচ কাঠের স্বাভাবিক রং বজায় রেখে শুদ্ধ ঘসে' মেজে তাকে কতখানি সুন্দর করে তোলা যায়, চোখে না দেখ্‌লে তা ঠিক বোঝা যায় না।

শহরের কথা বল্‌ছি না। সেখানে আমেরিকার

অনুকরণে কুড়ি-তলা বাইশ-তলা স্কাই-স্ক্র্যাপার দিন দিন অভ্র ভেদ ক'রে উঠ্‌ছে। কি আকারে, কি অলঙ্কারে—তার আড়ম্বরের অন্ত নেই। বাইরের বিশালতা তার বিস্ময় আনে, ভিতরের সাজগোজ আকর্ষণ করে। পাশ্চাত্যের যত কিছু বিলাসের উপকরণ তার কোনটারই অভাব সেখানে নেই। তার এক-একটা বাড়ীর ভিতরে ঢুকে জাপানে আছি কি নিউ-ইয়র্কে আছি, বোঝা যেত না—যদি তার সাজ-সজ্জায়, আস্‌বাব-উপকরণে জাপানী চরিত্রের সহজ-সুন্দর বৈশিষ্ট্যের ছাপ না থাকত!

কিন্তু জাপানীদের প্রায় কেউই শহরে বাস করে না। কাজেই শহরের মাপকাঠি দিয়ে জাপানী-জীবনকে বিচার কর্‌তে গেলে ভুল করা হবে। শহরের সীমানার বাইরে তু-চার মাইল গেলেই পাহাড়ের পাশে, নদীর ধারে, মনোরম স্থানের অন্ত নেই; সেখানে শহুরে জীবনের চাঞ্চল্য নেই, কোলাহল নেই,—আছে একান্তের শান্তি। সেইখানে ছোট ছোট বাড়ী ক'রে এবং প্রতি বাড়ীর সঙ্গে একটি ক'রে সুন্দর বাগান তৈরী ক'রে তারা বাস করে। সেইখানেই পাওয়া যায় তাদের প্রকৃত জীবনের স্পন্দন। তাই শহরের পাশ্চাত্য ঐশ্বর্য্যের পাশাপাশি এই সামান্য গৃহসজ্জার সারল্য, এই কাঠের বাড়ীগুলির সহজাত সৌন্দর্য্য, তার প্রাচ্য জীবনযাত্রার বিলাসহীনতা বিস্মিত করে, মুগ্ধ করে।

শহরের অট্টালিকাও খুব বেশী দিনের নয়। ভূমিকম্পের ভয়ে বড় বাড়ী তৈরীর কল্পনা কেউ কখনও করেনি। কংক্রীটের যুগ আরম্ভ হওয়ার পরে লোহার ফ্রেমের পরে কংক্রীটের দেওয়াল দিয়ে এই সব আধুনিক ইমারত তৈরী হয়েছে, তাতে ইট'পাথরের নাম গন্ধ নেই। তার সংখ্যাও খুব বেশী নয়—সারা শহরে শতকরা দশভাগের অধিক হবে না। বাকী সব সেই কাঠের ফ্রেম, কাগজের বেড়া আর টালিখোলার চাল। বড় বড় দোকানপাট, হোটেল-রিয়কান, আবাস-মন্দির, এমন কি রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত কাঠের বাড়ী।

আশ্চর্য্য জাপানের এই কাঠগুলি। বছরের পর বছর রোদে বৃষ্টিতে পড়ে থেকেও তাতে ঘুণ ধরে না, পচন ধরে না, তার কোথায়ও এতটুকু চিড় খায় না। কাগজের বেড়া শুন্‌তে ভারী আশ্চর্য্য লাগে, কিন্তু সত্যি সত্যিই এই কাগজ দিয়েই তারা বেড়া দেয়, যদিও সাধারণ লেখার কাগজের সঙ্গে তার অনেক তফাৎ। কিন্তু তাই ব'লে তা কাচের মতো নয়, কিংবা কাঠের মতো নয়। ঋতু অনুসারে তার পরিবর্ত্তন করা হয়, তার সহন-শীলতা এবং

মাটীর নীচে রেল ষ্টেশন—টোকিও

রংয়ের উপযোগিতার দিকে নজর রেখে। কৌতূহলী হয়ে জাপানী বন্ধুদের কাছে প্রশ্ন করেছি—কাগজের ঘরে বাস করে চোর ডাকাতের ভয় তারা এড়ায় কি করে? তাসের ঘরে বাস করা না কি নিরাপদ নয়, কিন্তু এও তো তাসের ঘরের মতোই। শ্রীরামচন্দ্র কখনও জাপানে গিয়ে রাজত্ব করেছিলেন বলে' শুনিনি, অথচ এ রামরাজত্ব তারা পেল কোথায়? উত্তর যা পেয়েছি তার মর্ম্মার্থ এই যে, জাপানীদের অনাড়ম্বর সরল জীবন স্তব্ধ করেছে তাদের দেশের চুরি-ডাকাতিকে। তার মানে এ নয় যে, সে দেশের লোক সকলেই পরমহংস! অর্থ এই যে গৃহস্বামীর অবস্থা যাই হোক, এই গৃহগুলি কিন্তু একেবারেই নিঃস্ব। চুরি

ডাকাতি না থাকার কারণ প্রবৃত্তির অভাব হয়তো ততটা নয়—যতটা বস্তুর অভাব।

জাপানীদের ঘরে অলঙ্কারের বালাই নেই। হাতভর্ত্তি সোনার চুড়ি, গলায় হার, কোমরে বিছে, কানে দুল, নাকে নাকছাবি, সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কারের এই আড়ষ্ট বন্ধনে জাপানী মেয়েরা বাঁধা পড়েনি। একমাত্র বিবাহের বরণের আংটি ছাড়া তাদের সারা দেহে সোনার চিহ্নমাত্র নেই। যে সোনাকে ভিত্তি করে সারা দুনিয়ার অর্থনীতির ইমারত গড়ে উঠেছে, তাকে বন্ধ্যা ক'রে সিন্দুকে বন্ধ রেখে তার অলস পেশল সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হতে তারা অভ্যস্ত হয়নি।

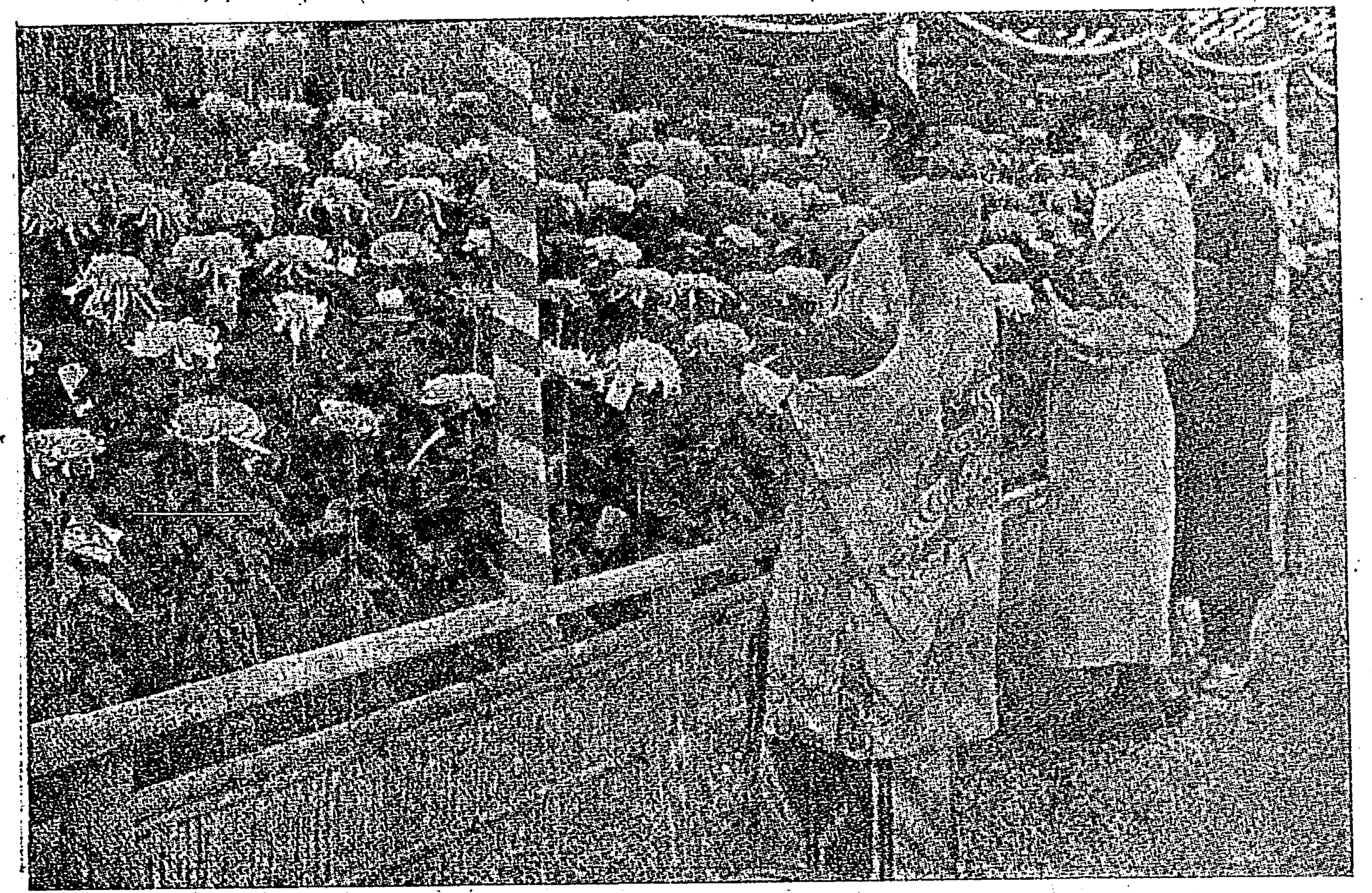

ক্রিসন্থিমাম ফুল

সিন্দুকে সোনা আর মাটীর নীচে টাকা রাখার পঙ্গু আভিজাত্য নিয়ে গর্ব্ব করতে তারা শেখেনি। শিল্প-বাণিজ্যের লীলাভূমির নারী তা'রা, নিজেরা যেমন আলস্যে দিন কাটায় না, অর্থকেও তেমনি নিরর্থক পড়ে থাকতে দেয় না। তারা যখের ধন আগ্‌লে প'ড়ে থাকে না। তাদের কষ্টার্জ্জিত সঞ্চয় তারা রাখে ব্যাঙ্কে, তারা নিয়োগ করে মিল ফ্যাক্টরির শেয়ারে। সমস্ত জাতির এইরূপ অকুণ্ঠিত সহায়তা পায় বলেই জাপানের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির গণেশ-বাবাজিরা সোজা হয়েই বসে থাকতে পারেন; তাঁদের ইঁদুর-বাহনেরা অল্পে অল্পে আসনের তলার মাটী খুঁড়ে ফাঁক করে ফেলে না এবং বাবাজিদেরও ল্যাণ্ডশ্লিপ-এর দরুণ উল্‌টে পড়তে হয় না।

অলঙ্কার যখন নেই, অর্থ যখন মিলে আর ব্যাঙ্কে, তখন চোর ডাকাতের লোভনীয় বস্তু আর বিশেষ কিছু রইল না। মূল্যবান বাসন-কোসন জাপানীদের ঘরে থাকে না। পিতল কাঁশা বা রূপার ব্যবহার তাদের নেই। পোর্সিলেনের ডিস্-কাপ তারা ব্যবহার করে—জাপানে মাটীর জিনিস মাটীর দামেই বিকোয়। তা' ছাড়া আছে, কাঠের ল্যাকার-করা তৈজসপত্র—দেখ্‌তে সুন্দর, দামে সস্তা এবং টেকসই হিসাবে উইল করে দিয়ে যাওয়া চলে। তারপর পোষাক পরিচ্ছদ, তাও অতি সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণ; তার যতখানি সৌন্দর্য্য—সে পরিমাণ দাম নয়। তা'তে না আছে সাচ্চা জরির কাজ, না আছে সল্‌মা-চুম্‌কির বাহার। গালিয়ে নিয়ে একরতি সোনা-রূপা পাওয়ারও সম্ভাবনা নেই। একমাত্র দামী জিনিস ওবি—অর্থাৎ যে কাপড়টা মেয়েরা পেটে বাঁধে প্রজা-পতির পাখার মতো। অবস্থা অনুসারে ওবির দাম অনেক সময় তিন অঙ্ক ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু তা নিয়ে বিক্রী করতে গেলে ধরা-পড়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। তা'ছাড়া শুধু একখানা কাপড় চুরি করতে হানা দেওয়ার মজুরি পোষায় না। ডাকাতদের ত নয়ই, ছিঁচকে চোরেরও নয়!

জাপানীদের ঘরে আসবাবপত্রের বালাই নেই। যে জাপানী মাদুর আমরা এখানে সচরাচর দেখে থাকি, সেই রকম মাদুর দিয়ে প্রায় তিন ইঞ্চি পুরু গদি তৈরী হয়, ভিতরে একজাতীয় মোলায়েম ঘাস দিয়ে। লম্বায় ছ' ফুট, চওড়ায় তিন ফুট। সকল জাপানীর বাড়ীই এই গদির মাপে তৈরী—ছয় গদির ঘর—আট গদির ঘর—এই হিসাবে। মাটী থেকে প্রায় তিন ফুট উপরে কাঠের ফ্রেমের

উপর এই-সব গদি বসানো থাকে—এই ঘরের মেজে। মেজের নীচেটা থাকে একেবারে ফাঁকা—স্যাঁৎসেঁতের ভয় থাকে না। এই গদির মেজের উপর জাপানীরা কখনও বজ্রাসনে কখনও সিদ্ধাসনে বসে, ছোট ছোট কুশান অর্থাৎ তুলার বালিস পেতে—কুশাসন পেতে নয়। চেয়ার টেবিল খাট পালঙ্কের বালাই নেই। থাকবার মধ্যে কেবল একখানা ল্যাকার-করা হাল্‌কা টেবিল, ফুট দেড়েক উঁচু। খাওয়ার সময় এই টেবিল তারা ঘরের মেজেয় পেতে খানা খায়, খাওয়া শেষ হলে আবার ধুয়ে-মুছে অন্য জায়গায় রেখে দেয় এবং সেই মেজেতে তারা বিছানা

বাঁশের বেড়ার সম্মুখে জাপানী তরুণী

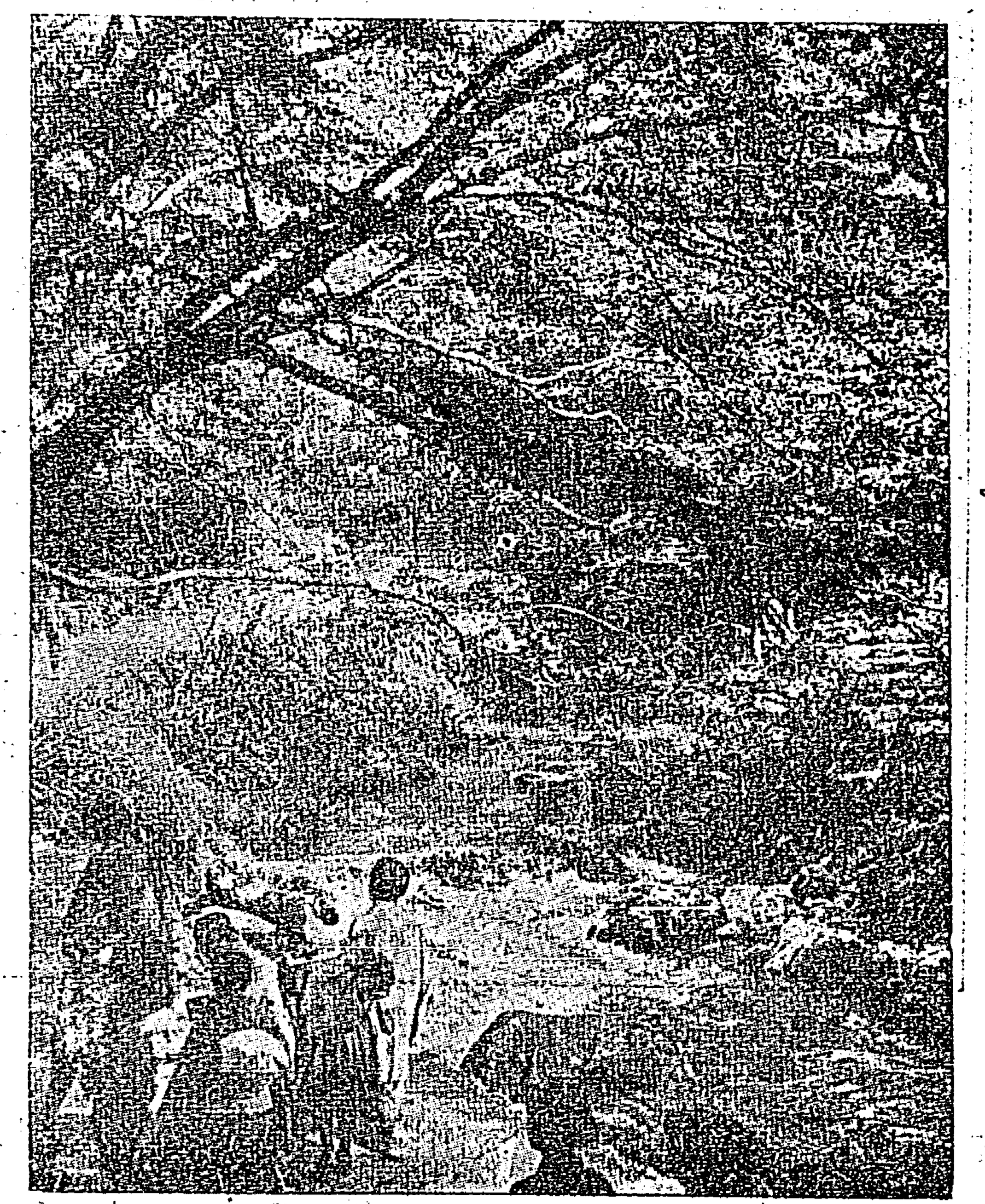

ম্যাপেল

পেতে শয়ন করে। সকাল বেলায় বিছানা তারা ভাঁজ করে' তুলে রেখে দেয়, ঘরের এক পাশে কাগজের ঠেলা দরজা খুলে দেওয়ালের গায়ে আল্‌মারির ভিতর। ঘরের ভিতর থাকে না বিছানা বালিসের ছড়াছড়ি।

ঘরের একদিকে ফুটখানেক উঁচু একটা মঞ্চ থাকে। তার নাম টোকোনোমা অর্থাৎ সন্মানের স্থান। ঘরের একদিকের খানিকটা অংশ, প্রায় তিনফুট চওড়া জায়গা, অনেকটা ষ্টেজের মত করা। তার উপর তারা সাজিয়ে রাখে ফুলের সাজি, ঝুলিয়ে রাখে দু-একখানা ছবি এবং তাদের প্রিয় কোন একটা কবিতার দু'চার লাইন—মোটা কাগজের ওপর তুলি দিয়ে লেখা। ঘরের আর কোথায়ও ছবির বাহার বা ফুলদানির আড়ম্বর নেই। ঋতু অনুযায়ী এই ফুলের, ছবির এবং কবিতার অদলবদল হয়। কোন সম্মানিত অতিথি এলে, তাকে বসতে হয় এই টোকোনোমার দিকে এবং গৃহস্থ বসে সেই দিকে মুখ ক'রে। মঞ্চের উপর কারও বসবার নিয়ম নেই। কিন্তু তার সামনে বসে' আমার কেবল মনে পড়েছে আমাদের দেশের কথকঠাকুরদের কথা। এখানে বস্‌তে পেলে তাঁরা হয়তো অষ্টপ্রহরই পাঠ চালাতে পারতেন। ভাগবত পাঠের এমন উপযুক্ত মঞ্চ আমাদের দেশে বড় একটা পাওয়া যায় না।

ল্যাকার-করা সুন্দর টেবিলের উপর জাপানীরা যে খাদ্য আহার করে তার বর্ণনায় কারও জিহ্বায় জল-সঞ্চারের সম্ভাবনা নেই, সে কথা আগেই বলে রাখা ভাল। আহার জিনিসটাকে জাপানীরা বড় সংক্ষেপ ক'রে নিয়েছে। তা'তে না আছে কালিয়া-কোর্ম্মার খোশ্‌বো, না আছে সুক্ত-ডালনার স্বাদ। জাপানীরা ভাত খায় তিন বেলা। মোটা

আতপচালের ভাত—ফেন গড়ানো নয়, ভিতরেই শুকিয়ে-নেওয়া। আমাদের দেশে যাদের সরু দাদ্খানি বালামের ঝুরঝুরে ভাত খাওয়া অভ্যাস—এ ভাত খেতে তাদের জীবন্তে পিণ্ড-আস্বাদনের অভিজ্ঞতা লাভ হবে। অন্যান্য আয়োজনও খুব রুচিকর নয়। একটা পাতলা সুপ—আমাদের ঝোল খাওয়া মুখে তা ভাল লাগবে না। তারপর সিদ্ধ এবং কাঁচা তরকারি—আমাদের পোড়ার মুখে তা' রুচবে না। তার পরেরটি শোনবার আগে বরফের কুঁচি মুখে রাখতে অনুরোধ কচ্ছি, কারণ গা-বমি করাটা অতি সহজেই অনেকের সুরুচির পরিচয় দিয়ে থাকে। কিন্তু সাঁতলানো,

চেরি-ফুল

সুঁটকি এবং কাঁচা মাছ জাপানীদের খুব প্রিয় খাদ্য। এক রকম কালো রংয়ের সস্ দিয়ে তারা তা' খায়। নেহাৎ মন্দ লাগে না। অবশ্য ভোজনবিলাসীদের কথা স্বতন্ত্র।

দধি দুগ্ধ ঘৃত মাখম জাপানীরা কখনও চোখেও দেখে না। মাংস তারা খায় খুব কম—যেমন সখ ক'রে এক-আধ দিন আমরা খেয়ে থাকি। এ খাওয়ার ভিতর আগে তাদের বাচ্-বিচার ছিল—এখন আর নেই। মুরগী, শূকর, এমন কি, তার বড়টা পর্য্যন্ত তারা এখন চালিয়ে নিয়েছে, যদিও এমন কুসংস্কারাপন্ন বুড়োবুড়ী এখনও আছে, যারা বাড়ীতে ও-সব রান্না করতে দেয় না। আমাদের দেশে নিষিদ্ধ পক্ষীমাংসের যেমন প্রথম সৎকার হয়েছিল ঢেঁকিশালে, এখন লক্ষ্মীর মত তিনি হেঁসেলে ঢুকেছেন, তাদের দেশেও তেমনি। কিন্তু সংস্কারের আইনে না বাধলেও সচরাচর তার বড় একটা প্রচলন নেই—আমাদের দেশের বিধবা-বিবাহের মতো।

মুরগীর ডিম জাপানীরা ব্যবহার করে খুব বেশী। ডিমগুলির বিশেষত্ব আছে। আমাদের দেশের হাঁসের ডিমকে তারা আকারে হার মানিয়েছে। এখানে মুরগীর ডিম যাঁরা গোপনে খান, তাঁরা এর নাম দিয়েছেন 'ছোট ডিম'। কিন্তু জাপানের এই ডিমগুলি ঠিক রাজহাঁসের ডিমের মত। শুনলাম তাদের দেশে এর আকার আগে এমনই ছোট ছিল, চেষ্টা ক'রে তারা বড় বানিয়েছে। আমাদের সখ আছে—কিন্তু চেষ্টা নেই।

জাপানীদের খাওয়ার একটা বিশেষ অনুষ্ঠান আছে, তার নাম সিকিয়াকি। কোন বিশিষ্ট অতিথিকে নিমন্ত্রণ করলে তারা এর আয়োজন করে। আয়োজনটি একটু বিচিত্র রকমের। খাওয়ার টেবিলের মাঝখানে তোলা উনুনে কড়া বসিয়ে তাতে হাড়বিহীন মাংস, কাঁটাহীন মাছ এবং খোসা-ছাড়া তরকারি চাপিয়ে দেওয়া হয়। টেবিলের চারিপাশে এক একটা বাটি হাতে করে সকলে ঘিরে বসে। যেমন যেমন সিদ্ধ হতে থাকে, খাওয়ার কাঠি দিয়ে তারা খেতে আরম্ভ করে। এ খাওয়ায় স্বাদ ও তৃপ্তি যেমন আছে তার চেয়ে বেশী আছে পরস্পরের ভিতর একটা ঘনিষ্ঠ আন্তরিকতার সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধকে জাপানীরা বড় মূল্যমান মনে করে এবং এই আন্তরিকতার সূত্র দিয়ে তারা পরকে আপন করে নিতে চায়।

সাহেবী ধরণে খাবারের পাত্র পাস্ করবার দস্তর জাপানীদের নেই। বাঙ্গালীদের মতো আহারের সব কিছু উপকরণ তা'রা একসঙ্গে ভোক্তার সামনে উপস্থিত করে

এবং গৃহিণীরা নিজের হাতে গরম খাবার পরিবেশন করে' ভোক্তাকে পরিতুষ্ট করে। জাপানীরা গরম খাবার খেতে ভালোবাসে। অনেক সময় এত গরম তারা খায় যে অনভ্যস্ত যা'রা, তা'দের হয়তো জিভ্ পুড়ে যাবে! জাপানে শ্রীক্ষেত্র জগন্নাথধাম নাই বলেই বোধহয় পান্তাভাতের প্রচলন সেখানে নাই।

খাওয়ার সময়েও জাপানীদের আদব-কায়দা আছে অনেক-কিছু। খাওয়ার সময় গৃহিণীরা যখন সাম্নে বসে, তা'দের হাতে তখন হাত-পাখা থাকে না বটে—ঠাণ্ডা

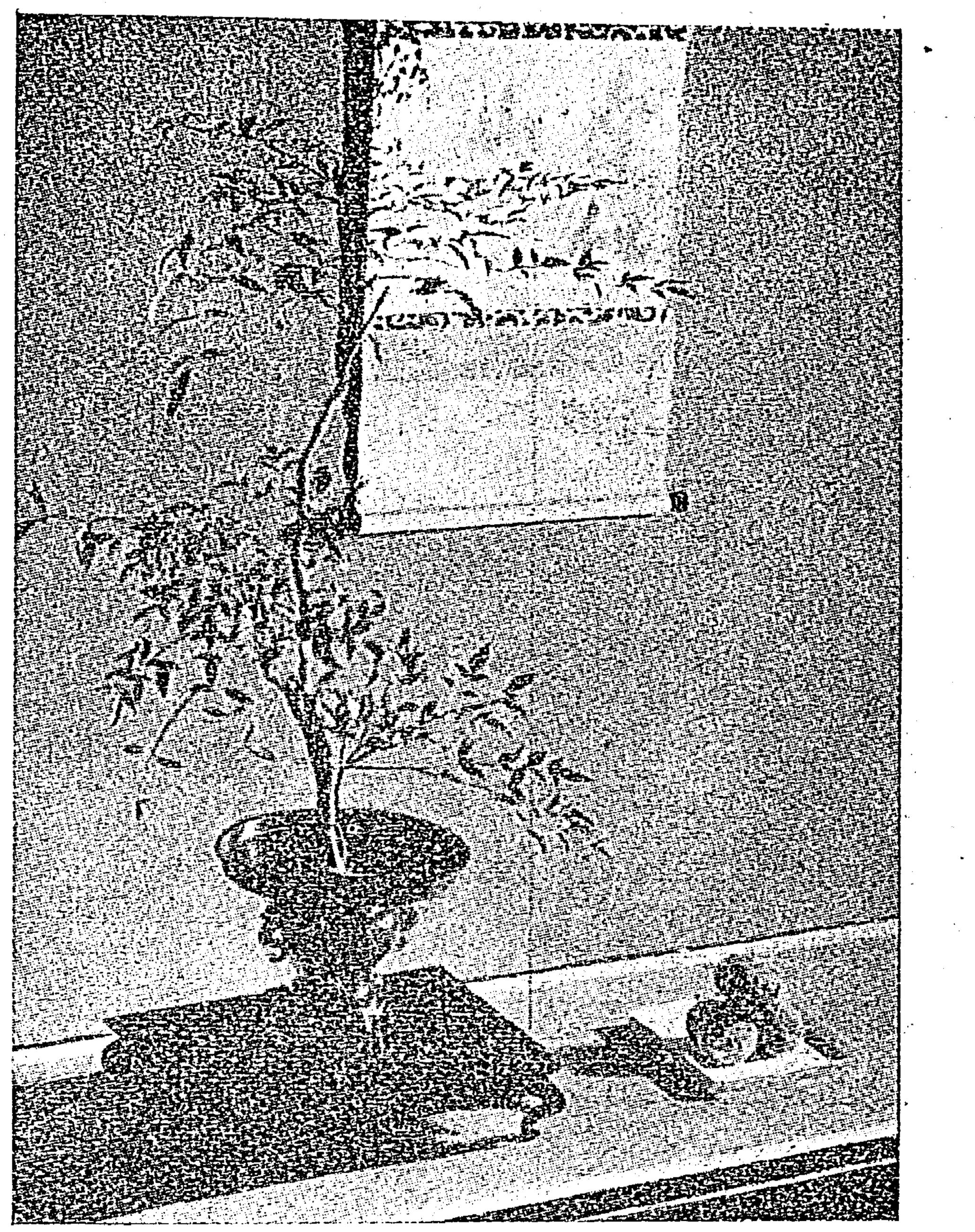

টোকোনোমার বৃক্ষসজ্জা

দেশে তার প্রয়োজনও হয় না—কিন্তু তা'রা কাছে বসে' নানা রকম আলাপে-আলোচনায় আহার জিনিসটাকে একঘেয়ে গর্ত্তপূরণের বিড়ম্বনা থেকে উপভোগ্য করে' তোলে। হাসি-ঠাট্টায়, আমোদে-আহ্লাদে তা'রা সারা দিনের কর্ম্মক্লান্ত পরিজনের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে। শত অভাব-অভিযোগের লম্বা ফিরিস্তি বা গয়নার ফর্দ্দ পেশ করবার এই মাহেন্দ্রক্ষণটি তাদের পাঁজিতে লেখা নাই।

কিন্তু তা'দের শ্রুতি ও স্মৃতির ভাণ্ডারে যে-সব বিধি-ব্যবস্থার পুঁজি আছে, তাও নিতান্ত কম নয়। তার একটুখানি ব্যত্যয় হলেই বিপর্য্যয় বাধ্বার সম্ভাবনা। জাপানী মাত্রেই বড় ভাবপ্রবণ। ব্যবহারের একটু তারতম্য হলেই তা'রা বড় আহত হয়। আহারের সময়ে তরী-তরকারি যেমন-তেমন, ভাত অন্ততঃ দু-বার না নিলে তারা ব্যথিত হয়—মনে করে আহার্য্য ভোক্তার রুচিকর হয় নি,'—অথবা সে তাকে অবহেলা করছে। তেম্নি আবার শুধু ভাত নিয়েই নিস্তার নাই—যতটা নেওয়া হবে, তার সবটাই নিঃশেষে খাওয়া চাই—সদ্ব্রাহ্মণের শত-অন্নের দোহাই দিয়েও রেহাই নাই—তারা ব্যথিত হবে। ভাত দু-তিনবার চেয়ে নিয়ে যিনি নিঃশেষে খেতে পারবেন, তাঁর উপর জাপানীরা ভারী খুশী হয়—নেওয়ার সময় পরিমাণ কম করে' নিলে অবশ্য কোন আপত্তি নাই।

তাদের এই যাচাই করার ভিতর এইটুকু বিশেষত্ব আছে যে, তা'তে যত্ন আছে, কিন্তু পীড়ন নাই। শাস্ত্রের আর সমস্ত বিধান সযত্নে মেনে চ'লেও আমরা কিন্তু 'ন

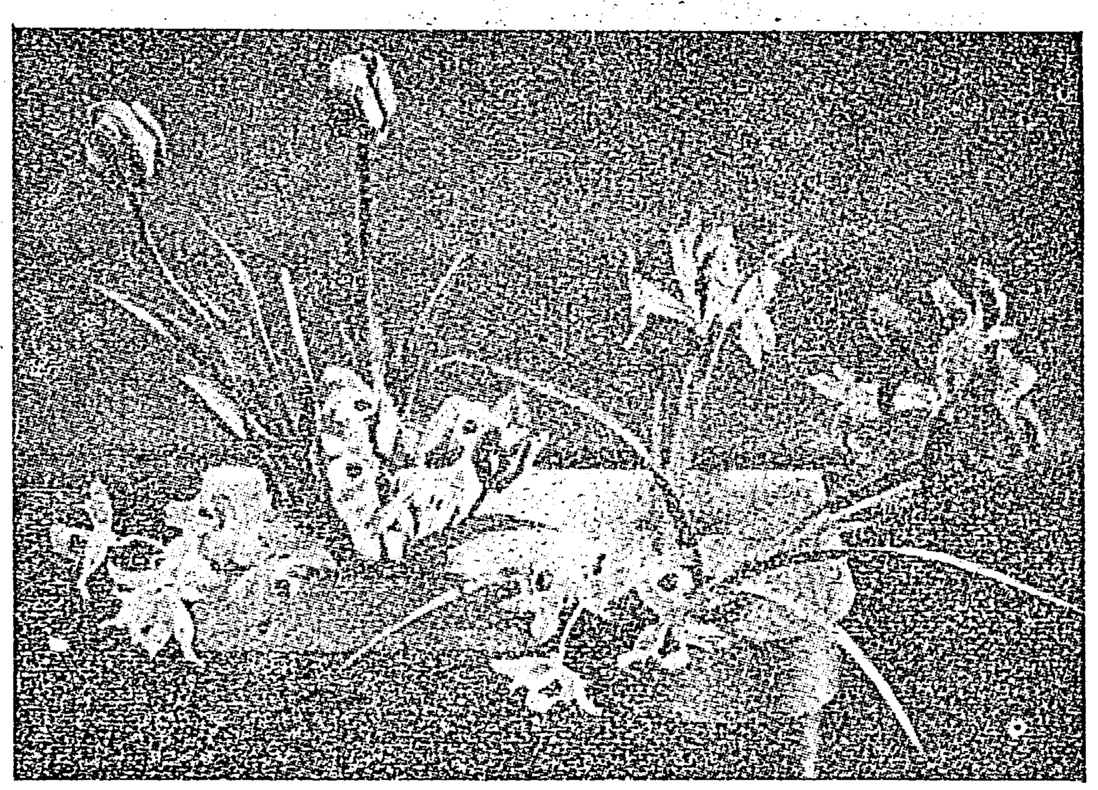

টোকোনোমার পুষ্পসজ্জা

দেয়ং ব্যাঘ্রঝম্পনের" বিধানটা সব সময় মান্তে চাই না। আদরের আতিশয্যে অনেক সময় ব্যাঘ্র-ঝম্পিতের মাথার উপরই আমরা পরিবেশন করে ফেলি এবং ভোক্তার উদরের থলিটি চামড়ার কি রবারের তৈরী, তা'র স্থির সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা তাকে ছাড়্তে চাই না। কিন্তু জাপানীদের যত্নের ভিতর ভোক্তাকে খুশী করবার চেষ্টা আছে—তার উদর-ব্লাডারকে পাম্প করবার ব্যবস্থা নাই।

কাঁচা মাছ খাওয়ার প্রসঙ্গে একটা কৈফিয়ৎ দেওয়ার

আছে। অনেকের ধারণা, জাপানীরা চীনেদের মতোই সাপ-ব্যাং আর্শলা-টিক্‌টিকি খেয়ে থাকে। চীনেদের সঙ্গে জাপানীদের আকার ও চেহারার সাদৃশ্যের দরুণ এবং দুই জাতিরই কাঠি দিয়ে খাওয়ার রীতির নিমিত্ত তাদের খাদ্যকেও আমরা একই শ্রেণীর ধরে নিয়ে থাকি। চীনে পাড়া দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের আহার্য্য বস্তর যে সুগন্ধ আমাদের নাকের ভিতর দিয়া উদরে পশিয়া সমস্ত শরীরটাকে আলোড়িত করে তোলে, জাপানীদের শুট্‌কি-মাছের আতরদানিতেও আমরা সেই সুগন্ধের কল্পনা করে নিয়েছি—সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা নাই বলেই—আদতে কিন্তু ব্যাপারটা একেবারেই উল্টো। চীনেরা যেমন অপরিচ্ছন্নতা

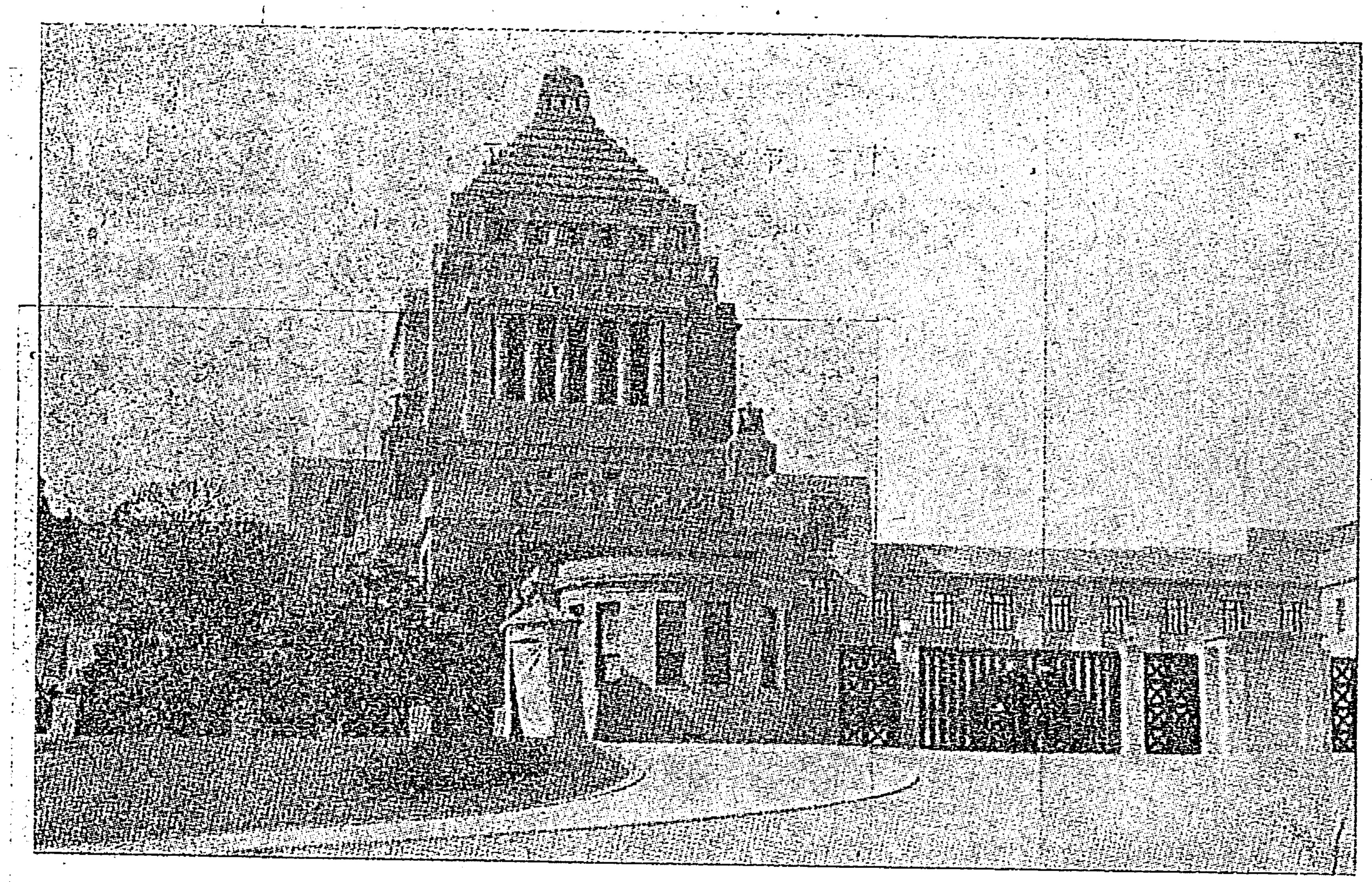

জাপানের পার্লামেণ্ট গৃহ

এবং কুরুচির জন্য বিশ্ববিদিত—জাপানীরা তেমনি পরিচ্ছন্নতা এবং সুরুচি সম্বন্ধে অতিরিক্ত খুঁৎখুঁতে। দুর্গন্ধ জিনিসটা তা'রা একেবারেই সহ্য করতে পারে না।

চীনেরা খায় খুব বেশী এবং তার পরিমাণও যথেষ্ট। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রায় অনবরতই তাদের মুখ চলছে। কিন্তু জাপানীরা খায় খুব কম এবং তার আয়োজনও খুব সংক্ষিপ্ত। মাছ বা তরকারীর একটা সুপ, কিছু কাঁচা বা সিদ্ধ শাক বা মাছ, দুধ-চিনি-না-দেওয়া সবুজ চা আর ভাত—জাপানীদের এই সাধারণ আহার। সে স্বল্প আয়োজন দেখে আমাদের মতো চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় আহারীদের হয় তো আশঙ্কাই হবে যে পেট ভরবে না। কিন্তু দেখেছি, কুমীরের পেট না হ'লে ভর্ত্তি হ'তে কিছুই বাকী থাকে না।

কাঁচা মাছ খায় বলেই যে তারা সব কিছুই কাঁচা খায়, তা' নয়। একরকমের কাঁটাবিহীন সামুদ্রিক মাছ আছে, যার আঁশ নেই এবং আঁশ্‌টে গন্ধ নেই। সে মাছ কাঁচা খেতে কোন অসুবিধা নাই। কাঁটা-ওয়ালা বা আঁশ-ওয়ালা মাছ তা'রা সাঁত্‌লে খায়। চিংড়ি মাছের কাট্‌লেট্‌ তা'রাও খেয়ে থাকে। জাপানী আহার্য্যের খাদ্য-মূল্য (Food value) প্রচুর, কারণ আহার্য্য-বস্তর ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ তা'রা অতিরিক্ত সিদ্ধ করে' নষ্ট হ'তে দেয় না। যে জাতির পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য্য-বোধের তুলনা নাই, তাদের রুচিকে অতখানি কদর্য্য কল্পনা করবার কি কারণ আছে, তা' রুচিবাগীশেরাই বল্‌তে পারেন।

অবশ্য একথা হল্‌প করে' বল্‌তে পারি না যে, কুরুচি-কর খাদ্য খাওয়ার লোক সে দেশে একেবারেই কেউ নেই। আমাদের এই আচার-শাসিত আহারের দেশেও এক শ্রেণীর লোকে ধেঁাড়া সাপ খেয়ে থাকে। শামুক-গুগ্‌লির ঝোল চিকিৎসা-শাস্ত্রের সুপারিশ নিয়ে আমাদের রুচির সঙ্গে একটা কম্‌প্রোমাইজ করে' ফেলেছে। জাপানেও যদি সেই শ্রেণীর লোক থাকে তা'তে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছুই নাই। কিন্তু তার দ্বারা সমস্ত জাপানীকে বিচার করা চলে না।

ভেতো বাঙালী বলে' আমাদের একটা দুর্ণাম আছে। অথচ তিনবেলা ফেন-ভাত খেয়েও জাপানীদের সে দুর্ণাম যে নাই কেন—তার বিচার করা দরকার। ক্ষীর ননী দুধ-ঘি খেয়ে আমরা কুষ্মাণ্ডের মতো ভুঁড়ি দুলিয়ে বেড়াই, মশলার রসায়ন খেয়ে ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার ঢেঁকুর তুলি, আর

কাঁচা-মাছ-তরকারী খেয়ে জাপানীরা যে শক্তি সঞ্চয় করে, আমরা তা' পাই কোথায়? সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ভিতর জিহ্বাটাকেই আমরা বড় করে' তুলেছি। ভীম নাগ, দ্বারিক ঘোষের বাড়-বাড়ন্ত হোক্‌—কিন্তু কাঁচা ফলমূলের খাবার বেচ্‌বার দোকান আমাদের দেশে কবে হবে?

খাওয়ার আয়োজনের জন্য জাপানীরা দিনের কতটুকু সময় ব্যয় করে, শুন্‌লে অবাক্‌ হ'তে হয়। আমাদের দেশে কি ধনী, কি দরিদ্র, সকল গৃহস্থেরই ভোর থেকে আরম্ভ করে' গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত শুধু খাওয়ার ধান্দাতেই কেটে যায়। এমন অনেক গৃহস্থ আছেন, যাঁদের বাড়ীতে উনুন জ্বলে ঠিক সাগ্নিকের চির প্রজ্জ্বলিত বহ্নিশিখার মতো। কিন্তু জাপানীরা রাঁধে শুধু দু'বার এবং প্রতিবারে তাদের আধ ঘণ্টার বেশী সময় লাগে না। শুধু ভাতটা সিদ্ধ হ'তে যতক্ষণ। তা'র ভেতরেই তা'রা যৎসামান্য তরকারীর যোগাড় করে' নেয়—অধিকাংশই কাঁচা। আতপ চালের ভাত হ'তে বেশীক্ষণ লাগে না, সাঁত্‌লানোর কাজও অল্প সময়েই সারা যায়। তারপর সুপটা তৈরী হলেই উনুনের নিবৃত্তি।

পুরুষেরা সকাল ৭টায় খেয়ে কাজে বেরিয়ে যায়, দুপুরের খাওয়াটা তা'রা বাইরেই খায়। অনেক আফিসে টিফিনের বন্দোবস্ত আছে। যাদের নেই, তারা হোটেলে খুব সস্তায় সেরে নেয়। ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাওয়ার সময় বাঁশের কৌটায় করে' খাবার নিয়ে যায়। মেয়েরা বাড়ীতে সকালের রান্না দিয়েই চালিয়ে নেয়। কাজেই সারাটা দিন তাদের সময় থাকে প্রচুর। এই সময়ের ভিতর তারা হাঠ-বাজার দোকান-পশারের কাজ সারে, আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে, সেলাই-বোনা বা ছেলেমেয়ের জামা তৈরী করে এবং ঘরের খুঁটিনাটি সাতশ' রকম কাজের ব্যবস্থা করে। যেখানেই তারা যাক্‌ না কেন, সন্ধ্যার আগে ঠিক বাড়ীতে ফিরে আসে, কেননা স্বামী-পুত্রকে নিজের হাতে রেঁধে-খাওয়ানো তা'রা তাদের বিশেষ অধিকার বলে' মনে করে, ঝি-চাকরের প্রাচুর্য্য থাকলেও তাদের এ অধিকারের উপর কাউকেই তারা হস্তক্ষেপ করতে দেয় না।

এঁদের সঙ্গে আমাদের দেশের গৃহলক্ষ্মীদের একটু তুলনা করবার দুষ্প্রবৃত্তি কিছুতেই দমন করা যায় না। সারাদিন তরকারি কুটেই তা'রা অবসর পান্‌ না একটু পানদোক্তা খেতে। নিজের হাতে রান্না করাটা তো অক্ষমতার চেয়ে অপমানের বিষয় হয়ে পড়েছে। অত্যাবশ্যকীয় দিবানিদ্রার পর একটু নভেল পড়্‌বার বা পাড়ার আর দু-দশজনের সঙ্গে সংসারের সকলের দোষকীর্ত্তন এবং নিজের অশেষ গুণের সবিশেষ বর্ণনা দেওয়ার সময়টুকু পাওয়া যায় না বলে' তা'দের আক্ষেপের অন্ত নাই। অতিরিক্ত খাটুনীর ফলে তাঁদের স্থূল দেহ যে আরও স্থূলত্বপ্রাপ্ত না হ'য়ে কেন কৃশ হ'যে আস্‌ছে, এই দুশ্চিন্তায় তা'রা অস্থির। আধুনিকাদের কথা না-ই বল্লাম, কেননা প্রাচীনাদের চেয়ে তাঁদের শিক্ষা বেশী, কিন্তু ধৈর্য্য কম। তা'ছাড়া, স্বরূপ-বর্ণনা মাত্রেই নিন্দার মতো শোনায়—এমন কি দেবতাদেরও!

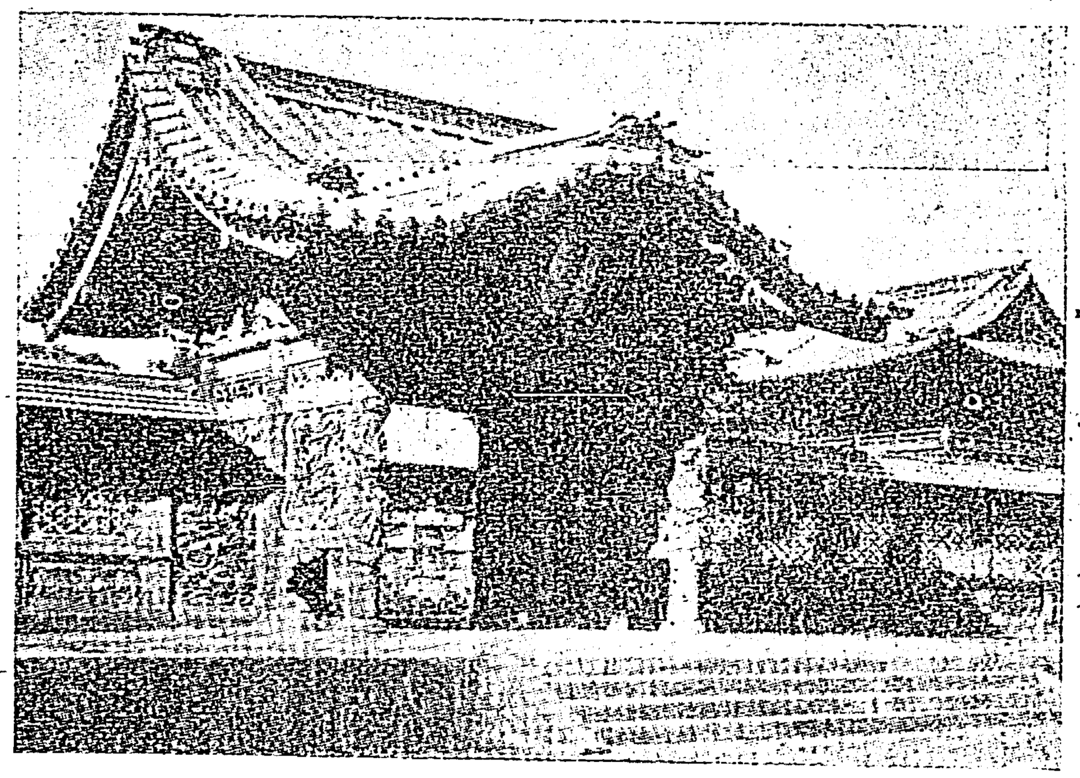

মন্দির দ্বার—টোকিও

জাপানে ঘুরে এবং জাপানীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে, শুধু একটা কথাই আমার অনবরত মনে জেগেছে যে—জাপানীদের পূর্ব্বপুরুষ বাঙালী ছিল কিনা! নতুবা সহস্র যোজনদ্বারা দূরীকৃত এই দুটি জাতির ভিতর এমন আশ্চর্য্য রকমের মিল সম্ভব হ'ল কি করে? শুধু আহার, বিহার ও জীবন-যাত্রার প্রণালীতে নয়—শিক্ষায়, সংস্কারে, প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিতে, এমন কি মনোবৃত্তিতে পর্য্যন্ত এই দুই জাতির ভিতর অতি সুস্পষ্ট সাদৃশ্য আছে। এতখানি মিলের মূলে কোন বিশেষ কারণ না থাকলে শুধু এক্‌সিডেণ্ট বলে' একে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। এই সাদৃশ্যের যোগসূত্র খুঁজে বার করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়—কারণ আমার অক্ষমতা আছে এবং বিনয় আছে। তা'ছাড়া,

আহার এবং নিদ্রা, এই দু'টিতেই আমার প্রয়োজন যথেষ্ঠ। কোন বিশেষজ্ঞ নৃতত্ত্ববিদ এই সঙ্কেত গ্রহণ করে' আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গবেষণা করতে পারলে হয়তো জগতে একটা অদ্ভুত কীর্ত্তি রেখে যেতে পারবেন।

এম্‌নি করেই তো জগতের বড় বড় তথ্যের আবিষ্কার

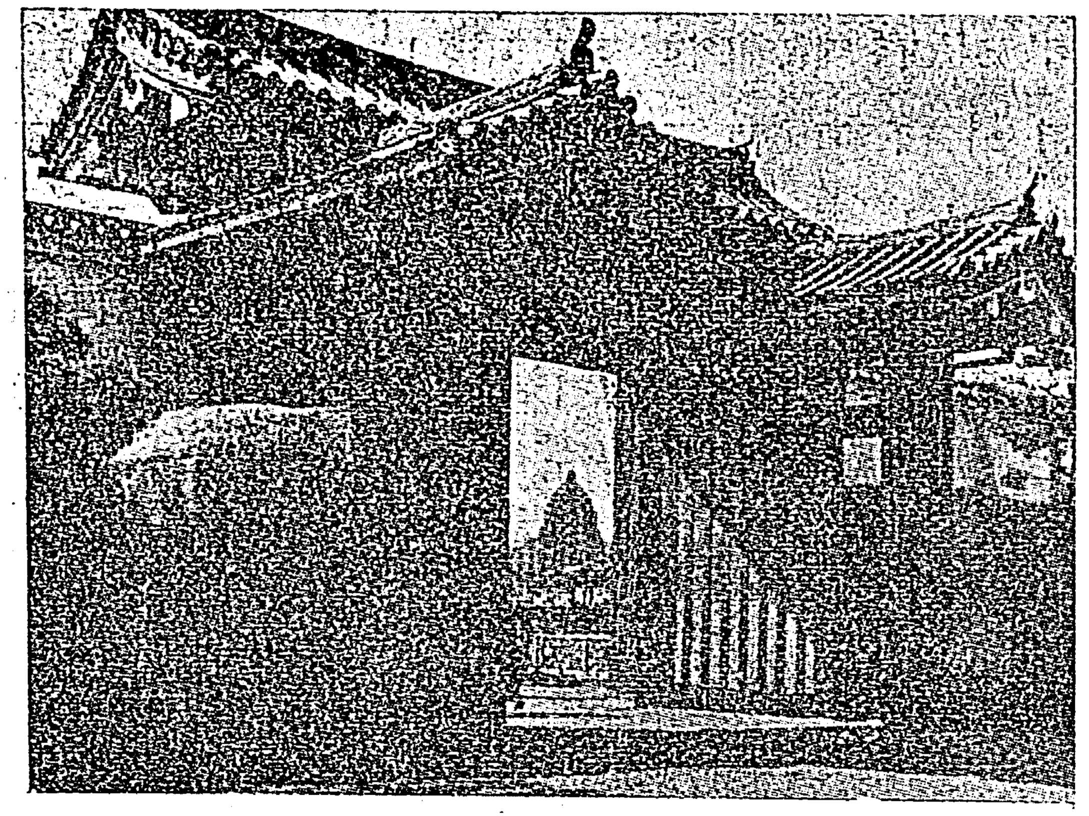

রাজবাড়ীর তোরণ—টোকিও

হয়েছে। এম্‌নি করেই সারনাথের সার-সংগ্রহ হয়েছে, মহেঞ্জদারো, হরপ্‌পা, নালন্দা, নগরজুনকোন্‌ডা পাতাল-পুরী থেকে প্রমাণ দিয়েছে পৌরাণিক বিচিত্র সভ্যতার। এম্‌নি করেই মধ্য এশিয়ায় নির্দ্দিষ্ট হয়েছে ভারতীয় আর্য্যদের আদি বাসস্থান। বুদ্ধিমান বিশেষজ্ঞ চেষ্টা করলে জাপান ও বাঙলার ভিতর রক্তের সম্বন্ধ আবিষ্কার করা হয়তো খুব কঠিন হবে না। হয়তো প্রমাণ হয়ে যাবে যে অতি প্রাচীনকালে বাঙলার সুকৃতি সন্তান ভগবান্‌ তথাগতের বিজয়-বৈজয়ন্তী নিয়ে গিয়েছিল সুদূর জাপানে। সেখানে তারা অসভ্য আদিম অধিবাসীদের পরাজিত করে' তাদের তাড়িয়ে দিয়েছিল দুর্গম পার্ব্বত্য-প্রদেশের নিভৃত প্রকোষ্ঠে, যেখানে তা'রা আজও তাদের অবিকৃত সত্ত্বা বজায় রেখে চেয়ে আছে মুগ্ধ হয়ে, বিস্মিত হয়ে, নবসভ্যতার আলোকদীপ্ত তুষারশীর্ষ ফুজিয়ামার দিকে! হয়তো সে শুভদিন আসবে, যেদিন গৃহমণ্ডূক বাঙালীর এই অতীত বিজয়বাহিনীর বিস্ময়কর কাহিনী প্রমাণিত প্রচারিত হয়ে সারা বিশ্বকে স্তম্ভিত করে' দেবে। সেদিন কারও মনে পড়্‌বে না এই হতভাগ্যকে, যে এই বিংশশতাব্দীর এক বর্ষানিষিক্ত সন্ধ্যায় এতবড় একটা মহা আবিষ্কারের সন্ধান দিয়ে গেল। সেদিন তা'র এই ঋণ হয়তো কেউ স্বীকার পর্য্যন্ত করতে চাইবে না! সেই অনাগত দুর্দ্দিনে আজিকার পাঠকদের সম্ভবতঃ তাদের বংশধরদের, সাক্ষীমানার প্রয়োজন হবে। আজই তার নোটিশ দিয়ে রাখ্‌লাম, দয়া করে' নোট করে' রাখ্‌বেন।

ক্ষণিকা

শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য বি-এল্‌

মনের পরশ মনে মনে
চুপি চুপি কথা
কখন হাসা, কখন কাঁদা
কখনো নীরবতা।
ভুলে যাওয়া ক্ষণে ক্ষণে
অনেক কাজের মাঝে

হঠাৎ প্রদীপ জলে ওঠে
চমক দিয়ে সাঁঝে।
নিমেষ তরে মনের দেশে
দীপালী উৎসব
গান গেয়ে যায় ক্ষণিক সুরে
ক্ষণেই সে নীরব।

বানর-সমস্যা সমাধান

শ্রীগঞ্জিকাসেবী

উদ্যোগ পর্ব্ব

বৃন্দাবনে বড়ই বাঁদরের উপদ্রব। বাঁদরের জ্বালায় বাড়ীতে বৌঝিদের টেকা দায়। বানরগণ নারীর সম্মান তো কিঞ্চিন্মাত্র জানেই না, পরন্তু ভয়ও করে না। ইহাদের বোধ করি পুরুষানুক্রমিক একটা ধারণা আছে যে মেয়ে মাত্রেই সীতার মত নিরীহ গোবেচারা, ছিঁচকাঁদুনে। উহাদের কিছুমাত্র পৌরুষ নাই। আমার ইচ্ছা হয়, বালিগঞ্জের গোটাকতক বাছা বাছা মেয়ে বৃন্দাবনে ছাড়িয়া দিয়া বানরদের এই পর্ব্বতপ্রমাণ ভুলটা (Himalayan blunder) ভাঙ্গিয়া দিয়া দেখি ব্যাপারটা কিরূপ দাঁড়ায়। বাঁদরের অত্যাচারে পুরুষেরাও ব্যতিব্যস্ত। ছোট ছেলে-মেয়েগুলিও দেখিয়া দেখিয়া নানাপ্রকার বাঁদরামি শিখিতেছে। অথচ পাণ্ডাদের বাধায় ইহার কোন প্রতিকার করিবার উপায় নাই। ইহাদেরই পূর্ব্বপুরুষ হনুমানচন্দ্র (নামটি বোধ হয় মাদ্রাজী হনুমন্তরাওএর আর্য্য-সংস্করণ) নাকি রামচন্দ্রের লঙ্কাযুদ্ধের সময় বিলক্ষণ সাহায্য করিয়া-ছিলেন ; সুতরাং রামচন্দ্রের বংশধরগণেরও ইহাদিগের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ঝামেলা করিবার এক্তিয়ার নাই।

সদ্য বৃন্দাবন হইতে বায়ুপরিবর্ত্তন করিয়া ফিরিয়াছি। বালিগঞ্জে ডোভার লেনের বাড়ীর বৈঠকখানায় বসিয়া নিজেদেরই বাঁদর-ঘটিত কয়েকটি দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করিয়া সকালবেলা মনটা খারাপ হইয়া গেল। চিত্তবিনোদনার্থে একটা মাসিক পত্রিকায় মনঃসংযোগ করিলাম।

নাঃ, ইহাদের এড়াইবার উপায় নাই। মাসিকের দু-চার পৃষ্ঠা উল্টাইয়াই চোখে পড়িল—একটি ক্ষুদ্র নাটিকা। আরম্ভেই লেখা : স্থান—অরণ্য, কাল—প্রাগৈতিহাসিক, পাত্র—বিশ্বামিত্র, পাত্রী—মেনকা। বিশ্বামিত্র সবে ধ্যান সমাপন করিয়া উঠিয়াছেন। মেনকা বেদিং স্যুট পরিয়া আসিয়া বড়ই বাহানা ধরিয়াছেন, আজ মিক্সড বেদিং-এ যাইতেই হইবে। বিশ্বামিত্র অনেক করিয়া বুঝাইতেছেন যে এ নিবিড় অরণ্যে মিক্সড বেদিং-এ গিয়া কোনও লাভ নাই। একে তো অরণ্যের নদীতে স্নানার্থে অধিক লোকসমাগম হয় না। যাহারাও আসে, তাহারা অত্যন্ত হুঁসিয়ার ঋষি অথবা ঋষিপুত্র। মেনকা মুখনাড়া দিয়া বলিলেন, ওসব ঢের ঢের ঋষি আমার দেখা আছে। কিন্তু বিশ্বামিত্র তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া বলিয়া চলিলেন, হয়ত তাঁহারা তোমাকে দেখিলেই চক্ষু বুঁজিয়া মন্ত্রতন্ত্র সুরু করিয়া দিবেন। বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ থাকিলেও হয়ত কিছু না বুঝিয়া-সুঝিয়া তোমার সহিত আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু কিছুদিন হইল লোমপাদ রাজার আড়কাটিরা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। মেনকা সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, চা-বাগানে না কি ?

স্লীপিং স্যুটের উপরে রেশমের ড্রেসিং গাউন চাপাইয়া দুইটি যুবক ঘরে ঢুকিলেন। মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখি সজনে ডাটা ও যোগী গুহ। গুটিপোকা অবস্থায় ইহাদের নাম ছিল সজনীকুমার দত্তগুপ্ত ও যোগেন্দ্রনাথ গুহ। সম্প্রতি বিলাত হইতে কোকুন কাটিয়া সজনে ডাটা ও যোগী গুহ হইয়া ফিরিয়াছেন।

ডাটা একটু উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "বীরেনদা, একটা গুরুতর কাজে আপনার কাছে এসেছি। আপনার এ আয়েসী জীবন কিছুদিনের মত ছাড়তে হবে। আমাদের একটা কাজে আপনার সাহায্য বিশেষ দরকার।"

জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিলাম।

ডাটা বলিয়া চলিলেন, 'বৃন্দাবনে বাঁদরের অত্যাচারে জীবন দুর্ব্বিসহ—আপনিও তো সদ্য সদ্য দেখে এলেন! কিন্তু পাণ্ডাদের বাধায় এর কোন প্রতিকার করবার উপায় নেই। তাই আমরা কজনে মিলে ঠিক করেছি, আমরা একটা দল করে বৃন্দাবনে যাব। গিয়ে পাণ্ডাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে হয় তো ভালই, তা নইলে সত্যাগ্রহ ক'রে বৃন্দাবনকে এ অত্যা-চার থেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করব। অমন একটা হলিডে রিসর্ট তো এমন ক'রে কুসংস্কারের বশে নষ্ট করতে দেওয়া যায় না! কি বলেন ?'

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, 'হলিডে রিসর্ট

হিসেবে যা বললে তা কিছু মিথ্যে নয়। দ্বাপরযুগ থেকে ওর প্রসিদ্ধি আছে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নাকি ওখানে অনেক দিন কাটিয়েছিলেন। তেমন ফুর্ত্তি নাকি আজকাল মণ্টি কর্লোতেও হয় না। কিন্তু সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে কংগ্রেসের বিবৃতি পড়েছ তো? সত্যাগ্রহ যদি আরম্ভ করতে হয় তবে করবেন হয় মহাত্মা স্বয়ং, নয় নিদেন এ, আই, সি, সি। তুমি আমি সত্যাগ্রহ সুরু করলে ডিসিপ্লিনারী য়্যাক্‌সন্ নেওয়া হবে।'

ডাটা ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, 'আপনাকে নিয়ে ঐ তো মুস্কিল, বীরেনদা। এলাম একটা গুরুতর কথা বলতে, আর আপনি ঠাট্টা করেই উড়িয়ে দিচ্ছেন।'

তাহাকে ঠাণ্ডা করিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম, আরে না না—তা আমাকে কি করতে হবে তা তো কিছুই বললে না।

ডাটা ঠাণ্ডা হইয়া বলিল, আপনাকে আমাদের দলের সভাপতি হতে হবে।

আমি প্রমাদ গণিয়া হাসিয়া বলিলাম, দেখ, তোমরা এই বালিগঞ্জের ছেলেরা সারা বাংলার তথা ভারতের ফরওআর্ড ব্লক্। সভাপতির নিকুচি করেছে—সব জায়গায় সভাপতি শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল—তোমরা একটি সভাপত্নীর আদর্শ দেখিয়ে দাও দেখি!

কিন্তু কথায় চিঁড়া ভিজিল না। আমার ন্যায় একটি দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন বয়স্থ লোক সভাপতি রূপে না থাকিলে নাকি কাজ কিছুই আগাইবে না। কাজেই আমাকে সভাপতি হইতেই হইবে। বরং নারীপ্রগতির নমুনাস্বরূপ একটি সম্পাদিকা রাখা হইবে।

আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, সম্পাদিকা কি হে? কাগজ টাগজ বের করবে নাকি?

যোগী গুহা হাসিয়া বলিল, না, না বীরেনদা, সম্পাদিকা মানে সেক্রেটারী।

আমি অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, তা ভায়া, চল্লিশের ওপর বয়স হ'ল, তোমাদের আধুনিক কৃষ্টির একখানা অভিধান না হলে সব সময় তাল রাখতে পারি না—দেখি কুড়ুলরামের গমস্তিকায় কাজ হয় কি না।

যাহা হউক, সম্পাদিকাও স্থির হইয়া গেল। মিস্ নোরা শীল অপেক্ষা উপযুক্ত পাত্রী আর নাই। তাঁহার বাবার পয়সাও অগাধ—আবশ্যক হইলে মোটা গোছের কিছু চাঁদাও পাওয়া যাইবে।

নোরা শীলের বাবা ফটিকচাঁদ শীল ১৯১৪ সালে হঠাৎ ফাঁপিয়া উঠিতে সুরু করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ডালভাত ছাড়িয়া ব্রেকফাস্ট ডিনার খাইতে আরম্ভ করেন ও ছেলেমেয়েদের জন্য ফিরিঙ্গি গভর্ণেস্ রাখিয়া দেন। কিন্তু ছেলেমেয়েরা গোলমাল বাধাইল। তাহারা ইতিপূর্ব্বেই কৈ মাছ-চচ্চড়ির স্বাদ পাইয়াছে। চাকরদের জন্য ঐরূপ একটা কিছু রান্না হইলেই বাহানা ধরিত, আমরা সার্ভেণ্টদের খাওয়া খাব। ঠাকুমা নিস্তারিণী দেবী তাহাদের অনেক বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা করিতেন—আরে, তোরা সাহেব হয়েছিস্, সাহেব হ'লে আর মাছ-চচ্চড়ি খেতে নেই। কিন্তু এসব বিশেষ ফলপ্রসূ হইত না। সাহেবীর মর্য্যাদা রক্ষার্থে মাছ-চচ্চড়ি ছাড়িবার মত বয়স তাদের তখনও হয় নাই।

এই সময় মিস্ শীলের জন্ম হয়। নিস্তারিণী দেবীর ক্ষেমঙ্করী, ক্ষ্যান্তমণি, মোক্ষদা ইত্যাদি বাছা বাছা ক্ষ-সংযুক্ত সুলক্ষণ নামগুলি সমস্তই অপছন্দ করিয়া যখন ফটিক শীল আদর করিয়া মেয়ের ইংরাজি নাম রাখিলেন 'নোরা', তখন নিস্তারিণী দেবী বোমার মত ফাটিয়া পড়িলেন, আহা কি নামই রাখা হ'ল নোরা, এরপর নাম রাখবে, হামানদিস্তে, গুঞ্চট! বলি ও ফটিক, এর পর এই মেয়ে বড় হয়ে যখন 'তোরই শীল তোরই নোড়া, তোরই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া' করবে তখন সামলাতে পারবি তো? কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হইল না। বরং ফটিক শীল কন্যাকে গোড়া হইতেই ইংরেজী কায়দায় মানুষ করিতে লাগিলেন—যাহাতে এও বড় হইলে বিগড়াইয়া গিয়া সার্ভেণ্টদের খাওয়া খাইবার বাহানা না ধরে।

ইহারই কিছুকাল পরে চাষাধোপাপাড়া লেনের পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া ফটিক শীল যখন সেণ্ট্রাল এভিনিউতে ফ্ল্যাট্ লইয়া উঠিয়া আসেন তখনও নিস্তারিণী দেবী কিছু করিতে পারেন নাই। নিজের গোটা-বাড়ীটা ছাড়িয়া দিয়া পরের বাড়ীর খানকয়েক ঘর ভাড়া করিয়া থাকাকে তাঁহার বুদ্ধিতে উঞ্ছবৃত্তি বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু এ ফ্ল্যাটও ছাড়িতে হইল। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর সেণ্ট্রাল এভিনিউর নাম যখন চিত্তরঞ্জন এভিনিউ হইল তখন ফটিক শীল ল্যান্সডাউন রোডে বাড়ী কিনিয়া উঠিয়া আসিলেন। সম্প্রতি শোনা

যাইতেছে যে, এই ল্যান্সডাউন রোডেরই কিয়দংশের 'বিপিন পাল রোড' নাম দেওয়া হইবে। ফটিক শীল শাসাইয়া রাখিয়াছেন যে তাঁহার বাড়ী এই অংশে পড়িলে তিনি কর্পোরেশনের নামে ক্ষতিপূরণের নালিশ করিবেন, কেন-না ল্যান্সডাউন রোডের পরিবর্ত্তে বিপিন পাল রোড নাম হইলে তাঁহার বাড়ীর মূল্য শতকরা নিদেন দশ-পনের টাকা কমিয়া যাইবে।

যাহা হউক, মাসখানেকের মধ্যে বাঁদর-নিবারণী সভায় একটা খসড়া প্রস্তাব পাশ হইয়া গেল। প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারী ও সজনে ডাটা, যোগী গুহা, ষোড়শী মহিলানবীশ প্রমুখ পাঁচ জন মেম্বর বৃন্দাবনে গিয়া একটা কিছু হেস্তনেস্ত করিয়া আসিবে। মেম্বরগণ সকলেই নামের দ্বিতীয় পদ বর্জ্জন করিয়া মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয় সাজিয়া বসিয়াছেন—কেবল মহিলানবীশ নিজের পুরুষত্ব বিজ্ঞাপনার্থে মধ্যে মধ্যে লুপ্ত অকারের চিহ্নের ন্যায় ব্র্যাকেটে "কান্ত" লাগাইয়া থাকে। বৃন্দাবন যাইবার বন্দোবস্তও সমস্তই নির্ব্বিঘ্নে ঠিক হইয়া গেল। কেবল বৃন্দাবনযাত্রী মেম্বর নির্ব্বাচনের সময় সভাপতির আসনে বসিয়া স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিয়াছিলাম—মেমের বর-মেম্বর, ষষ্ঠীতৎপুরুষ—তাহাতে সমস্ত মেম্বরগণই যারপরনাই মনঃক্ষুণ্ণ হন। যাহা হউক, এ সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া বৃন্দাবন-যাত্রা করা গেল। কোনমতেই সভাপতির পদ হইতে অব্যাহতি না পাইয়া আমি পূর্ব্বেই স্থির করিয়া লইলাম যে বৃন্দাবনে গিয়া যথাসম্ভব আড়ালে থাকিব।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

পথে আগ্রায় দুই দিন কাটাইয়া প্রত্যুষে বৃন্দাবনে পৌঁছিলাম। শীতকাল—বিলক্ষণ কোয়াশা হইয়াছে। বৃন্দাবনে নামিতেই—বাঁদর তাড়াইব কি, পাণ্ডারাই আমাদের বাঁদর নাচাইতে সুরু করিল। ইহাদের নামের নির্ঘণ্ট-প্রণালী অনুধাবনযোগ্য। আমার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের কেহ কখনও বৃন্দাবন গিয়াছিলেন বলিয়া আমার জানা ছিল না—মেয়েরা কেহ কেহ গিয়াছিলেন বটে। পাণ্ডারা শুধুমাত্র নাম ও ধাম জানিয়া লইয়া ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মোটা মোটা খাতা সহ আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নামধাম স্বাক্ষর ইত্যাদি অকাট্য প্রমাণ দিয়া দেখাইয়া দিল যে, বৃন্দাবনে রূপানাথ আচার্য্য আমার ও কৃতপ্রসাদ বর্ম্মা ডাটার কুলপুরোহিত। এই কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার চরেরা আমাদের নামধাম শুনিয়া স্টেশনেই আমাদের গ্রাম ও বংশ ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু তথ্য মুখস্থ বলিয়া সজনে ডাটাকেও চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিল।

স্টেশন হইতে বাড়ী যাইবার জন্য গাড়ীতে উঠিয়া তিক্ত কণ্ঠে ডাটা বলিল, 'কত প্রতিভাই আমরা হেলায় নষ্ট করি বীরেনদা! বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে এদের জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তি বিলেতে হ'লে কত কাজেই লাগাত। টিকটিকি পুলিশ বিভাগের মাথায় বসে হয়ত সারা ইংলণ্ডের বংশাবলী মুঠোর মধ্যে নিয়ে বসে থাকত—কারো সাধ্যি হ'ত না একটু ট্যাঁ-ফোঁ করে। এরাও মোটা মাইনে পেত, দেশেরও কত উপকার হ'ত। আমাদের দেশে তো তা নয়, যত বোগাস কাণ্ড!'

যোগী গুহা সায় দিয়া বলিল, 'সত্যি বীরেনদা, সেবার বদ্যিনাথ গিয়েছিলাম—এক জায়গায় দেখি একটা গরুকে তীর্থযাত্রীরা সব রসগোল্লা খাওয়াচ্ছে। জিজ্ঞেস করলুম, ব্যাপার কি? শুনলুম গরুটা নাকি কামধেনু, তার কাছে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়, তাই তীর্থযাত্রীরা তাকে রসগোল্লা খাইয়ে তুষ্ট করছে—গরুটা নাকি রসগোল্লা খেতে বড় ভালবাসে। গরুটার বিশেষত্ব এই যে, তার কখনও বাছুর হয় না কিন্তু সম্বৎসর দিনে আধসের ক'রে দুধ দেয়। আমি তো বুঝি এই কথা যে, অত রসগোল্লা খাইয়ে যদি মোটে আধসের ক'রে দুধ পাওয়া যায় তবে লাভের গুড় তো পিঁপড়েয় খেল। আবার বলে দুধ নাকি ভারী মিষ্টি—আরে, অত রসগোল্লা খেলে যে আমাদের ঘামশুদ্ধ মিষ্টি হয়ে যেত। আজকাল বৈজ্ঞানিক উপায়ে পশুপালনের দিনে কি-না এই অপব্যয়! বিলেতে হলে ওর পেছনে অত পয়সা না ঢেলে সাগার-এ ব্ল্যাকপুলে ঐ গরু দেখিয়ে কত পয়সা রোজগার করত।

ইহাদের বিলাতী গল্পে হাঁপাইয়া উঠিলাম। ও প্রসঙ্গ চাপা দিবার উদ্দেশ্যে বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিলাম, ওঃ কি কোয়াশাই হয়েছিল, এখন কিছুটা ফর্সা হচ্ছে।

কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। ডাটা একটু হাসিয়া বলিল, "এ আর কি কোয়াশা বীরেনদা! কোয়াশা দেখেছিলাম সেই ম্যাঞ্চেস্টারে ১৯৩৬ সালে—পনের দিন

ধরে একটানা কী কোয়াশাই চলল! ডিনারের পর রাস্তায় বেরিয়েছি, ভাবলুম একটা সিগারেট ধরাই। পাঁচ-সাতখানা কাঠি পোড়ালুম কিন্তু সিগারেট আর ধরে না। ভাবলুম—ব্যাপার কি? হঠাৎ খেয়াল হ'ল, সিগারেটটা মুখ থেকে খুলে চোখের কাছে ধরে দেখি সিগারেট দিব্যি জ্বলছে, আধখানা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—কোয়াশা এমন যে তার মাথার আগুনটা এতক্ষণ চোখে দেখতে পাই নি।

আমি হাসিয়া বলিলাম, তোমার সিগারেটের গল্প শুনে আমারও যে বড় সিগারেট খাবার ইচ্ছে হচ্ছে—দাও দেখি দেশলাইটা, একটা ধরাই।

ষোড়শী মহিলানবীশ নিতান্ত ছেলেমানুষ—দূরসম্পর্কে আমার ভাগিনেয়। সুতরাং আমার সাক্ষাতে সে কথনও সিগারেট খায় না। একবার তাহাদের বাড়ীতে হঠাৎ আমার গলার খ্যাঁকর শুনিয়া তাড়াতাড়ি জ্বলন্ত সিগারেটটা পিছন দিকে লইয়া পাঞ্জাবীর তিন ইঞ্চি পোড়াইয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া বেশ সপ্রতিভভাবে বলিয়াছিল, ঠাকুমাকে বলে বলে আর পারা গেল না—ধূপের ধোঁয়ায় ঘরটাকে কি ক'রে রেখেছে, দেখুন না! আমি তখন ষোড়শীর পিছনে পাঞ্জাবীর ধোঁয়া দেখিতে ব্যস্ত ছিলাম। দেখিলাম আর দেরী করিলে দমকল ডাকিতে হইবে—বলিলাম, গরম লাগছে না তোমার? পাঞ্জাবীটা গিয়ে খুলে ফেল না!

ডাটা এত বৃত্তান্ত জানে না—বলিল, আমার কাছে তো দেশলাই নেই—ষোড়শীর কাছে আছে। ষোড়শীও দেখি খেয়াল না করিয়া পকেটে হাত ঢুকাইয়া দিয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি সজোরে বলিলাম, না, ওর কাছে নেই। —ষোড়শী সড়াক করিয়া খালি হাতটা পকেট হইতে বাহির করিয়া ফেলিল। তথন যোগী গুহার দেশলাইতে সিগারেট ধরাইতে ধরাইতেই গন্তব্যস্থানে পৌছিয়া গেলাম।

দিন দশেক পরের কথা। পাণ্ডাদের বুঝাইয়া বুঝাইয়া হয়রাণ হইয়া আজ তিন দিন যাবৎ চারজন মেম্বর মন্দিরের দরজায় সত্যাগ্রহ সুরু করিয়াছেন। মিস্ নোরা শীল বেলা এগারটায় একবার সত্যাগ্রহের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়া বাড়ীতে আধুনিক নিয়মানুযায়ী মশলা না পিশিয়া কলম পিশিয়া থাকেন—অর্থাৎ ডাটাদের বর্ণিত পূর্ব্বদিনের সত্যাগ্রহবৃত্তান্ত রিপোর্ট আকারে লিখিয়া ফেলেন। সম্পাদিকার ফাউন্টেন পেনে কালী ভরিয়া দিবার জন্য ষোড়শী মহিলানবীশ বাড়ীতেই থাকেন। আমি সকাল সন্ধ্যা উত্তমরূপে আহার করিয়া দিবাভাগে নিদ্রা যাই। বাহির হইবার বড় একটা প্রবৃত্তি হয় না—পাণ্ডারা বদনাম রটাইয়াছে, পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী ধৌম্য সমভিব্যাহারে বৃন্দাবনে আসিয়া বড়ই ঝামেলা সুরু করিয়াছে। পাছে দ্বাপর যুগের ন্যায় জয়দ্রথ আসিয়া হঠাৎ কোনরূপ উৎপাত ঘটায়, তাই তৃতীয় পাণ্ডবকে দ্রৌপদীর পাহারায় রাখিয়া বাকি চারি ভাই দুপুরবেলা শীকার অন্বেষণে বাহির হন।

শীকার সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছুই জানি না। শুধু শুনিতে পাই সত্যাগ্রহীরা নাকি মহিলাদেরই বিশেষ করিয়া অনুরোধ করেন। কাল ডাটা ও গুহার মুখে শুনিলাম, দুটি বাহিরের স্বেচ্ছাসেবিকার নিকট হইতে নাকি তাঁহারা বিশেষ সাহায্য পাইতেছেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি রকম দেখতে হে তাঁরা?

ডাটা। ভয়ানক সুন্দরী বীরেনদা, আই-সি-এসের সঙ্গে বিয়ে হতে পারে।

আমি গম্ভীর ভাবে বলিলাম, "তাহ'লে সুন্দরীবটে!"—বুঝিলাম সুন্দরীর থার্ম্মোমিটারে আই-সি-এসের সঙ্গে বিয়ে হওয়াই বয়্‌লিং পয়েণ্ট।

আমি। চুল কত বড়?

ডাটা—আমার মাথার চেয়ে বড় তাদের খোঁপা।

আমি—বটে? কি জাত?

ডাটা—মিস্ গীতালি গুপ্তা—বৈদ্য।

গুহা—মিস্ চয়নিকা চৌধুরী—কায়স্থ।

আমি—কি গোত্র?

এইবার ডাটা চটিয়া উঠিল, ঐ তো আপনাকে নিয়ে মুস্কিল বীরেনদা—কাজের কথা নিয়ে ঠাট্টা জুড়ে দেন!

কিন্তু তবু জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিয়া লইয়াছিলাম, গীতালি গুপ্তার বাবা আমারই সহপাঠী বন্ধু সুরেশচন্দ্র গুপ্ত—নিকটেই থাকেন। আজ বৈকালে তাঁহারই উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িলাম।

সুরেশ গুপ্ত অমায়িক হাসি-খুশী লোক। প্রৌঢ় হইলেও এখনও ছেলে-ছোকরাদের মত হাসিতামাসা করেন।

পূর্ব্বে রাসবিহারী এভিনিউতে থাকিতেন। বছরখানেক আগে স্ত্রীবিয়োগের পর হইতে একমাত্র কন্যাসহ বৃন্দাবনে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছেন। কিছুক্ষণ খুঁজিয়া তাঁহার বাড়ী বাহির করিলাম। ফটকের সামনে কাঠের ফলকে সংযুক্তাক্ষরে লেখা আছে—শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত। ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। বাহিরের বৈঠকখানা ঘর হইতে সুরেশের গলার আওয়াজ পাইলাম—বোধ করি কন্যাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন—আচ্ছা, তোর যদি এরকম একটি বর জোটে যে সবদিক দিয়ে ভাল—স্বাস্থ্যবান, ধনী, বিদ্বান—শুধু মাত্র এই দোষ যে সকাল সন্ধ্যে এক ছিলিম করে গাঁজা খায়—তা হ'লে তুই তাকে বিয়ে করবি?

বাস্, আর শুনিতে হইল না। জানালা দিয়া হঠাৎ আমাকে দেখিতে পাইয়া সুরেশ প্রায় দৌড়াইয়া আসিয়া অভ্যর্থনা করিল। অভ্যর্থনা-পর্ব্ব শেষ হইলে ফটকের দিকে হাত দিয়া দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ভাই, রামমাণিক্য পণ্ডিত মশায় যে বলে দিয়েছিলেন যে শুধু হরিশ্চন্দ্র শব্দটিই যুক্তাক্ষরে হয়, তা ছাড়া দীনেশচন্দ্র, সুরেশচন্দ্র, নরেশচন্দ্র কোনটাই হয় না, তা কি ভুলে গেছ?

সুরেশ খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল:

সংস্কৃতর গণ্ডপরি বিরাজ কর বিস্ফোটক
বাংলা ভাষার কেউ তুমি নও হংস, সারস কিংবা বক।

তুমি আমায় কি পেয়েছ বল দেখি—আমরা কি সেই পুরোনো জিনিস নিয়েই পড়ে থাকব? আমি তো বাপু, হয় নিজে একটা কিছু বের করব, আর নয় অপরের বিধিনিষেধ যদি মানতেই হয়, তবে সাহিত্যক্ষেত্রে আমার একমাত্র অবতার—বুদ্ধদেব।

আমি বলিলাম, ভাই, ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না, একটু বুঝিয়ে বলবে কি? তুমি কোন্ বুদ্ধদেবের কথা বলছ? যিনি সেই বোধিদ্রুমের তলায়—

সুরেশ—আরে না না, কি বিপদ! সে বুদ্ধ তো কবে মরে ভূত হয়েছে।

'আমরা চলি সমুখ পানে কে আমাদের বাঁধবে?
রইল যারা পিছুর টানে কাঁদবে তারা কাঁদবে।'

আমি আধুনিক বুদ্ধদেবের কথা বলছিলাম।

এ প্রসঙ্গ গেল। আরও অনেক প্রসঙ্গও গেল। শেষে বানর-প্রসঙ্গ উঠিল।

সুরেশ বলিল, গীতালি তো বাঁদরের জ্বালায় আর একদিনও এখানে থাকতে চায় না। একটি ভাল পাত্র পেলে ভাবছিলুম ওকে বালিগঞ্জে ফিরিয়ে পাঠিয়ে দি। অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ একটি পাত্র জুটেও গেছে—সবদিক দিয়েই ভাল—স্বাস্থ্যবান, ধনী, বিদ্বান—শুধু কার্য্য-কলাপ দেখে মনে হয়, বোধ হয় সকাল-সন্ধ্যে এক ছিলিম ক'রে গাঁজা খায়।

বুঝিলাম লক্ষ্যটা সজনে ডাটার দিকেই। কিন্তু সুরেশ নামধাম বলিলেন না—আমারও মেয়ে আছে!

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—লেখাপড়া কতদূর?

সুরেশ—বিলেত-ফেরৎ।

আমি—ও বাব্বা, তা হ'লে দিয়েই ফেল। কিন্তু মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে তুমি থাকবে কি ক'রে?

সুরেশ রহস্য করিয়া বলিল, আর একটি বিয়ে করব ঠিক করেছি।

আমি হাসিয়া বলিলাম, তোমায় আমায় আর কে মেয়ে দেবে বল? কুড়ি বছর তো এক বৌ নিয়ে ঘর করলুম।

সুরেশ বলিল, আমাদেরই তো দেবে হে, হাজার হোক অভিজ্ঞতার একটা দাম আছে তো?'

আমি—সে কি হে? তুমি না য়্যাকাউণ্টেন্সী পড়েছিলে? এরই মধ্যে ভুলে গেলে? স্পষ্ট যে লেখা আছে—স্লিপিংপার্টনার এর অভিজ্ঞতার দরকার নেই।

গীতালিকেও দেখিলাম। সত্যই সুন্দরী—তবে আমার মনে হইল আই-সি-এস্ না হইয়া বি-সি-এস্ গ্রেডের হইবে। বাঁদরামী বা উদ্দাম চাপল্য মোটেই নাই, কিন্তু খুবই স্মার্ট—দেখিয়াই বোঝা যায় বালিগঞ্জ-মার্কা—মেড্ ইন্ বালিগঞ্জ। সজনে ডাটাকে চিবাইয়া খাইতে ইহার অধিক দিন সময় লাগিবার কথা নয়। ডাটারও তাহাতে লাভ বই ক্ষতি নাই—মেয়েটিকে দিব্যি লক্ষ্মী বলিয়াই বোধ হইল। গীতালির কাছে শুনিলাম, চয়নিকা তাহারই বন্ধু, তাহারই নিমন্ত্রণে মাসখানেক হইল বৃন্দাবনে বেড়াইতে আসিয়াছে, কিন্তু বাঁদরের জ্বালায় অস্থির, তাই আর থাকিতে চায় না। অতঃপর চা-টা খাইয়া বাড়ী ফিরিলাম।

বাড়ী আসিয়া দেখি ডাটা ও গুহা পাশাপাশি দুখানি

চেয়ারে বসিয়া আছেন। তাঁহাদের সে শ্রী আর নাই। পাঞ্জাবী ছিঁড়িয়া গিয়াছে, চুলগুলি উস্কো-খুস্কো, ঠোঁট কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। শ্রীমতী চয়নিকা গুহার ও মিস্ নোরা শীল ডাটার সুশ্রূষায় ব্যস্ত। ষোড়শী মহিলানবীশ মিস্ শীলকে সাহায্য করিতেছেন। শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হ'ল হে?'

বিশ্বের বিরক্তি মুখের উপর টানিয়া আনিয়া বদনব্যাদান করিয়া ডাটা জবাব দিল, 'দেখুন না খোট্টাই বুদ্ধি! পিঠটা রয়েছে কি জন্যে? তা নয়, মেরে দিলে ঠোঁটের ওপর—বুঝলে না যে রক্ত বেরিয়ে যাবে। এর নাম কি রকম ইয়ার্কি?'

গুহা বলিল, 'ওরা আগে মেঠাই খেয়ে পরে তরকারী খায়—পিঠে না মেরে ঠোঁটে মারবে তা আর আশ্চয্যি কি?'

দেখিলাম এখন আর জিজ্ঞাসাবাদ না করাই ভাল। ইহার উপর শুনিলাম গোদের উপর বিস্ফোটক হইয়াছে। তাড়াতাড়ি ঠোঁটের রক্ত বন্ধ করিতে গিয়া মিস্ নোরা শীল অতর্কিতে একটু আঘাত করিয়া ফেলিয়াছেন—তাহাতে ডাটার একটা দাঁতের গোড়া একটু নড়নড় করিতেছে।

সৌপ্তিক পর্ব্ব

সেদিন সকলেই সকাল সকাল খাইয়া শুইয়া পড়িলাম। রাত্রি গোটা নয়েকের সময় বাহিরে ডাক শুনিলাম, 'বাবুজী, এ বাবুজী!' সকলেই বোধ করি নিদ্রামগ্ন। আমি আলোটা জ্বালিয়া বাহিরে আসিলাম। দেখি কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা। ঘরে আনিয়া বসাইলাম। তাঁহারা দিনের ঘটনা বর্ণনা করিলেন। সত্যাগ্রহীরা মহিলাদের দিকটায় বড় বেশী উৎপাত ও বাঁদরামী আরম্ভ করেন। মেয়েদের আব্রু রাখা দায় হইয়া ওঠে। পাণ্ডাগণ প্রথমে নিষেধ করে—পরে কয়েকটি পর্দ্দানশীন হিন্দুস্থানী পূণ্যার্থিনীর কাকা-দাদারা মিলিয়া উত্তম মধ্যম দিয়া ছাড়িয়া দেয়। পাণ্ডাদের কথা সত্যই বোধ হইল—বাঁদরামীটা সম্পূর্ণই একতরফা। শুনিতে শুনিতে মনটা তিক্ত হইয়া উঠিল। আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া কৃতবর্ম্মা বলিলেন,—'বাবুজী, আপকো কলকাত্তামে এত্তা বান্দর হ্যায়, তা সত্ত্বেও বৃন্দাবনের বাঁদর তাড়াইতে এদের এত উৎসাহ কেন? একেই কি কলোনিয়াল্ এক্সপেন্‌শন্ বলে?' লজ্জায় অধোবদন হইলাম।

কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাকে বিদায় দিয়া আলোটা নিবাইয়া বিছানার উপর বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। বিরক্তিভরে অনুচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলাম, মহাভারত, মহাভারত!

হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল। দ্রৌপদী ও পাণ্ডবগণ সুষুপ্ত। কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য এইমাত্র শুইতে গিয়াছে। একা আমি অশ্বত্থামা জাগিয়া বসিয়া আছি। বিরক্তিতে মুখও পেচকের ন্যায় হইয়াছে। অতএব এই-বেলা—কিন্তু কি করিব? বাঙ্গালীর ছেলে—পলায়নটাই আগে মাথায় আসে। স্থির করিলাম—আর নয়, এই বেলা পলায়ন করিব। স্টেশনে গিয়া এখন কলিকাতার ট্রেন না পাইলে পূর্ব্বদিকগামী যে-কোন একখানা ট্রেনে উঠিয়া পড়িব—পরে ট্রেন বদলাইয়া কলিকাতা যাইবার ব্যবস্থা করা যাইবে। আলো জ্বালিতে সাহস হইল না, অন্ধকারেই জিনিসপত্র গুছাইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। ঘণ্টাখানেক পরে একটা ট্রেনে উঠিয়া কম্বল বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম।

ট্রেনে একটা স্বপ্ন দেখিলাম। আনন্দমঠের দেশে গিয়া পড়িয়াছি। সম্মুখেই মন্দির—"মা যা আছেন।" ঢুকিয়া পড়িলাম। দেখিলাম—বেদীর উপর গীতালি ও চয়নিকা যুগপৎ আসীনা। দুই পার্শ্বে যোড়হস্তে দণ্ডায়মান সজনে ডাটা ও যোগী গুহা। পদপ্রান্তে দুইটা মুমূর্ষু বৃহল্লাঙ্গুল বানর। সম্মুখে দণ্ডায়মান স্বামী সত্যানন্দ—নয়নে দর-বিগলিতধারা, বলিতেছেন, হায় মা, তোমাদের উদ্ধার করিতে পারিলাম না। আবার তোমরা বানরের হস্তে পড়িলে।

পার্শ্বস্থিত মহাপুরুষ বলিলেন, বানর কই? বানর আর নাই। ইহাদিগের বানরত্ব মুমূর্ষু অবস্থায় মাতৃ-যুগলের পদপ্রান্তে পড়িয়া আছে। মালক্ষীদের কৃপায় ইহারা শীঘ্রই মানুষ হইয়া উঠিবে।

বিপিনচন্দ্র পাল

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

যাঁহারা কোন সমাজের চিন্তা-জগতে ও কর্ম্ম-জগতে কোন বিরাট পরিবর্ত্তনের সূচনা করেন, ইতিহাস তাঁহাদের নাম অক্ষয় করিয়া রাখে। এমন ঐতিহাসিকের কথা পাঠ করিয়াছি যাঁরা বলেন যে, এই যুগ-প্রবর্ত্তকদের জীবন-কথা পাঠ করিলে সমাজ-জীবনের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়; ইতিহাস ইঁহাদের জীবন-কথার চর্ব্বিত-চর্ব্বণ মাত্র। আর এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকের মত এই যে, যাঁহাদিগকে আমরা মহাপুরুষ বড়লোক বা যুগ-প্রবর্ত্তক বলিয়া মনে করি তাঁহারা সমাজ-মন ও সমাজ-জীবনের অন্তরালে যে বিরাট প্রাণশক্তি কার্য্য করিতেছে তার বহিঃপ্রকাশ মাত্র, তাঁহার সাক্ষী মাত্র। সমাজ-জীবনে কোন পরিবর্ত্তনের যখন প্রয়োজন উপস্থিত হয়, সমাজ-মনে যখন পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন জাগিয়া ওঠে; সমাজ-জীবনের আত্মরক্ষার প্রয়োজনে যখন কোন বিশেষ উপায়ের অবলম্বন অপরিহার্য্য হইয়া ওঠে তখন যিনি বা যাঁহারা এই প্রয়োজনের অনুভূতিকে ভাষা দিতে পারেন, এই উপায় অবলম্বন না করিলে সমাজ-জীবন বিপন্ন হইবে এই ভাবনা ও চিন্তা সমাজের মনে জাগাইয়া তুলিতে পারেন এবং তাহা সমাজের স্ত্রী-পুরুষের বুদ্ধি-গ্রাহ্য করিতে পারেন, তাঁহারা এই বিপ্লব বা পরিবর্ত্তনের সাক্ষী মাত্র, প্রতিনিধি মাত্র সমাজ-মন বিপ্লবের ক্ষেত্র, সমাজের প্রাণশক্তি বিপ্লবের জনক-জনয়িত্রী। মহাপুরুষ, বড়লোক বা যুগ-প্রবর্ত্তক এই পরিবর্ত্তনের প্রচারক মাত্র।

এই দুই মতের মধ্যে কোন্‌টি সত্য তৎসম্বন্ধে তর্ক ও বিচারের যথেষ্ট অবসর আছে। এই তর্ক ও বিচারের স্থান বর্ত্তমান প্রবন্ধ নয়। যার যার জ্ঞান, বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা অনুযায়ী প্রত্যেকে এই তর্কে পক্ষাপক্ষ অবলম্বন করিবেন। উভয় পক্ষেই যুক্তি আছে, এই কথা বলিয়া এই তর্কের পাশ কাটাইয়া যাওয়াই নিরাপদ এবং এই বিশ্বাসের আলোকেই বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের জীবন-কথার চিত্র ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিব। যাঁহার জীবন-কথার আলোচনা করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছি "ভারতবর্ষ" পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের সৌজন্যে, তাঁহার মত ও বিশ্বাস এইরূপ ছিল বলিয়া মনে করি এবং এই আলোকেই তাঁহাকে বোঝা যাইবে বলিয়া তাঁহার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব। "সত্তর বৎসর" নামে বিপিনচন্দ্রের একখানি আত্মচরিত প্রকাশিত হইয়াছিল। সৃষ্টি-বিধানে মানব-শিশুর স্থান নির্দ্দেশ করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন:

> "মানুষের কর্ম্মের দায় একপুরুষের বা দুইপুরুষের নহে। প্রথম মানব যেদিন এই পৃথিবীর আলোকে চক্ষু খুলিয়াছিল, সেই দিন হইতে অদ্যকার সদ্যজাত শিশুর কর্ম্মের বোঝা জমিতে আরম্ভ করিয়াছে। অথবা প্রথম মানবের কথাই বলি কেন! যেদিন হইতে এই সৃষ্টির সূত্রপাত, সেইদিন হইতেই এই সদ্যজাত শিশুর সংসারের জাল অদৃশ্য হস্তে বোনা আরম্ভ হইয়াছে। মাথার উপর জ্যোতিষ্কমণ্ডল, পায়ের নীচে এই পৃথিবী—ইহাদের অভিব্যক্তির সঙ্গে তিলে তিলে, 'অনাদি কাল অনন্তগগন' এই ক্ষুদ্র জীবনের ক্রমাভিব্যক্তির আয়োজন করিয়া আসিয়াছে। এই সৃষ্টিতে জড় ও চেতন যাহা কিছু ছিল ও যাহা কিছু আছে, সকলের সঙ্গেই এই সদ্যজাত মানবশিশুর জীবন জড়াইয়া আছে।"

সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির এই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের এই নাড়ীর টানের কথা স্বীকার ও স্মরণ করিয়া অন্য স্থানে বিপিনচন্দ্র কহিয়াছেন:

> "এ-জগতে আসিয়া ভারতবর্ষে জন্মিয়াছি, ইহা সৌভাগ্যের কথা।…এই ভারতবর্ষের মধ্যে এই বাংলাদেশে জন্মিয়াছি, ইহা আরও সৌভাগ্যের কথা। সর্ব্বোপরি, এই বাংলাদেশে এযুগে জন্মিয়াছি, ইহা পরম সৌভাগ্যের কথা। মৃত জাতি কি করিয়া নবজীবন প্রাপ্ত হয়, এযুগে এই বাংলাদেশে জন্মিয়া তাহা স্বচক্ষে অনেকটা দেখিয়াছি। এ পরম সৌভাগ্য সকলের ঘটে না।"

এই সৌভাগ্যের কথা কালির রেখায় ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিব। বাগ্মী, লেখক, সাংবাদিকরূপে, দার্শনিক সমাজতত্ত্বজ্ঞরূপে বিপিনচন্দ্র প্রসিদ্ধি লাভ করেন। "স্বদেশীযুগে" তিনজন রাজনীতিজ্ঞের নাম লোকমুখে ধ্বনিত হইত—'লাল-বাল-পাল'। লালা লাজপৎ রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক ও বিপিনচন্দ্র পাল—এই তিনটি নাম সংক্ষেপ করিয়া লোকপ্রিয় করা হইয়াছিল। কর্ম্ম-জগতে ইহাই বিপিনচন্দ্রের পরিচয়। তাঁহার জন্মস্থানের পরিচয় ও পিতৃ-পরিচয়ও দিতে হয়। শ্রীহট্ট জিলার পৈল গ্রামে সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে ১২৬৫ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসের ২২ তারিখে বিপিনচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। এই পরিবারে এইরূপ একটা কিম্বদন্তী ছিল যে তাঁদের পূর্ব্বপুরুষ একজন কোন দূর অতীতে দক্ষিণ রাঢ়ের মঙ্গলকোট গ্রাম হইতে আসিয়া বুড়ীগঙ্গার তীরবর্ত্তী স্থানে পৈল নামে গ্রাম স্থাপন করিয়া বসতি আরম্ভ করেন। ঐ ভদ্রলোকের নাম হিরণ্য পাল। অত্যাপি বর্দ্ধমান জিলার কাটোয়া সব্‌ডিভিসনে মঙ্গলকোট নামে এক গ্রাম আছে। পৈল গ্রামের দুই মাইল দূরে একটি নদী আছে, তার নাম খোয়াই। হইতে পারে পাঁচশত-ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে এই অঞ্চলের বুক বহিয়া বুড়ীগঙ্গা নদী চলিত। আজ ঢাকা শহরের গায়ে বুড়ীগঙ্গা নদীর একাংশ দেখা যায়। তিনশত বৎসরের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদ যখন একশত মাইল পশ্চিমে সরিয়া আসিয়াছে, তখন বুড়ীগঙ্গার উৎপত্তি স্থানের নিরুদ্দেশের, গতি পরিবর্ত্তনের বা নাম পরিবর্ত্তনের ইতিহাস সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া কঠিন হইতে পারে। হিরণ্য পাল হইতে বিপিনচন্দ্রের মধ্যে ব্যবধান সাতাশ পুরুষ। এই পাঁচশত-ছয়শত বৎসরের মধ্যে দেশের চেহারা অনেক বদলাইয়াছে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বিপিনচন্দ্রের পিতা রামচন্দ্র পাল মহাশয় যখন ঢাকার কলেক্‌টরের পেস্কার ছিলেন, তখন বিপিনচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। "সিপাহী-বিদ্রোহ" নামে পরিচিত বিপ্লব-চেষ্টা তখন দেশের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল। ঢাকা শহরেও একদল সিপাহীর রক্তে ঢাকার মাটি রাঙ্গা হইয়াছিল। চট্টগ্রাম হইতে একদল সিপাহী বিপ্লব ছড়াইয়া শ্রীহট্ট জিলার লাতু পরগণা পর্য্যন্ত গিয়াছিল। তাহাদের রসদ জোগাইয়া অনেকে পরে জমিদারী কিনিয়াছিলেন। বিপিনচন্দ্রের জন্মস্থান এই সিপাহীদের পথে পড়ে নাই। কিন্তু তাঁহাদের আবির্ভাবে দেশময় আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছিল দিকে দিকে, তাহা পরে তিনি শুনিয়াছিলেন। এই বিপ্লব-চেষ্টা পশ্চিমে দিল্লী হইতে পূর্ব্বে বিহার ও দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যদিও বাংলাদেশে তার ছিটাফোঁটা পড়িয়াছিল, তবুও বাঙ্গালী সমাজপতিদের মধ্যে কেহ এই আন্দোলনে যোগদান করেন বা তাতে উৎসাহ দেন এইরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশও নিশ্চেষ্ট ছিল। কেবল পাঞ্জাবের শিখ সৈন্যের সাহায্যে ইংরেজ এই চেষ্টাকে ব্যর্থ করিতে সক্ষম হন। 'পশ্চিমা' সিপাহীরা পাঞ্জাব-জয়ে ইংরেজের সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া তার প্রতিশোধস্বরূপ শিখেরা "সিপাহী-বিদ্রোহ" দমনে ইংরেজের সাহায্য করিয়াছিল, এরূপ কথাও ইতিহাসে পড়িয়াছি।

বিপ্লবের সময়ে জন্মগ্রহণ করাতে বিপিনচন্দ্র সমাজে ও রাষ্ট্রে বিপ্লবীর মতন কাজ করিয়া গিয়াছেন, এইরূপ ধারণা বিচারসহ কি-না জানি না। কিন্তু এই কথা সত্য যে, প্রথম যৌবনেই তিনি এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান করেন। বিপিনচন্দ্রের পিতা রামচন্দ্র পাল কয়েক বৎসর মুন্‌সেফী করেন। এই কর্ম্মোপলক্ষে তাঁহাকে নানা স্থানে ঘুরিতে হইত। কিন্তু বিপিনচন্দ্রের যখন স্কুলে যাইবার বয়স হইল, তখন পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার সুবিধার জন্য তিনি সরকারী চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহট্ট শহরে ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং কালে ব্যবসায়ে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। ১৮৭৪ খৃঃ এণ্ট্রান্স (বর্ত্তমানে মাট্রিকুলেশন) পরীক্ষা পাশ করিয়া বিপিনচন্দ্র কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ফার্স্ট আর্ট্‌স্ (বর্ত্তমানে আই-এ, আই-এস্‌সি) পড়িবার জন্য ভর্ত্তি হন। সেই বৎসরই শ্রীহট্ট ও কাছাড় জিলাকে বাংলা দেশ হইতে ছিন্ন করিয়া আসামপ্রদেশের সৃষ্টি হয়। এই দুই জিলার রাজস্বে আসামপ্রদেশের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রীহট্টের নেতৃবর্গ আপত্তি জানাইয়াছিলেন; আজিও তাহা করিতেছেন। সেইরূপ বাংলা দেশের পশ্চিম সীমান্তে মানভূম, সিংহভূম, ভাগলপুর, দেওঘর প্রভৃতি স্থানের অংশবিশেষ বিহার প্রদেশের প্রয়োজনে বাংলা দেশ হইতে ছিন্ন করা হইয়াছে।

বিপিনচন্দ্র যখন উচ্চ শিক্ষার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন তখন বাংলার জীবনে বান ডাকিয়াছে। আপাত-

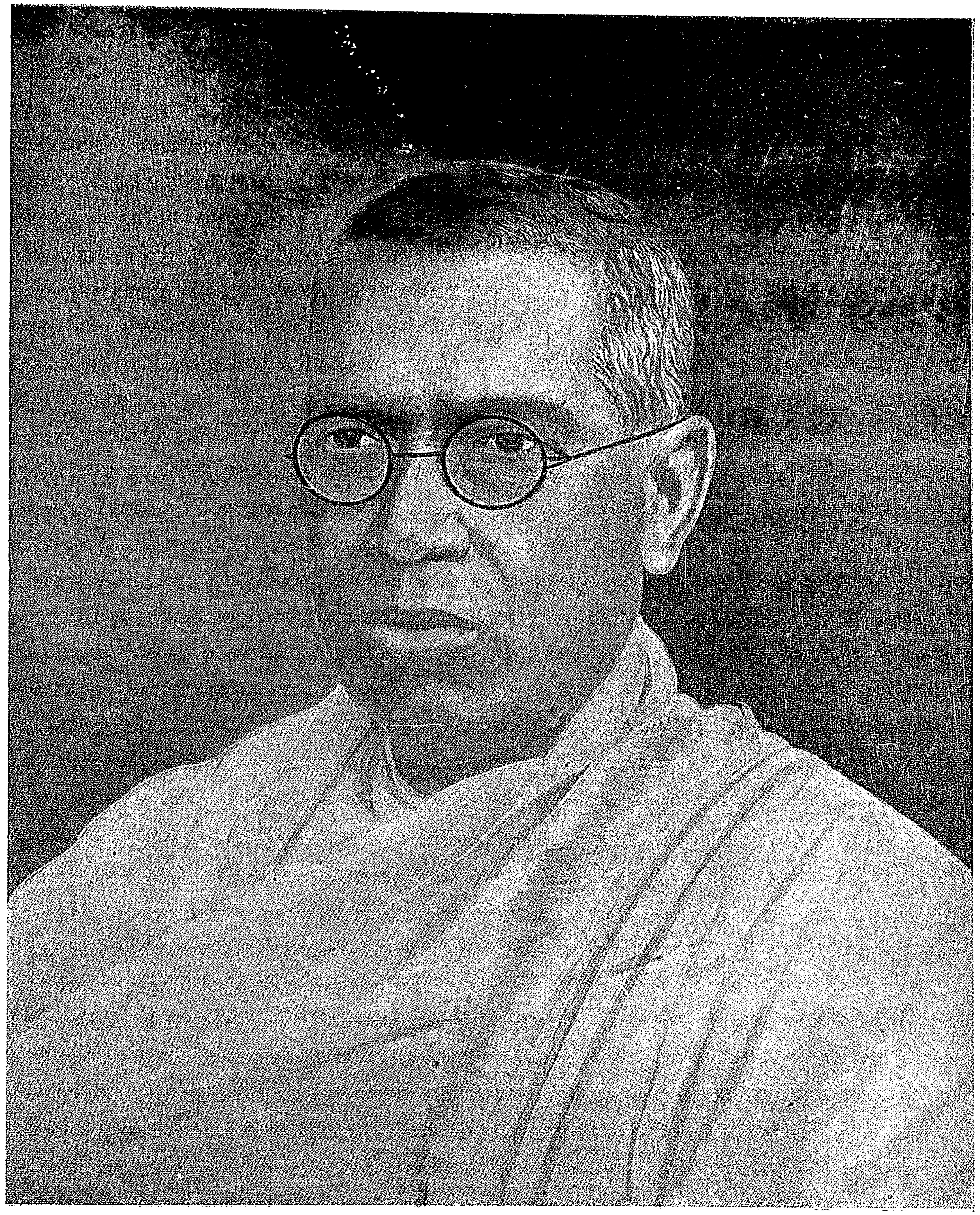

জন্ম—২২শে কার্ত্তিক ১২৬৫ সাল   বিপিনচন্দ্র পাল   মৃত্যু—৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯ সাল

COLOURED ILLUSTRATION

বিরুদ্ধ দুইটি শক্তি তখন বাঙ্গালীর মনকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। একদিকে ধর্ম্ম ও সমাজজীবন সংস্কারের আন্দোলনে উচ্ছ্বসিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ এই আন্দোলনের নেতা। ইঁহাদের অনুপ্রাণনায় অনেক বাঙ্গালী যুবক পৈত্রিক ধর্ম্ম ও সমাজ ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবায় আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই যুবকবৃন্দের মধ্যে বিপিনচন্দ্র অন্যতম। অন্যদিকে দেশের সভ্যতা সাধনা সম্বন্ধে লোকের মনে সম্ভ্রমের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্যের অনুকরণে নিজেদের সমাজের ও ধর্ম্মের নবকলেবর দান করিতে হইবে, এই চেষ্টার বিরুদ্ধে দেশের লোকের মনে একটা ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। বাংলা দেশে বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন" ও মহারাষ্ট্রে বিষ্ণুশাস্ত্রী বিপুলঙ্কারের "নিবন্ধমালা"—এই দুইখানি মাসিক পত্রিকায় এই পরানুকরণের বিরুদ্ধে দেশের লোকের মনোভাব প্রকাশ পাইতেছিল। প্রায় সেই সময়ে পাঞ্জাবে দয়ানন্দ সরস্বতী ও মান্দ্রাজে থিয়োসফিকাল সোসাইটি প্রাচীন আদর্শে আমাদের দেশের জীবন নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিবার কথা প্রচার করিতেছিলেন এবং সেই সময়ে যুক্তপ্রদেশের মুসলমান-সমাজে নবজীবনের প্রবর্ত্তকরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—সৈয়দ আহাম্মদ। সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, শিশিরকুমার শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি রাজনীতিক নূতন পথে চালিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এইরূপ নানা প্রভাবের মধ্যে বিপিনচন্দ্রের প্রথম যৌবন গড়িয়া উঠিয়াছিল।

ষোল বৎসর বয়স্ক বিপিনচন্দ্র লেখার ও বক্তৃতার সাহায্যে গণ-মত ও গণ-মন সংগঠন করিবার কল্পনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠেন। কেশবচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায়, বঙ্কিমচন্দ্র শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখায় নিজের জীবনের কর্ম্ম-পথের সন্ধান পান। সেইজন্যই দেখিতে পাই বাঁধাধরা পাঠ্য-পুস্তকের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিপিনচন্দ্র জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে জ্ঞান আহরণ করিতেছেন। কলেজের কাছে ক্যানিং লাইব্রেরী নামে একখানি পুস্তকের দোকান ছিল। কলেজের ক্লাসে অনুপস্থিত থাকিয়া এই পুস্তকের দোকানে বসিয়া দিনের পর দিন তিনি পুস্তক ঘাঁটিতেন। তাহার ফলে ফার্স্ট আর্ট্স্ পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। এই ব্যর্থতায় কিন্তু তাঁহার জ্ঞানান্বেষণের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং এই অনুশীলনের প্রসাদে বাইশ বৎসর বয়সে তিনি কটক শহরের প্যারীমোহন হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। এই বিদ্যার জোরে পরে তিনি শ্রীহট্ট শহরের জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকপদ লাভ করেন। এই বিদ্যার জোরে মহীশূরের বাঙ্গালোর শহরের আরকট নারায়ণ নারায়ণস্বামী নাইডু হাই স্কুলেও এইরূপ উচ্চপদ লাভ করেন। উত্তরকালে ইংরেজী ভাষার উপর অধিকার বলে মেটকাফ্ হল (বর্ত্তমানে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী) নামক গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের লাইব্রেরিয়ান পদ লাভ করেন। বিপিনচন্দ্রের লেখায় ও বক্তৃতায় যে বাকবিভূতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা এই ভাবেই তাঁহার প্রথম জীবনে লাভ হইয়াছিল।

শ্রীহট্ট শহরের জাতীয় বিদ্যালয়ের সেবায় যখন নিযুক্ত ছিলেন তখনই বিপিনচন্দ্র "পরিদর্শক" নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। কলিকাতা হইতে কম্পোজিটার আনাইয়া এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এক সময়ে ইহাদের ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া নিজেদের প্রবন্ধ নিজেরা কম্পোজ করিয়া নিজেরা ছাপিয়া প্রকাশিত করেন। এই হাতেখড়ি ব্যর্থ হয় নাই। জীবনের বিশিষ্ট অংশ সংবাদপত্রের লেখক, সংবাদপত্রের সম্পাদক-রূপে তাঁহার কাটিয়াছে। কত সংবাদপত্রে যে তাঁহার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইংরেজী বাংলা উভয় ভাষায় তাঁহার তুল্যাধিকার ছিল। লেখায় বক্তৃতায় কেশবচন্দ্রের পূর্ব্বে ও পরে তাঁহার মতন বাঙ্গালী লেখক ও বাগ্মী কম দেখা গিয়াছে—দুইটি ভাষায় যাঁহার ভাবের স্রোত বন্যার মতন বহিয়া গিয়াছে। কয়েকখানি পত্রিকার নাম করিলে বিপিনচন্দ্রের লেখক-জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন'—চিত্তরঞ্জন দাশের পিতা ভুবনমোহন দাশ ইহার সম্পাদক ছিলেন; বিপিনচন্দ্র ছিলেন সহকারী সম্পাদক। 'হিতবাদী', 'বঙ্গবাসী', 'সঞ্জীবনী' ও লাহোরের সহরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকা তখন সাপ্তাহিক ছিল; প্রায় এক বৎসর বিপিনচন্দ্র ট্রিবিউনের সহকারী সম্পাদক ছিলেন; মাস দুই-তিনের জন্য সম্পাদক ছিলেন। 'বেঙ্গলী' পত্রিকা যখন দৈনিক হয় তখন তাহার নিয়মিত লেখক ছিলেন; সুরেন্দ্রনাথ তাহার সম্পাদক। 'নিউ ইণ্ডিয়া'

সাপ্তাহিকের সম্পাদক ; 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক ; বিলাতে 'স্বরাজ' মাসিকের সম্পাদক ; 'হিন্দু রিভিউ' মাসিকের সম্পাদক ; 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র নিয়মিত লেখক ; 'ডিমোক্রাট' সাপ্তাহিকের সম্পাদক ; 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক—শেষের দুইখানি এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হইত।

'ইংলিশম্যান' পত্রিকার নিয়মিত লেখকরূপে প্রায় চার-পাঁচ বৎসর তিনি বিশেষ প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন। এই ইংরেজী পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার জন্য বিপিনচন্দ্র নিজের স্বদেশবাসী অনেকের নিকটে নিন্দাভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু যে অবস্থায় পড়িয়া তাঁহাকে এই পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে হয়, তাহার ইতিহাস লোকচক্ষুর গোচরীভূত করা প্রয়োজন। অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০-১৯২১ খৃঃ) গান্ধিজী প্রবর্ত্তিত কর্ম্মপন্থার বিরোধী হইলেও কোন কোন বিষয়ে বিপিনচন্দ্র তাহার স্বপক্ষে তাঁহার শক্তি নিয়োজিত করেন। যখন স্কুল-কলেজ বর্জ্জন করিয়া ছাত্রদিগকে দেশের সেবায় আহ্বান করা হয়, তখন বিপিনচন্দ্রের কণ্ঠেই—'এডুকেশন ক্যান্ ওয়েট্, স্বরাজ ক্যান্নট'—গতানুগতিক শিক্ষা স্থগিত করিয়া স্বরাজই দেশের ধ্যান-ধারণা হউক—এই বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল। কিন্তু বেশীদিন তিনি এই সাহায্য দিতে পারিলেন না। কারণ, গান্ধিজী-প্রবর্ত্তিত আন্দোলনের নীতি, যুক্তি ও কৌশল সম্বন্ধে প্রথম হইতে একটা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভাব তাঁহার মনে ক্রিয়া করিতেছিল এবং লেখা ও বক্তৃতায় তাহা প্রকাশ পাইতেছিল। বাঙ্গালা দেশে এই আন্দোলনের নেতৃবর্গ তাঁহার মুখ বন্ধ করিবার জন্য যে সব পত্রিকায় বিপিনচন্দ্রের প্রবন্ধাদি নিয়মিত প্রকাশিত হইত তাহাদের স্বত্বাধিকারীদের উপর চাপ দেন। বিপিনচন্দ্রের পক্ষ হইতে প্রস্তাব করা হয় যে, তিনি নিজের নামে প্রবন্ধাদি লিখিবেন এবং এই প্রবন্ধের জন্য কোন আর্থিক প্রতিদান গ্রহণ করিবেন না। এই প্রস্তাবও অগ্রাহ্য হইলে পর নিজের মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার হইতে এইরূপে বঞ্চিত হইবার কল্পনায় বিপিনচন্দ্র অস্থির হইয়া উঠিলেন এবং 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিয়া এই বিষয়ের ব্যবস্থা করিলেন। সপ্তাহে তিন দিন তাঁহার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, সম্পাদকীয় স্তম্ভে বিপিনচন্দ্রের প্রবন্ধের প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে এবং অন্য স্তম্ভে তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, সম্পাদক প্রবন্ধের উপর কলম চালান নাই।

বিপিনচন্দ্রের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও যে সব প্রভাবের মধ্যে তিনি মানুষ হইয়াছিলেন তাহার পরিচয় না দিলে তাঁহার দেশসেবা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করা সম্ভব নয়। তাঁহার আত্মজীবনীতে দেখিতে পাই যে, নিজের পথ নিজে কাটিয়া লইবার স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁহার মন সদা জাগ্রত ছিল ; নিজের জ্ঞান-বিশ্বাস মতে চলিবার স্বাধীনতা এবং নিজের জ্ঞান-বিশ্বাস, যুক্তি-তর্কের প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা সম্বন্ধে এমন সাবধানী লোক অতি অল্পই আমার চোখে পড়িয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কারের ফলে লোকের চিন্তাজগতে যে পরিবর্ত্তন দেখা দেয় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস তাহার মধ্যে প্রধান। ইহা 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—এই উপলব্ধির বৈজ্ঞানিক রূপ। বিপিনচন্দ্র এই যুগের লোক। তাঁহার সহজাত সংস্কার নূতন বৈজ্ঞানিক পরিবেশের অনুপ্রাণনায় জীবনে নানারূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার ধর্ম্ম, সামাজিক ও রাজনীতিক মতামত ও কর্ত্তব্য এই ছাঁচে গড়িয়া উঠিয়াছিল। সে জন্যই দেখিতে পাই যে, প্রথম যৌবনেই তিনি নিজের সমাজ ও ধর্ম্মের নানা সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় একটি গুপ্ত সমিতি গঠিত হয়। নয় জন সভ্য এই সমিতির ব্রত গ্রহণ করেন ; নিজের বুকের রক্তে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া তাহা অগ্নি-কুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়। জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা বিরাজ করিবে ইহাই ছিল সমিতির মূল মন্ত্র। সেইজন্য সামাজিক জীবনে বর্ণভেদ ও জাতিভেদ এবং রাজনীতিক জীবনে পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার ব্রত এই সমিতির নয় জন সভ্য গ্রহণ করেন ; তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস মহাশয় আজিও কর্ম্মক্ষম হইয়া বাঁচিয়া আছেন। 'স্বায়ত্ত শাসনই ভগবৎ-নির্দ্দিষ্ট রাজনীতিক ব্যবস্থা বলিয়া গ্রহণীয়'—এই আদর্শের প্রেরণায় সভ্যগণ প্রতিজ্ঞা করেন যে—"বিদেশী শাসন-ব্যবস্থার অধীনে তাঁহারা কখনও কোন চাকুরী করিবেন না।" আজীবন তাঁহারা এই ব্রত পালন করিয়া গিয়াছেন।

দেশের উন্নতির জন্য, দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য সমাজ-জীবনকে দোষমুক্ত, সবল করিতে হইবে—এই আকাঙ্ক্ষাই সমাজ-সংস্কার চেষ্টার মূল কথা। সংস্কারকগণ সেইজন্য সমাজ-শরীরে যত সব ব্রণ, যত সব রোগ আছে, তাহার নিদান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এই কার্য্যের একটা বিপদও আছে। সংস্কারকগণ ক্রমশ সমাজ হইতে দূরে চলিয়া যান ; সমাজের দোষ উদ্ঘাটন করিতে করিতে সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলেন। সমাজও প্রতিশোধে সংস্কারকগণের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সমাজ ও সংস্কারকগণের মধ্যে এইরূপ একটা সংগ্রাম চলিতেছিল। শিক্ষিত ভারতবাসী সমাজ-জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটা ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছিলেন—ইচ্ছা করিয়া নয়, কর্ম্মের তাড়নায়। শিক্ষিত সমাজের মধ্য হইতেই এই বিপদের সম্বন্ধে সাবধান বাণী উত্থিত হয়। মহারাষ্ট্র দেশে বালগঙ্গাধর তিলক এই বিষয়ে প্রথম হইতেই সজাগ ছিলেন ; বাংলা দেশে বঙ্কিমচন্দ্র, শশধর তর্কচূড়ামণি, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, স্বামী বিবেকানন্দ এই বিচ্ছেদ ও ব্যবধান সম্বন্ধে সমাজকে সাবধান করিয়া দেন। সমাজশক্তির মূলাধার যে জনগণ—তাহাদের জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দেশের স্বাধীনতা আনয়ন করিবার চেষ্টা সফল হইতে পারে না ; নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ভারতবাসীকে ভালবাসিয়া, সেবা করিয়া তাহাদের মনে বুদ্ধি ও বুকে সাহস জাগাইয়া তুলিতে হইবে, তাহাদের বলে বলীয়ান হইয়া দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইবে। বিপিনচন্দ্রের জীবনে এই বিশ্বাস জাগিয়া ওঠে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তিনি ভারত সভ্যতার প্রাণবস্তুর পরিচয় লাভ করেন। আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের সাহচর্য্যে এই পরিচয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রমাণের উপর সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতীয় সভ্যতা-সাধনার মধ্যে মানবজীবনের সার্থকতা লাভ করিবার নানা ইঙ্গিত তাঁহার মানসপথে ফুটিয়া ওঠে। ১৮৯৮ খৃঃ তিনি বিলাত গমন করেন। বিলাতের একেশ্বরবাদী সম্প্রদায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকবর্গের শিক্ষার সুবিধার জন্য একটি বৃত্তি দান করিতেন ; অক্সফোর্ডের মানচেষ্টার কলেজে এক বা দুই বৎসর পাঠ করিবার জন্য এই বৃত্তি দান করা হইত। বিপিনচন্দ্র এই বৃত্তি লাভ করিয়া তথায় গমন করেন। চারি-ছয় মাস পাঠ করিবার পরেই কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া কলেজে পাঠ করিবার দায় হইতে তাঁহাকে মুক্তিদান করেন। বিপিনচন্দ্র ভারতীয় সভ্যতা-সাধনার সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতা-সাধনার তুলনামূলক বিচার করিয়া বিলাতে ও মার্কিনে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে থাকেন। এই সময়ে হাইণ্ডম্যান প্রভৃতি চিন্তানায়কদের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় লাভ হয়। হাইণ্ডম্যান ভারতে ইংরেজ-শাসনের বিরোধী ছিলেন ; বিলাতে সমাজ-তন্ত্র-বাদের একজন প্রবর্ত্তক ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আলোচনায় বিপিনচন্দ্র বর্ত্তমান জগতের রাজনীতির অনেক গুহ্য কথা ও তথ্য পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারেন।

মার্কিন দেশে যখন ধর্ম্ম-প্রচার করিতেছিলেন, তখন একটা অভিজ্ঞতায় বিপিনচন্দ্রের জীবনের মোড় ফিরিয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব তখন মার্কিনে প্রবল। বিবেকানন্দের দেশের লোক ধর্ম্মের কথা বলিলে লোকে তাহা নতশিরে শুনিত। বিপিনচন্দ্রও সর্ব্বত্র আদর-যত্ন পাইয়াছিলেন। বিপিনচন্দ্র তাঁহার বক্তৃতায় ভারত-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিতেন ; বিধাতাপুরুষ ভারতবর্ষকে আধুনিক জগতের আচার্য্য পদে বরণ করিয়াছেন এই বার্ত্তা প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেন ; ভারতবর্ষই কেবল আধুনিকতার মধ্যে বাঁচিয়া আছে, কারণ এখনও তাহার বিশ্বকে কিছু দিবার আছে। তাঁহার একজন মার্কিন বন্ধু এই গুরুগিরিতে খোঁচা মারিয়া বিপিনচন্দ্রের চৈতন্য সম্পাদন করেন। বিপিনচন্দ্র যেদিন নিউ-ইয়র্কে পদার্পণ করেন, সেইদিন এই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি বিপিনচন্দ্রকে দেখিবামাত্র হস্ত-মর্দ্দন করিয়া বলিলেন—"মহাশয়, আপনি এক বিরাট দেশ হইতে আসিতেছেন ; আপনারা জগতের শিক্ষা-গুরু, দীক্ষা-গুরুপদে বিধাতা কর্ত্তৃক বৃত হইয়াছেন ; কিন্তু যতদিন না আপনারা জগতের অন্যান্য জাতির সঙ্গে এক মঞ্চে দাঁড়াইয়া তাহাদের চোখের দিকে সমানভাবে চাহিতে পারিতেছেন, ততদিন এই বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবেন না। বিপিনচন্দ্রের ভাষায় এই অভিজ্ঞতার বর্ণনা করিতে হয়—"কথাগুলি যেন আমার প্রাণের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত খোঁচাইয়া দিল। আর নিউ ইয়র্কের

হোটেলের পাঠাগারে এই মার্কিন-বন্ধুর এই অপ্রত্যাশিত সম্বর্দ্ধনার মধ্যেই মনে হয় আমার অজ্ঞাতসারে সেই মাঘের অপরাহ্নে আমার অন্তরে আমার নূতন স্বাদেশিকতার জন্ম হয়। তখন হইতেই বুঝিলাম…যতদিন না ভারতের রাষ্ট্রীয় দাসত্ব ঘুচিয়াছে এবং আমরা চারিদিকের স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ জাতি সকলের মাঝখানে স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছি ততদিন আমাদিগের যাহা দিবার আছে, জগতের লোকে তাহা গ্রহণ করিবে না।… ভারতবর্ষ যতদিন য়ুরোপের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিবে ততদিন তাহার রত্নভাণ্ডার বিদেশীয়েরাই লুটিয়া লইবার চেষ্টা করিবে, সে নিজের হাতে সে ভাণ্ডারের চাবি খুলিয়া বিশ্বমানবের জ্ঞানকোষের সমৃদ্ধি সাধন করিতে পারিবে না—এই কথাটা এমন সোজাসুজিভাবে আগে কেহ কহে নাই। আর আমিও আধুনিক ভারতের সকল সাধনের পূর্ব্ববর্ত্তী-সাধন যে জাতীয় স্বাধীনতা লাভ, একথাটা সমুদয় জ্ঞান ও সমুদয় ভাব দিয়া ধরিতে পারি নাই।"

মার্কিন-প্রবাসের এই "সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষয়" লইয়া বিপিনচন্দ্র ১৯০০ খৃঃ দেশে ফিরিয়া আসেন এবং নিউ ইণ্ডিয়া নামে একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া রাজনীতিক জীবনে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিবার কথা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এরূপ কথা বঙ্কিমচন্দ্রের "লোকরহস্য"-এ পাওয়া যায়; রাজ-দরবারে "আবেদন-নিবেদনের পালা" বহিয়া লইবার হীনতার কথা রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে প্রচারিত হইয়াছিল। বিপিনচন্দ্র এই কথাটা সারা ভারতময় প্রচার করেন। লর্ড কার্জ্জন তখন ভারতবর্ষের বড়লাট। তাঁহার দাম্ভিকতায় দেশের শিক্ষিত সমাজ উত্যক্ত। শাসনকার্য্যের সুবিধার নামে বাঙ্গালী জাতিকে দুই প্রদেশের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন তিনি। বাঙ্গালী জাতির শক্তি ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইবে, এই আশঙ্কায় এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বাঙ্গালী, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী হিন্দুসমাজ দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া দাঁড়াইল। দেশব্যাপী এই প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া ১৯০৫ খৃঃ ১৬ই অক্টোবর বঙ্গ-ভঙ্গ হইল। তাহার প্রতিকারের জন্য বিলাতের পণ্য-দ্রব্য বর্জ্জন করা হইল। এই অর্থ-নীতিক অস্ত্র-প্রয়োগ সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র প্রথমে সন্দেহাকুল ছিলেন। কিন্তু এই বর্জ্জনের অস্ত্রকে বিলাতের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার সংশ্রবের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যায়, এই ভাবিয়া তিনি দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপ বর্জ্জন দ্বারা আত্মপ্রত্যয় জন্মিবে, আত্ম-বিশ্বাস ফিরিয়া আসিবে এবং আত্মশক্তির বলে জাতি স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিবে এই কথাটা প্রচার করিবার জন্য বিপিনচন্দ্র পাগলপারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেন! ১৯০৬ খৃঃ তিনি "বন্দে-মাতরম" নামে একখানি ইংরেজী দৈনিক পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা স্তম্ভে একটি প্রবন্ধে 'অটোনমী ফ্রি ফ্রম্ বৃটিশ্ কন্ট্রোল্'—বৃটিশের প্রভুত্বমুক্ত স্বাধীনতার কথা বলেন। সেইদিন এই কথা বলা কম সাহসের কাজ ছিল না। এই পত্রিকার সম্পাদকের পদ তিন-চারি মাস পরে তিনি ছাড়িয়া দেন এবং শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ তাহার সম্পাদক হন। তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত রাজদ্রোহের মোকদ্দমায় সরকার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করার অপরাধে বিপিনচন্দ্র ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। বক্সার জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া যেদিন বিপিনচন্দ্র কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন, সেদিন যে অভ্যর্থনা তিনি লাভ করিয়াছিলেন তাহা রাজার ভাগ্যেও বড় একটা জোটে না। ইহার এক বৎসর পরে বিপিনচন্দ্র বিলাত চলিয়া যান। সেখানে প্রায় তিন বৎসর ছিলেন। বর্ত্তমান জগতের রাজনীতিক খেলার কেন্দ্রে বসিয়া তিনি দুনিয়ার শক্তি-নিচয়ের কুটিল গতিবিধির বিশেষ পরিচয় লাভ করেন। এই অভিজ্ঞতার কথা তাঁর 'ন্যাশনালিটি এণ্ড এম্পায়ার' বই-খানিতে লিপিবদ্ধ আছে। এই বইয়ে তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে হইলে ভারতবর্ষকে স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ করিয়া দেওয়া ছাড়া ইংরেজের গত্যন্তর নাই, যেমন কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা স্বাধীন হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে বৃটিশের সাহচর্য্যের প্রয়োজন। ১৯০৯ হইতে ১৯৩২ পর্য্যন্ত, যতদিন বিপিনচন্দ্র বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন নানাভাবে তিনি এই কথাটাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আজ দুনিয়া, আজ বৃটিশ সাম্রাজ্য ও ভারতবর্ষ যখন বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে, তখন এই চিন্তা-নায়কের কথা মনে হয়।

বিপিনচন্দ্র কেবল রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না। সাহিত্য-রসিক সমালোচকরূপে বাংলা সাহিত্যে তাঁহার আসন উচ্চে স্থাপিত। 'বিজয়া,' নবপর্য্যায়ের 'বঙ্গদর্শন,' ও 'নারায়ণ' মাসিক পত্রিকায় তার চিন্তা-ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তত্ত্বান্বেষী ছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের অলক্ষ্য অনু-প্রেরণায় বাংলা দেশের, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধক ও সাধনা সম্বন্ধে তিনি যে আলোচনার সূচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পণ্ডিত-সমাজ গ্রাহ্য করিয়াছেন। 'নারায়ণ' পত্রিকার পৃষ্ঠার বিচ্ছিন্ন এই প্রবন্ধাবলী, 'হিন্দু রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী, এই বিষয়ে নূতন আলোক নিক্ষেপ করিয়াছে। ইংরেজী প্রবন্ধগুলি 'বেঙ্গল বৈষ্ণবিজম্' নামে পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের নবযুগের চিন্তা নায়ক, রাজনীতিক নেতৃ-বৃন্দের চরিত-কথা তিনি যেভাবে বাংলা ইংরেজীতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা সাহিত্য-জগতে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। 'সোল্ অফ ইণ্ডিয়া' নামীয় বইয়ে হিন্দু সভ্যতার গোড়ার কথা তিনি যেমন করিয়া পরিস্ফুট করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহার মূল্য-নির্দ্ধারণ করিবার দিন কবে আসিবে জানি না। দেশ যখন জ্ঞানে, কর্ম্মে, চিন্তায় স্বাধীনতা লাভ করিবে তখন বাংলা দেশ এই চিন্তা-নায়কের প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন করিতে পারিবে, এই ভরসায় তাঁহার জীবন-কথার সামান্য পরিচয় দিলাম।

পিতৃ-জীবন

শ্রীকালিদাস রায়

সারা রাত্রি জাগিয়াছি। গেছে রাত বেঘোরে খোকার,
কত জ্বর কেবা জানে? ভয়ে ভয়ে থার্মোমিটার
দিই নি বগলে তার— দিয়ে গেছি বরফ মাথায়,
ভোরে মনে হ'ল কম, কম্প্রহস্তে দেখিলাম হায়
তখনো একশ' দুই। যেতে হয় ডাক্তারের বাড়ী,
রাতজাগা ছিল ভালো, এখন যে যেতে হয় ছাড়ি'।
গৃহিণীরে যেতে হয় অনিচ্ছায় রান্নাঘর পানে,
দশ বছরের মেয়ে অমিয়ারে বসায়ে সেখানে।

আমাদের খাওয়া সে-ত পিণ্ডগেলা, মুখপানে চেয়ে
অন্য ছেলেমেয়েদের, রাঁধিবারে যেতে হয় নেয়ে,
ছুটিয়া আসিতে হয় রান্নাঘর হ'তে শতবার
খোকার কাঁদন শুনে।
চুকাইতে ঔষধ ডাক্তার,
নয়টা বাজিয়া যায়। তাড়াতাড়ি কলে স্নান ক'রে
আলু সিদ্ধ ভাত গুঁজে নাকেমুখে দগ্ধোদর ভ'রে
যেতে হয় কর্ম্মস্থানে। শতবার চেয়ে পিছুপানে
খোকার মুখের দিকে, গৃহিণীরে উপদেশ দানে
বিশেষ সতর্ক ক'রে অবশেষে ফেলি দীর্ঘশ্বাস
ছাতা হাতে নিতে হয়, নতুবা সবার উপবাস
চলিবে দুদিন পরে অন্নাভাবে। হ'য়ে যায় দেরি
পঁহুছিতে কর্ম্মস্থানে। সেথা গিয়ে রক্তচক্ষু হেরি,
কাজে লাগে নাক মন, তবু কাজ করিতেই হয়
নিতান্ত অভ্যাস বশে। মাঝে মাঝে চমকে হৃদয়
স্মরিয়া বাড়ীর কথা, ভুল হয়, দীর্ঘশ্বাস ফেলি,
দিনের খেয়ার নায়ে প্রাণপণে চলি লগি ঠেলি,
বেলা যত শেষ হয় পোড়া কাজ যায় তত বেড়ে,
সাথীদের আনুকূল্যে তাড়াতাড়ি বাকি কাজ সেরে
ছুটে যাই বাড়ী পানে। ভাবিতে ভাবিতে পথে যাই
বাড়ী গিয়ে দেখি যদি খোকাটির আর জ্বর নাই,
গৃহিণী দুয়ার খুলি বলে যদি হাসি—হাসিমুখে
'আজ জ্বর ছেড়ে গেছে।' প্রাণ তবে কি অপূর্ব্বসুখে
ভ'রে যায়, কি আনন্দ, এর চেয়ে কি আনন্দ আছে?
সৌভাগ্য ইহার চেয়ে এ জীবনে কবে মিলিয়াছে?
ভাবিতে ভাবিতে চলি, দূর হ'তে বাড়ীটি দেখিয়া
বুক করে দুরু দুরু। কাণ পেতে শুনি দাঁড়াইয়া
সেথায় উঠিছে কি না শোকধ্বনি, দেখি লক্ষ্য ক'রে
সম্মুখে জমেছে কি না লোকজন সারা পথ ভ'রে।
পাশের বাড়ীর দ্বারে মোটর দাঁড়ানো দেখি ছুটি
নিজের বাড়ীর দ্বারে মনে করি চমকিয়া উঠি,—
মহানবমীর ছাগ আমি যেন, কাঁপিতে কাঁপিতে
চলি নিজ গৃহপানে। কি জানি কি দেখিব বাড়ীতে,
শঙ্কায় আকুল প্রাণ। এই চিত্র একদিনকার
নহে, নহে। এই নিয়ে আমাদের বিচিত্র সংসার।
এই দিনগুলি দীর্ঘ— অতি দীর্ঘ বেদনা নিবিড়
বিপুল বিশাল হ'য়ে পান করি বুকের রুধির,
গ্রাস করি ফেলিয়াছে জীবনের বাকী দিনগুলি
ভুবনেরে অন্ধকার, জীবনেরে অন্ধ ক'রে তুলি।

বাংলা পুঁথিতে বানান ও লিপিকৌশল

শ্রীনারায়ণ রায় এম-এ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই শ্রীচৈতন্যদেবের সময় হইতে বঙ্গভাষার চর্চ্চা পূর্ব্বাপেক্ষা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। বঙ্গভাষায় বহু গ্রন্থাদি লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। এই সকল পুস্তক শিক্ষার্থী ও জ্ঞান অন্বেষণকারীগণ নকল করিয়া বা করাইয়া পাঠ করিতেন, পরে শিষ্য বা পুত্রগণকে পাঠের নিমিত্ত দিতেন।

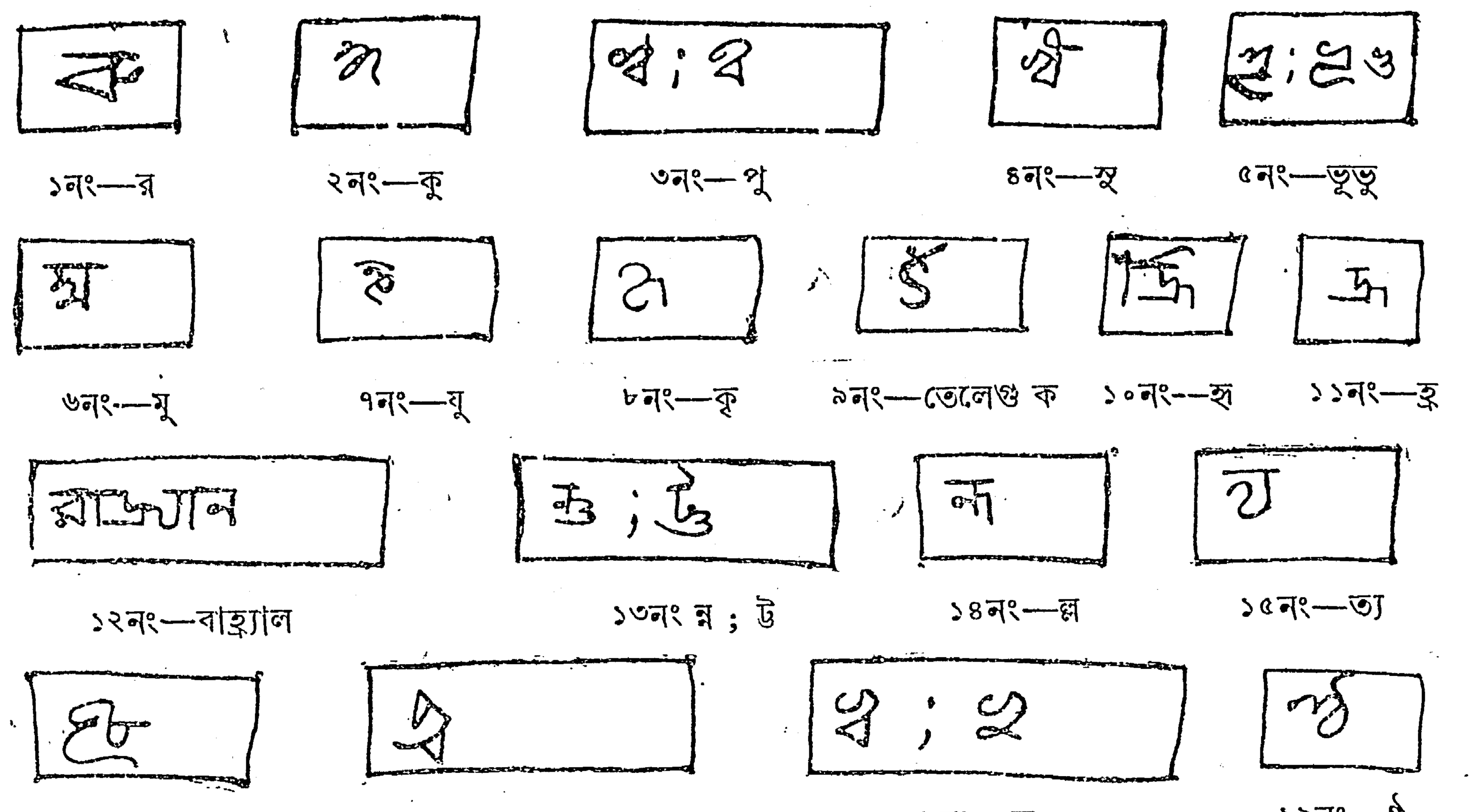

১নং—র ২নং—কু ৩নং—পু ৪নং—স্থ ৫নং—ভুভু
৬নং—মু ৭নং—মু ৮নং—কৃ ৯নং—তেলেগু ক ১০নং—হ্ন ১১নং—হ্রু
১২নং—বাত্যাল ১৩নং ম্ভ ; উ ১৪নং—ল্ল ১৫নং—ত্য
১৬নং—ধ্য ১৭নং—প্র ১৮নং—স্র ১৯নং—ঠ

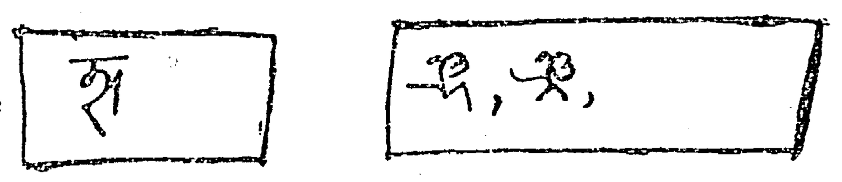

২০নং—দ্ধ ২১নং—ঞ্জ

আমাদের দেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় হুগলীতে, ঈস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর উইলকিন্স সাহেবের দ্বারা, মাত্র ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে। তাহার পূর্ব্বে মুদ্রাযন্ত্র আমাদের দেশে ছিল না। অবশ্য মুদ্রাযন্ত্র ছিল না বলিয়াই যে মুদ্রণ হইত না এরূপ মনে করিলে ভুল হইবে। দীনেশবাবু তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের নবম অধ্যায়ের পরিশিষ্টে বলিয়াছেন—"বাঙ্গালার প্রাচীন পুঁথিতে আমরা মুদ্রিত লিপির নমুনা পাইয়াছি। প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন একখানি বাঙ্গালা পুঁথিতে কাঠের উপর খোদিত লিপির সাহায্যে কাগজে মুদ্রিত লিপির নমুনা দেখিয়াছি। তদ্দ্বারা মনে হয় সাধারণের মধ্যে মুদ্রিত লিপির প্রচলন না থাকিলেও ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় সেইরূপ মুদ্রণকার্য্য মধ্যে মধ্যে হইত। ইহা অবশ্যই নিষ্কর্ম্মা লিপিকরের স্বীয় চিত্তবিনোদনের জন্যই সম্পাদিত হইত।"

সে যাহাই হউক, এইরূপ মুদ্রণের সংখ্যা এত কম যে, উহা নিষ্কর্ম্মা লিপিকরের স্বীয় চিত্ত বিনোদনের অথবা অপর কাহারও চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত করা হইত, সে অনুসন্ধানের তাগিদ মিটান বর্ত্তমানে মুলতুবি রাখিয়া আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার সুপ্রচলিত হওয়ার পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় লেখকগণ যাহা রচনা করিতেন, নকলনবীশগণ অতি পরিচিত হরিদ্রাবর্ণের তুলট কাগজে উহার নকল করিতেন, ক্রমেই এইরূপ হস্তলিখিত পুঁথির সংখ্যা বাড়িতে থাকিত ও রচিত গ্রন্থ-সকল সুপ্রচারিত হইত।

মুদ্রাযন্ত্রের বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যামোদী ও অনুসন্ধিৎসুগণ হস্তলিখিত পুঁথি হইতে পাঠোদ্ধার করিয়া ঐ সকল পুস্তক মুদ্রণ করাইতে লাগিলেন। কিন্তু এই মুদ্রণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুঁথির বিবরণ বা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ও এসিয়াটিক সোসাইটীর পুঁথির তালিকা-দৃষ্টে অতি সহজে উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে, যাহা মুদ্রিত হইয়াছে তাহা সমগ্র পুঁথির সংখ্যার একটী অতি সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র।

এইসকল গ্রন্থে এমন বহু বিষয় সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, যাহার প্রচারে বহু জ্ঞাতব্য তথ্যের উপর আলোকসম্পাত করা হইবে। ঐ সকল পুঁথির অনেকগুলির ঐতিহাসিক

মূল্যও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। যাহা অপঠিত হইয়া গৃহকোণে পড়িয়া রহিয়াছে হয়ত সেই সকলের পাঠ ও প্রচারের ফলে বাংলার ইতিহাস, বিশেষ করিয়া বাংলার সাহিত্যের ইতিহাস, ধর্ম্মের ইতিহাসও বটে, নূতন করিয়া লিখিবার প্রয়োজন হইতে পারে।

কিন্তু উহা পাঠ করে কে? একে ত বহু পুঁথি পাওয়াই যায় না। তাহার উপর যাঁহাদের নিকট আছে তাঁহারা হয়ত উহাকে অনাদরে কোন মাচার উপর বহু অব্যবহার্য্য জিনিসের সহিত রাখিয়াছেন, কালক্রমে কীটদষ্ট হইয়া অথবা অন্য প্রকারে লোপ পাইতেছে, আবার কেহ-বা উহাদিগকে সাধারণের অগোচরীভূত রাখিয়া দেবতার সিংহাসনের পার্শ্বে একটু স্থান দিয়া সযত্নে পূজা করিয়া সন্তুষ্ট আছেন। প্রকৃষ্টরূপে ব্যবহার করিতেছেন কয়জন? আবার যে সব পুঁথি সাধারণে দেখিবার বা পড়িবার সুযোগ পাইতে পারেন, উহা দেখিয়া বা পড়িয়া সেই সুযোগের সদ্ব্যবহারই বা কয়জন করেন! অনেকে করেন না, অনেকে পারেন না।

না করার কারণ যাহাই থাকুক, না পারার কারণ আছে বহু। বাংলাপুঁথির বানান ও লিপিকৌশল জানা না থাকা, বাংলা পুঁথি পাঠ না করিতে পারার অন্যতম কারণ।

লিপিকৌশলের আলোচনা করার পূর্ব্বে বানান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। বর্ত্তমানে প্রচলিত বাংলার বানানের সহিত বাংলা পুঁথির বানানের অসাদৃশ্য বহু পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর এক একটী করিয়া অতি সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিব।

'ই'-কারের প্রভাব অত্যন্ত বেশী, মনে হয় 'ঈ'-কারকে অতি যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করা হইয়াছে। যে বানানগুলি অতি সাধারণ সেরূপ স্থলেও 'ঈ'-কারের পরিবর্ত্তে 'ই'-কার দৃষ্ট হয়। উকার সম্বন্ধেও প্রায় তাই, দু-এক স্থল ব্যতীত 'ঊ'কার নাই, প্রায় সর্ব্বস্থলেই 'উ'কার লিখিত হইয়াছে। দুটী ন স্থানে মাত্র দন্ত ন ব্যবহার করা হইয়াছে। তিনটী স স্থলেও এইরূপ পক্ষপাতিত্ব ঘটিয়াছে। দন্ত 'স'ই বেশী। 'ষ' যদিও দেখিতে পাওয়া যায়, 'শ' প্রায় নাই বলিলেই চলে। বানানে 'য' স্থানে 'জ'-এর ব্যবহার বহুল পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়। এমন কি যুগ, যুবতী ইত্যাদি অতি সাধারণ কথায়ও। ং স্থানে ঙ ও 'য়াঁ' স্থানে এ্যা ব্যবহৃত হইয়াছে।

যুক্ত অক্ষরকে পারতপক্ষে পরিত্যাগ করা হইয়াছে, আবার অনেক স্থলে অযথা বহু জটিল যুক্তাক্ষরের প্রয়োগ করা হইয়াছে। যে সকল স্থলে সমঅক্ষরের যুক্তাক্ষর হওয়া উচিত, সে সকল স্থলে সাধারণত 'ব'-ফলা বা 'ব'-ফলা দ্বারা তাহা নিষ্পন্ন হইয়াছে। এইরূপে অন্ন স্থানে অর্ন বা অন্য প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যাইবে। রেফের প্রাদুর্ভাব, যুক্তাক্ষরের সহিত, বিশেষ করিয়া উল্লিখিতরূপ যুক্তাক্ষরের সহিত, অতি অধিক। "ম" বা ম্ম স্থলে ন্ম লিখিত হইয়াছে। আবার ক্ষেত্রবিশেষে সরল করিতে গিয়া 'চ্ছ' স্থানে 'ৎস' লিখিত হইয়াছে (যথা আচ্ছাদিয়া স্থলে আৎসাদিয়া)।

অনেকে হয়ত বলিবেন, এ সকল অতি সাধারণ ভুল। আজও নকলনবীশগণ বানান ঠিক রাখিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন আমরা দেখি, সকলেরই এক প্রকার ভুল তখন কি আমরা উপরিউক্ত যুক্তি বলে ধরিয়া লইব যে, সকল নকলকারীই মূর্খ ছিল? আবার ইহাও দেখি যে, যে সকল পুঁথির বয়স দেড়শত-দুইশত বৎসরের বেশী নহে তাহাতে এই সকল বানানবিভ্রাট বেশী নহে। যে সকল বানানের কথা বলিলাম, উহা সত্যই অজ্ঞতাপ্রসূত অথবা তৎকালীন বাংলা বানানের কোন নিয়ম না থাকাজনিত তাহা কে বলিতে পারে! সকল নকলকারীই মূর্খ ছিল, এ অনুমান বোধ হয় অতি অসঙ্গত হইবে।

কিন্তু সে যাহাই হউক, আমরা দেখিতে পাই, যে কারণেই হউক, দেড়শত-দুইশত বৎসরের বেশী পুরাতন প্রাচীন পুথিতে এইরূপ বানান সর্ব্বত্র, সুতরাং এ সম্বন্ধে পুঁথিপাঠকারীগণের ওয়াকিবহাল থাকা উচিত।

বানানের প্রশ্ন হইতে আপাতত লিপিকৌশলের প্রসঙ্গে আসা যাউক। পুঁথির লিপি সম্বন্ধে কিছু জানা না থাকিলে পুঁথি পাঠ করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র; কেন না, বর্ত্তমানে ছাপার হরফ পাঠে অভ্যস্ত চোখ আমাদের পুঁথির হরফ পড়িতে গিয়া পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হইবে।

প্রথমেই কয়েকটী সাধারণ অক্ষরের কথা ধরা যাউক :—

'ন' ও 'ল'-এ তফাৎ বিন্দুমাত্রও নাই, অবশ্য সে বৈশিষ্ট্য এখনও প্রাচীনপন্থীদের হস্তলিপিতে দৃষ্ট হয়। এখনও বহু ব্যক্তি 'ন'-কারের নিম্নে বিন্দু প্রয়োগ করিয়া 'ল' লিখিয়া থাকেন—তফাৎ এই যে, পুঁথিতে এই বিন্দুটীও নাই, উহা বিসর্জ্জিত হইয়াছে এবং উহার ফলেই বহু বিভ্রাট ঘটিয়াছে।

তারপর আর একটী বিভ্রাট ব ও র লইয়া। বহুস্থলে 'ব' ও 'র' পরস্পরের সহিত রূপ পরিবর্ত্তন করিয়াছে। কখনও 'ব'য়ের পেট কাটিয়া আবার কখনও বা 'ব'এর দক্ষিণ পার্শ্বে মাত্রার সমান্তরাল একটী রেখা টানিয়া 'র' বোঝান হইয়াছে (১নং চিত্র)। 'ব' ও 'র'-এও বিভ্রাট মন্দ নহে, তবে উহা বুঝা বিশেষ কষ্টসাধ্যও নহে। বাংলা পুঁথিতে 'ঙ' হইয়াছে সংখ্যাবাচক ২ চিহ্ন ও অনুস্বারের মাত্র বিন্দুটাই অবশিষ্ট আছে, পুচ্ছটী লোপ পাইয়াছে—ঠিক যে ভাবে দেবনাগরীতে অনুস্বার বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে। দীর্ঘ উকারের উপরের আঁকড়ির লোপ ঘটিয়াছে। বহুস্থলে 'চ' ও 'ঠ'-এ পার্থক্য বোঝাই দায়। ড় ও ঢ়-এ যে বিন্দুর বালাই কুত্রাপি নাই একথা বলা বাহুল্য মাত্র।

বর্ত্তমান বাংলায় ‘ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত উ-কারের তিনটী রূপ, একটী দেখি ‘র’-এ উকারে (রু), আর একটী দেখি ‘ত’-এ ‘উ-’কারে (স্তু) ও অপরটী দেখিতে পাই সাধারণ ক্ষেত্রে (স্থু)। কিন্তু পুঁথির ‘উ’-কার বিভিন্ন অক্ষরের সহিত যুক্ত হইবার সময় বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া নিজের রূপ ত পরিবর্ত্তন করিয়াছেই, উপরন্তু যাহার সহিত যুক্ত হইয়াছে তাহারও ভোল ফিরাইয়া দিয়াছে। কয়েকটী নমুনা দিতেছি। ‘ক’-এ যুক্ত হইয়া কু আঁকড়িবিহীন দীর্ঘ ‘ঈ’ বা চন্দ্রবিন্দু-বিহীন ‘ঙ্গ’-এ পরিণত হইয়াছে (২নং চিত্র)। আবার বহুস্থলে প্রায় এই ভাবেই ‘দ’-এ ‘দ’-এ লিখিত হইয়াছে। ‘প’-এর সহিত যুক্ত হইয়া তাহার রূপের যে পরিবর্ত্তন করিয়াছে তাহা মুখে বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা না করিয়া আঁকিয়া দেখানই যুক্তিসঙ্গত ও সহজসাধ্য (৩নং চিত্র)। ‘থ’-এর মাথায় একটী পাগড়ি বাঁধাইয়া (৪নং চিত্র) ‘স্থু’ করা হইয়াছে। ‘ভ’-এর সহিত উ-কার যুক্ত হইয়া অসহায় ‘ভ’-কে চতুষ্কোণ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাতেও নিষ্কৃতি নাই; একটী দীর্ঘলাঙ্গুল সংযোগ করিয়াছে (৫নং চিত্র)। একটী স্থলে ডুইটী ‘পুঁটুলির’ বোঝা বহিয়া ‘ম’ উকারের সম্মান রাখিয়াছে (৬নং চিত্র) যেন ‘ম’-এ ‘ভ’-এর শেষাংশের আঁকড়িটুকু মুছিয়া ফেলা হইয়াছে। নির্ব্বোধ ‘য’ ‘উ-কারের চাপে ‘হ’-এ ‘ব’-এ হইয়া গিয়াছে (৭নং চিত্র)।’

ঋকারের বিভ্রাটও বড় কম নয়। ‘ক’-এ ঋফলাযুক্ত হইয়া বাংলা ‘ক’-এর রূপ হইয়াছে প্রায় তেলেগু ‘ক-’এর মতই। যেন একটী উল্টা ইংরেজী ‘এস্’ অক্ষরে ঋকার-জ্ঞাপক বা ‘র’-এ ‘উ’-কারের ‘উ’-কারজ্ঞাপক চিহ্নটী বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে (৮ ও ৯নং চিত্র)। হৃ লিখিতে গিয়াও বিপদ বড় কম নহে, সর্ব্বত্রই ‘দ’-এ র-ফলা লিখিয়া তাহাতে ‘ই’-কার (দ্রি) ও ‘হ’-এ ঋ-ফলার ঋ-কার বা ‘রূ’-র ‘উ’-কারজ্ঞাপক চিহ্ন যোগ করিয়া হৃ লিখিত হইয়াছে (১০নং চিত্র) এবং ‘হ্র’ বুঝাইতে উহার ‘ই’-কারটুকু বাদ দেওয়া হইয়াছে (১১ নং চিত্র)। অর্থাৎ হৃ লিখিতে পুঁথির ‘হ’-এ ‘র’-ফলায় ‘ই’-কার যোগ করা হইয়াছে এবং সেই ‘হ’-এ ‘র’-ফলা হইতেছে ‘দ’-এ ‘র’-ফলায় ‘উ’কার বা ‘দ’-এ ‘র’-ফলায় ‘ঋ’-ফলা। পুঁথিতে বহুস্থলে ‘বেরুল’ বা বাহির হইল স্থলে বাহ্র্যাল লিখিত হইয়াছে, যথা— “নাসাপথে বরাহ বাহ্র্যাল আচম্বিতে।” এক্ষণে চেষ্টা করিয়া দেখা যাউক, পুঁথির লিপি অনুসারে লিখিলে এই ‘বাহ্র্যাল’র কি রূপ দাঁড়ায়। ‘ব’ ‘র’-এর আকারে, ‘হ্র’ যেরূপ বলিলাম সেইরূপে ও ‘ল’টী দন্ত ন রূপে লিখিত হইয়া ‘বাহ্র্যাল হইল “রাদ্র্যান” গোছের। ঠিক ‘রাদ্র্যান’ও নহে, হইল ‘র’-এ আকার, ‘দ’-এ র-ফলা ঋ-ফলা য-ফলা আকার ও ন (১২ নং চিত্র)।

সামান্য স্বরবর্ণ সংযোগের ফলেই এত বৈচিত্র্য, এবার ব্যঞ্জনবর্ণ যোজনা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। দেখিতে পাইব পুঁথির লিপি কত ভিন্ন।

সম অক্ষরের দ্বিত্ব (যথা—অন্ন, পট্ট) জ্ঞাপন করিতে ‘ঞ’-তে ‘এ’-র পরের চিহ্নটুকুর সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া মূল একক অক্ষরটীর পার্শ্বে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে (১৩নং চিত্র)। ডু-এক স্থলে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে—‘ন্ন’ লিখিতে গিয়া ‘ন’-কারে দীর্ঘ উ-কারজ্ঞাপক চিহ্নের সংযোজন ঘটিয়াছে (১৪ নং চিত্র)।

য-ফলা লিখিতে হাঙ্গামা বিশেষ কিছুই নাই, সামান্য গোল বাধাইয়াছে চতুর্থ বর্গের প্রথম ও চতুর্থ অক্ষরটী। ‘ত’-এ ‘য’-ফলার আকার অনেকটা ‘৯’-র ন্যায়, তবে পার্থক্য এই যে প্রথমোক্তের শেষাংশ সরল, উহা মাত্রা উঁচাইয়া যায় নাই (১৫নং চিত্র); এটী লেখার টানেই ঘটিয়াছে, ও বিশেষ কিছুই নয়। আসল হইতেছে ‘ধ্য’-র সময়ে। ‘ধ’-এ ‘য’-যুক্ত হইয়া যুগ্ম অক্ষরটীর আকার হইয়াছে যেন ‘ঘ’-এ ৮ যুক্ত হইয়াছে (১৬ নং চিত্র)।

‘য’-ফলার ব্যাপার অল্পে শেষ হইলেও ‘র’-ফলা কিন্তু এত অল্পে নিষ্কৃতি দেয় নাই। ‘প’-এর যুক্ত হইয়া রূপ হইয়াছে অপরূপ ও ‘স’-এর সহিত যুক্ত হইয়া হইয়াছে বিশ্রী। পরস্পরের সংযোগের ফল যা দাঁড়াইয়াছে তাহা বুঝাইয়া বলিবার ক্ষমতা এ অধমের নাই, চিত্রকরের সাহায্য লইলেই ভাল হয় (১৭ ও ১৮নং চিত্র)।

সংযুক্ত বর্ণ লিখিতে বহু স্থলে এইরূপ জটিলতার সৃষ্টি করা হইয়াছে।—‘ণ’-এ ‘ঠ’-এ (১৯নং চিত্র) বোঝা বিশেষ কষ্টকর না হইলেও দ-এ ধ-এ, ‘ঞ’-য় ‘জ’-এ ইত্যাদি যুক্তাক্ষর বোঝা বিশেষ আয়াসসাধ্য। বহু স্থলে ‘দ্ধ’ লিখিত হইয়াছে হৃ লিখিয়া (২০নং চিত্র)। ‘জ’ টানের দোষে কখনও হইয়াছে ৫, কখনও হইয়াছে ‘দ’-এর সাগিল (২১নং চিত্র)।

প্রবন্ধ ক্রমেই দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে, বলিবার বিষয় বহু থাকিলেও ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কায় এখানেই সমাপ্ত করা ভাল, সুতরাং অতি সামান্য ডু-চারিটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। পুঁথি পড়িবার সময় ইহার বানান ও লিপি-কৌশলের কথা অতি সাবধানে মনে রাখিতে হইবে, নচেৎ বহু স্থলে ত পাঠ করিতেই পারিবে না। আবার যে সকল স্থলে উহা সম্ভব হইবে, সেস্থানে যে-কোন মুহূর্ত্তে লুচি হইবে নুচি, স্থন হইবে খন, রাবণ হইবে বারণ, কুম্ভ হইবে কুর্ম্ম; অকুল হইবে অঙ্গন, পঞ্চানন হইবে পঞ্চানল ইত্যাদি। এবং এইরূপ পাঠ-বিভ্রাটের ফলে “গৌরী সেথা তপ করে জ্বালিয়া পঞ্চানল” স্থলে হইবে “গৌরী সেথা তপ করে জ্বালিয়া পঞ্চানন”, অর্থাৎ—যে পঞ্চাননের তুষ্টি বিধানার্থে গৌরীর তপস্যা, পুঁথি-পাঠকারীর অতি সাধারণ ভুলের জন্য গৌরী সেই পঞ্চাননকেই পোড়াইয়া মারিবে।

বিজ্ঞান-প্রবাহ

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

পঙ্গপাল

মানুষের শত্রু অনেক। আজ সারা পৃথিবীর নরনারী যে যুদ্ধের বিভীষিকার কথা কাগজে পড়ে আতঙ্কিত হ’য়ে পড়ছেন সে-যুদ্ধ এক সভ্য জাতির সহিত অপর এক সভ্য জাতির।

এইভাবে মানবকে নিজের আধিপত্য বজায় রেখে জীবন ধারণ করতে কেবল যে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করতে হ’য়েছে এমন নয়। মানবের বুদ্ধি এবং শক্তির তুলনায় অতি নিকৃষ্ট এইরূপ বহু ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গের সঙ্গেও তাদের যুদ্ধ সংঘটিত হ’য়েছে। এবং বেশীর ভাগ সময়ে শ্রেষ্ঠজীব মানব পরাজয় স্বীকার ক’রেছে।

কীটপতঙ্গের মধ্যে মানবের সবচেয়ে পুরাতন শত্রু পঙ্গপাল। এই পঙ্গপাল যে মানবের কিরূপ ক্ষতিকারক তা পুরাতন বাইবেল ধর্ম্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। কোন স্মরণাতীত যুগ থেকে মানব এই পঙ্গপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক’রে আসছে কিন্তু এখনও বর্ত্তমান বিজ্ঞান সভ্যতার যুগেও ইহাদের আক্রমণে পৃথিবীর বেশীর ভাগ অংশের কৃষিকার্য্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। সহস্র সহস্র বৎসরের মেলামেশার পরও ইহাদের জীবন-ইতিহাসের কোন কোন অধ্যায় এখনও আমাদের নিকট রহস্যাবৃত।

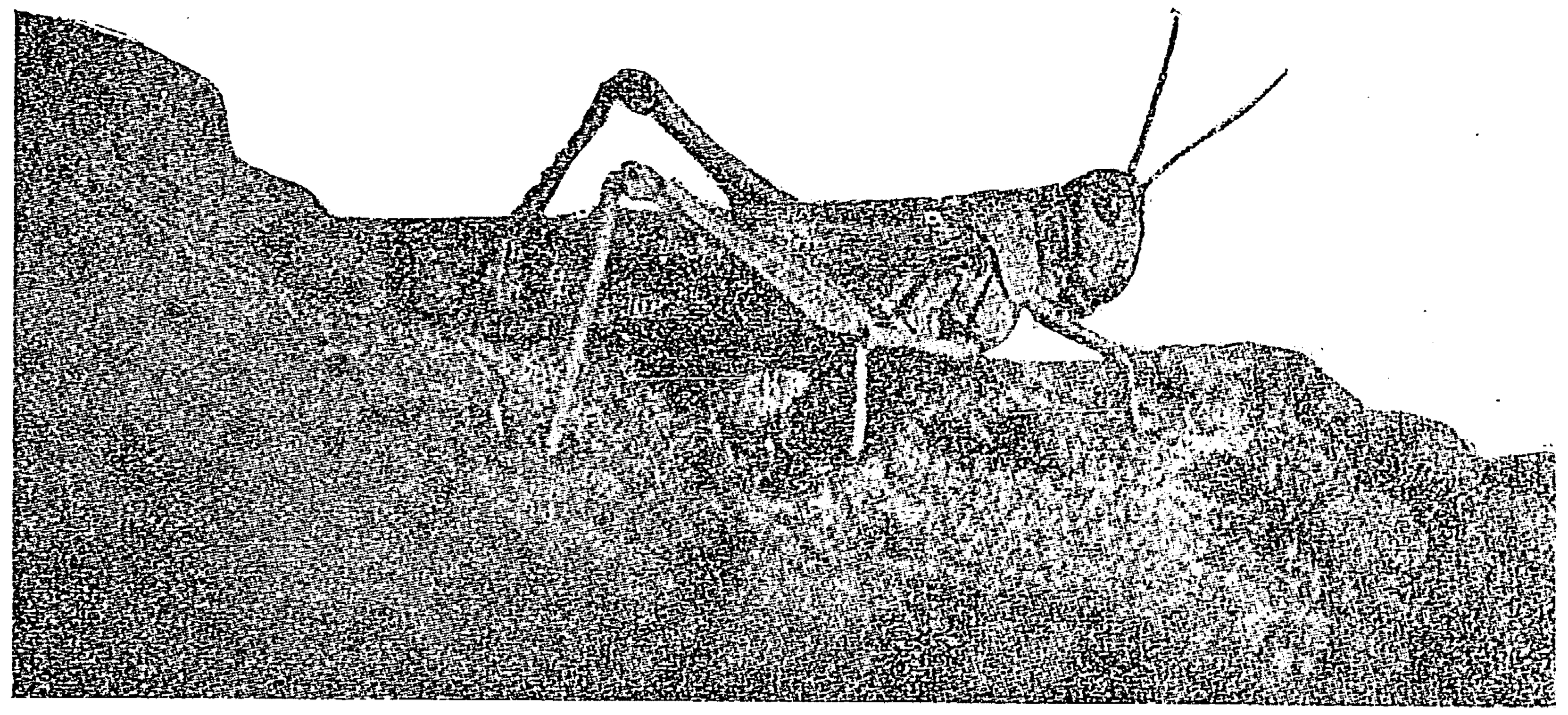

স্ত্রী-পঙ্গপাল মাটির নীচে প্রায় পাঁচ-ছয় ইঞ্চি গর্ত্ত খনন ক’রে তার মধ্যে ডিম রাখছে; ডিমগুলি গর্ত্তের তলদেশ হ’তে লম্বা নলের ন্যায় স্তূপাকারে সুন্দরভাবে সজ্জিত থাকে

পঙ্গপালের অত্যধিক বংশ বিস্তারে এবং ক্ষতির পরিমাণ অবিশ্বাস্যরূপে বৃদ্ধি হওয়ায় ইহাদের বিনাশের নিমিত্ত দেশবাসীর সম্মিলিত শক্তির প্রয়োজন হয়। সেইহেতু এই পঙ্গপাল পতঙ্গের বিরুদ্ধে কয়েকটি দেশ সমবেত হ’য়ে আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধ ঘোষণা ক’রেছিল। ফ্রান্স, ইটালী এবং গ্রেটবৃটেন এই তিনটি দেশের আন্তরিক চেষ্টায় লণ্ডন সহরে পঙ্গপাল পতঙ্গ-নিবারণী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং উক্ত সঙ্ঘের প্রায় ষাটটি বৃটিশ উপনিবেশ এবং পঁচিশটি বৈদেশিক শাখা-সঙ্ঘ থেকে পঙ্গপাল সম্বন্ধে বহু তথ্যপূর্ণ বিবরণী সংগ্রহ করে।

ইহাদের জন্মস্থান, ভ্রমণ-পথ এবং এই সকল দৈব-দুর্ব্বিপাকের কারণ কি তা অনুসন্ধানের নিমিত্ত ঐ সকল বিভিন্ন প্রদেশের বিবরণগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিভিন্ন দেশের সহিত উহাদের কিরূপ সম্বন্ধ তা আলোচিত হয়।

পঙ্গপাল নির্দ্দিষ্ট কোন সীমানার মধ্যে অবস্থান করে না; একবার আকাশ-পথে ভ্রমণ আরম্ভ ক’রলে কোথায় এবং কখন যে ইহারা তাদের ভ্রমণ হ’তে বিরত হবে তা আজও বিশেষজ্ঞরা নির্দ্ধারণ ক’রতে পারেন না। পথমধ্যে সবুজ শস্যের বংশ লোপ করবার পূর্ব্বে ইহারা শত শত মাইল উড়িয়া চলে।

আফ্রিকা এবং এসিয়ার প্রায় ত্রিশ কোটী বর্গমাইল শস্যপূর্ণ ভূখণ্ড পঙ্গপালের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ১৯৩০ সালের বসন্ত এবং গ্রীষ্মকালে অত্যধিক পঙ্গপালের আগমনে প্যালেষ্টাইন গভর্ণমেণ্টকে ৫০,০০০ পাউণ্ড ক্ষতি স্বীকার

ক'রতে হয়। ঐ সময় শস্যক্ষেত্র রক্ষার জন্য পঙ্গপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রতে প্রায় ৭৫,০০০ হাজার লোক নিযুক্ত হ'য়েছিল।

ইহার পূর্ব্ব বৎসরে এই পঙ্গপালের আক্রমণের ফলে কেনিয়া গভর্ণমেণ্ট ৮০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় করে। এবং এই দৈব-দুর্ব্বিপাকের ফলে সহস্র সহস্র নরনারী অনাহারে প্রাণ দেয়।

আর এক প্রদেশে প্রায় ১,৩০,০০০ অধিবাসী খাদ্যাভাবে পড়ে। ফলে সেই প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট পাঁচ মাসকাল উহাদের খাদ্য দানে সাহায্য ক'রতে বাধ্য হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঈজিপ্ট, সুদান, টাঙ্গানিকা, উগাণ্ডা এবং ট্রান্সভাল প্রভৃতি দেশগুলি পঙ্গপালের অত্যাচারে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহাছাড়া, আফ্রিকা ও যুক্তপ্রদেশের কোন কোন অঞ্চলেও ইহাদের অভিযান সুরু হ'য়েছিল।

পঙ্গপালের বিচিত্র সমাবেশ

দক্ষিণ দাকোতার ১৬০০ একর শস্যপূর্ণভূমিকে বিধ্বস্ত ক'রতে পঙ্গপালের মাত্র কয়েকমিনিট সময় লেগেছিল। ইহাতে সেখানকার অধিবাসীদের বিশেষ ক্ষতি হয়; কংগ্রেস এই পতঙ্গশ্রেণীর বংশ ধ্বংস ক'রতে এক কোটী টাকা ঐ সময়ে সাহায্য করে।

পঙ্গপালের বংশ দ্রুত বিস্তার লাভ করে। বিশেষজ্ঞ Mr. H. J. Shepstone, F. R. G. S বলেন, মাত্র একটি জীবিত পতঙ্গ বংশ-বিস্তার ক'রে ইংলণ্ড অপেক্ষা বৃহত্তর দেশকে পূর্ণ ক'রতে পারে।

সবচেয়ে অসুবিধা এই যে, ইহাদের আবির্ভাবের পূর্ব্বলক্ষণ কেহ অনুমান ক'রতেও পারে না।

ইহাদের আবির্ভাব হয় অকস্মাৎ। আকাশে প্রথমে কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হয় এবং সময়ে সময়ে ঝড়ের ন্যায় শব্দ শুনা যায়। সংখ্যায় ইহারা এত অধিক থাকে যে, সূর্য্যকেও ঢাকিয়া ফেলে। উপযুক্ত স্থান বুঝিলে নীচে নামে এবং কুয়াশার ন্যায় ভূখণ্ডের চতুর্দ্দিকে নিজেদের বিস্তার ক'রে ফেলে।

বাইবেলের যুগ থেকে প্যালেষ্টাইনে পঙ্গপালের অভিযান চলে আসছে। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহাদের অভিযানে প্যালেষ্টাইনে কিরূপ ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হ'য়েছিল তা সেখানের অধিবাসীরা এখনও ভুলতে পারেনি।

কয়েকবার দৈবকৃপায় সেখানকার অধিবাসীরা ইহাদের কবল হ'তে রক্ষা পায়। একবার জেরুজেলামে পঙ্গপালের মেঘ দেখা গেল। সংখ্যায় অধিক থাকায় সূর্য্যদেবকেও আবৃত ক'রেছিল। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ পবিত্র নগরে পদার্পণ করে নি। সহস্র সহস্র নরনারীর ভয়-বিহ্বল দৃষ্টির উপর দিয়ে সেই বিরাট সৈন্যবাহিনী কোন দূর দেশের সন্ধানে চলে গেল। আর একবার জাফাতে কোটী কোটী পঙ্গপাল অকস্মাৎ প্রবল ঝটিকা এবং বৃষ্টির প্রকোপে সমুদ্র বক্ষে নিমজ্জিত হয়। পরে সেই সকল মৃত পঙ্গপালের স্তূপ সমুদ্রতটে উপস্থিত হ'লে সেখানকার অধিবাসীরা তা সংগ্রহ ক'রে জ্বালানী কাষ্ঠরূপে ব্যবহার করে।

শস্য রক্ষার জন্য কৃষকেরা সমবেত হ'য়ে ওদেশে সহস্র সহস্র টন্ পঙ্গপাল হত্যা করে। এই কার্য্যে তারা গভর্ণমেণ্টের কিছু কিছু সাহায্যও পায়। কিন্তু সকল প্রকার প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন সত্ত্বেও ইহাদের দ্বারা যে পরিমাণ ক্ষতি হয় তা অপূরণীয়।

কোন স্থান পরিত্যাগ করবার পূর্ব্বে পঙ্গপাল ভূখণ্ডের চতুর্দ্দিকে ডিম প্রসব করে। জর্ডন নদীর তীরবর্ত্তী স্থানসমূহে, লবণ সমুদ্রের পার্শ্বস্থ জলাভূমিতে, সুউচ্চ পর্ব্বতে, উপত্যকায়, মনোরম অলিভ্ কুঞ্জে, টায়ার, সিডোন ও গাজার সমুদ্রতটে—ডান থেকে বিয়ারসেবারের সর্ব্বত্রই পঙ্গপাল তাদের বংশ বিস্তারের নিমিত্ত ডিম প্রসব করে। প্রত্যেক স্ত্রী-পঙ্গপাল একশত ডিম প্রসব ক'রতে পারে।

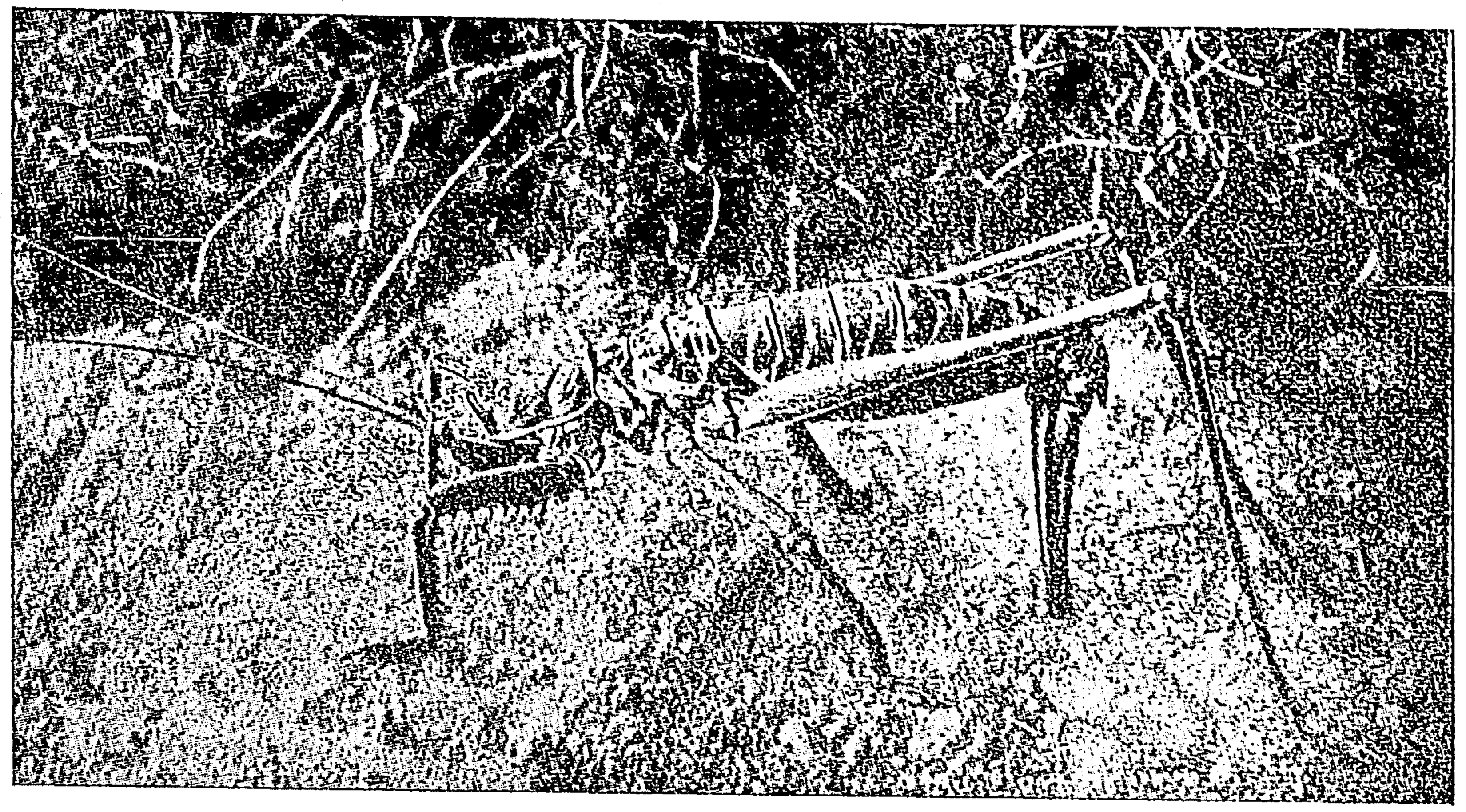

"Horse-headed" পঙ্গপাল কঠিন মাটির উপর অণ্ড-যোনি সাহায্যে কিরূপভাবে গর্ত্ত তৈয়ার ক'রছে

বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন যে, এক বর্গ গজ পরিমিত ভূখণ্ডে কখন কখনও ৭৫,০০০ ডিম অবস্থান করে। তাঁদের মতে, যদি তা দেবার সময় শতকরা ত্রিশটি ডিম নষ্ট হয় তাহ'লে ছত্রিশ বর্গ ইঞ্চি পরিমিত স্থান হ'তে ৫০,০০০ হাজার পঙ্গপালের বংশধর জন্মলাভ ক'রবে। ডিম প্রসব করবার পূর্ব্বে স্ত্রী-পঙ্গপাল অণ্ড-যোনি সাহায্যে মাটির মধ্যে প্রায় পাঁচ-ছয় ইঞ্চি গভীর গর্ত্ত খনন ক'রে তার মধ্যে ডিম রাখে। ডিমগুলি গর্ত্তের তলদেশ হ'তে লম্বা নলের ন্যায় স্তূপাকারে সুন্দরভাবে সজ্জিত থাকে। এইরূপ ক্ষুদ্র পতঙ্গ কি অদ্ভুত কৌশলে কঠিন ভূখণ্ডে গর্ত্ত নির্ম্মাণ করে তা দেখলে বিস্মিত হ'তে হয়। ডিম প্রসবের পর

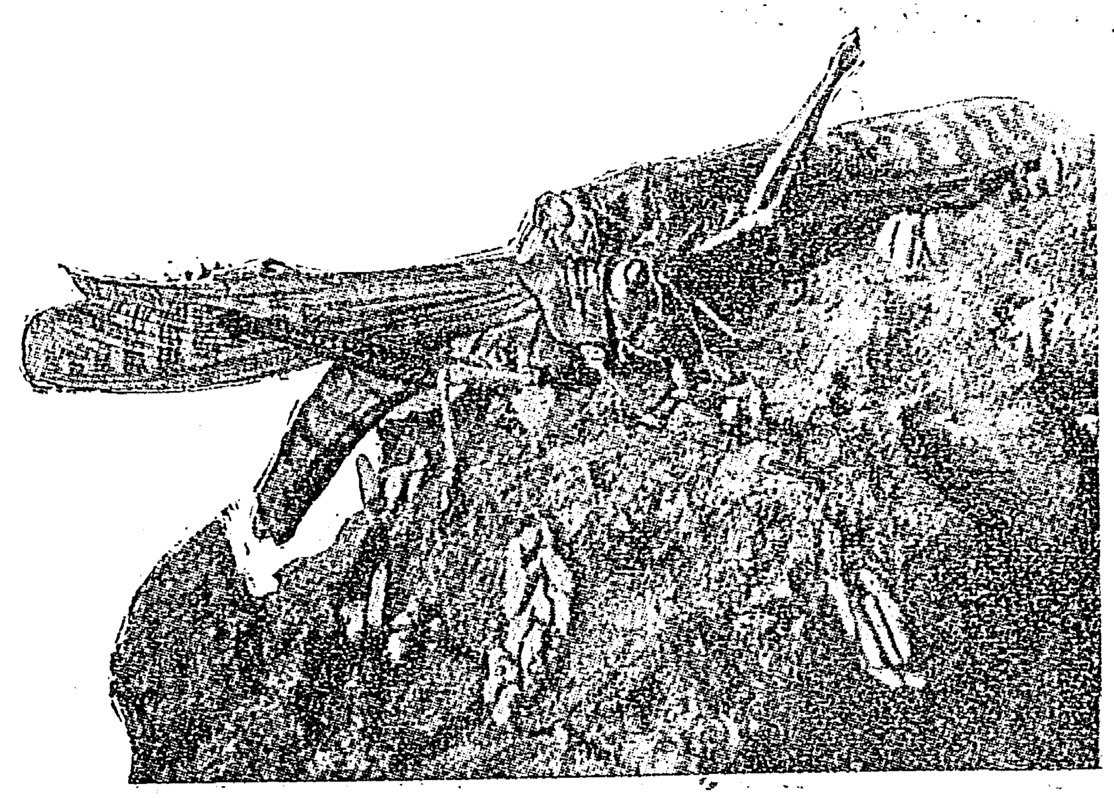

পূর্ণ-বয়স্ক পঙ্গপাল ও তাহাদের ডিম

স্ত্রী-পঙ্গপালের আর কোন দায়িত্ব থাকে না। ডিমে তা দেবার ভার তারা প্রকৃতি দেবীর হস্তে ছেড়ে দিয়ে নিজেরা মৃত্যু-বরণ করে।

ভূমিকর্ষণ ক'রে ইহাদের ডিমগুলিকে ধ্বংস করা হয়। ইহাই একমাত্র কার্য্যকরী উপায়। একবার ডিমগুলি বাতাসের সংমিশ্রণে এলে তা থেকে আর নূতন পঙ্গপালের জন্মলাভ সম্ভব হয় না।

ইহাদের কবল হ'তে শস্য রক্ষার জন্য কৃষকেরা শত শত একর ডিমপূর্ণ ভূমি কর্ষণ ক'রেছে আর এইরূপ কার্য্যের জন্য সহস্র সহস্র কৃষকের শক্তি নিয়োজিত হ'য়েছে। অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহকারে তারা ভবিষ্যৎ অবস্থার কথা ভেবে কাজ করে। ফলে অসংখ্য পঙ্গপালের ডিম বিনষ্ট হয়।

প্রথম অবস্থায় ডিমগুলি কাল, ডানাবিহীন বড় পিপীলিকার মত। কিন্তু ক্রমঃ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটী অবস্থার মধ্য দিয়া জীবন অতিবাহিত ক'রে পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রধানতঃ এই তিনটি অবস্থা উল্লেখযোগ্য :—

(১) অণ্ড-নির্ম্মুক্ত কীট অর্থাৎ ডানাবিহীন অবস্থা, (২) পতঙ্গগুটি—ছোট ডানাযুক্ত অবস্থা এবং শেষ (৩) পূর্ণ-পতঙ্গ অবস্থা।

পতঙ্গগুটি অবস্থায় ইহাদের নিঃসন্দেহে 'Hoppers' বলে অভিহিত করা চলে। এবং এই অবস্থায় চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণে যেরূপ শস্যের ক্ষতি করে তার পরিমাণ অনেক

সময় বিশ্বাসযোগ্য বলে কেউ মনে ক'রতে পারে না। পূর্ণ পতঙ্গ অবস্থায় পরিণত হবার পর প্রথমে প্রতিদিন একত্রে ৪০০।৫০০ ফিট পথ হাঁটিয়া চলে এবং ইহাদের সংখ্যাধিক্যে রাস্তাঘাট এরূপ পিচ্ছিল হয় যে, ঘোড়ার খুর কদাচিৎ পা ঠিক রেখে চলতে পারে। এমন কি, এরূপ সংবাদও বহুবার পাওয়া গেছে যে, পঙ্গপালের স্তূপ রেলপথের উপর এসে পড়ায় কয়েক ঘণ্টাকাল রেল চলাচল বন্ধ থাকে।

ফাঁদ পেতে পঙ্গপাল ধরবার কৌশলও আছে। পতঙ্গগুটি অবস্থায় ইহাদের ছোট ডানার আবির্ভাব হ'লেও উড়তে সক্ষম হয় না। এই অবস্থাতেই পঙ্গপালকে ফাঁদে ধরা যায়। একবার পূর্ণঅবস্থাপ্রাপ্ত হ'লে এইরূপ কৌশল অচল হ'য়ে পড়ে।

প্রথমে পতঙ্গগুটির ভ্রমণ-পথে মাটির নীচে খুব বড় এক গর্ত্ত তৈয়ার করা হয়। গর্ত্তের চারিপাশ আবার মসৃণ টিন দ্বারা আবৃত থাকে। ফলে ভূগর্ত্তস্থ নীত পতঙ্গ উপরে উঠতে পারে না। গর্ত্তের উপরিভাগের চারিপাশের মাটিও মসৃণ টিন দ্বারা আবৃত রাখা হয়।

ইহার পর মাটির উপর এক বৃহৎ পতাকার ছায়া ফেলে সুকৌশলে পতঙ্গগুটিদের গর্ত্তের মধ্যে আনা হয়। গর্ত্তটী পূর্ণ হ'লে অগ্নিসংযোগে সেই সকল ধৃত পতঙ্গগুটিকে হত্যা করা হয়।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন কৌশলও আবিষ্কার হ'য়েছে। কিন্তু পূর্ণবয়স্ক পতঙ্গদের ফাঁদে ধরা সহজ নয়। এরোপ্লেন সাহায্যে উড্ডীয়মান পঙ্গপালকে অনুসরণ ক'রে বায়ুদ্বারা উৎক্ষিপ্ত বিষাক্ত জলবিন্দু সিঞ্চনে তাহাদের ধ্বংস করবার কৌশলও আবিষ্কার হ'য়েছে। একবার নেব্রাসকায় এক বৃহৎ পঙ্গপালবাহিনীকে অনুসরণ করা হয়। কিন্তু যন্ত্র বিকল হওয়ায় শেষ পর্য্যন্ত নিরাশ হ'য়ে এরোপ্লেনটি নীচে নেমে আসতে বাধ্য হয়। পরীক্ষার পর দেখা গেল এরোপ্লেনের রেডিয়েটার পতঙ্গের স্তূপে সম্পূর্ণ রুদ্ধ হ'য়েছে।

পঙ্গপালের মুখ হ'তে একপ্রকার গাঢ় লালা নিঃসৃত হয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে উক্ত লালা যন্ত্রণাদায়ক।

সাধারণের বিশ্বাস ইহারা নিরামিষভোজী। কিন্তু তাহা নহে। সঙ্গীরা দৈবক্রমে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়লে অন্যেরা সেই সুযোগে তৎপরতার সহিত তাদের হত্যা ক'রে ভক্ষণ করে। এমন কি, ইহারা সময়ে সময়ে মৌচাকে প্রবেশ ক'রে মধু ও মৌমাছি উভয়কেই খেয়ে ফেলে। সুযোগ পেলে ইন্দুর প্রভৃতির ন্যায় ছোট জীবকেও আক্রমণ ক'রে ভক্ষণ ক'রতে এদের একটুও বাধে না।

বর্ত্তমানে বিশেষজ্ঞগণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে

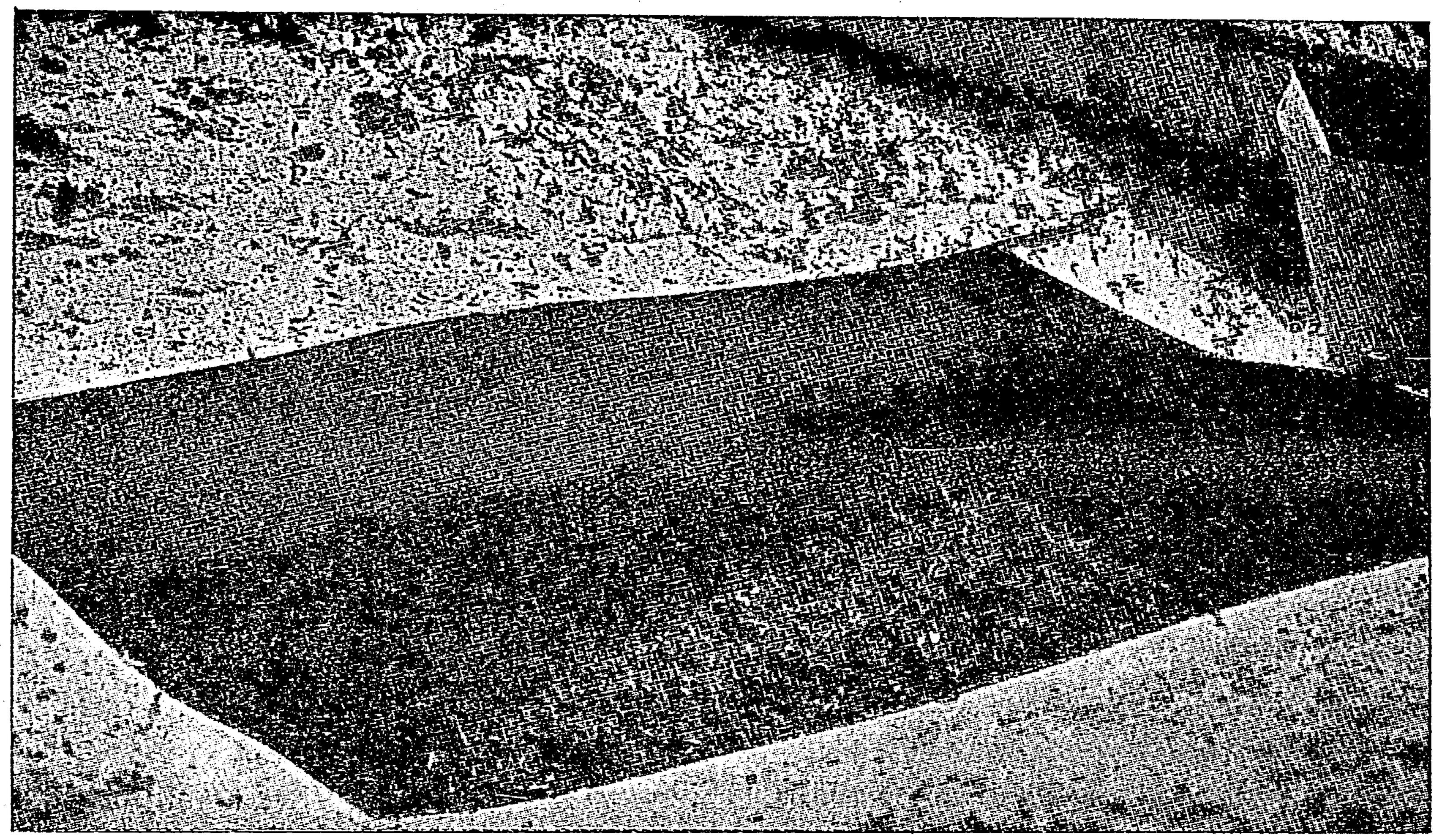

পঙ্গপাল বিনাশের ফাঁদ

পঙ্গপালের ইন্দুর শিকার

ইহাদের উৎপত্তি-স্থান নির্ণয় ক'রতে বিশেষ উদ্বিগ্ন। তাঁদের এইরূপ বিশ্বাস, যে পঙ্গপালবাহিনী প্যালেষ্টাইন এবং সিনায়িতে অভিযান ক'রেছিল তারা মধ্য-আরব এবং সুদানের মরুময়প্রদেশ হ'তে আগত। অনুর্ব্বর জন্মভূমিতে তাদের সংখ্যাধিক্য হ'লেই তারা দেশান্তরে গমন ক'রতে বাধ্য হয়।

আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের ও ট্রান্সভালের পঙ্গপালদের সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা চলে না। পূর্ব্ব-আফ্রিকার সর্ব্বত্রই সহস্র সহস্র মাইল প্রায় দশ ফিট লম্বা ঘাসে পূর্ণ। এইখানে পঙ্গপাল নিরাপদে ডিম প্রসব করে এবং বংশ বিস্তার হ'লে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এই দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী নিয়ে পররাজ্য লুণ্ঠনে অগ্রসর হয়।

তুরস্কের নবজন্ম

শ্রীসুধাংশুকুমার বসু

ইউরোপের মহাযুদ্ধ এগিয়ে চলেছে নিতান্ত শ্লথগতিতে। আয়োজন অনুষ্ঠানের ত্রুটি কোনো পক্ষেই নেই; স্থলেজলে অন্তরীক্ষে সর্বত্রই সংগ্রাম চলেছে অল্পবিস্তর; কিন্তু এখনও পর্যন্ত আগুনের চেয়ে ধোঁয়ার উৎপাতই বেশী। আপাতত যা চলেছে সে সমস্তই ব্যাপক অভিযানের উপক্রমণিকা মাত্র। সমুদ্রে তবু ডুবোজাহাজের অত্যাচারে কিছু কর্মব্যস্ততা দেখা যাচ্ছে;—কিন্তু পশ্চিম সীমান্ত আজও প্রশান্ত। মাঝে মাঝে কামানের হুঙ্কার সেখানকার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেও সেখানে সৈন্য-সমাবেশ হয়েছে এই মাত্র—যুদ্ধ এখনও সুরু হয়-নি। বর্মাবৃত কূর্মের মতো দুর্ভেদ্য 'মাজিনো লাইন' এবং 'সীগ্‌ফ্রিড শিবিরের' অন্তরালে আত্মগোপন করে দুই বাহিনী তাদের সীমান্তপ্রদেশ সুরক্ষিত করছে এবং অধীর-আগ্রহে অপেক্ষা করছে ব্যাপক অভিযানের প্রতীক্ষায়।

আপাতত উদ্যোগ-পর্বের যে অধ্যায় চল্‌ছে, তার নাম দেওয়া যেতে পারে, 'মিত্রভেদ এবং মিত্রপ্রাপ্তি'। হিতোপদেশের যুগ থেকে এটি সর্বদেশে কূটনীতির একটি বিশিষ্ট অঙ্গ বলে পরিগণিত হয়ে এসেছে। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করে মিত্র-নির্বাচনে বিচক্ষণতার ওপর,—বিশেষত, সঙ্কটকালে। বাস্তবিক, শক্তিশালী মিত্রের সহায়তা পাওয়া এবং শত্রুর সঙ্গে তার মিত্রদের মনান্তর ঘটান মানেই বিনা-লোক-ক্ষয়ে সংগ্রামক্ষেত্রে সাফল্যের পথে এগিয়ে যাওয়া। এ সত্য উপলব্ধি ক'রে বহুদিন যাবৎ বিভিন্ন রাষ্ট্র অন্যান্য শক্তির সঙ্গে মিতালী পাতাবার চেষ্টায় মন দিয়েছে। ফলে ধীরে ধীরে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে সম-স্বার্থ-বিশিষ্ট এবং একমতাবলম্বী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এক একটি মিলনী গড়ে উঠ্‌ছিল। এই নীতির অনুসরণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে সাম্প্রতিক কালে বল্‌কান আঁতাৎ এবং রোম-বার্লিন এক্সিস্‌ প্রভৃতি। এই সব চুক্তির উদ্দেশ্য মুখ্যত পরস্পরের সহায়তায় পরস্পরের অধিকার এবং স্বার্থ অটুট রাখা।

কিন্তু সহসা ধূমকেতুর মতো ইউরোপের রাষ্ট্রীয়-গগনে আবির্ভূত হয়ে সমস্ত ওলট পালট করে দিল সোভিয়েট রুশিয়া। রুশ-জার্মান মিতালীর ফলে কোমিণ্টার্ন বিরোধী চুক্তির হলো অবসান—রোম-বার্লিন মৈত্রী হলো নিস্তেজ—এবং মিত্র-শক্তিবর্গ হলো আতঙ্কিত। জার্মানীর মুখের গ্রাস পোল্যাণ্ডের পূর্বাঞ্চলে অধিকার বিস্তার ক'রে রুশিয়া ক্ষিপ্রগতিতে তার রক্ত-পতাকা প্রোথিত করলে বাল্‌টিক অঞ্চলে। স্বল্পায়তন বাল্টিক রাষ্ট্র তিনটি—লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া এবং এস্থোনিয়া মেনে নিল সোভিয়েটের দাবী এবং তার সঙ্গে হলো পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ। সোভিয়েট দিলো তাদের অভয়; ফলে জার্মানীর Drang nach Osten (প্রাচ্য অভিযান) নীতি পেলো বাধা। তারপর যখন ফিনল্যাণ্ড (১২ই অক্টোবর) এবং তুরস্কের (১৩ই অক্টোবর) সঙ্গে সুরু হলো মিতালী-স্থাপনের জন্য আলাপনী তখন মনে করা গেলো পূর্বাঞ্চলে, উত্তর মহাসমুদ্র থেকে ভূমধ্য-সাগর পর্যন্ত রুশিয়া এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর সৃষ্টি করছে যা প্রশমিত করবে জার্মানীর দুরাকাঙ্ক্ষা। এতে মিত্রশক্তিবর্গের লাভ বই ক্ষতি নেই—যতদিন পর্যন্ত সোভিয়েট থাকবে নিরপেক্ষ।

কিন্তু রুশিয়া যদি জার্মানীর পক্ষে সমরে অবতীর্ণ হয় তা হ'লে বাল্‌টিক এবং বল্‌কান অঞ্চলে তার প্রাধান্য মিত্রশক্তির উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। বিশেষ ক'রে তুরস্কের সহায়তায় যদি রুশিয়া দার্দানেলিস্ প্রণালী অবরুদ্ধ করতে পারে তাহ'লে বৃটেনের সমূহ ক্ষতি। কাযেই তুরস্কে রুশিয়ার প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা বৃটেন এবং ফ্রান্সের উদ্বেগের সঞ্চার কর্‌লো।

কিন্তু তুরস্কের বৈদেশিক নীতি এবার মিত্রশক্তিপুঞ্জকে অকারণ উদ্বেগের হাত থেকে রক্ষা কর্‌লে। তুরস্কের পররাষ্ট্র-সচিব সারা জোগ্‌লু গিয়েছিলেন রুশিয়ায়, তুরস্কের তরফ থেকে সোভিয়েটের সঙ্গে আলোচনা চালাতে;—১৮ই অক্টোবর তিনি প্রত্যাবর্তন কর্‌লেন মস্কো থেকে নতুন কোনো চুক্তি না ক'রে; এবং পরের দিন (১৯শে অক্টোবর) আংকারাতে বৃটেন, ফ্রান্স এবং তুরস্কের মধ্যে এক পারস্পরিক সহায়তার চুক্তি সম্পাদিত হলো। এই চুক্তি নিষ্পন্ন ক'রে তুরস্ক গণতন্ত্রাবলম্বী রাষ্ট্রগুলির মিত্র বলে গণ্য হলো এবং ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক আসরে তার আসন হলো সুপ্রতিষ্ঠিত। বিগত মহাসমরের পর ইউরোপে তুর্কীদের প্রাধান্য লোপ পায়—সেখানে তার পূর্বকালীয় গৌরব এতকাল বিলুপ্ত হয়েছিল। এতদিনে এই যুদ্ধের সুযোগে তুর্কী তার পুরাতন মর্যাদা কতকটা ফিরিয়ে আন্‌তে পেরেছে।

গত মহাযুদ্ধে তুরস্ক নিয়েছিল পরাজিত জার্মানীর পক্ষ। সুতরাং সমরাবসানে তাকে অনেকটা লাঞ্ছনা সইতে হয়েছিল বিজেতাদের হাতে। তার দুর্গতি চরম-সীমায় উপনীত হয়েছিল মহাসমরের শেষের দিকে; যার ফলে তুরস্কের বহু-শতাব্দী-খ্যাত অটোমান সাম্রাজ্যের হলো পতন। অটোমান সাম্রাজ্য এককালে সুবিস্তীর্ণ থাক্‌লেও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তার আয়তন ছিল পূর্বের তুলনায় নিতান্তই সংক্ষিপ্ত; তারও সমাধি হলো সেভ্‌রের সন্ধিপত্রের (Treaty of Sevres) সঙ্গে ১৯২০ সালে। এই সন্ধির সর্ত অনুযায়ী তুরস্ক ইউরোপের প্রত্যন্ত স্পর্শ করে রইলো মাত্র—তার সাম্রাজ্য ভেঙে ফেলে কতক অংশ বাঁটোয়ারা করে দেওয়া হোলো গ্রীসকে এবং সেই চিতাভস্মের ওপর কয়েকটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন ক'রে অধিকাংশের কর্তৃত্ব এবং অভিভাবকত্ব দেওয়া হোলো ফ্রান্স এবং বৃটেনকে।

ইস্তাম্বুলে সুলতান এ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করলেও এঙ্গোরাতে জাতীয় পরিষদ একে অস্বীকার করলে। মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে তুরস্কে তখন এক নতুন জাতীয় দলের অভ্যুত্থান হোলো এবং তুর্কীবাহিনী ফরাসী এবং ইতালীয়ানদের হটিয়ে দিলে দক্ষিণ আনাতোলিয়া এবং সিলিসিয়া থেকে। তারপর ১৯২২ সালে তুর্কীরা গ্রীকদের এশিয়া মাইনর থেকে উচ্ছেদ ক'রে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সুপ্রতিষ্ঠিত করলে। সেভ্‌রে সন্ধির ফলে বৃটেনের লাভই হয় বেশী, ফলে তা ফ্রান্স এবং ইতালীতে ঈর্ষার সঞ্চার করে। এ কারণে মিত্রশক্তিবর্গের পক্ষে একযোগে কামালকে বাধা দেওয়া ঘটে ওঠে নি। তুর্কী-বাহিনীর অগ্রগতি এর ফলে হোলো অপ্রতিহত। কামালের অধিনায়কত্বে তুরস্কের হলো পুনর্জন্ম। তার জরাজীর্ণ প্রাচীন-পন্থী সমাজ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হলো কামালপন্থী নব্য তুর্কীর হাতে। ১৯২২ সালেই সুলতান হলেন পদচ্যুত এবং তুরস্কে প্রতিষ্ঠিত হলো অভাবনীয়ভাবে সাধারণতন্ত্র। কামাল হলেন সার্বভৌম রাষ্ট্রনায়ক। তারপর তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি যে ভাবে তুরস্কের সংস্কার সাধন করেছেন তার তুলনা ইতিহাসে আর মেলে কি-না সন্দেহ। তাঁর নেতৃত্বে তুরস্ক পাঁচশত বৎসরের পথ অতিক্রম করেছে পনের বৎসরে এবং মধ্যযুগীয় অন্ধকার পার হয়ে সে এসে পড়েছে আলোকোদ্ভাসিত বিংশ-শতাব্দীতে। তাঁর সহকর্মী এবং বর্তমান রাষ্ট্রপতি ইস্‌মেত ইনোনুও তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চলেছেন।

কামাল আতাতুর্কের বিজয় অভিযান সেভ্‌রে-সন্ধিপত্র পরিকল্পিত ব্যবস্থা উল্‌টে দিল। অদূর প্রাচ্যে এর ফলে এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হলো—যা স্বীকৃত হলো লোসান সন্ধিতে (Treaty of Lausanne) ১৯২৩ সালে। গ্রীসকে স্মার্না, থ্রেস এবং গ্যালিপলি প্রত্যর্পণ করতে হলো তুরস্ককে; উপরন্তু ডোডোকেনিস দ্বীপমালা ছেড়ে দিতে হলো ইতালীকে। তবে হেজাজ, প্যালেস্টাইন, ট্রান্স-জর্ডন প্রদেশ, ইরাক এবং সিরিয়ার ওপর দাবী তুরস্ক ছেড়ে দিলে; তার আয়তন পূর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত হ'লেও সীমারেখা হলো কতকটা সুনির্দিষ্ট এবং সে পেলো আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য। মোটামুটি, লোসান সন্ধি তুরস্কের মর্যাদা খানিকটা বৃদ্ধি করলে এবং এতে তার লাভই হলো বেশী যদি চ তার অসন্তোষের কারণও কিছু কিছু বর্তমান রইলো।

তুরস্কের ভৌগোলিক অবস্থান রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে তার প্রতিপত্তি অনেকটা বাড়িয়েছে। তুরস্ক ইউরোপকে যুক্ত করেছে এশিয়ার সঙ্গে। কৃষ্ণসাগর এবং ভূমধ্যসাগরের মধ্যে যোগসূত্রস্বরূপ মর্মর সাগর, এবং দার্দানেলিস ও বসফোরাস প্রণালীর অবস্থান হচ্ছে তুরস্ক অধিকৃত ভূখণ্ডের মধ্যে। রুশিয়া এবং বল্‌কান উপদ্বীপ থেকে ভূমধ্য সাগরে আস্‌তে হলে এ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই; অথচ লোসান চুক্তি অনুসারে এগুলির ওপর তুর্কীর কোনো কর্তৃত্ব রইলো না। এগুলি রইল অরক্ষিত এবং সর্বজাতি পেলো সেখানে যাবার অবাধ অধিকার। তুরস্কের দিক থেকে এ ব্যবস্থা কখনই ন্যায়সঙ্গত ঠেক্‌তে পারে না; কিন্তু কতকটা নিরুপায় হয়েই তাকে এ ব্যবস্থায় সায় দিতে হয়।

কামাল-পন্থী তুরস্ক বৈদেশিক ব্যাপারে শান্তিবাদী হয়ে দাঁড়াল। সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব পরিহার ক'রে নব্য তুরস্ক তার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত কর্‌ল বহু শতাব্দীর পুঞ্জীভূত জঞ্জাল সাফ করতে; কাজেই, পর-রাজ্য-গ্রাসের লিপ্সা তার অন্তর্হিত হলো। জার্মানীর মতো সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায়ের দাবী রক্ষার অজুহাতে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির ওপর হানা না দিয়ে তুরস্ক তাদের সঙ্গে মিতালী পাতাবার প্রয়াস পেলো। ফলে একে একে সে সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হলো তার পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র-বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে। এতে বৈদেশিক নীতি হলো সরল এবং তার নিরাপত্তার ভিত্তি হোলো সুদৃঢ়।

নব্য তুরস্কের প্রথম বান্ধব হোলো সোভিয়েট রুশিয়া। ১৯২১ সালে তুরস্কের সঙ্গে সোভিয়েটের যে সন্ধি হয় তাতে রুশিয়া সেভ্‌রে সন্ধির নিন্দা করে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে তুর্কীর অভিযানকে অভিনন্দিত করে। রুশিয়ার সঙ্গে তার পূর্বকালের শত্রুতা আজ তুরস্ক বিস্মৃত হয়েছে এবং তাদের মৈত্রী এ যাবৎ অটুট রয়েছে। কৃষ্ণসাগরের দুই তীরে তুরস্ক এবং রুশিয়ার বসতি। কাজেই রুশিয়ার বিরুদ্ধাচরণ যে তুরস্কের অভিপ্রেত নয় তা সহজেই বোঝা যায়। সাম্যবাদের জয়-যাত্রা এ মৈত্রী বন্ধন কিছুমাত্র শিথিল করে-নি; কেন না, রাজনীতিক্ষেত্রে ধর্মের প্রাধান্য কামাল আতাতুর্ক বহুকাল পূর্বেই অস্বীকার করে এসেছেন। তা ছাড়া, তুরস্কের চরম দুর্ভাগ্যের সময় সোভিয়েট তার সহায়তা করে এসেছে একথা নব্য তুরস্ক সহজে ভুল্‌বে বলে মনে হয় না। বর্তমান বৃটিশ-ফরাসী-তুর্কী চুক্তিতে এমন কিছুই নেই যা রুশিয়ার স্বার্থের পরিপন্থী। কাজেই একে যাঁরা রুশিয়ার বিরোধী বলে মনে করছেন তাঁরা যে ভ্রান্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

লোসান সন্ধির পর ধীরে ধীরে তুরস্ক তার সীমান্তবর্তী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপন কর্‌ল। ইরাণের সঙ্গে তার মৈত্রী দৃঢ়তর হলো যখন ১৯৩৪ সালে ইরাণের ভাগ্য-বিধাতা রেজা শা পহ্‌লবী এলেন তুরস্ক ভ্রমণে। ইরাকের সঙ্গেও তার অন্তরঙ্গতা স্থাপিত হয়েছে, এখানকার তৈল-বহুল মোসুল (Mosul) অঞ্চলটির ওপর আধিপত্যের দাবী তুরস্ক বহুদিন ত্যাগ করে-নি। ১৯২৬ সালে আংকারা সন্ধির ফলে এ সমস্যার একটা সন্তোষজনক মীমাংসা হয়ে গিয়েছে—তুরস্কের কিছু অধিকার স্বীকৃত হয়েছে ও অঞ্চলে এবং সে পেয়েছে ক্ষতিপূরণ। ইরাকের সীমান্ত রেখাও এই সঙ্গে সুনির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে। তারপর ১৯৩৭ সালে ইরাক, আফগানিস্থান এবং ইরাণের সঙ্গে তুরস্কের একটি পারস্পরিক সহায়তার চুক্তি নিষ্পন্ন হয়েছে; তার ফলে এসিয়ার ইসলামপন্থী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অদূর ভবিষ্যতে একটি নীতিগত ঐক্য দেখা দেবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

তুরস্কের শান্তিকামী নীতির নিদর্শন হলো গ্রীসের সঙ্গে সৌহার্দ্য। ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গ্রীসের সঙ্গে তুরস্কের যে সন্ধি হলো তাতে এ দুটি দেশের মধ্যে যে বিরোধ চল্‌ছিল বহু বর্ষ ধরে তার হলো অবসান। এই দুই দেশে যে তুর্কী এবং গ্রীক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ছিল তাদের সমস্যা মিটিয়ে নেওয়া হলো প্রজা-বিনিময় ব্যবস্থায়। এই বন্দোবস্ত অনুসারে প্রায় পনের লাখ তুর্কী গ্রীস ছেড়ে তুরস্কে প্রত্যাবর্তন করেছে এবং বহু গ্রীক পরিবার ফিরে গিয়েছে স্বদেশে। ফলে সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায় দেশে অসন্তোষের অগ্নি জ্বাল্‌তে সমর্থ হয়নি। গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া এবং তুরস্ক—এই চারটি রাষ্ট্র নিয়ে যে বলকান আঁতাত্ গড়ে উঠেছে তারও পুরোধা হচ্ছে নবীন তুরস্ক। বল্‌কান অঞ্চলে তার নেতৃত্ব এখন সর্ববাদিসম্মত।

মুসোলিনী এবং হিটলারের অভ্যুত্থান তুরস্ককেও আতঙ্কিত করে। ইথিওপিয়া গ্রাসের পর অরক্ষিত কৃষ্ণোপ-সাগর তীরবর্তী অঞ্চলের কথা ভেবে তুরস্ক চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল এবং লোসান-সন্ধি পরিবর্তনের দাবী করলে। এবার আর

তার দাবী উপেক্ষিত হলো না। এক বৈঠকের অধিবেশন হলো স্বইজার্লাণ্ডের অন্তর্বর্তী মঁত্রো (Montreux) নামক এক স্থানে—এই সমস্যার সমাধানের জন্য। এই বৈঠক বস্‌ফোরাস এবং দার্দানেলিস্ প্রণালীর ওপর তুরস্কের কর্তৃত্ব মেনে নিল এবং তাকে ওঅঞ্চল সুরক্ষিত কর্‌বার দিল অধিকার। সোভিয়েট ছাড়া অন্যান্য রাষ্ট্রের রণ-তরীর গতায়াতও নিয়ন্ত্রিত হলো। সামরিক প্রয়োজনে প্রণালী দুটি বন্ধ করে দেওয়ার অধিকারও তুরস্ক পেল।

বিগত মহাসমরের সময় বৃটিশ-বিরোধী যে ভাবধারা তুরস্ক অঞ্চলে প্রসার পেয়েছিল সমরোত্তর কালে তা ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হয়েছে; আংকারা সন্ধি (১৯২৬) যার ফলে ইরাকের সীমারেখা নির্ধারিত হয়—তুর্কো-বৃটিশ সম্প্রীতির পথ সুগম করে। কিন্তু মঁত্রো বৈঠকে বৃটেনের আনুকূল্য সেই বৃটিশ-পরিপন্থী-ভাব সম্পূর্ণ মুছে দেয়। ১৯৩৮ সালের ১২ই মে বৃটেনের সঙ্গে তুরস্কের এক অর্থনৈতিক চুক্তি হয়। তার ফলে কারাবুকে বৃটিশ মূলধনের সাহায্যে এক বিরাট লোহার কারখানা গড়ে উঠেছে। এই প্রীতিরই পরিণতি হচ্ছে ২০শে অক্টোবর সম্পাদিত বৃটিশ-ফরাসী-তুর্কী-চুক্তি।

ফ্রান্সের সঙ্গে তুরস্কের মনান্তর ঘটে সিরিয়া অঞ্চল নিয়ে। মহাসমরের অবসানে এই ভূতপূর্ব তুর্কী প্রদেশটি ফ্রান্সের অভিভাবকত্বে স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। এখানকার অধিবাসীরা অবশ্য তুর্কী নয়—আরব। লোসান সন্ধির সময় এ দেশটির ওপর আধিপত্যের অভিপ্রায় পরিহার করলেও উত্তর-সিরিয়ায় অবস্থিত আলেকজান্দ্রেতা বন্দরটির ওপর তুরস্ক দাবী জানায়। ফ্রান্স প্রথমে এ দাবী অস্বীকার করে; এমন কি, সিরিয়াকে স্বাধীনতা দান কর্‌বার সময়ও একে তুরস্ক-প্রভাবমুক্ত একটি স্বাধীনা নগরীতে পরিণত কর্‌বার পরিকল্পনা হয়। কিন্তু সম্প্রতি এটি তুরস্ক ফিরে পেয়েছে এবং ফ্রান্সের সঙ্গে তার মনোমালিন্য মিটে গিয়েছে।

এই পটভূমিকায় বৃটেন এবং ফ্রান্সের পক্ষে তুরস্কের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নেওয়া কিছুমাত্র কঠিন হয়-নি। পক্ষান্তরে, জার্মানীর পক্ষে এ রকম চুক্তি বর্তমান ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয়-নি; তার কারণ, হিটলারের আত্মবিস্তার-নীতি (laben sraum) সম্বন্ধে অন্যান্য বল্‌কান রাষ্ট্রগুলির মতো তুরস্কও সন্দিগ্ধ। তার পরিণতি যে কী সে বিষয়ে কিছুই স্থিরতা নেই। এ কথা ঠিক যে যদি জার্মানী তুরস্কের সঙ্গে সম্মিলিত হতো তা হ'লে দানিয়ুব নদী-পথে জার্মান ইউবোট এসে পড়ত কৃষ্ণসাগরে এবং সেখান থেকে সহজেই আসা চল্‌ত ভূমধ্যসাগরে। তাতে ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চল তাদের অত্যাচারে উদ্ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ত এবং বৃটেন এবং ফ্রান্সের নৌবহর হত বিপন্ন। কিন্তু এই চুক্তির ফলে দার্দানেলিস এবং বসফোরাস রইল উন্মুক্ত বৃটিশ এবং ফরাসী রণতরীর জন্য। তা ছাড়া, ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলে কোনও রাষ্ট্র আক্রান্ত হলে কিংবা রুমানিয়া বা গ্রীসের নিরাপত্তা বিপন্ন হলে বৃটেন ও ফ্রান্সের সহায়তাকল্পে তুরস্ক যুদ্ধে ব্রতী হবে। তবে সোভিয়েটের বিপক্ষতা করতে তুরস্ক বাধ্য থাক্‌বে না।

এই চুক্তিকে বলা হয়েছে—মিত্রশক্তিপুঞ্জের বিশিষ্ট বিজয় এবং জার্মানীর কূটনৈতিক ক্ষেত্রে পরাজয়। কেন না, জার্মাণ-প্ররোচনায় রুশিয়া তুরস্ককে কৃষ্ণ-সাগরের দ্বারপথ রুদ্ধ করতে অনুরোধ করেছিল। কিন্তু মঁত্রো চুক্তি ভঙ্গ ক'রে এ ব্যবস্থা করতে তুরস্ক রাজী হয়নি। জার্মানী ও ইতালীতে উষ্মার সঞ্চার হলেও তাতে তুরস্কের আশু বিপদের সম্ভাবনা নেই। বর্তমানে যুদ্ধের গতি যে এই চুক্তি প্রভাবিত কর্‌বে তা মনে করবার কোনও কারণ না থাক্‌লেও ভবিষ্যতে এর প্রয়োজনীয়তা সামান্য না হওয়াই সম্ভব। রুশিয়ার কাছে আশ্বাস পেয়ে তুরস্ক যদি কৃষ্ণসাগরের দ্বার বন্ধ করে দিত তা হলে সে গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির বৈরী বলে গণ্য হত এবং তাতে তার বিপদ ঘনিয়ে আস্‌ত। যদিও তুর্কী-রুশিয়া আলোচনা আপাতত ব্যর্থ হয়েছে, তবুও সোভিয়েট-বিরোধী কোনও চুক্তিতে তুরস্ক যোগ দেয়-নি। সুতরাং নতুন করে সে আলোচনা সুরু হতে কোনও বাধাই নেই। আপাতত রাষ্ট্রপতি ইস্‌মেত ইনোনু বিশেষ কোনও ভুল করেছেন বলে মনে হয় না। অন্তত, এ কথা ঠিক যে, এই চুক্তির কল্যাণে তুরস্ক আবার ইউরোপে জাতে উঠ্‌ল।

হে সম্রাট কবি, এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নব মেঘদূত, অপূর্ব্ব অদ্ভুত—রবীন্দ্রনাথ

শিল্পী—সুনীলকুমার দাশগুপ্ত, কলিকাতা

COLOURED ILLUSTRATION

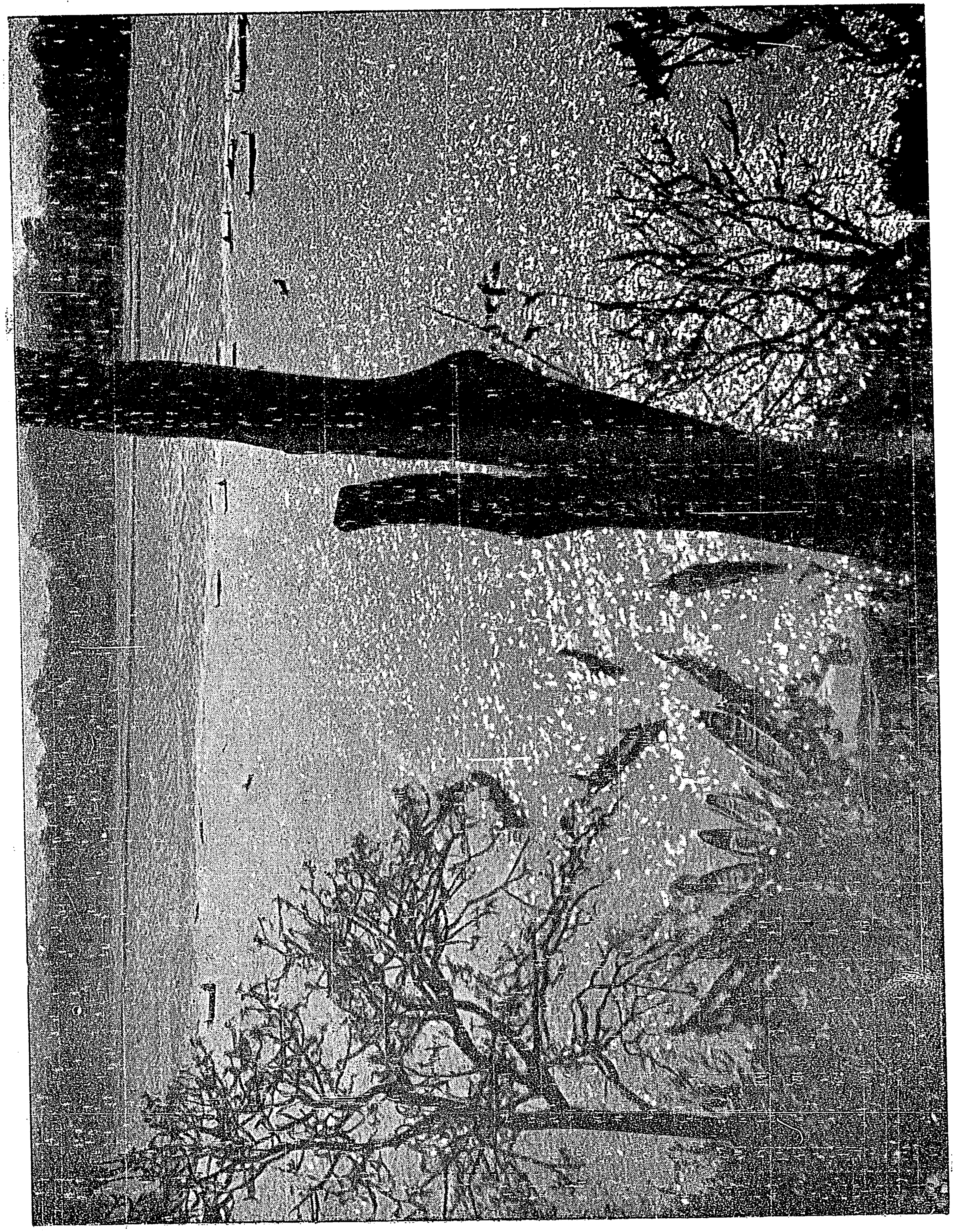

জেলে ডিঙি

শিল্পী—নবীন কর, শীলট

স্যার স্যামুয়েল হোরের বক্তৃতা—

কংগ্রেসের দাবীর উত্তরে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে স্যার স্যামুয়েল হোর যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত নৈরাশ্যব্যঞ্জক। "ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের" কোন প্রতিশ্রুতি তাহার মধ্যে নাই। সুদীর্ঘ বক্তৃতা; শিশুকালের সুমধুর ইতিহাস হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক কথা তাহার মধ্যে আছে। ভারতের সম্বন্ধেও অনেক আন্তরিকতা দেখানো হইয়াছে। নাই কেবল প্রার্থিত দাবী পূরণের আশ্বাস। স্যার স্যামুয়েল হোরের কথায় প্রকাশ, তাহা যে তিনি দিতে পারিলেন না সে তাঁহার বদান্যতা ও উদারতার অভাবে নয়, আমাদেরই অদৃষ্ট দোষে। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলি কংগ্রেস-শাসন চাহে না, কংগ্রেসকে বিশ্বাসও করে না। রাজন্যবর্গ কংগ্রেস-প্রাধান্যের আশঙ্কায় ইহারই মধ্যে রীতিমত আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। এতগুলি সম্প্রদায়কে মনঃক্ষুণ্ণ করিয়া কি করিয়া "ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস" দেওয়া যায়? যেদিন তাহারা মিলিত হইবে সেইদিনই ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইবে। তৎপূর্ব্বে দিলে অভিভাবক হিসাবে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্যহানি হইবে। তাহাদিগকে নিরাপত্তার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা তো পালন করিতে হইবে!

সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থ—

স্যার স্যামুয়েল হোর যে অসম্ভব সর্ত্ত দিয়াছেন তাহা ভালো ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার। মেজরিটি-মাইনরিটি প্রত্যেক গণতান্ত্রিক স্বাধীন দেশেই আছে। ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ এখানে মেজরিটি-মাইনরিটি রাজনৈতিক মতবাদের উপর নির্ভর করে না। এখানে দলভেদের ভিত্তি সম্প্রদায়গত কৃত্রিম বিভেদ। লঘিষ্ঠ সম্প্রদায় বলিতেও শুধু মুসলমান সম্প্রদায়ই বোঝায় না। শিখ আছে, পার্শী আছে, খৃষ্টান আছে, অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায় আছে, দেশীয় রাজন্যবর্গ আছেন—এমন কি ইউরোপীয় সম্প্রদায়ও সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্ত অসংখ্য সম্প্রদায় যেদিন এক-বাক্যে স্বায়ত্তশাসন চাহিবে, মাত্র সেইদিনই ভারতের ভাগ্যবিধাতাগণ ঊর্দ্ধাকাশ হইতে ভারতের উপর স্বায়ত্ত-শাসন বর্ষণ করিবেন। তৎপূর্ব্বে নয়। যতদিন কংগ্রেসের উপর হইতে তাহাদের আশঙ্কা বিদূরীত না হইতেছে, ততদিন—কংগ্রেস যত চেষ্টাই করুক না কেন—তাহারা বৃটিশ শাসনের সুশীতল স্নেহচ্ছায়ার বাহিরে এক পাও আসিতে প্রস্তুত নয়।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ—

কংগ্রেসের উপর সংখ্যালঘিষ্ঠদের কেন এই আশঙ্কা, কি তাহারা চায়, কোথায় তাহাদের স্বার্থহানি হইতেছে সে সম্বন্ধে কলরব যথেষ্ট উঠিলেও কোনো সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ এখনও পর্য্যন্ত কেহ তোলে নাই। জিন্না সাহেব লীগের পক্ষ হইতে কংগ্রেসী প্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডলের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ তুলিয়াছেন তাহা যেমন এলোমেলো, তেমনি ভিত্তিহীন। মহাত্মাজি এবং রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র-প্রসাদ এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস গায়ারকে দিয়া তদন্ত ও আবশ্যক বিচার করাইতে প্রস্তুত ছিলেন। মিঃ জিন্না অত্যন্ত তুচ্ছ যুক্তি দিয়া তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার এই একটা মাত্র অর্থই হইতে পারে যে, তিনি অথবা তাঁহার লীগ অভিযোগের তদন্ত ও সত্য হইলে তাহার প্রতিকারের জন্য ততটা ব্যগ্র নন, যতটা ব্যগ্র কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারে। তাঁহার স্বার্থও কংগ্রেসের সহিত আপোষে নয়, কংগ্রেসের বিরোধিতায়।

মহাত্মার অভিমত—

মহাত্মাজি হরিজনপত্রে এই কথাই আরও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :

"Janab Jinna Saheb looks to the British power to safeguard the Muslim rights. Nothing that the Congress can do or concede can satisfy him. For he can always, and naturally from his own standpoint, ask for more than the British can give or guarantee. Therefore, there can be no limit to the Muslim League demands."

ইহার অর্থ :

"জনাব জিন্না সাহেব মুসলীম স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য বৃটিশ শক্তির মুখাপেক্ষা করিয়া আছেন। কংগ্রেস যাহা কিছু করিতে পারে অথবা দিতে পারে তাহাতে তাঁহার মন উঠিবে না। কারণ তিনি সর্ব্বদাই বৃটিশের নিকট হইতে তাহারা যাহা দিতে অথবা দিবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে, তাহার চেয়ে বেশী চাহিতে পারেন। সুতরাং মুসলীম লীগের দাবীর কোনো সীমা নাই।"

বস্তুতপক্ষে তথাকথিত সংখ্যালঘিষ্ঠ সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির সৃষ্টি ও স্থিতি বিবেচনা করিলে বোঝা যায়, কংগ্রেসের অগ্রগতিকে ব্যাহত করা ছাড়া ইহাদের আর কোন কর্ত্তব্য নাই। ইহাদের অস্তিত্ব ও শক্তি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর মেহেরবাণীর উপরই নির্ভর করিতেছে। মিঃ জিন্না বলিয়াছেন, তাঁহারা একমাত্র নিজেদের শক্তির উপরই নির্ভর করিয়া থাকেন এবং কংগ্রেস ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরোধিতা সত্ত্বেও মুসলীম লীগ তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য সংগ্রাম করিবে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তাঁহারা প্রতিনিয়তই করিতেছেন সত্য। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রামটা কোথায় চলিতেছে তাহা স্যার সেকান্দার হায়াৎ খাঁ অথবা মৌলবী ফজলুল হক জানাইয়া দিলে দেশবাসীর কৌতূহল চরিতার্থ হয়।

অন্যান্য মুসলীম প্রতিষ্ঠানের অভিমত—

যুক্তপ্রদেশ মুসলীম লীগ দলের ডেপুটি লীডার মিঃ জেড্, এইচ, লারী পর্য্যন্ত বিরক্তভাবে বলিয়াছেন, মিঃ জিন্না স্বাধীনতা ধামাচাপা দিয়া এখন মুসলীম লীগ যে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেস এবং গবর্ণমেণ্টকে দিয়া তাহাই স্বীকার করাইবার চেষ্টায় আছেন। মিঃ জিন্না জানেন, বিভিন্ন স্বার্থসম্পন্ন প্রতিক্রিয়াপন্থীদের লইয়া জোড়াতালি দিয়া গঠিত এই লীগ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রামের স্পর্দ্ধাই করিতে পারে, সত্যকার সংগ্রাম করিতে পারে না। ভারতের যত বিখ্যাত মডারেট—নবাব বাহাদুর, স্যার আর খাঁ বাহাদুর—লইয়া এই লীগ গঠিত। ইঁহাদের অনেকেই খয়ের খাঁ হিসাবে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। উত্তেজনার প্রথম ঘোরটা কাটিয়া যাইতেই মুসলীম লীগের তরুণ দলে এখন সংশয়ের তরঙ্গ জাগিয়াছে, ভারতের স্বাধীনতার জন্য লীগের উপর কতখানি ভরসা করা যায়।

দিল্লী বৈঠকে মিঃ জিন্না গান্ধীজির নিকট মুসলীম লীগকে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবার দাবী তুলিয়াছেন বলিয়া একটা কথা উঠিতেই অন্যান্য মুসলীম দল, যথা—জমিয়ৎ-উল-উলেমা, অহ্রর দল, শিয়া সম্প্রদায়, মোমিন সম্প্রদায় প্রভৃতি গান্ধীজি ও ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট তার করিয়া এই দাবীর তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। বলিয়া রাখা ভাল, ভারতের সাত কোটি মুসলমানের মধ্যে তিন কোটি মোমিন সম্প্রদায়ের লোক। ইঁহাদের দাবী সংখ্যাগণনার হিসাবে উপেক্ষা করা যায় কি করিয়া?

গণতন্ত্র অচল—

জিন্না সাহেবের নূতন চাল—ভারতে গণতন্ত্র অচল। তৎপরিবর্ত্তে কি চলিবে, কোন্ শাসনতন্ত্র ভারতের প্রতিভা ও ভারতের মাটির পক্ষে উপযোগী অবশ্য তাহাও তিনি খুলিয়া বলেন নাই। তাহা রাজতন্ত্র, স্বেচ্ছাতন্ত্র, অভিজাত-তন্ত্র যাহাই হউক না কেন, নিরক্ষর, নিরন্ন ও রোগজীর্ণ মুসলীম জনসাধারণের শাসনতন্ত্র যে নয় তাহা নিঃসন্দেহ। বাস্তবিক পক্ষে আরাম চেয়ারে বসিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম তিনি গত কয়েক বৎসর ধরিয়া অবিশ্রান্ত-ভাবে চালাইতেছেন, তাহাতে "আমীর-এ-মিল্লৎ" জিন্না সাহেব যদি একটা বাদশাহগিরি না পান তবে আর কি পাইলেন! তাঁহাকে "গ্রেট-মোগলের" ভূমিকায় দেখিবার জন্য অনেকেরই আগ্রহ আছে।

কিন্তু একটা বিষয়ে আমাদের খটকা বাধিয়াছে। গণতন্ত্র যদি ভারতে অচলই হয়, গণতন্ত্রের ব্যর্থতা যদি প্রতিপন্নই হইয়া গিয়া থাকে, তবে লীগের গঠনতন্ত্র এখনও গণতান্ত্রিক কেন? আর লীগ মন্ত্রীগণকেই বা তিনি গণতান্ত্রিক মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিবার হুকুম দিতেছেন না কেন? "গ্রেট মোগলই" বটে! কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁহার দুই সুবেদার যে ভিন্ন পথ ধরিয়াছেন!

কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ—

বর্ত্তমান বর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ। মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও সীমান্তের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন। আসামও (এই প্রবন্ধ লিখিবার সময়) পদত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। এই সমস্ত প্রদেশে ব্যবস্থা পরিষদে বিভিন্ন দলের শক্তি নিম্নলিখিতরূপ :

	কংগ্রেস	অকংগ্রেস	মোট সংখ্যা
যুক্তপ্রদেশ···	১৪৭	৮১	২২৮
মাদ্রাজ···	১৬২	৫৩	২১৫
বোম্বাই···	৮৯	৮৬	১৭৫
বিহার ··	৯৮	৫৪	১৫২
উড়িষ্যা···	৩৫	২৫	৬০
মধ্যপ্রদেশ···	৭১	৪১	১১২
সীমান্ত···	২১	২৯	৫০
„ কোয়ালিশন···	২৯	২১	৫০
আসাম···	৩২	৭৬	১০৮
„ কোয়ালিশন···	৫৮	৫০	১০৮

ইহাতে বোঝা যায়, আসাম ছাড়া আর কোথাও নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইবার আশা নাই। অন্যান্য প্রদেশে গবর্ণর সে চেষ্টা একবার করিয়া স্বয়ং প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং এইজন্য কয়েক-জন করিয়া আই-সি-এস'কে লইয়া পরামর্শ সভা গঠন করিয়াছেন।

কংগ্রেস বর্ত্তমান যুদ্ধে বৃটেনের উদ্দেশ্য এবং যুদ্ধশেষে সেই উদ্দেশ্য কি ভাবে ভারতে প্রযোজ্য হইবে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কাছে তাহার সুস্পষ্ট ঘোষণা চাহিয়াছিলেন। বড়লাটের এবং তাহার পরে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে স্যার স্যামুয়েল হোরের ঘোষণায় তাহার সন্তোষজনক উল্লেখ না থাকায় কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল তাহার প্রতিবাদে পদত্যাগ করিয়াছেন। কংগ্রেসী প্রদেশে তাঁহাদের পদত্যাগ এবং গবর্ণর কর্ত্তৃক শাসনভার গ্রহণের কি প্রতিক্রিয়া হয় তাহাই দেখিবার বিষয়।

লাটপ্রাসাদে বৈঠক—

কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল কর্ত্তৃক পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই বড়লাট কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মহাত্মা গান্ধী ও রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদকে এবং মুসলীম লীগের পক্ষ হইতে মিঃ জিন্নাকে আমন্ত্রণ করেন। ইহাতে অনেকের মনে এই আশার সঞ্চার হয় যে, হয় তো বা একটা আপোষ হইয়া যাইবে এবং মন্ত্রিগণ আবার ফিরিয়া আসিয়া স্ব স্ব প্রদেশের শাসন ভার গ্রহণ করিবেন। কিন্তু সে আশাও ব্যর্থ হইয়াছে। দিল্লী বৈঠকে কংগ্রেসের সহিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কোন আপোষ সম্ভব হয় নাই।

এই সম্পর্কে বড়লাট যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যে মতভেদের ফলেই দিল্লী বৈঠক ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু বস্তুত পক্ষে ব্যাপার যে তাহা নয় তাহা পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর উক্তিতে প্রকাশিত। আলোচ্য বৈঠকে সাম্প্রদায়িক বিরোধ নিষ্পত্তির কোনো কথা ওঠে নাই। সে সম্বন্ধে জিন্না সাহেবের সহিত পণ্ডিতজির যে আলোচনা চলিতেছে তাহা এখনও শেষ হয় নাই। এমন কি, ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কংগ্রেস যে ঘোষণার দাবী করিয়াছে, তাহার সহিত জিন্নাসাহেবের কোনও মতবিরোধ নাই।

বড়লাট নাকি প্রস্তাব করিয়াছিলেন, প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডল গঠন সম্বন্ধে লীগ-কংগ্রেস একমত হইলেই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টে কি পরিবর্ত্তন করা যায় তাহার ব্যবস্থা হইবে। কংগ্রেস এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ফলে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে জিন্নাসাহেবের সহিত কোনো আলোচনাই হয় নাই।

কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের কারণ দ্বিবিধ। প্রথমতঃ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রার্থিত ঘোষণা না পাওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করিতেই

প্রস্তুত নন। দ্বিতীয়তঃ কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল কর্ত্তৃক পদত্যাগ করার পরে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই অবান্তর।

এসম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ সুস্পষ্ট ভাষায় বড়লাটের নিকট লিখিত অভিমত প্রেরণ করিলেও জিন্নাসাহেব তাঁহার পত্রে লীগের কোন অভিমতই জানান নাই। তিনি শুধু ইহাই জানাইয়াছেন যে, কংগ্রেস বড়লাটের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় তাঁহার সহিত কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই সম্ভব হয় নাই। এই "ধরি মাছ না ছুঁই পাণি" নীতি জিন্নাসাহেবের বিশেষত্ব এবং ইহাই তাঁহার তুরুপের তাস।

'টাইম্‌স-এর' দুঃখ—

দিল্লী বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় সুদূর বিলাতে বসিয়াও 'টাইম্‌স্' পত্র অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিয়াছেন এবং কংগ্রেসকে আর কালবিলম্ব না করিয়া সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের সঙ্গে অর্থাৎ মুসলমান, অনুন্নত সম্প্রদায় এবং দেশীয় রাজন্যবৃন্দের সহিত আপোষে মিটমাট করিয়া লইয়া অবিলম্বে 'ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস' হস্তগত করিবার সুপরামর্শ দিয়াছেন। বলা বাহুল্য সুপরিচিত সৌজন্যের সহিত 'টাইম্‌স্' সাম্প্রদায়িক মতভেদকেই দিল্লী বৈঠকের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এমন কি, কংগ্রেসী প্রদেশে সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের উপর যে অত্যাচার হইয়াছে, 'টাইম্‌স্' তাহারও উল্লেখ করিয়া অনেক 'কুম্ভীরাশ্রু' বিসর্জ্জন করিয়াছেন।

মহাত্মাজি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরল ভাষায় ইহার চমৎকার উত্তর দিয়াছেনঃ "ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ করিবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সাম্প্রদায়িক মতভেদের অজুহাত ব্যবহার করিয়া থাকেন," এবং "দেখা যাইতেছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লীগকে খেলাইবার সেই কদর্য্য দৃশ্য এখনও চলিতেছে।"

কিন্তু এবার আর শুধুই লীগ নয়। পাছে কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে লীগ কংগ্রেসের সহিত আপোষ করিয়া ফেলে সেজন্য নূতন আর একটি সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে—দেশীয় রাজন্যবৃন্দ। ভগবান জানেন, এই স্বেচ্ছাতন্ত্রী শাসকসম্প্রদায় কি চাহেন! 'গ্রেট মোগলের' এই দুর্ব্বল এবং অক্ষম অনুকারকগণের সহিত 'মুসলীম ভারতের' ভবিষ্যৎ 'গ্রেট মোগলের' মতের কিছু মিল থাকিতে পারে। কিন্তু কি মতবাদে, কি দৃষ্টিভঙ্গীতে, কংগ্রেসের সহিত ইঁহাদের ক্ষীণতম যোগসূত্রই বা কোথায়? মহাত্মা বলিয়াছেনঃ

The mention of Princes in this connection is particularly unfair. They owe their existence to the Paramount power and have no status independent of it. Strange as the assertion may appear, they can do nothing big or good without the consent, tacit or implied, of the Paramount power. They represent nobody but themselves. To invite the Congress to settle with the Princes is the same as inviting to settle with the Paramount power.

দেশীয় রাজন্যগণ প্রজা সাধারণের প্রতিনিধি নন। তাঁহারা বৃটিশ সার্ব্বভৌম শক্তির সম্মতি ছাড়া কোন কাজ করিতে পারেন না। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাদের সহিত কংগ্রেসকে আপোষ করিতে বলা, আর সার্ব্বভৌম শক্তির সহিত আপোষ করিতে বলা যে একই কথা—তাহা অস্বীকার করিবার পথ কোথায়?

কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ—

কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের বিরুদ্ধে লীগ অবিশ্রান্তভাবে নানা অভিযোগ তুলিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহা যে ঠিক কি তাহা কোন দিন সুনির্দ্দিষ্টভাবে বলে না; লীগ এ বিষয়ে তদন্ত করাইতেও ইচ্ছুক নয়। 'টাইমস্'-এর অভিযোগের উত্তরে মহাত্মা এ সম্বন্ধে সত্য ঘটনা বিবৃত করিবার ভার কংগ্রেসী প্রদেশের গবর্ণরদের উপর দিয়াছেন।

বোম্বাই প্রদেশে মুসলীম-সংবাদপত্রদলনের যে অভিযোগ মৌলবী ফজলুল হক সাহেব তুলিয়াছিলেন, সেখানকার মন্ত্রিমণ্ডল তাঁহাকে চাপিয়া ধরিতেই তিনি তাহা বোম্বায়ের কাঁধ হইতে যুক্তপ্রদেশের কাঁধে ফেলিয়াছেন। কিন্তু তথাপি নিস্তার নাই। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এবারে তাঁহাকে চাপিয়া ধরিয়াছেন। উত্তেজনাবশে হক সাহেবও তাঁহার 'চ্যালেঞ্জ' গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত যুক্তপ্রদেশে তদন্ত করিতে রাজি হইয়াছেন। অবশ্য সম্প্রতি তিনি কটিবাতে শয্যাগত। রোগমুক্তির পরে একটা ভাল দিন দেখিয়া তিনি যুক্তপ্রদেশ যাত্রা করিবেন বলিয়া অনেকেই প্রতীক্ষা করিয়া আছেন।

কিন্তু যুক্তপ্রদেশের অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়াই তাঁহার মহৎ কর্ত্তব্য শেষ হইবে না বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। ইতিপূর্ব্বে হক সাহেবের এক বিবৃতির উত্তরে সুভাষচন্দ্র জানাইয়াছিলেন, বাঙ্গলার মফঃস্বল হইতেও হিন্দুদের উপর উৎপীড়নের অনেক অভিযোগ তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। আমরা আশা করি, হকসাহেব সে সম্বন্ধেও যথাবিহিত তদন্তে ব্রতী হইবেন।

ইতিমধ্যে যুক্তপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ বলিয়াছেন, পাঞ্জাবে তিনশত সংবাদপত্রের জামিন তলব করা হইয়াছে। তাহার পরিমাণ বহু টাকা। বাজেয়াপ্ত জামিনের পরিমাণও সামান্য নয়। হকসাহেব পাঞ্জাব বলিতে ভুল করিয়া যুক্তপ্রদেশে বলেন নাই তো?

পরলোকে ফণীন্দ্রনাথ পাল—

গত ১১ই কার্ত্তিক শনিবার লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ সাহিত্যিক ফণীন্দ্রনাথ পাল মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৫৮ বৎসর হইয়াছিল। ফণীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল অধুনালুপ্ত "যমুনা" ও "গল্পলহরী" যথেষ্ট কৃতিত্ব ও যশের সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। সাহিত্যিক হিসাবেও তিনি বাঙ্গলার পাঠকসমাজে যথেষ্ট সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার রচিত "স্বামীর ভিটা", "সুকুমার" "বন্ধুর বৌ", "ইন্দুমতী" প্রভৃতি উপন্যাসগুলি সে সময়ে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিল। তাঁহারই সম্পাদিত "যমুনা"য় অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের প্রথম আবির্ভাব। সুদূর বর্ম্মায় শরৎচন্দ্র যখন বাস করিতেন, যখন বাঙ্গলা দেশে তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন, তখন হইতেই ফণীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গতা ছিল। শরৎচন্দ্রের অজ্ঞাত জীবনের অনেক কথা তিনি জানিতেন যাহা শরৎচন্দ্রের জীবনী-রচয়িতার পক্ষে উপাদানরূপে গৃহীত হইতে পারিত। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা স্বজন-বিয়োগবেদনা অনুভব করিতেছি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

কংগ্রেস কি হিন্দু প্রতিষ্ঠান?

সম্প্রতি ভারতসচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড জিন্না সাহেবের অনুকরণে কংগ্রেসকে হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। লর্ড জেটল্যাণ্ড ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। কংগ্রেসের শক্তি ও স্বরূপ তিনি ভাল করিয়াই জানেন। সমস্ত জানিয়াও যদি তিনি ও কথা বলিয়া থাকেন তাহা হইলে আর বলিবার কি থাকিতে পারে? ভারতে কংগ্রেসই একমাত্র অসাম্প্রদায়িক জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ইহাতে সকল ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল ভারতবাসীরই যোগদান করিবার অধিকার আছে। এই প্রতিষ্ঠানকে ছোট করিতে পারিলে ভারতের অগ্রগতি যে ব্যাহত হইবে এ কথা মিঃ জিন্নার মত লর্ড জেটল্যাণ্ডও জানেন। কিন্তু তাঁহারা একটা কথা জানেন না যে, কংগ্রেসের খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা ও শক্তি আরাম চেয়ারে বসিয়া অর্জ্জিত হয় নাই, তাহা সংবাদপত্রের কোলাহল ও কটূক্তির উপরও নির্ভর করে না।

আজাদ মুসলীম সম্মেলন—

পাঞ্জাবের মুক্তিকাম মুসলমানদের লইয়া গঠিত আজাদ মুসলীম সম্মেলনের একটি জরুরী বৈঠকে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছেঃ

"মিঃ এম, এ, জিন্না মুসলীম লীগকে ভারতের মুসলমানদের একমাত্র প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকার করিবার উপর সর্ব্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। যদিও সত্য কথা এই যে, মুসলীম লীগের মোট সদস্য-সংখ্যা অপেক্ষা কংগ্রেসের মুসলমান সদস্যের সংখ্যা অনেক বেশী। অধিকন্তু জমিয়ৎ-উল-উলেমা, মজলিস-ই-অহ্‌র প্রভৃতি অনেক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান আছে, যাহারা কংগ্রেসের সহিত একযোগে কাজ করিয়া থাকে।

তৎসত্বেও যদি মুসলীম লীগকে স্বীকার করার সমস্যাই জাতীয় ঐক্যের একমাত্র অন্তরায় হইয়া থাকে তাহা হইলে জাতীয় মুসলমানগণের সে পথ রোধ করিবার ইচ্ছা নাই; মিঃ জিন্না এবং তাঁহার সহকর্ম্মীগণ তাঁহাদের অমুসলমান

ভ্রাতৃবৃন্দের কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিতে প্রস্তুত আছেন। এই সভার মতে, লর্ড জেটল্যাণ্ড ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে কেবলমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান বলিয়া যে উল্লেখ করিয়াছেন তাহার দ্বারা ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন, বিশেষ করিয়া এই সময়ে যখন মুসলীম লীগ ও কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঐক্যের চেষ্টা চলিতেছে এবং তাহা আশাপ্রদ বলিয়া মনে হইতেছে। আমাদের কমিটি আরও বিশ্বাস করে যে, কংগ্রেসই একমাত্র জাতীয় এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যাহা সকল সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি এবং যাহার দ্বার জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলেরই জন্য উন্মুক্ত আছে।”

ইহার উপর মন্তব্য অনাবশ্যক। কিন্তু ইহাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী এবং তাঁহাদের ভেরীবাদক সংবাদপত্রগুলির চোখ ফুটিবে কি ?

স্যার মন্মথনাথের মাতৃবিয়োগ—

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি সার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জননী গত ১৮ই কার্ত্তিক শনিবার সকালে ৯০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। তাঁহার ৫ পুত্র ও ৪ কন্যার মধ্যে ৪ পুত্র ও দুই কন্যা পূর্ব্বেই পরলোক গমন করায় তাঁহাকে বহু শোকভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি বিশেষ সদয়হৃদয়া ও সুগৃহিণী ছিলেন। সার মন্মথনাথের মত উপযুক্ত পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন, ইহা তাঁহার কম সৌভাগ্যের পরিচায়ক নহে। আমরা সার মন্মথনাথের এই দারুণ শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরলোকে হেমনলিনী কর—

বহু চিকিৎসাগ্রন্থ প্রণেতা, কলিকাতা মেডিকেল স্কুল ও কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বনামখ্যাত ডাক্তার ৺রাধাগোবিন্দ (আর-জি) কর মহাশয়ের পত্নী হেমনলিনী কর পরিণত বয়সে গত ২১শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার সকালে সাধনোচিত ধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। হেমনলিনী কর মহাশয়া স্বামীর আদর্শে অনুপ্রাণিতা হইয়া পরোপকারব্রতী হইয়াছিলেন। ডাক্তার করের কোন সন্তানাদি ছিল না—তাঁহার কয়েকটি ভ্রাতুষ্পুত্র বর্ত্তমান। সুবিখ্যাত সাংবাদিক শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ডাক্তার করের ভ্রাতার অন্যতম জামাতা।

এক রাত্রির ইতিহাস

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র কুশারী

শ্রাবণ মাস। আকাশে বর্ষার ঘনঘটা।

তারপর আজ কয়দিন থেকে অবিশ্রাম বর্ষণ চলেছে, চারদিকে একটা গম্ভীর নিস্তেজ থম্‌থমে ভাব—যেন মেঘ-মেদুর আকাশের ম্লান মায়া তার ছায়া ফেলেছে মানুষের মনে, আচ্ছন্ন করেছে বিশ্ব-প্রকৃতিকে, বর্ষণ-শ্রান্ত ধরণীর ছবি আজ ব্যথিতের দীর্ঘ নিশ্বাসের মত নীরব, নিবিড়।

এমন দিনে আর যাই চলুক, আড্ডা চল্‌তে পারে না। ভবতোষের বাড়ীতেই আমাদের প্রাত্যহিক সান্ধ্য আড্ডাটি বসত, এ কয়দিন সেখানে কেউ যায় নি এ খবর পেয়েছি। কিন্তু আজ আর ভাল লাগছিল না—আড্ডার নেশায় মনটা উতলা হয়ে উঠ্‌ছিল। “এমন দিনে তারে বলা যায়” এই ধরণের কবিতা পড়ে কাব্যচর্চ্চা করবার মত যৌবন আমার ছিল না, স্ত্রীরও ছিল না। কারণ একদিন যিনি তন্বীশ্যামা বধূরূপে আমার জীবনে স্বপ্নের মত উদিত হ’য়েছিলেন, তিনি আজ আর স্বপ্ন নন, বধূ নন—প্রবীণা স্থূলাঙ্গিনী গৃহিণী, জননী—ধরণীর ধূলিতে একান্তই বাস্তব, সংসার নিয়েই তিনি ব্যস্ত, আর তদধিক ব্যস্ত ছেলেদের নিয়ে। বর্ষার দিনে তাদের উৎপাতও বড় কম নয়—বাইরে যাবার উপায় নেই, ঘরের মেঝেই হ’য়েছে তাদের রণক্ষেত্র। তাদের নৃত্য, হাসি, কান্না,

তর্ক সমানভাবে চলছে। সারাদিন টেবিল, চেয়ার, বাক্স, পেটরা—অত্যাচারে জর্জ্জরিত, ক্ষত বিক্ষত, মেঝেতে ছেঁড়া কাগজ, কাপড়ের টুকরো, ছাতি লাঠি, দোয়াত কালিকলম চারদিকে বিক্ষিপ্ত—আর তার মধ্যে চলছে অবিরাম তাণ্ডব নর্ত্তন, ঘন ঘন সিংহনাদ, ঠিক সেকালের যুদ্ধক্ষেত্রের মত, যদিও যুদ্ধক্ষেত্র দেখবার সৌভাগ্য আমার কখনো ঘটেনি। আজ তাদের বীরত্বের মাত্রাধিক্য, সুতরাং খণ্ডপ্রলয়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা। গৃহিণী এখনো নীচে কি কার্য্যে ব্যস্ত, নতুবা খণ্ডপ্রলয়টা অনেক পূর্ব্বেই ঘটিয়া যাইত। এখন যে কোন মুহূর্ত্তে তিনি উপরে উঠিতে পারেন। সুতরাং এই আসন্ন বিপদের মধ্যে জড়িত না থাকাটাই যুক্তিযুক্ত। ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখি—সন্ধ্যা হয় হয়; নিঃশব্দে আড্ডার দিকে রওনা হলুম।

আড্ডায় এসে দেখি—বেশ জম্‌জমাট। পাটের দালাল ঘনশ্যাম চা পান করছে, বৈজ্ঞানিক সীতাংশু “চয়নিকা” খুলে নিবিষ্ট মনে ইজিচেয়ারে এলিয়ে আছে—বোধ হয় সে বর্ষার কবিতা মনে মনে উপভোগ করছে। কবি প্রভাত-কুসুম টেবিলে পা তুলে দিয়ে বিড়ি টানচে, ঔপন্যাসিক নিবারণ তেল-সংযুক্ত মুড়ি চর্ব্বণে ব্যস্ত, ভবতোষ আর দার্শনিক অজয় হ্যাভ্‌লক এলিস, না, ম্যারি ষ্টোপ্‌সের সিদ্ধান্ত নিয়ে তর্কে মশ্‌গুল, মৃদঙ্গগণ্ডার অক্ষয় মৃদঙ্গ অভাবে টেবিলের উপর তাল ঠুকছে। অক্ষয় এ তল্লাটে ভাল মৃদঙ্গ বাজিয়ে, তার বাজনার শব্দ এক মাইল দূরের থেকেও নাকি শোনা যায়। তাই ঘনশ্যাম ওর উপাধি দিয়েছি মৃদঙ্গ-গণ্ডার। আর যে দু-চারজন আছে, তাদের নাম না করলেও তারা চট্‌বে না, কারণ তারা “জুনিয়র” দলের।

আমি ঢুকতেই তারা সশব্দে আমার অভ্যর্থনা করল। অভ্যর্থনা কথাটা নেহাতই ভদ্রগোছের হ’ল—চল্‌তি ভাষায় বল্‌তে গেলে বল্‌তে হ’ত চেঁচামেচি। আমি কোন কথা না বলে একটা চেয়ার টেনে বসলুম।

বৈজ্ঞানিক সীতাংশু ‘চয়নিকা’খানা সশব্দে বন্ধ করে আমার দিকে চেয়ে বলল—এ কিন্তু ভারি অন্যায়—

আমার অনুপস্থিতির সম্বন্ধে হয়ত সে কিছু বল্‌তে যাচ্ছিল। তাকে তার কথা শেষ করতে দিলুম না। সীতাংশুর কথার জের টেনে আমি ঘনশ্যামের দিকে চেয়ে বল্লুম—নিশ্চয়ই, পাটের দর যে নেমে যাবে গবর্ণমেন্টের একথা আগেই···

ঘনশ্যাম আমাকে বাধা দিল—কলকাতার পাটের বাজার সুবিধা নয়, আর মনটাও বোধ হয় তার ভাল ছিল না—সে বল্ল—থামো, যার সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই তা নিয়ে তর্ক করো না।

চায়ের বাটিতে শেষ চুমুক দিয়ে তা সশব্দে নামিয়ে রাখল।

প্রভাতকুসুম কবি হ’লেও তার্কিক, সে জবাব দিল—ঘনশ্যাম, কথাটা তোমার ঠিক হ’ল না। জ্ঞান যেখানে নেই তর্ক সেখানেই চলে, কারণ জ্ঞানীর পক্ষে অসতর্ক হ’বার সম্ভাবনা কম।

ঘনশ্যাম চটে উঠল—চট্‌বার মুখে সে যখন কথা বলে তখন তার তর্কের খেই হারিয়ে যায় এবং বাক্যগুলি হ’য়ে উঠে অসংলগ্ন।

ঘনশ্যাম জবাব দিল—তাহ’লে পাটের তথ্য ছেড়ে স্ত্রীতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা কর।

কি কথায় কি কথা এল। কিন্তু নিবারণ কথাটাকে যেন লুফে নিল। সীতাংশুর দিকে কটাক্ষ করে নিবারণ বল্ল—তাই ভাল, তথ্য ও তত্ত্ব দুইই আলোচনা করা যাক। প্রথম ধরো ফ্রয়েডের কথা—

সীতাংশুর ফ্রয়েড-বিশারদ বলে খ্যাতি কিংবা অখ্যাতি ছিল, কারণ স্ত্রীতত্ত্ব সম্বন্ধে যখনই কোন আলোচনা হ’ত তখনই সে ফ্রয়েডের কথা তুল্‌ত। আমরা তাকে ফ্রয়েড সম্বন্ধে ‘অথরিটি’ বলে নির্ব্বিবাদে মেনে নিয়েছিলুম, যেহেতু আমাদের আড্ডার আর কেউ ফ্রয়েড পড়েনি।

সীতাংশুর জবাব দিবার কথা কিন্তু জবাব দিল প্রভাত-কুসুম—থামো, এই বর্ষার দিনে ফ্রয়েড চলবে না। এস রবীন্দ্রনাথের বর্ষার কবিতা পড়া যাক্।

সে চয়নিকা খুলতে সুরু করল।

কেন জানি না ঘনশ্যামের মেজাজ আজ ভাল ছিল না। প্রভাতের কথা শুনে সে বলে উঠল—তা হ’লে পড় তোমরা, আমি দোসরা আড্ডার চেষ্টা দেখি। ন্যাকামি করে এখন দিলটাকে আমি মাটি করতে রাজী নই।

কথা শেষ করে সে এমনভাবে সরে বসল যেন সে উঠেই যায়।

ভবতোষ বলল—ঘনশ্যাম ঠিকই বলেছে। কবিতা আজ চলবে না। বই তুমি বন্ধ কর প্রভাত, মৃদঙ্গ-গণ্ডার অক্ষয় টেবিলটার উপর একটা প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে বলল—কবিতা-টবিতা কিছু নয়—দুই-একটা প্রেমের গল্প চলুক।

কথাটা সকলের মনেই সায় দিল। আমরা সকলেই খুশী হ’লুম এই ভেবে যে, সত্যিই অক্ষয় আজ্ একটা রুচি-সম্মত কথা বলেছে—যা বলতে তাকে আমরা কদাচিৎ শুনি।

সত্যি কথা বলতে হলে, এমন বর্ষার দিনে একমাত্র প্রেমের গল্পই চল্‌তে পারে—আর আমাদেরও তা ভাল লাগবার সম্ভাবনা, কারণ প্রেমের যুগ আমাদের জীবনে এখন অতীত এবং অতীতের অল্প ছবিরই সে আকর্ষণ আছে, তার প্রবলতা কম নয়। সুতরাং আমাদের অনেকেরই মন সজাগ হ’য়ে উঠল।

বাইরে অবিরাম বর্ষণ চল্‌ছে, আকাশে মেঘের গুরু গুরু ডাক, নীরন্ধ্র অন্ধকারের বুকে বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ, বাগান হ’তে ফুলের গন্ধ এলোমেলো ভেসে আস্‌ছে—

এই পরিবেশের মধ্যে ঘনশ্যামই প্রেমের গল্প বলবার জন্য প্রস্তুত হ'ল।

ঘনশ্যাম গল্প বল্‌বে এই ভেবে অনেকেই বোধ হয় অস্বস্তি বোধ করল। গল্প সাধারণত মিথ্যেই হয়, কিন্তু আমরা তা শুন্‌তে চাইনি। কারো জীবনের সত্যিকার প্রেমের ইতিহাস আমরা শুনব—এই ছিল আমাদের অভিপ্রায়। ঘনশ্যামের কাছ থেকে এ ধরণের ইতিবৃত্ত শোনা সম্ভব নয়, কারণ সে প্রায়ই সত্যি কথা বলে না। আর তা ছাড়া সচ্চরিত্র বলে তার একটা বিশেষ খ্যাতি আছে।

অক্ষয় এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। আমাদের মনের কতকটা আন্দাজ করে নিয়ে সে বল্‌ল—'প্রেমের জেপলিন' কিংবা 'চুম্বনে খুন' গোছের আমরা শুন্‌তে চাইনি।

ঘনশ্যাম জবাব দিল—আরে না, সত্যিকার গল্পই বল্‌ব—আমার জীবনের ঘটনা।

অনেকেই বিস্মিত হ'ল।

নিবারণ বল্‌ল—সে কি হে ঘনশ্যাম! তোমার জীবন-নাটকের আদি ও অকৃত্রিম নায়িকা ত তোমার স্ত্রী। তোমার জীবন-নাটকে আর কোন উপনায়িকা ছিল বা আছে—এমন একটা সুসমাচার আমরা জানি বলে ত মনে হয় না। আর তা ছাড়া, তুমি সচ্চরিত্র বলে একটা খ্যাতি আছে।

দার্শনিক অজয় এবার নড়েচড়ে বল্‌ল—তর্কের গন্ধে সে বিশেষ উৎসাহিত হয়েছে বলে মনে হ'ল এবং অবিলম্বে তর্কটা সুরু করিয়া দিল—চরিত্রের সঙ্গে প্রেমের সে সম্বন্ধটা তুমি আবিষ্কার করেছ নিবারণ, তা একদম মৌলিক—এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

কথা শেষ করে সে হো—হো করে হেসে উঠ্‌ল।

হঠাৎ বেমক্কা একটা ধাক্কা খেয়ে নিবারণও উত্তেজিত হ'য়ে সুরু করল—মৌলিকতার দাবি অবশ্য আমি করিনে, কিন্তু কতগুলি বাঁধা বুলিতে আমার মনের ঝুলি যে ভর্ত্তি হয়নি, একথা আমি মানি। অর্থাৎ

—অর্থাৎ তুমি শুধু বইই পড় আর ধার করা বুলি আওড়াও। স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে জান না। তাই একটা নূতন কথা শুন্‌লে একেবারে চম্‌কে ওঠো। প্রেম—

বোঝা গেল, তর্ক যেভাবে উদ্দাম হ'য়ে উঠল তাতে আজ-কার বাদলার আসর একদম মাটি হ'বার যথেষ্ট সম্ভাবনা। ভবতোষ পাকা আড্ডাধারী—সে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল এবং সভাপতির মত গম্ভীর স্বরে বলল—নিবারণ,তোমাদের তর্কটা কালকের জন্য মুলতুবী রইল।

তার পর আমাদের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল—আশা করি, এতে তোমাদেরও কারো আপত্তি নেই?

বস্তুত আপত্তি কারো ছিল না; বরঞ্চ আমরা যথেষ্ট শঙ্কিতই হয়েছিলুম। ভোট-গণনা করে দেখা গেল, সভাপতির প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'য়েছে।

ভবতোষ ঘনশ্যামের দিকে চেয়ে বলল—তুমি আরম্ভ কর।

সঙ্গে সঙ্গে কয়েক কাপ চায়ের অর্ডার হয়ে গেল।

ঘনশ্যাম সুরু করল—তোমরা বোধ হয় জান, আমি ক্লাইভ ষ্ট্রীটের পাটের আফিসে প্রথম চাকুরী সুরু করি এবং ইতিও করি এইখানে। এই ইতির সঙ্গেই এ ঘটনার সম্পর্ক।

আমার কাজ ছিল পাট কেনার তদারক করা, আর বর্ষাকালে মফঃস্বলে ঘুরে ঘুরে পাট চাষ সম্বন্ধে কোম্পানিতে রিপোর্ট দেওয়া এবং বড়সাহেবের উপদেশমত চাষীকে দাদন দেওয়া। ফলে সমস্ত বর্ষাকালটাই আমাকে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে হ'ত। অবশ্য তাতে যে আমার দু'পয়সা অতিরিক্ত আয় হ'ত তা তোমাদের বলাই বাহুল্য।

এমন সময় চাকর রামধনিয়া ট্রে করে চা দিয়ে গেল।

চা-পর্ব্ব সুরু ও শেষ হ'ল। তার পর হ'ল ধূম্রলোকের সৃষ্টি।

ঘনশ্যাম সিগারেটে গোটা কয়েক মার টান দিয়ে আবার আরম্ভ করল—

তখনো আমি বিয়ে করিনি বা আমার জীবনে অন্য কোন নারীর আবির্ভাব ঘটেনি।

সেবার এমনি বর্ষাকাল, বোধ হয় মাসটাও শ্রাবণ। আমি মফস্বলে রওনা হলুম। খুব বেশী দূর যেতে ইচ্ছে হ'ল না—মনে ভাবলুম, কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসি। আর তা ছাড়া ঠিক এ সময় পাড়াগাঁয়ে ঘুরে বেড়ান যে খুব লোভনীয় তা নয়। তবে কবিদের কথা স্বতন্ত্র, কারণ তারা যা বলেন তা সত্যি নয়, আর যা সত্যি তা বলেন না। প্রমাণ, আমাদের কবি প্রভাতকুসুমের কবিতা—বর্ষার পল্লীশ্রী।

দীর্ঘ দুই পৃষ্ঠাব্যাপী প্রভাতকুসুমের এক গদ্য কবিতা সম্প্রতি এক মাসিকে প্রকাশিত হয়েছে। কবি সেটাকে 'মাষ্টার পিস্' বলে মনে করে, সুতরাং ঘনশ্যামের এই অতর্কিত বিরুদ্ধ সমালোচনায় প্রভাত রুষ্ট হ'য়ে জবাব দিল—ধান ভান্‌তে শিবের গীত গেয়ো না ঘনশ্যাম। কবিতা কমলদল-বিহারিণী সরস্বতী—পাটের গায়ে কমলদলের বিশেষ কোন সাদৃশ্য আছে বলে ত আমাদের জানানেই।

এই রূঢ় ভাষণে ঘনশ্যামকে বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হ'তে দেখা গেল না। সে হেসে জবাব দিল—নেই ঠিক কিন্তু আবিষ্কৃত হ'তে কতক্ষণ? গলিত মৃত্তিকা—অর্থাৎ সাদা কথায় যাকে আমরা বলি কাদা, যদি তা সুগন্ধ চন্দন হ'তে পারে তবে পাটের বনও যে একদিন তোমাদের মত কবির কলমে কমলবন হ'য়ে উঠবে তাতে আর বিচিত্র কি? যাক্—যা বলছিলুম—

লোভনীয় হোক আর না হোক—গোলামের স্বাধীন ইচ্ছার বালাই নেই, সুতরাং রওনা হলুম। কলকাতা থেকে রাণাঘাট, রাণাঘাটের কয়েকটা ষ্টেশন পরে হালসা—যে

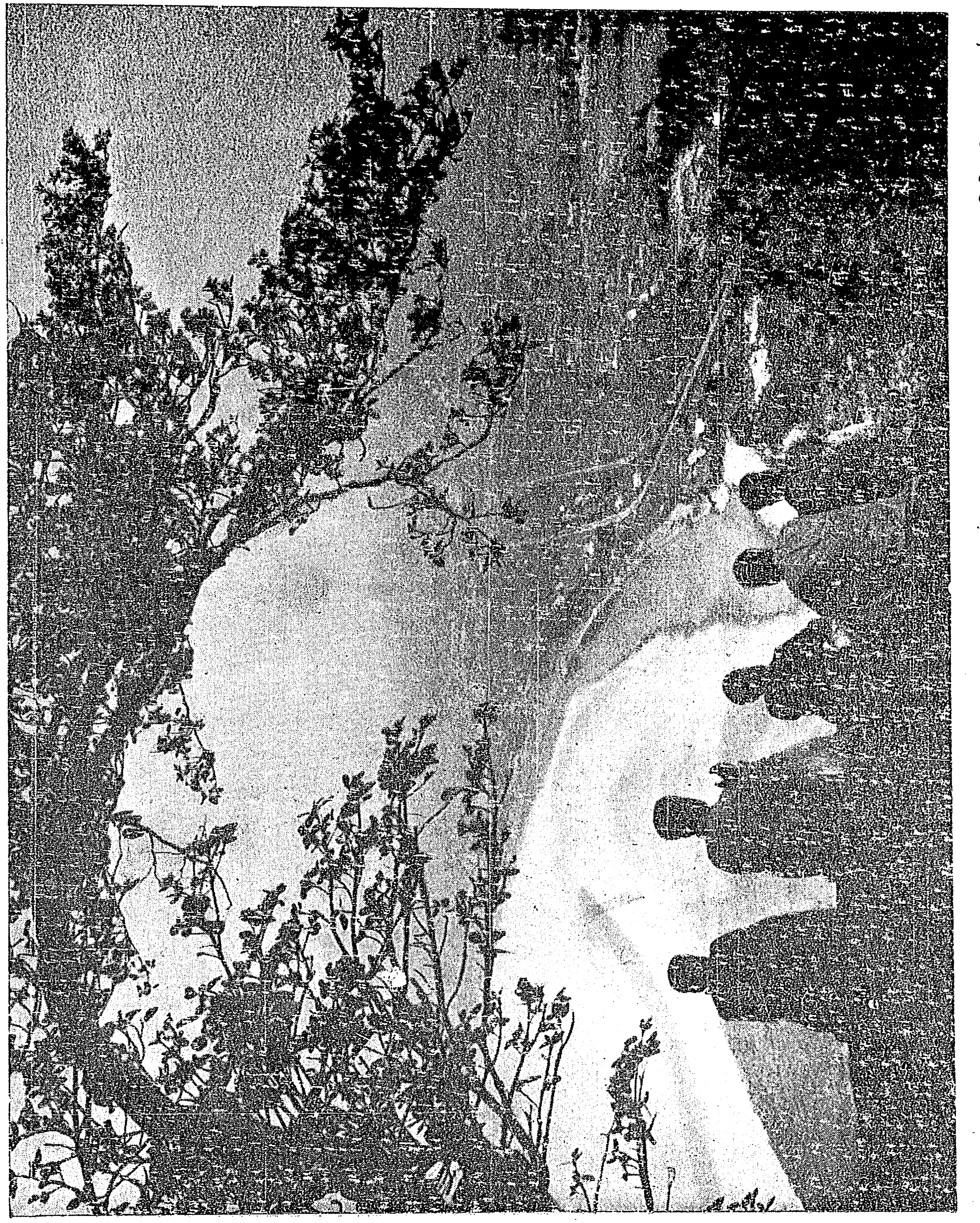

শিল্পী—নীরোদ রায়, গৌহাটি

বিমুগ্ধ বিস্ময়

ভারতবর্ষ

COLOURED ILLUSTRATION

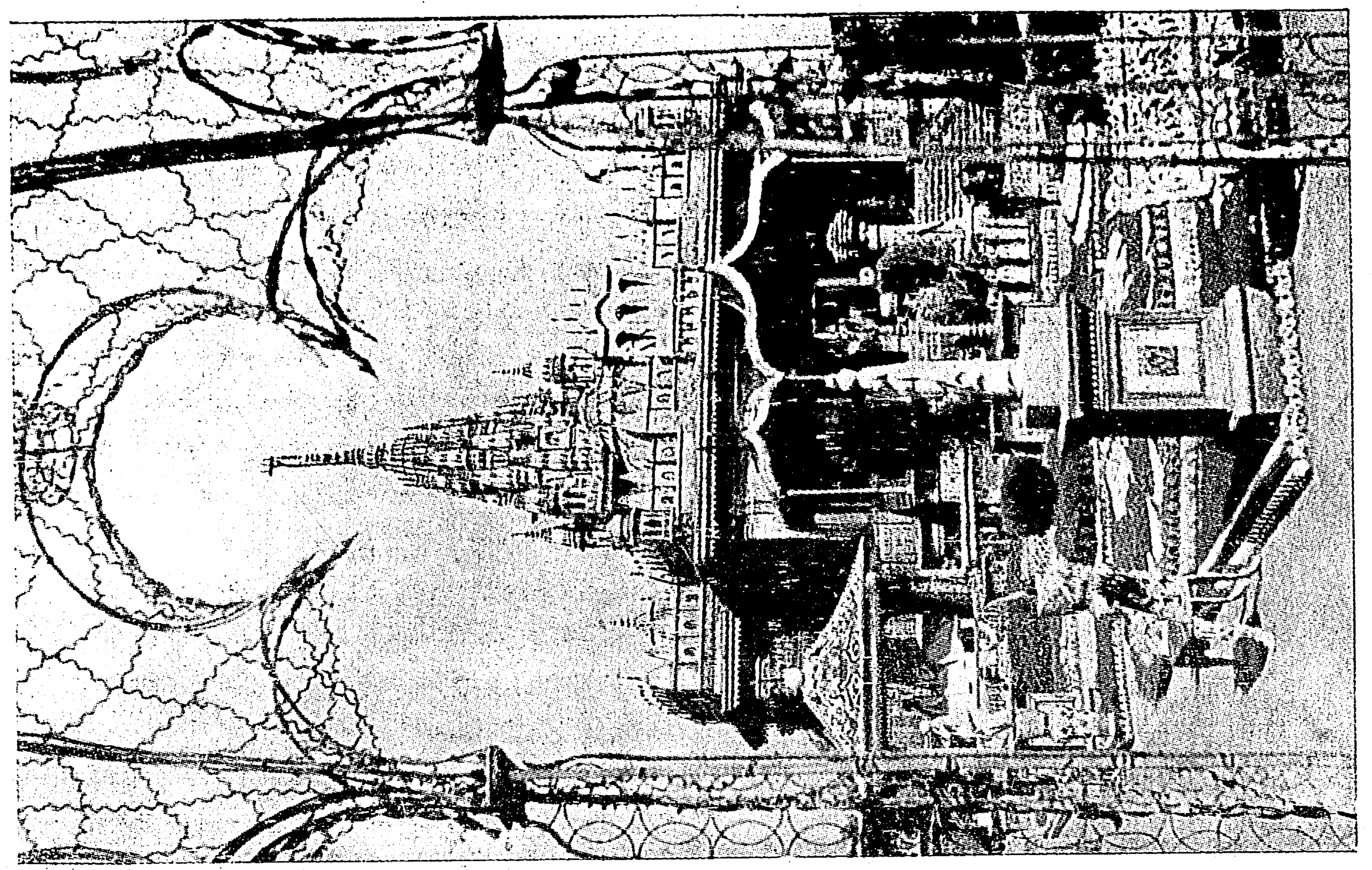

পরেশনাথের মন্দির—গৌরীবেড়ে
শিল্পী—কিরণ নাহার, কলিকাতা

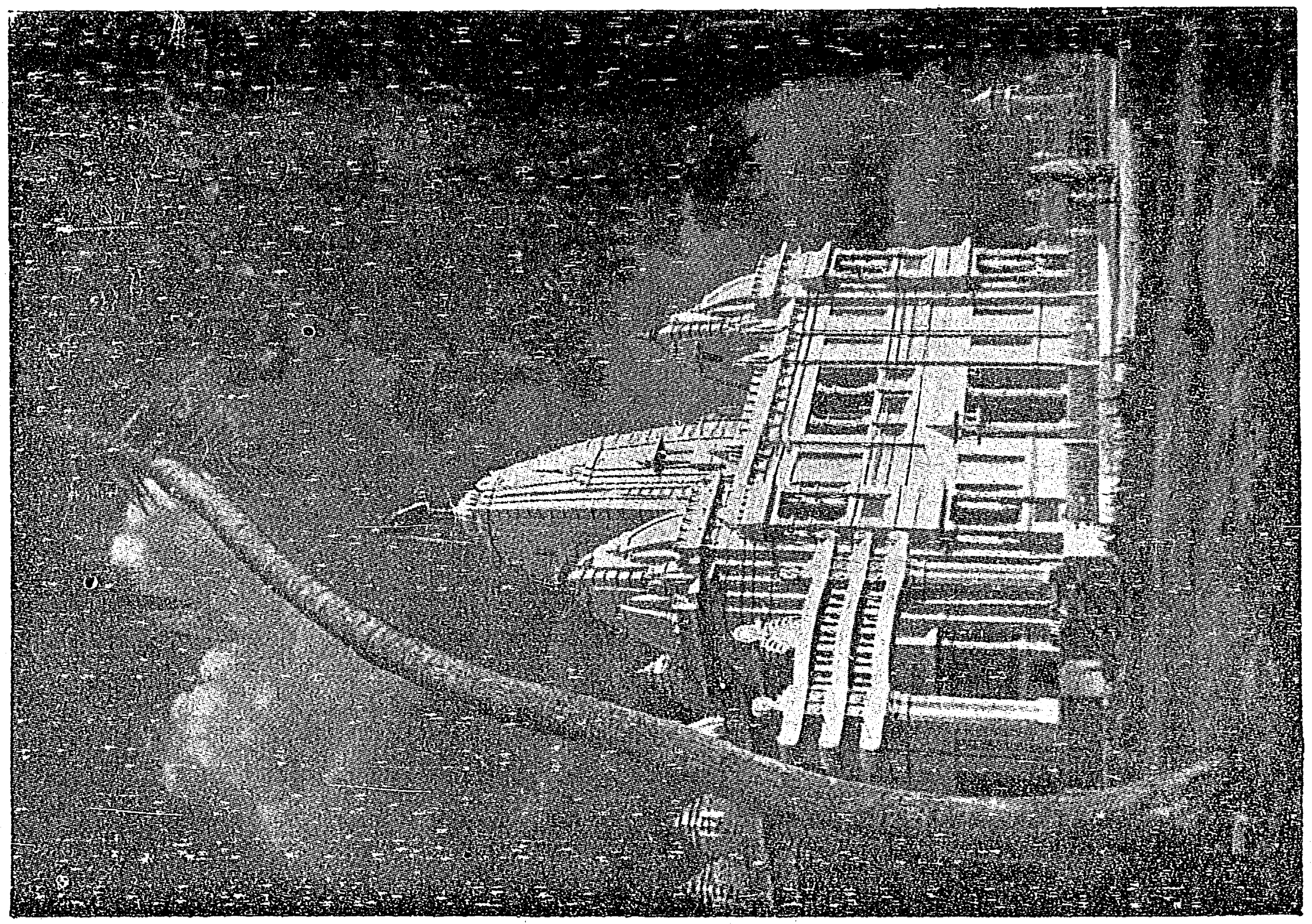

পরেশনাথের মন্দির—বেলগেছিয়া
শিল্পী—বি দালাল, কলিকাতা

হালসায় একবার ঢাকা মেল চুরমার হ'য়ে গেছল—বোধ হয় তোমাদের মনে আছে। সেখানে একটা ডাকবাংলো আছে, ডাকবাংলো শুনলে যে ধরণের ছবি তোমরা মনে মনে আঁকবে এ তা নয়, ভ্রাম্যমাণ রাজ-কর্ম্মচারীদের সাময়িক বিশ্রামের জন্যই বোধ হয় এটা তৈরী। একজনের এখানে স্বচ্ছন্দে থাকা চলে কিন্তু একাধিক হ'লেই বিপদ, কারণ একটি মাত্র কক্ষ আর একাধিক খাটিয়া পাত্‌বার স্থান নেই বলে শোবার খাটিয়াও এক এবং অদ্বিতীয়।

এই বাংলোতেই আশ্রয় নিলুম।

সারাদিন নিজের কাজকর্ম্মেই ব্যস্ত রইলুম—আর দিনটাও ছিল বেশ। কিন্তু বিকেলের দিকে আবার বৃষ্টি এল, বাইরে একটু কাজ ছিল, স্থগিত রাখ্‌তে হল।

একটা ইজিচেয়ার টেনে নিয়ে বারান্দায় বসলুম। বৃষ্টিও চেপে এল। মাঠের মাঝে বাংলো, আশেপাশে বাড়ীঘর নেই—মাঠের পরে মাঠ, ধান ও পাটে ভর্ত্তি—শ্যামলতায় ঝলমল। মাঝে মাঝে দুই-একটা বাবলা গাছ—দুই-একটা নিঃসঙ্গ দীর্ঘ তাল গাছ—আর কিছু নেই।

ভাল লাগছিল না।

একবার মনে হ'ল—কলকাতায় ফিরে যাই। আর একদিন না হয় আসা যাবে।

হঠাৎ আমার সুমুখে একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটে গেল। বিপর্য্যয় কথাটা বোধ হয় ঠিক হ'বে না—মানে ঠিক—

মৃদঙ্গ গণ্ডার বল্ল—আছে। হ'ল বিপর্য্যয়—তুমি বল। আমরা ঠিক বুঝে নেব।

ঘনশ্যাম বলতে লাগল—দেখি, একটী তরুণী বাংলোর দিকে আস্‌ছে। মাথায় ছাতি, গায়ে ওয়াটার প্রুফ, পায়ে হাই হিল জুতো, হাতে এটাচি কেশ।

আমার বুকটা ধ্বক করে উঠল, শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তস্রোত দ্রুত তালে নাচ্‌তে লাগল। তখনকার অবস্থাটা হয়ত আমি ঠিক বোঝাতে পাচ্ছি না।

প্রভাত জবাব দিল—বেশ বুঝতে পাচ্ছি, তুমি বল—

তরুণী এসে দাঁড়াল আমার সামনে। আমিও উঠে দাঁড়ালুম—দুজনে একেবারে মুখোমুখী।

সে বোধ হয় পদ্মকলির মত দু'টী হাত তুলে আমাকে নমস্কারও করেছিল। তবে আমি যে প্রতি-নমস্কার করেনি, এ আবার বেশ মনে আছে—আমার বুকে তখন চল্‌ছে ইঞ্জিন, কানে ভোঁ ভোঁ শব্দ, পা দুটো কাঁপ্‌ছে—আমি যেন একটা অশরীরী মূর্ত্তি যার সঙ্গে ধরণীর যোগ সূত্র মুহূর্ত্ত মাত্র ছিন্ন হ'য়েগেছে।

ভেবে দেখ আমাদের অবস্থান, কল্পনা কর আমাদের অবস্থা—কেউ কোথাও নেই; বৃষ্টির নাই বিরাম, মেঘের গুরু গুরু ডাক, জলো হাওয়ার এলোমেলো ঝাপ্‌টা—এই পরিবেশের মধ্যে ছোট্ট একটি বাংলো আর সেই বাংলোয় দাঁড়িয়ে মুখোমুখী দুই তরুণ-তরুণী—অজানা অচেনা—এমনি এক বর্ষার সন্ধ্যায় অন্ধকারে নীরব নির্জ্জন পথের মাঝে তাদের প্রথম দেখা—

যাক্।

আমরা কঠিন পৃথিবীর মানুষ—স্বপ্নে বিচরণ বেশীক্ষণ চলে না। পরিচয় হ'ল। বাংলোর চৌকিদারকে দু'কাপ চা করতে বলে তরুণীকে বল্লুম—চলুন ভেতরে গিয়ে বসি।

দু'জনেই দু'খানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে আমিই আবার প্রশ্ন করলুম—এই ত একখানা কামরা। আপনিই বা কোথায় থাক্‌বেন, আর আমিই বা কোথায় থাকি?

তরুণী হেসে জবাব দিল—সে কথাটা এখন আর না-ই ভাব্‌লেন। যা হোক একটা উপায় হ'বে।

আমি চুপ করে রইলুম। উপায়টা কি এবং সেটা যে কি ধরণের হ'বে তা আমি ধারণা করতে পারলুম না।

চৌকিদার চা দিয়ে গেল।

চায়ে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—মাপ করবেন, একটা কথা জিগ্‌গেস করতে পারি?

নিতান্ত সপ্রতিভভাবে তরুণী জবাব দিল—খুব পারেন।

এবং মৃদু হেসে চায়ে চুমুক দিল। কানের ঝুমকো দুটো হ্যারিকেনের আলোতে চিক্ চিক্ করে উঠল।

আমি প্রশ্ন করলুম—আপনাকে এমন দিনে এক ডাক-বাংলোয় দেখা—

—অস্বাভাবিক! কেমন না?—তরুণী জবাব দিল। আমি কতকটা আম্‌তা আম্‌তা করে বল্লুম—না, ঠিক—তা নয়—ইত্যাদি।

তরুণী উত্তরে যা বললে তা থেকে আমি এই মাত্র বুঝলুম—সে অল-ইণ্ডিয়া বীমা কোম্পানীতে মহিলাবিভাগে কাজ করে এবং হালসার এক জমিদার-গৃহিণীর মোটাটাকার ইনসিওরেন্স করবার জন্য এসে জানতে পারে যে, তার মক্কেল কয়েক দিনের জন্য কোথায় বেড়াতে গেছেন। তারপরে এই দুর্ব্বিপাক এবং ভোর চারটার পূর্ব্বে কলকাতা ফেরবার আর ট্রেণ নেই বলে বাংলোয় আশ্রয় গ্রহণ।

অক্ষয় ফস করে প্রশ্ন করল—তরুণী বাংলোয় এলেন কেন? তিনি ত এই কয়ঘণ্টা জমিদার বাড়ীতেই কাটাতে পারতেন?

ঘনশ্যাম নিতান্ত সপ্রতিভভাবে জবাব দিল—কাটাতে পারতেন কিন্তু কাটাননি। আর আমিও এসব কথা খুঁটিয়ে জিগ্‌গেস করিনি।

অক্ষয় চুপ করে রইল।

ঘনশ্যাম পুনরায় সুরু করল—অনেক দিনের কথা—আজ সে সব কথা স্মৃতি থেকে বলা শক্ত—উপন্যাস কখনো লিখিনি, তাই কি ভাবে বানিয়ে এবং ফেনিয়ে বলতে হয় তাও জানি না। তারপর অনেক কথাই আমাদের হয়েছিল, তার সঙ্গে এ কাহিনীর প্রত্যক্ষ যোগ নেই, সুতরাং সে সব

খুঁটিনাটি বাদ দিলেও চলে, আর তা ছাড়া মনেও নেই। মোটের উপর শেষ পর্য্যন্ত শয়ন-সমস্যাটাই প্রধান হ'য়ে দাঁড়াল।

আমি এ সমস্যাসমাধান-কল্পে কি একটা কৈফিয়ৎ দিতে যাচ্ছিলাম—

তরুণী বাধা দিয়ে বল্‌ল—সমস্যা যখন দাঁড়িয়েছে তার সমাধানও নিশ্চয়ই আছে। এর জন্য খুব বেশী চিন্তা করে কি লাভ বলুন ?

আমি হেসে জবাব দিলুম—লাভ-অলাভের প্রশ্ন নয়—সমাধান ত আছে, কিন্তু সেটা কি ?

মধুর হাসি হেসে তরুণী বল্ল—আসলে এটা একটা সমস্যাই নয়। এক ঘরেই আমরা থাক্‌ব।

আমি অবাক্ বিস্ময়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম।

—অবাক্ হচ্ছেন, কিন্তু কেন ?—তরুণী প্রশ্ন করল। এ 'কেন'র উত্তর আমি কি দিব ? আর উত্তর দিতে গেলেও তা খুব প্রাঞ্জল ভাবে দেওয়া চলে না। সুতরাং চুপ করেই রইলুম এবং এত বড় একটা জটিল সমস্যার এত সহজ সমাধানে মনে মনে বেশ খুশীই হ'লুম—এ কথা আমি স্বীকার করছি।

পাছে ব্যবস্থাটা পাল্টে যায় এ ভয়েই তাড়াতাড়ি আমি বল্লুম—বেশ—আমি এ চেয়ারটায় শুই, আর আপনি ওই খাট্‌টায় শুয়ে কোন মতে রাত্রিটা কাটিয়ে দিন।

রাতও হয়েছিল। তরুণী উঠল এবং আমার দিকে একটি মধুর কটাক্ষ হেনে বিছানার দিকে অগ্রসর হ'ল—আমার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হ'য়ে উঠল।

নারীর নয়নভঙ্গিতে যে কত মধু সঞ্চিত থাক্‌তে পারে আমি সেদিন তা বুঝতে পারলুম। এমন সহজ সরল অথচ গভীর রহস্যময় কটাক্ষ জীবনে আর কখনো দেখিনি—নারীর অন্তরের অন্তরতম বাণী যেন প্রাণ পেয়ে লীলায়িত হ'য়ে জেগেছিল সে ছ'টি নয়নের কোণে—আমি সে ছবি এখনো ভুলতে পারিনি—

আর ভুলতে পারিনি আজও সে রাত্রির কথা—প্রথম যৌবনের সে বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। মানুষ ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে, আমি জেগে স্বপ্ন দেখতে লাগলুম।

তরুণী শুয়েছে—হ্যারিক্যানটা প্রায় নিবানো—ঘরে তরল অন্ধকার···

এই স্তিমিত দীপালোকে, এই প্রায়ান্ধকারে আমি কতক্ষণ জেগে ছিলুম আজ আর আমার তা মনে নেই, হঠাৎ মনে হ'ল—একটা গভীর আবেশে আমার দেহযন্ত্র শিথিল, অবসন্ন; আমার বুকের পরে পাখীর পালকের কোমল লঘু ভার, গালে উষ্ণ পরশ, কণ্ঠে পেলব বাহুলতার নিবিড় নীরব বন্ধন—যেন আমাকে কেন্দ্র করে আজ উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে বিশ্বের যত রস যত মধু—বিচিত্র বর্ণে গন্ধে গানে যার মধ্যে হারিয়ে গেছে আমার আকাশ, আমার বাতাস, আমার অতীত, আমার ভবিষ্যৎ—আমার সত্তা। একটা তীব্র তীক্ষ্ণ আদি-অন্তহীন অনুভূতির মধ্যে যেন আমি অনাদি কাল বেঁচে আছি।

* * * *

ভোরের দিকে জেগে উঠলুম। কখন যে ঘুমিয়ে গেছি মনে নেই। ঘুমের ঘোর ভাল করে' কাটেনি—দেখি ইজিচেয়ারটাতেই শুয়ে আছি—সামনের বিছানাটার দিকে নজর পড়ল—বিছানায় কেউ নেই—খালি।

মনটা ধ্বক করে উঠল, ডাকলুম—চৌকিদার!

চৌকিদারকে তরুণীর কথা জিজ্ঞেস করতে সে জবাব দিল, তিনি ত ভোর চারটার গাড়ীতে চলে গেছেন।

চলে গেছেন ?—

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমি স্প্রিংয়ের মত লাফিয়ে উঠলুম। এতক্ষণে টেবিলটার উপর নজর পড়ল। ছ'টী এটাশি কেস পাশাপাশি ছিল—একটি আছে, কিন্তু সেটি আমার নয়।

সর্ব্বনাশ—তার মধ্যে কোম্পানীর দরুণ প্রায় পাঁচশত টাকা ছিল—আর তা ছাড়া ছিল আমার দামী রিষ্ট ওয়াচ, শেফার পেন, নিজের সামান্য টাকা-পয়সা, রিটার্ন টিকিট, আরও টুকিটাকি জিনিষ। বোধ হয় তাড়াতাড়িতে অদল-বদল হয়ে গেছে। কিন্তু এখন উপায় ?—কলকাতায় ফিরে যাই কি করে ? তরুণীর এটাশি কেসটা খুলতে চেষ্টা করলুম—চাবি দেওয়া ছিল, খুলতে পারলুম না।

ঘনশ্যাম চুপ করল।

অক্ষয় জিজ্ঞাসা করল—তার পর ?

ঘনশ্যাম জবাব দিল—তার পরে আর কিছু নেই।

নিবারণ বল্‌ল—তরুণীর আর খোঁজ কর নি ?

করেছি, পাইনি।

প্রভাত প্রশ্ন করল—কোম্পানির নামটা জান্‌তে। সেখানে—

কলকাতায় ও নামের কোন কোম্পানি নেই।

অজয় বলল—এটাশি কেশটা ?

ঘনশ্যাম জবাব দিল—এখনো আমার কাছে আছে, ইচ্ছা করলে তোমরা দেখতে পার—তার মধ্যে শাদা কাগজ এবং টয়লেটের টুকিটাকি জিনিষপত্র ছাড়া আর কিছু ছিল না।

ঘনশ্যাম এবার উঠে দাঁড়াল—ফিল্ম ষ্টারের ভঙ্গিতে আমাদের সকলকে শুভরাত্রি জ্ঞাপন করে সে বৃষ্টির মধ্যেই চলে গেল।

একজন বলে উঠল—বিলকুল মিথ্যে।

অজয় জবাব দিল—জীবনটাই ত মিথ্যে, সুতরাং জীবনের ঘটনাগুলি···

ঢং ঢং করে এগারোটা বাজল। অজয়ের কথা শেষ হ'ল না। আমরা উঠে দাঁড়ালুম—বাড়ী যেতে হ'বে।

দেখি বাইরে তখনো সমানভাবে বর্ষণ চল্‌ছে।

রঞ্জি ক্রিকেট ঃ

নওনগর—৩৮৭

বোম্বাই—৩৫১

রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আরম্ভ হ'য়েছে। পশ্চিম অঞ্চলের খেলায় নওনগর ৩৬ রানে বোম্বাইয়ের নিকট জয়লাভ ক'রেছে। রাত্রে বৃষ্টি হওয়ায় পিচের অবস্থা খারাপ ছিল তাই নির্দ্ধারিত সময়ে খেলা আরম্ভ হ'ল না। বোম্বাই টসে জিতেও নওনগরকে ব্যাট করতে সুযোগ দেয়।

খ্যাতনামা বোলার এস্ ব্যানার্জ্জি নিজ দলের সর্ব্বোচ্চ ১০৬ রান করেন। তাঁর ৭টা 'চার' ছিল। শতরাণ পূর্ণ করতে ২০৭ মিনিট সময় নেয়। অমরসিংয়ের ৭৬ রান ও মানকাদের ৫৮ রানও উল্লেখযোগ্য। বোম্বাইয়ের তারাপুর ৯১ রানে ৮ উইকেট নিয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

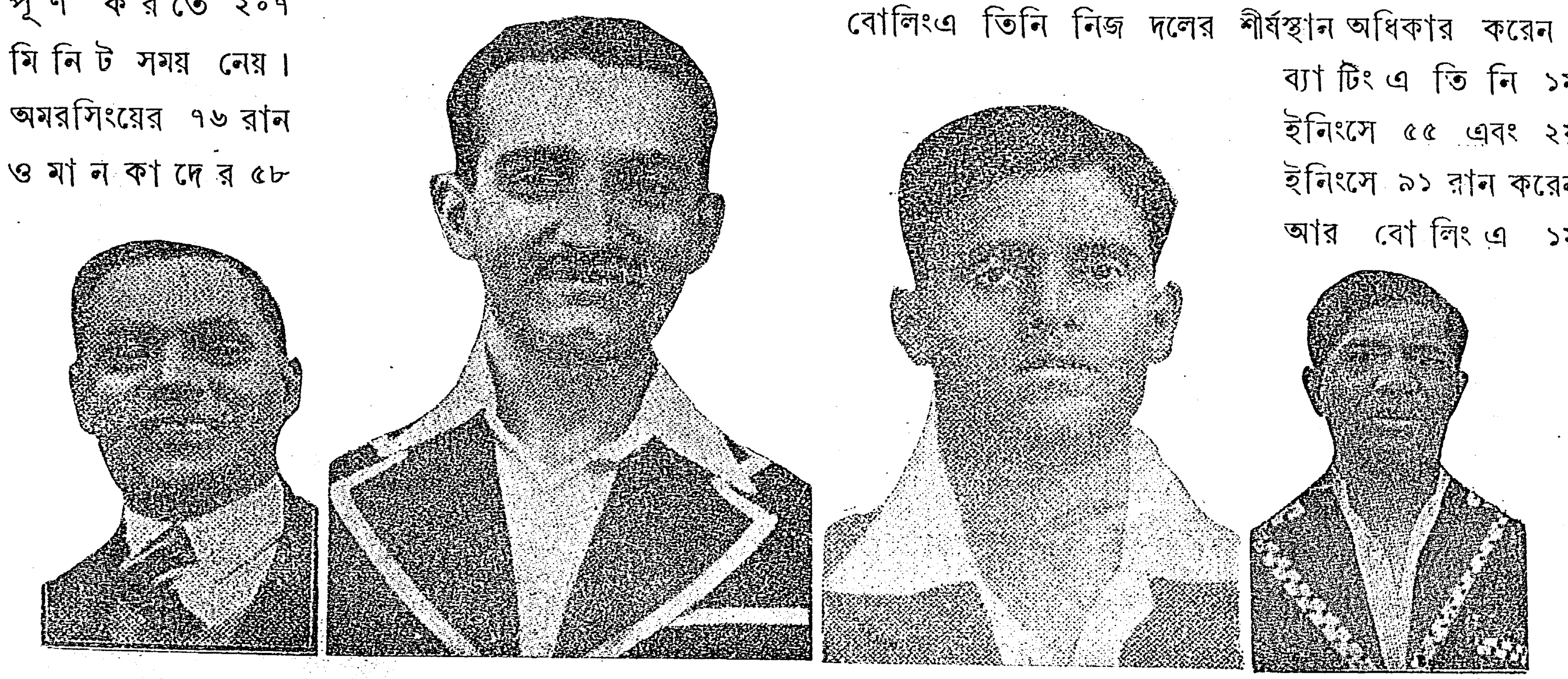

অমরসিং বিজয় মার্চ্চেণ্ট এস্ ব্যানার্জ্জি মানকাদ

নওনগর দলের ৪০৫ মিনিটে প্রথম ইনিংস শেষ হ'ল।

বোম্বের প্রথম ইনিংসে ৩৫১ রান উঠে। অধিনায়ক বিজয় মার্চ্চেণ্ট একাই ১৪০ রান করেন ; আউট হ'বার একবারও সুযোগ দেন-নি। তাঁর খেলা সত্যই অতুলনীয় হ'য়েছিল। এর পর তাঁর ভাই উদয় মার্চ্চেণ্টের ৯৪ রান উল্লেখযোগ্য। নির্ভুলভাবে খেলে খোটে ৫২ রান তুলেন। শেষ খেলোয়াড়গণ মোটেই কিছু করতে পারেন নি। বোলিংএ মানকাদ ৮৭ রানে ৪ উইকেট পান।

মান্দ্রাজ—১৭২ ও ২০০ (৮ উইকেট)

মহীশূর—১০৭ ও ২৬৩

মান্দ্রাজ ২ উইকেটে বিজয়ী হ'য়েছে।

মহীশূরের সহিত রঞ্জি ট্রপির খেলায় মান্দ্রাজ প্রতিবারই বিজয়ী হ'য়েছে। মান্দ্রাজের এবারের বিজয় রামসিংএর ব্যক্তিগত কৃতিত্বের জন্য। উভয় ইনিংসেই ব্যাটিং ও বোলিংএ তিনি নিজ দলের শীর্ষস্থান অধিকার করেন। ব্যাটিংএ তিনি ১ম ইনিংসে ৫৫ এবং ২য় ইনিংসে ৯১ রান করেন আর বোলিংএ ১ম ইনিংসে ৩৫ রানে এবং ২য় ইনিংসে ৪৫ রানে ৫ উইকেট পান। মহীশূরের রামকৃষ্ণাপ্পা মাত্র ১ রানের জন্য সেঞ্চুরী নষ্ট করেন। বিজয় সারথীর ৫৬ রানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম ইনিংসে একটু ধীরভাবে খেলতে পারলে মহীশূর মান্দ্রাজকে পরাজিত ক'রতে পারতো।

রঞ্জি প্রতিযোগিতা ও বাঙ্গলা ঃ

যুদ্ধের জন্য এবারের রঞ্জি প্রতিযোগিতা বন্ধ থাকবে কি না এসম্বন্ধে সমস্ত প্রদেশের মতামত জানবার জন্য বাঙ্গলা থেকে

মেয়েদের বাস্কেট বল প্রদর্শনী খেলায় 'ব্লু' দল। ইহারা ১৮-১৬ পয়েন্টে 'রেড্‌স' দলের নিকট পরাজিত হয় ছবি—পান্না সেন

প্রস্তাব করা হয়। বেশীরভাগ প্রদেশ প্রতিযোগিতা চালানোর পক্ষপাতী হওয়ায় প্রতিযোগিতা চলছে এবং বাঙ্গলাও তাতে যোগ দেবে। কিন্তু বাঙ্গলার উপরোক্ত প্রস্তাব নিয়ে বোম্বের একাধিক কাগজে যে কুশ্রী মন্তব্য করা হ'য়েছে তা অখেলোয়াড়ী মনোভাবের ও হীন মনের পরিচয় দেয়। খবরের কাগজে জনসাধারণের মনের নাকি পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু এই যদি বোম্বের ক্রীড়ামোদিদের পরিচয় হয় তাহ'লে আমরা তাঁদের প্রশংসা ক'রতে পাচ্ছি না। বোম্বের আজ হঠাৎ রঞ্জি ট্রপির ওপর দরদ বাড়লো কেন বুঝতে পারি না। পেণ্টাঙ্গুলারই সেখানকার প্রধান আকর্ষণ যদিও খেলার গুরুত্ব অনুযায়ী দর্শক সমাগম সেখানে বেশী হয় না। Illustrated Weeklyর উক্তি যে বাঙ্গলার শক্তিশালী দল না থাকার জন্যই তারা এবার খেলা না হবার পক্ষপাতী। এই অভিযোগ যে মিথ্যা তার প্রমাণ পূর্ব্বের জামনগর ও বাঙ্গলার ফাইনাল খেলা। বাঙ্গলা থেকে তিন চারজন নিয়মিত খেলোয়াড় ছুটির অভাবে যেতে পারলে না। জামসাহেব তাতেও নিশ্চিন্ত হ'তে না পেরে এস্ ব্যানার্জ্জিকে তার নিজ প্রদেশের হ'য়ে না খেলতে বাধ্য করালেন।

পেণ্টাঙ্গুলার প্রতিযোগিতা ঃ

১৫ই নভেম্বর বোম্বাইয়ে পেণ্টাঙ্গুলার খেলা সুরু হবে। যদি কোন অপ্রত্যাশিত কিছু না ঘটে তাহ'লে হিন্দু ও মুসলীম দলই ফাইনালে খেলবে। মুসলীম গত দুবছর বিজয়ী হ'য়েচে। গত বছর তারা হিন্দু দলকে পরাজিত করে। তার আগের বছর হিন্দুদল যোগদান করে নি। মুসলীম গত বছরের চেয়ে এবার বেশী শক্তিশালী। জাহাঙ্গীর খাঁ এবার মুসলীমদের পক্ষে খেলবেন। পতৌদীর নবাবও হয়ত খেলতে পারেন। খেললে তিনিই মুসলীমদের অধিনায়ক হবেন নতুবা ওয়াজির আলি। বোলিংয়ে যেমন নিসার, জাহাঙ্গীর, মহম্মদ সৈয়দ, আমীর

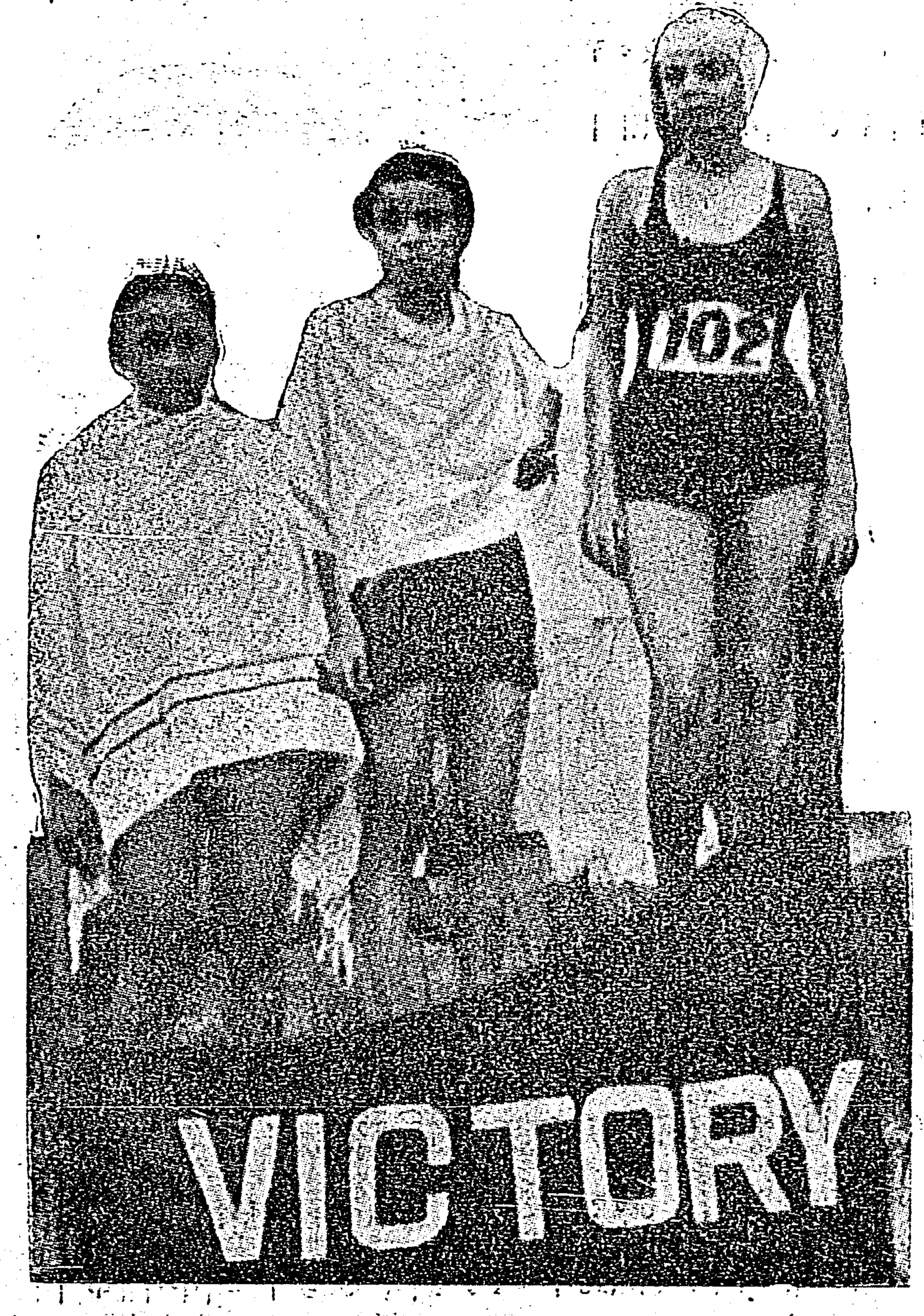

ন্যাসনাল সুইমিং স্পোর্টসের বালিকাদের (সাধারণ) ১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল বিজয়িনী প্রথম—মিস ই সণ্ডার্স, দ্বিতীয়—কুমারী সুখলতা পাল, তৃতীয়—পার্ব্বতী দত্ত ছবি—পান্না সেন

ইলাহি, ব্যাটিংয়ে সেইরূপ ওয়াজির, মাস্তাক, জাহাঙ্গীর, দিলওয়ার ও নাজির। মোটের উপর তাদের দল বেশ

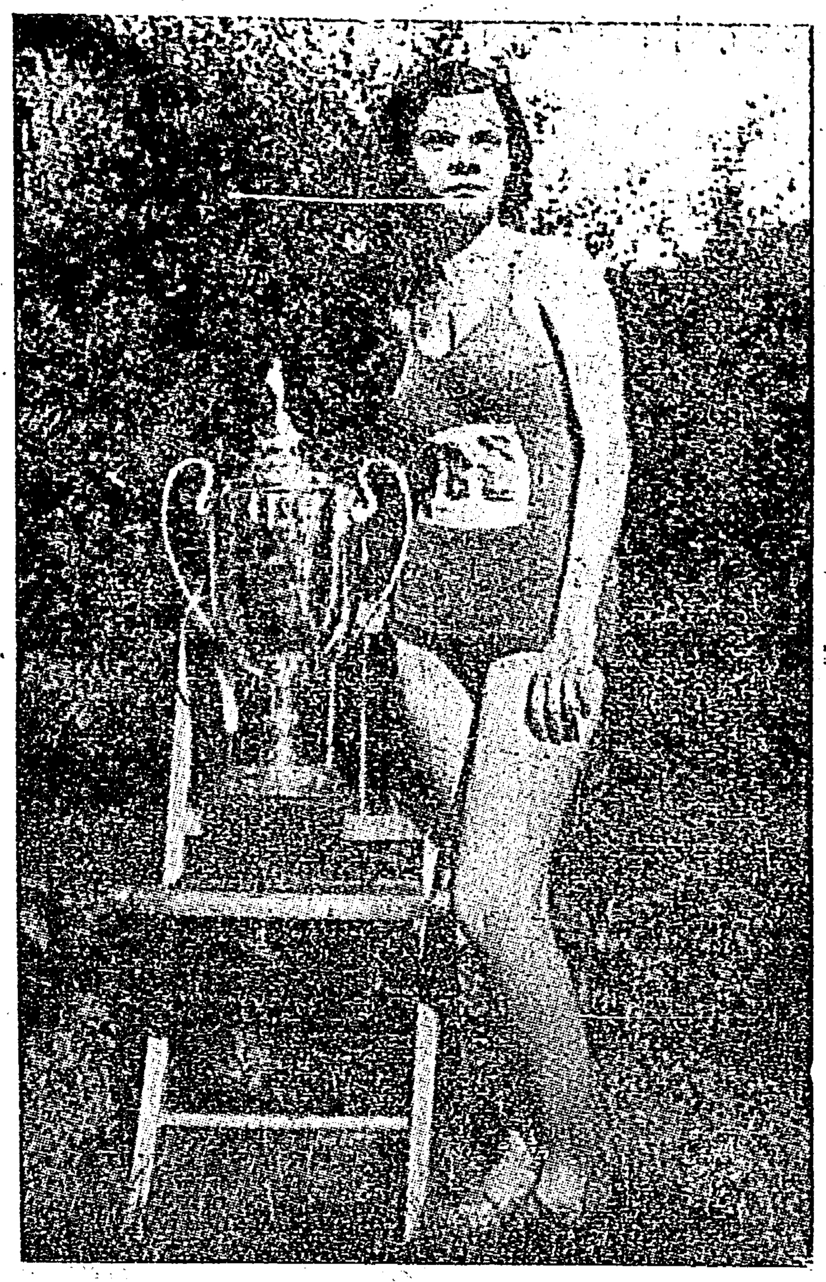

দক্ষিণ কলিকাতা সুইমিং এসোসিয়েশনের মেয়েদের সাধারণ ১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল বিজয়িনী মিস্ এভেলিন সণ্ডার্স ছবি—সি ব্রাদার্স এণ্ড কোং

শক্তিশালী। হিন্দুদলের শক্তিও মুসলীমদের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়, তবে সহযোগিতার অভাব। ব্যাটিংএ

হুগলী স্কালসঃ বিজয়ী কে সি সেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রবি দত্তকে এক লেংথে পরাজিত করেন

সি কে নাইডু, মার্চ্চেণ্ট, অমরনাথ, মানকাদ, হিন্দেলকার ছাড়া অনেক উদীয়মান ভাল খেলোয়াড় আছেন। বোলিংয়ে অমরসিং, সি এস নাইডু, ব্যানার্জ্জি, তা'ছাড়া সি কে, অমরনাথ, সি এস, অমরসিং প্রভৃতি অল রাউণ্ডার আছেন। হিন্দুদলের খেলোয়াড়ের সংখ্যা এত বেশী যে, মনোনয়ন কমিটিকে বেশ মুস্কিলে পড়তে হবে। মেজর নাইডু এবারও হিন্দুদলের অধিনায়ক মনোনীত হ'য়েছেন। নাইডু যে যোগ্যতম অধিনায়ক সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নেই। গত বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতা স্মরণ ক'রে হিন্দুদলের মনোনয়ন কমিটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে

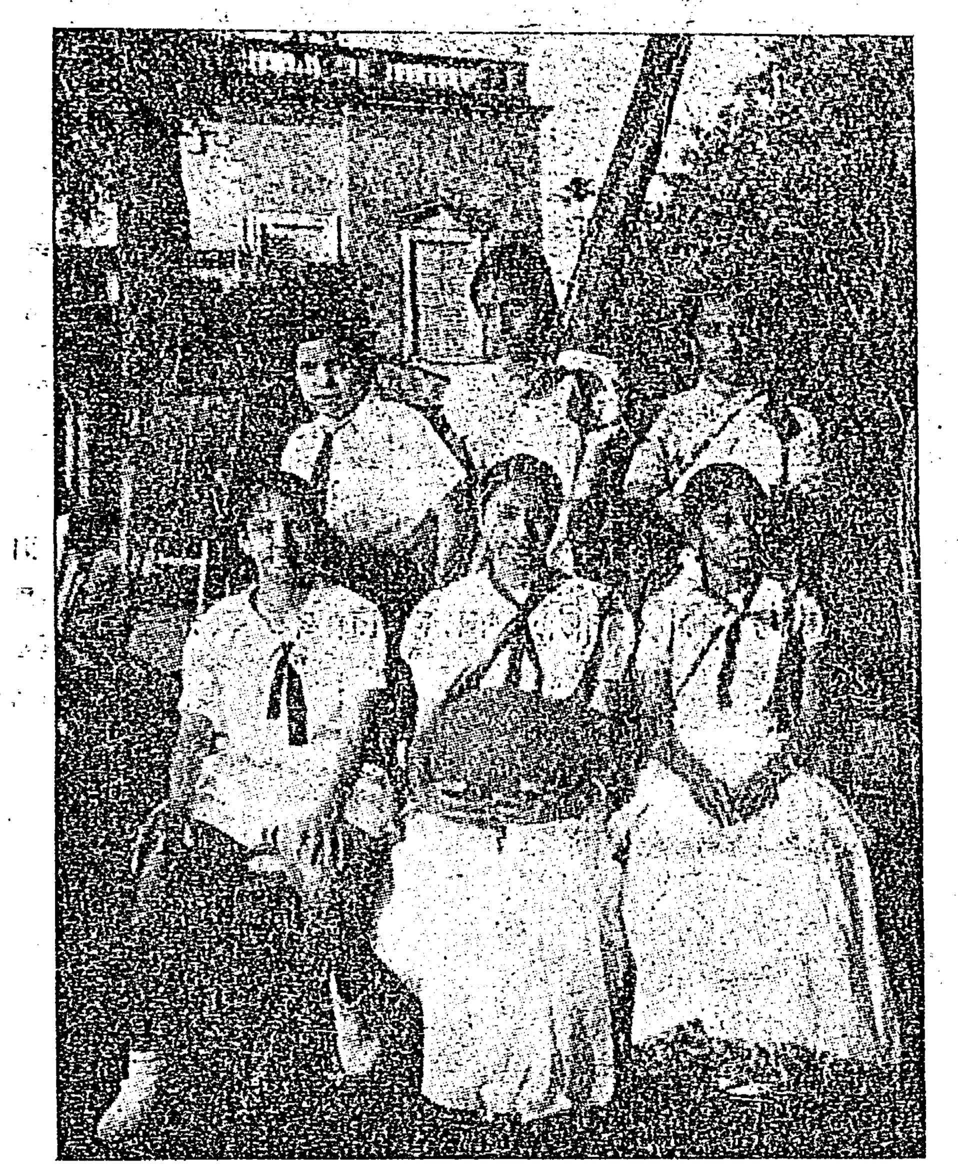

মেয়েদের বাস্কেট বল প্রদর্শনী খেলায় বিজয়ী 'রেড্‌স' দল ছবি—পান্না সেন

ঠিক ক'রেছেন যে, যে কোন খেলোয়াড় তা তিনি যতই নামকরা হ'ন না, যদি নাইডুর অধিনায়কত্বে খেলতে কোন রকম অসন্তোষ প্রকাশ করেন তাহ'লে তাঁকে দল থেকে বাদ দেওয়া হবে। নাইডুর অধিনায়কত্বে খেলতে সম্মত হ'য়ে পরে মাঠে নেমে খেলার নামে যেরূপ অভিনয় কোন বিখ্যাত খেলোয়াড় গতবার দেখিয়েছিলেন তার পূর্ব্বানুবৃত্তি যে হবে না তার নিশ্চয়তা কি? ইউরোপীয়ান দল খুব ভাল নয়। তাতে আবার এবার ক'লকাতা ও মান্দ্রাজের নামকরা খেলোয়াড়রা যুদ্ধের কারণে যোগদান ক'রতে পারবেন না।

পার্শী ও রেঞ্জার্সদল গতবারেরই মত। রেঞ্জার্সদলে সিলোনের কয়েকজন খেলোয়াড় খেলবেন।

মেয়েদের বাস্কেট বল প্রদর্শনী খেলায় 'ওয়াণ্ডার্স' দল। ইহারা ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনকে পরাজিত করে

ছবি—পান্না সেন

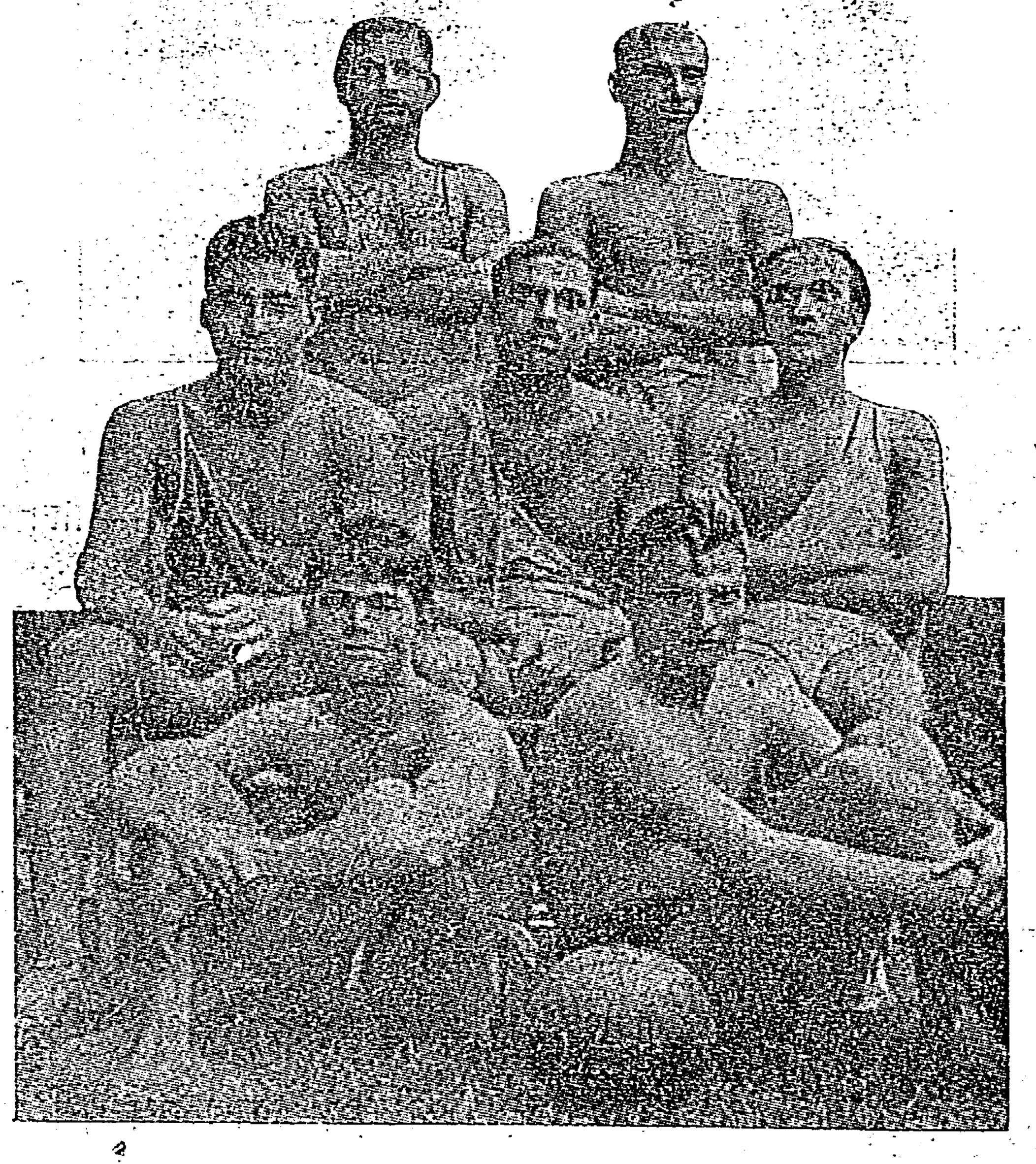

ওয়াটার পোলো খেলায় ব্রাবোর্ণ কাপ বিজয়ী ন্যাশনাল সুইমিং ক্লাব

ব্রাবোর্ণ কাপ ঃ

ব্রাবোর্ণ কাপ ফাইনালে মহমেডান স্পোর্টিং সন্দেহজনক পেনাল্টিতে গোল ক'রে বিজয়ী হ'য়েচে। ইষ্টবেঙ্গলের দুর্ভাগ্য! যে কোন নিরপেক্ষ দর্শকই ইহা স্বীকার ক'রবেন।

রেফারিংয়ের ত্রুটিই বি এফ এ গঠনের অন্যতম কারণ। এবার আবার অন্য এসোসিয়েশন গঠন হবে! বোধহয় না—কারণ মহমেডানরা রেফারিংয়ের ত্রুটিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি।

বেঙ্গল টেবিল টেনিস ঃ

বেঙ্গল টেবিল টেনিস এসোসিয়েশনের ষষ্ঠ বার্ষিক প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হ'য়েছে। এবার প্রতিযোগীর সংখ্যা

কমল বন্দ্যোপাধ্যায়

সর্ব্বাধিক হ'য়েছিল। পুরুষদের সিঙ্গলসে ১০৬ আর ডবলসে ৩১ জুটি যোগদান করে। এ ছাড়া মিক্সড ডবলস্ খেলাটি এবারে নূতন হয়। পুরুষদের সিঙ্গলসে তরুণ খেলোয়াড় কমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্লকুমার মিত্রকে পরাজিত ক'রে জয়ী হ'য়েচে। সে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ভাসিনকে পরাজিত করতে সক্ষম হ'য়েছিল। ১৯৩৭ সালেও কমল এই প্রতিযোগিতায় জয় লাভ ক'রেছিল। পুরুষদের ডবলসে অরুণ ঘোষ ও অমলেন্দু গুহ, হোসেন ও হান্সলসকে পরাজিত ক'রে বিজয়ী হ'য়েচেন। মহিলাদের

সিঙ্গলসে বিজয়িনী হন সালি লাড্ডি, বেঞ্জামিনকে পরাজিত ক'রে। মিক্সড্ ডবলসে অরুণ ঘোষ ও রমলা নাগ, অনিল গুপ্ত ও সালি লাড্ডিকে পরাজিত ক'রেচেন।

টেনিসের ক্রমপর্য্যায় ঃ

টেনিস জগতে আমেরিকার প্রাধান্যই বেশী। গতবারের মত না হ'লেও এবারেও আমেরিকা তার সম্মান অক্ষুণ্ণ

অষ্টিন

রেখেচে। গত বছর বিশ্বের টেনিসের ক্রমপর্য্যায় বাজ ও মুডী যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার ক'রেছিলেন। বাজ পেশাদার হ'য়েছেন আর মুডী এবার কোন খেলায় যোগদান করেন নি; তথাপি এবারও আমেরিকাই শীর্ষস্থান অধিকার ক'রেচে। পুরুষদের প্রথম স্থান পেয়েছেন রিগস আর মেয়েদের মার্ব্বেল।

রিগস

পুরুষদের ঃ

(১) রিগস (আমেরিকা)
(২) ব্রোম উইচ (অষ্ট্রেলিয়া)
(৩) কুইষ্ট "
(৪) ম্যাকনীল (আমেরিকা)
(৫) পুনসেক (যুগোশ্লোভিয়া)
(৬) কুক (আমেরিকা)
(৭) হেঙ্কেল (জার্ম্মানী)
(৮) অষ্টিন (গ্রেটবৃটেন)
(৯) হর্ণ (আমেরিকা)
(১০) কুকুলজেভিক (যুগোশ্লোভিয়া)

ম্যাকনীল

মহিলাদের ঃ

(১) মার্ব্বেল (আমেরিকা)
(২) ষ্টামার্স (গ্রেটবৃটেন)
(৩) জ্যেকবস্ (আমেরিকা)
(৪) স্পারলিং (ডেনমার্ক)
(৫) মাথিউ (ফ্রান্স)
(৬) জেড্রিজোস্কা (পোলাণ্ড)
(৭) ফেবিয়ান (আমেরিকা)
(৮) হার্ডউইক (গ্রেটবৃটেন)
(৯) স্কট "
(১০) বাণ্ডি (আমেরিকা)

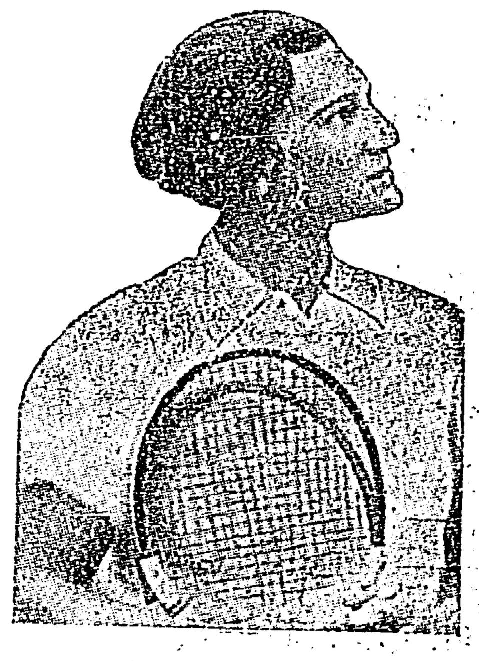

জ্যেকবস্

মার্ব্বেল

টেনিস টুর ঃ

সঠিকভাবে জানা গেছে, ক্যালকাটা সাউথ ক্লাবের তত্ত্বাবধানে বাজ, ভাইন্স, টিলডেন ও ষ্টাফেনের যে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণের কথা ছিল তা বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির জন্য বন্ধ হ'লো। তবে পুনসেক, মিটি ও খো-সীন-কী ইষ্ট ইণ্ডিয়া ও অল-ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়ানসিপের সম্মিলিত খেলায় যোগদান ক'রবেন।

হেলেন উইলস্ মুডি ঃ

বিশ্ববিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় হেলেন উইলস্ মুডি

আয়ার্লাণ্ডের আন্তর্জ্জাতিক পোলো খেলোয়াড় এইফেন রোয়াকের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হ'য়েচেন। এটি উভয়েরই দ্বিতীয় পরিণয়।

উইলস্ মুডি

জলক্রীড়া ঃ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক তৃতীয় বার্ষিক জলক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হ'য়েচে। ন্যাশানাল ও বৌবাজার প্রতিযোগিতায় যোগদান করেনি। ওয়াটার পোলো নক্-আউট-টুর্ণামেণ্টে হাটখোলার সঙ্গে যে গোলযোগ হয় এবং বি এ এস এ তার যে রায় দেয় তার প্রতিবাদের জন্যই তারা যোগদান করেনি। বৌবাজারের যোগদান না করার কারণ অজ্ঞাত। সেণ্ট্রালের মদন সিং ৪৩ পয়েণ্ট পেয়ে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেচে।

অল্-ইণ্ডিয়া-ফুটবল-ফেডারেশন ঃ

মিঃ ডি ময়ের ও মিঃ ই জে টার্ণার যথাক্রমে অল-ইণ্ডিয়া-ফুটবল-ফেডারেশনের সভাপতি ও সম্পাদক নির্ব্বাচিত হ'য়েচেন।

হল্যাণ্ড ভ্রমণ ঃ

ভারতীয় হকি ফেডারেশন একটি শক্তিশালী ভারতীয় দল হল্যাণ্ডে পাঠাবার জন্য সেখান থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছেন। হল্যাণ্ডে দল পাঠান সম্ভব হবে কিনা এবং পাঠাতে হ'লে তার আর্থিক বিষয়ে ব্যবস্থা করবার জন্য নভেম্বরের মাঝামাঝি ক'লকাতায় ভারতীয় হকি ফেডারেশনের এক সভা হবে। সেই সভায় আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতা সম্বন্ধেও আলোচনা হবে।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "হারজিত"—১॥০
শ্রীসতীশচন্দ্র শাস্ত্রী বি-এ প্রণীত ছেলেদের বই "গল্পে বারভুঁইয়া"—৸০
শ্রীঅঘোরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "চার ধাম ভ্রমণ"—১৲
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ"
শ্রীশচীন সেনের "রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিচয়"—৩৲
শ্রীপঞ্চানন রায় প্রণীত "বিবেকের দান"—২॥০
শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্রের "কল্পলোকের কথা"—॥০
শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্তের "কায়াহীনের প্রতিশোধ"—॥০
শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মায়ের গৌরব"—॥৵০
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষের "হরবোলা"—॥০
শ্রীপ্রভাতকিরণ বসুর "জগাপিসি"—॥০
শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্তের "পাতালপুরীর আংটি"—॥৵০
শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে'র "গল্পবেণু"—৷৵০
শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর "মালাই বরফ"—৷৵০
শ্রীসুনির্ম্মল বসুর "পাহাড়ে জঙ্গলে"—৷৵০
শ্রীমতিলাল দাশের "শিশু-মনের চলচ্চিত্র"—১৲
"জীবনের চলস্রোত"—২৲ ও "মনীষা"—১৲
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের "মানুষের প্রথম এ্যাডভেঞ্চার"—১৲
শ্রীনরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ব্যাখ্যাত "মন্ত্র ও পূজা রহস্য"—॥৵০
শ্রীঅসিতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "নবরত্ন"—৸০
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "ভুলের মাশুল"—১॥০
মির্জ্জা সোলতান আহ্মদের "আরুন-অল-রসিদ"—৸০ ও "রঙ্গরস"—॥০
শ্রীভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর "জাহ্নবী"—১৲
শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্তের "গণ্ডগোল"—২৲
শ্রীরাধারমণ দাস সম্পাদিত "পিশাচ ব্যাধের জাল"—৸০
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদারের "বিজ্ঞানের স্বপ্নপুরী"—৷৵০
শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়ের "হে কিশোর চিত্ত"—১৲
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়ের "পিশাচের কর্ম্মফল"—১৷০
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতীর "ব্যথিতা ধরিত্রী"—১॥০
শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "মরণ আহব"—৸০
নন্দগোপাল সেন গুপ্ত প্রণীত গল্পপুস্তক "মিছে কথা"—১৲
শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্যের "বৃদ্ধ বিধাতা"—১৸০
শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়ের "পঞ্চচন্দ্র"—৷০
শ্রীঅজিতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "হত্যার ইতিহাস"—৸০
শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়ার "অরু"—১॥
শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্তের "বিস্ময়ের ইন্দ্রজাল"—॥৵০
'জনৈকা'—র "কেন এ-পথে এলাম"—২৲
সঙ্গীতনায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বহুভাষা গীত"—১॥০
শ্রীগণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "গোপেশ্বর গীতিকা"—১৲
মায়া দে প্রণীত উপন্যাস "তাসের ঘর"—১॥০

বিশেষ দ্রষ্টব্য—২০শে অগ্রহায়ণের মধ্যে যে যাণ্মাসিক গ্রাহকের টাকা না পাইব, তাঁহাকে পৌষ সংখ্যা পরবর্ত্তী ছয় মাসের জন্য ভিঃ পিঃতে পাঠাইব। গ্রাহক নম্বর সহ টাকা মনিঅর্ডার করিলে ৩৵০ আনা, ভিঃ পিঃতে ৩॥০ টাকা। যদি কেহ গ্রাহক থাকিতে না চান, অনুগ্রহ করিয়া ১৫ই অগ্রহায়ণের মধ্যে সংবাদ দিবেন। —কার্য্যাধ্যক্ষ, ভারতবর্ষ

সম্পাদক
শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ || শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons, at the Bharatvarsha Ptg. Works 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta